। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস ।

॥ উত্তর খণ্ড ॥

এ. পি র বই

লেখকের অন্যান্য বই।

উপন্যাস ঃ

লখীন্দর দীগার

কটা-ভানারী

জননী

প্রবন্ধ ঃ

রবীন্দ্রনাথ

॥ রবীন্দ্র-রচনার পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ॥

গুণময় মান্না

জুনাপুর স্টীল

উত্তর খণ্ড ॥



এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স

প্র কা শ ক : নি র্ম লে ন্দু ভ দ্র

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
এ/৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা ১২

মুদ্রাকর। বিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৯

ব্লক নির্মাতা। স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ। নিউ প্রাইমা প্রেস
১১ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদ-রূপায়ণ। খালেদ চৌধুরী

দাম। নয় টাকা

শম্ভুদা

জীবনের যে প্রান্তে আপনি নীরবে সাধনা করে চলেছেন, আমি রয়েছি তার থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তবু আপনাকে কিছু-কিছু বুঝতে যে পারি, এই বই পড়ে হয়তো তা বুঝবেন।

অধ্যায় ১

সমস্ত ফেব্রুয়ারী মাস ধরে জিঙ্কোর কারখানায় স্লো-ডাউন চলতে লাগল। প্রথম হট মিলেই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তারপর যেমন করে একটা দীপ থেকে আর একটা জলে ওঠে, তেমনি করে এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৪" মিলে, ১৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমস্ত মিল এলাকায়, তারপর কারখানার অন্য বিভাগেও ছড়িয়ে পড়ল। কোন দিন আরো কোন বিভাগে ছড়িয়ে পড়বে তার কোনও নিশ্চয়তা রইল না। মার্চের প্রথম দিকেও জেম্‌স্‌ মাধবনের ইউনিয়ন কোন কিছু পাল্টা কার্যক্রম গ্রহণ করল না। কর্তৃপক্ষেরও এসব দেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করবার আছে বলে মনে হল না। সবাই বুঝলে, এ্যাকশন কমিটি এবং এই আন্দোলনের জয়ের আর বিলম্ব নেই।

যখন গঙ্গায় জোয়ার আসে, তখন তার একটা সামগ্রিক রূপ খোলে। মাঝ-নদীতে তার স্ফীত, গর্বিত ভঙ্গী; বাঁকের মুখে সে আবর্ত সৃষ্টি করে, সমমুখী অতিকায় নৌকোকে সে তীরগতি দেয়, বিপরীত-মুখীকে পদে পদে ব্যাহত করে; তীরের কাছে তার-ভঙ্গী চঞ্চল, কলকল ধ্বনিতে সে ছুটতে থাকে, ছোট ছোট জেলে ডিঙিকে তুলে সে আছড়ে ফেলে; তেমনি ছোট তৃণাগ্রকেও সে নাড়া দিয়ে আনত করে স্পর্শ করে।

জুনাপুরের কারখানায়, শ্রমিকদের জীবনে প্রাণের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। জুনাপুরের বস্তির একটি সামান্য বালিকা লীলার হৃদয়েও উন্মেষের ডাক এসে পৌঁছাল। আরও কত ক্ষেত্রে, কত হৃদয়ে এটা কাজ করছিল কে জানে। এদের পরস্পরের সঙ্গে কার্য-কারণগত কোন যোগ আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না, কিন্তু কী বিচিত্র উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে এরা জড়িয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। জীবনের সমগ্রতা বোধ হয় এমনি করে অলক্ষ্যে অথচ অনিবার্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে থাকে।

লীলা তার বন্ধু শেফালির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, একটা ভালো খবর নিয়ে ফিরে আসছে। আর পাঁচ দিন পরে, আগামী পঁচিশে ফাল্গুন শেফালির বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে। শেফালিদের বাসা থেকে ওদের বাড়ি মিনিট পাঁচ

সাতেকের পথ, এই পথটুকু কেমন আবিষ্টের মতো অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে এল সে। খুবই ভালো লেগেছে তার এই বিয়ের কথাটা, কিন্তু কেন জানি শেফালিকে তার থেকে আরো বেশি ভালো লাগছে। শেফালি এই খবরটা দিয়ে সত্যি যেন ওরই খুশির কিছু করেছে। দুপুর থেকে সমস্ত বিকেলটা শেফালিদের ওখানে কাটিয়েছে ও, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও একটুখানি থাকলে হত। জব্বলপুরের সেই কাঠের ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, যার ছবি সে আগেই দেখেছে তাকে খুবই পরিচিত মনে হতে লাগল। হঠাৎ বেলার কথা মনে পড়ল ওর, আর মনে মনে বললে, 'হতচ্ছাড়ী আমার সঙ্গে এলনা কেন…' এখনই গিয়ে তাকে আর কাকিমাকে শেফালির খবরটা দিতে হবে।

একজন সাইকেল-আরোহী পেছন থেকে এসে ক্রিং-ক্রিং করতে করতে পেরিয়ে গেল। লীলা সরে এসে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, আবার হাঁটবার সময় তারই পাশে খোলা, কাঁচা নর্দমাটার ওপর চোখ পড়ল ওর। নর্দমাটা আর চেনাই যায় না, এক রাশ করঞ্জফুল ওটাকে ঢেকে দিয়েছে। রাস্তার ওপরও এসে পড়েছে এখানে-ওখানে। সাদার ওপর বেগুনী রঙের ছোপ দেওয়া ফুলগুলি সব সময়ই গাছ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে। পড়ন্ত ফুলগুলো দেখতে দেখতে ওপরের দিকে চোখ পড়ল লীলার। নতুন, সবুজ পাতার ওপর শেষ বিকেলের আলো এসে ঝিকিয়ে পড়েছে। আবার ওর দৃষ্টি ফুলে-ঢাকা রাস্তার ওপর নেমে এল। এই সব কিছু মিলিয়ে কী যেন ভাবলে ও, তারপর আবার এগিয়ে গেল।

বাঁ-দিকের জলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। আর কয়েক দিন পরে বেরিয়ে-পড়া পাঁকের তলা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এখানেও পাড়ের হিজল গাছ থেকে ঘন গোলাপি রঙের ফুলের আবরণ পড়েছে। মজদুরদের ছেলে মেয়েরা প্যান্টের পকেট আর আঁচল ভরে তাই কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মালা গাঁথবে বলে। জলাটা পেরিয়ে গলি-পথের মাথায় একটা শিমুল গাছ আকাশ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। সব পাতা ঝরে গেছে, একটাও নতুন পাতা নেই, কিন্তু রাশি রাশি লাল ফুল ফুটে গাছটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যেন। মৌমাছি, আর পাঁচ জাতের পাখি গাছটাকে ঘিরে ঘিরে গান গাইছে।

আস্তে আস্তে কখন জুনাপুরের শিল্প-শহরের ওপর এ পরিবর্তন নেমে এসেছে। তার রুক্ষতার ওপর একটা নতুন রঙ ফুটিয়ে দিয়েছে।

অধ্যায় ২

সেইদিন রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় সাবিত্রী বনমালীর পুরণো একটা জামা নিয়ে রিপু করতে বসেছিল। লীলা জানালা খুলে দিয়ে তক্তপোষের ওপর চিৎ হয়ে চুপ করে পড়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে অকারণে গুটানো মশারির কোণাটা আলসেমির ভঙ্গীতে টেনে ধরছে। বেলা মেঝের ওপর সাবিত্রীর পাশে বই খুলে বসে মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে বিশেষ্য-বিশেষণের সংজ্ঞা মুখস্থ করছে আর ফাঁকে-ফাঁকে মায়ের সঙ্গে দিদির বন্ধু শেফালির বিবাহ নিয়ে তীব্র মন্তব্য করছে। নতুন বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে ওরা দুই ভাই-বোনেই নতুন ক্লাশে উঠেছে। এখন শন্তুর নবম, আর বেলার চতুর্থ শ্রেণী।

বেলা শেফালির ওপর ভীষণ চটে রয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসে আশীর্বাদীর পর খুব সাজগোজ করে যখন শেফালি ওদেরকে বিয়ের খবরটা দিতে এসেছিল, তখন তাকে দেখেই খুশি হয়ে উঠেছিল ও। কিন্তু ভাবী বরের ফটো-গ্রাফটা লুকিয়ে লীলাকে দেখাবার সময় বিরক্তির সঙ্গে বেলাকে চলে যেতে বলেছিল শেফালি। সেদিন থেকে বেলা তার নামও করে না, কথাও বলে না। ওর দুঃখটা এই, সাবিত্রী (আর দিদিও) এটার কথা জেনেও শেফালিকে প্রশ্রয় দেয়। বেলা চোখ কুঁচকে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'যাদের বিয়ে তাদের ভাল, আমাদের যাবার দরকার কি...'

সাবিত্রী সামনে এক পা ছড়িয়ে এক পা মুড়ে বসেছিল, সেলাইয়ের ওপর থেকে চোখ না তুলেই বললে, 'তা কি হয়, মা, যার বিয়া তার আনন্দ নয়, আনন্দ হল অন্য লোকের। তাছাড়া, বিয়া-বাড়িতে যেয়ে তোরা সব পাঁচটা দেখবি শুনবি, শিখতে পারবি। তোদেরও ত একদিন আসবেক...'

'ইস্, আমি যাব? দিদি তার বন্ধুর বাড়ি যায় যাবে। আমাকে নোতন ট্যাক্সি-গাড়িতে করে নিয়ে গেলেও যাব নাই...' বলে ও একবার আড়চোখে তক্ত-পোষের দিকে তাকিয়ে ওর ব্যাকরণের ওপর চোখ ফিরিয়ে নিলে, এমন করে পড়তে আরম্ভ করে দিলে যেন এই সব বাজে-কথায় কান দেবার মতো তার সময় নেই।

বেলার কথাগুলো যেন শুনতে পায় নি এমনিভাবে নিজেকে নিজে সাবিত্রী

বলতে লাগল, 'আমার হইছে এক জ্বালা···তোদের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই মরব আমি। তোমাকে কতবার বললম, হ্যাঁ গা, বড় খুকির বিয়ার কি করছ, তিনি বললেন, হবে-হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে কই···' বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ল সাবিত্রীর যে এ নিয়ে অনেক দিন বনমালীর সঙ্গে তার কোন কথা হয় নি। আর, এই ভেবে বিমর্ষ হয়ে উঠল যে, তিনি কিছু না বলুন, সে নিজেও তো আর কোন কথা বলে নি। তখন সে নিজেকেই দোষ দিতে আরম্ভ করলে।

বেলা আশা করেছিল দিদি কিছু বলবে, কিন্তু আগাগোড়া তার থেকে কোনো সাড়া পেলে না। বাতাসে পাল ফুলিয়ে দিয়ে নৌকো যখন ঢেউএর ওপর ভেসে-ভেসে চলে যায়, তখন ঢেউএর দিকে তাকায় না কেউ, বাতাসের কথাও ভাবে না, নৌকোর গর্বিত ভঙ্গীটাই চোখে পড়ে। লীলারও অবস্থা তাই, এরা যে কথাবার্তা বলছিল তা তাকে নিয়েই, কিন্তু এদের কথাবার্তা বা এদের সম্বন্ধে কোন কিছু খেয়াল করতে পারল না লীলা, কিন্তু এ সব অবলম্বন করে যেখানে তার বুকের ভেতর ভরা পালের মতো ফুলে উঠেছিল, যেন সেই দিকেই তাকিয়েছিল ও।

কিছুক্ষণ আগে সাবিত্রী ওকে বলেছিল, 'ওরে, জানলা খুলে রাখিস নি, ফাগুন মাসের বাতাস চট করে ঠাণ্ডা ধরে···,' কিন্তু শুনে লীলা কেবল একটু হেসেছে, জানালাটা তেমনি খোলা রয়েছে। সিরসিরে হাওয়া এসে ওর মাথার চুলের ওপর লাগছে, তারপর সারা শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। শেফালির বিয়ের কথাই ভাবছিল ও। আসছে বিষ্যুদবারে সন্ধ্যাবেলার ভাবী ঘটনাগুলো পরপর চোখের সামনে ঘটতে দেখছিল যেন ও। ওর মুগ্ধ-দৃষ্টির সামনে একটা আনন্দ টলটল করছিল যেন। ওর মনে হল না যে এসব শেফালিকে ঘিরেই হবার কথা, বা ওর নিজের সঙ্গে এসব জড়িত নয়। কিন্তু কেমন করে একটা নিবিড় আর তীব্র প্রত্যাশা ওর বুকের ভেতর টনটন করতে লাগল যেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মুচকে হাসল লীলা। পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল আলোতে সমস্ত ঘরখানা ভরে গেছে। বেলা তার পাশ থেকে উঠে যাবার সময় মশারি তুলে জানালা খুলে দিয়ে গেছে। বাঁ-দিকে আলনাটা থেকে কাকিমার একটা শাড়ি ঝুলে পড়ে বাতাসে পতপত করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে, কাপড়-চোপড়ে ঢাকা কোনো বউ মুখটি নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লীলা উঠতে গিয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়ল উপুড় হয়ে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে। রাস্তার ওপারে ডান দিক ঘেঁষে একটা আমগাছ, মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে। মৌমাছি আর

পতঙ্গ গুনগুন করছে, গুঁড়ি-গুঁড়ি রেণু পড়ছে ঝরে। লীলা তার ডান হাতটা বালিশের ওপর রেখে তার ওপর গাল চেপে পড়ে রইল। বাতাসে মুকুলের মৃদু গন্ধ যেন অনুভব করল ও। আস্তে আস্তে কখন চোখ দুটি নিমীলিত হয়ে এল ওর। মনে হল, এসব যেন কোথায় কবে সে দেখেছে, অনুভব করেছে।

গত রাত্রিতে যে কথা ভাবছিল ও, শেফালির বিয়ের কথাটা একেবারেই মনে পড়ল না ওর। কিন্তু ছায়াছবির মতো পরপর ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল কতকগুলো ঘটনা, ওর নিজেরই জীবনের। কেন জানি, বাবার কথা মনে পড়ল ওর। বাবা বেঁচে থাকলে আজ তিনি ওকে নিয়ে কি করতেন? এদের গৃহ-প্রবেশের দিন জ্যাঠামশায় (চন্দ্রকান্ত) দেখতে এসেছিলেন। কেন, কি ভেবেছিলেন উনি? এ পাড়ার মদন বাগুলিকে কাকা খুব পছন্দ করেন। ছেলেটা কেমন লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বসে থাকে। কুস্তি-প্রতিযোগিতা দেখে ফিরবার সময় ব্যানার্জী সাহেব ওকে মালা দিয়েছিলেন। মালাটা নেবার সময় কিছু মনে হয় নি, কিন্তু শত্রুর চোখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর কেঁপে উঠেছিল ওর। ও কি ভয় পেয়েছিল?

লীলা বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। ওর মনে হয়, এসব ঘটনা তার জীবনে এমনি ঘটছে না। সব কিছু মিলে তার মধ্যে কোনো কিছু একটা ঘটিয়ে তুলতে চাচ্ছে—তার বুকে কোথাও, খুব ভেতরে—কিন্তু সেটা কি তা সে ধরতে পারে না।

পৌষ সংক্রান্তির মেলার কথা মনে পড়ে ওর। উনি অমনি করে নিয়ে এসেছিলেন কেন। ভাগ্যিস, বেলা সঙ্গে ছিল। কিন্তু বেলা যদি না থাকত, তাহলে···তাহলে কি করতেন উনি? লীলার ছোট নাকটা স্ফুরিত হয়ে উঠল, সমস্ত শরীরের ভেতর একটা উত্তপ্ত বেগ অনুভব করল ও, নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল। লীলা উঠে দাঁড়াল মেঝের ওপর, দুই গালের ওপর দু'হাতের তেলো রাখলে, কিন্তু তারপর কি করবে বুঝতে পারল না।

'আশ্চর্য, উনি ডাকবা মাত্র আমি তো গাড়িতে উঠে এসেছিলাম। কেন না বলি নি···' নিজের মনে হেসে উঠল লীলা।

অধ্যায় ৩

লীলার এই ভাবান্তর সাবিত্রীর চোখ এড়াল না। কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে ও ভাঙা-গলায় বলে উঠল, 'কি মা, এত শীগ্রি ঘুম ভাঙল, এই ত সবে চারদিকে রোদ উঠেছে···ত এখন কি করবে, কালকার মতন বন্ধুঘর যাও?' বলে ও সতর্ক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রান্নাঘরের ভেতর থেকে খিলখিল করে হেসে উঠল বেলা, ছাই দিয়ে দাঁত ঘসতে ঘসতে বাইরে বেরিয়ে এসে ও বললে, 'মা বেশ বলেছে, সেই ভাল, দিদি বন্ধুঘর যাও···'

লীলা চমকে বারান্দায় থতমত খেয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল, অন্যমনস্কের মতো মুচকে হেসে তারপর সোজা নেমে এল কলতলায়। 'কাকিমা, আমাকে ডেকে দাও নি কেন। দাও, আমাকে বাসনগুলো দাও, যাও তুমি···' বলে এক রকম জোর করে সাবিত্রীকে উঠিয়ে দিয়ে বসে পড়ল ও।

সাবিত্রী আপত্তি না করে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। লীলার চমকে ওঠা, আর কাজে এই হঠাৎ আগ্রহ তার কাছে খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হ'ল। লীলা যে হাসছে তা যেন আর-কিছুর কথা ভেবে, তাদের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। লীলা কাজ করছে এটা তাকে আনন্দ দেবে কি, তার ভয় করতে লাগল। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এইটে মনে হতে লাগল তার এবং এর জন্যে সে নিজেকেই দায়ী করতে আরম্ভ করল।

ওখান থেকে চলে গেল সাবিত্রী। একবার শোবার ঘরে, সেখান থেকে তারপর রান্নাঘরে ঢুকল, কিন্তু এটা-ওটা ছুঁয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো কাজ করতে পারল না। এক সময় উনুনের কাছে পিঁড়িতে বসে সাবিত্রীর নিজের মনেই একটা অদ্ভুত চিন্তা উঠল। 'এই আমি ইয়াদের সংসারে আছি, আমি কেনে আছি··· আমি বেঁচে আছি ত?' নিজের মনে ককিয়ে ককিয়ে ও প্রশ্ন করলে। এদের কেউ কোনো দিন তার দিকে তাকায় নি, সে আছে কি গেছে তার খোঁজ নেয় নি। নিজের জীবনের পেছন দিকে তাকাল ও—সব কিছু ভুলে গিয়েছে। কবে বিয়ে হয়েছিল তার, কেমন করে এখানে এসেছিল, সব অস্পষ্ট, ঝাপসা হয়ে গেছে।

বেলা পড়তে সন্ধ্যা নাগাদ রোয়াকে পা ছড়িয়ে এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে ঢক ঢক করে জল খেল সাবিত্রী। উঠতে যাবে এমন সময় উড়ন্ত চড়ুই পাখির মতো বোন দু'টি বাইরের ঘর থেকে ছিটকে এসে বারান্দা বেয়ে উঠোনে পড়ল। ওরা লুকোচুরি খেলছে। লীলা হাঁপাতে হাঁপাতে সাবিত্রীর কাছে সরে এসে তার হাঁটুর ওপর হাত রেখে বলল, 'না-না, কাকিমা, তুমি উঠো না। আর একটু বস, লক্ষ্মীটি, তুমি আমাদের 'বুড়ি' হও…'

লীলার মুখখানি আরক্ত, চুলের কুচি এসে কপালে গালে পড়েছে, পরিশ্রমে বুক ওঠানামা করছে, যা বলছে তার থেকে অনেক বেশি কথা ফুটে উঠেছে ওর চোখে-মুখে। সাবিত্রী ওর মুখের দিকে তাকাতে পারল না, চোখ ফিরিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'কি রে, তোরা সব পড়ে যেয়ে হাত-পা ভাঙবি, না কি…', কিন্তু ততক্ষণ ডাক দিয়ে লীলা আবার বেরিয়ে গেছে।

এমনি করে দিন দুই কাটল লীলার, তারপর হঠাৎ ও চুপ করে গেল। লীলা কখনো রোয়াকের খুঁটিতে ডান হাতে বেড় দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুলে করে মেঝের ওপর জলের হিজিবিজি কাটে, একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, যেন কী পরীক্ষা করছে। বিছানায় চুপ করে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে কিন্তু ঘুমোয় না। কিছু জিজ্ঞেস করলে এক রকম করে তাকায়, যেন তাকে কথাটা বলা হয় নি।

সাবিত্রী এই সব দেখে আর ওর বুকের ভেতর শুকিয়ে ওঠে, হাত-পা কাঁপে। ওর মনে হয় ও আর বাঁচবে না, আর একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলে ও বলে, 'সেই ভাল, ভগমান আমাকে নিক…।'

বুধবার রাত্রে বনমালীকে খেতে দিয়ে সাবিত্রী মাথার কাপড়টা একটুখানি টেনে বললে, 'কাল রায়বাবুদের উখেনে যাচ্ছ ত, মেয়ে দু'টোকে নিয়ে যাও তুমি…'

বনমালী খাওয়া থামিয়ে সাবিত্রীর মুখের দিকে একবার তাকালে, কিন্তু কিছু না বলে আবার চুপ করে খেয়ে যেতে লাগল। সাবিত্রী যে-কথা বলতে যাচ্ছিল মনে হল সেই কথাটাই মনে মনে কাজ করছিল ওর। কথাটা অন্যের মুখে শুনে বিরক্ত হয়ে উঠল, গৃহস্থ লোকের যাত্রা করবার সময় পিছু ডাকলে যেমন হয়।

আনত বনমালীর মুখটা গালের উঁচু হাড় আর খাড়া নাকের নিচে আড়াল পড়েছিল। সাবিত্রী সেদিকে ক্ষণকালের জন্য তাকিয়ে রইল, স্বামীর বিরক্তির কারণটা যেন ও অনুমান করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ও আর কথা কাঁদাকাঁদির

মধ্যে না গিয়ে বললে, 'দেখ গা, তুমাকে একটা কথা বলছিলম··· বড় খুকির বিয়ার কি করলে? যা হোক একটা বন্দোবস্ত কর তুমি, আমার কিছু ভাল লাগছে নাই···'

'হুঁ, কি বলছিস! পাত্র কি পাঁচ-দশটা আমার আঙুলের ডগায় ঝুলছে যে বললেই তোর কাছে এনে দিব···'

সাবিত্রী থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু দুর্বল মানুষ ঘা খেলে হয় নিবে যায়, নয় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সাবিত্রীর বাঁ হাতটা ঘন-ঘন নড়তে লাগল, ও ধরা-ধরা গলায় বললে, 'সে কি গো, পাত্র কি নাই! শিবু আছে, মদন আছে, ঠিক নাই কি···'

এ'কথার কোনও উত্তর দিলে না বনমালী। ধীরে-সুস্থে খাওয়া শেষ করে মোলায়েম হেসে বললে, 'ছোটকীর বুঝি খুব বিয়া-বিয়া মনে হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া সেরে আয় উ-ঘরে, বলবখন···' বলে অর্থপূর্ণভাবে চোখ কুঁচকে আসন থেকে উঠে গেল ও।

বাইরের ঘরে জানালার পাশে চৌকিতে ওর বিছানা আগেই পাতা হয়েছিল, কিন্তু বিছানায় গেল না বনমালী। শম্ভুর চেয়ারে বসে তার পড়বার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে বিড়ি টানতে লাগল ও, আর সাবিত্রীর অপেক্ষা করে রইল।

এই কয়েক মাস বনমালীর অদ্ভুতভাবে কেটেছে। ডিসেম্বর মাসের কুস্তি-প্রতিযোগিতার ঘটনা তার মনে একটা শান্তি এনে দিয়েছিল। তার পর সে নিজের নতুন ঘরখানা সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার দিকে মন দিলে। এর আগে সাহেব-মালিকের কাছ থেকে পাওয়া টাকায় ভাইঝিকে সেলাইয়ের কল কিনে দিয়েছিল ও। এখন আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে শোবার চৌকি, শম্ভুদের পড়াশোনা করবার জন্য চেয়ার টেবিল, নতুন কয়েকটা ব্র্যাকেট, টুকি-টাকি এটা-ওটা কিনেছে। এই বস্তির খোলার আর মাটির ঘরে বিজলী আলো নেয় না কেউ, কিন্তু বনমালীর ইচ্ছে রাস্তার পোস্টের থেকে একটা লাইন সে নয়।

কিন্তু যে-আনন্দের জন্যে এসব পরিকল্পনা তার মাথার মধ্যে ঘুরছিল, তা ঘটল কই। ডি-কে সাহেবকে শুধু কারখানা আর জুনাপুর কেন, এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। কুস্তি-প্রতিযোগিতার দিন ব্যানার্জী সাহেবের কৃপাও লাভ করেছে সে, কিন্তু তারপরে যা ঘটা উচিত, তা ঘটছে না। অথচ বাধাও তো ছিল না কিছু।

'আমি হাঁদা···হাঁদু আমি চুপ করে আছি, আর সবাই বনবন করে ছুটে যাচ্ছে···' চিবিয়ে চিবিয়ে মনে মনে বলতে লাগল ও, বিড়িটাতে জোরে-জোরে টান দিলে। আজ এক-মাসের ওপর হল, কারখানায় 'ধীরসে চলো' আন্দোলন চলছে, এ্যাকশন কমিটি আর জেম্‌স্‌ সাহেবের ইউনিয়নের মধ্যে কামড়া-কামড়ি আরম্ভ হয়ে গেছে, ব্যানার্জী সাহেবও বসে নেই। বনমালী বুঝতে পারে, এই সুযোগ চিরকাল থাকবে না, এখনই যা করার করে নিতে হবে তাকে। হয়তো আর ক'দিন পরে সাদা সাহেব আর কালা সাহেবের মধ্যে বোঝা-পড়া হয়ে যাবে, তখন সব শেষ। তখন এ্যাকশন কমিটি এক দিনের জন্যও টিকবে না। কিন্তু কি করে কি করবে সে?

এরই মধ্যে একটা জিনিস গোপন সংকল্পের মতো তার মনে এসে পড়ে আর তার নিরুত্তাপ চিত্তকেও উত্তেজিত করে তোলে। একটু আগে সাবিত্রী যখন লীলার বিয়ের কথা পাড়ে, তখন সেই কথাই মনে মনে চিন্তা করছিল ও। কৃপণ যেমন করে তার সব চেয়ে মূল্যবান রত্নটি গুপ্ত স্থানে রেখে দেয়, কথাটা বনমালী ঠিক তেমনি করেই রেখেছিল, নিজের সঙ্গেও বেশি নাড়াচাড়া করত না। সাবিত্রীর কথায় সেই জন্যে অমনি চমকে উঠেছিল ও।

কুস্তি-প্রতিযোগিতার পর ফিরে আসবার সময় ব্যানার্জী সাহেব মালা দিয়েছিলেন লীলাকে। মুহূর্তে চিচিং-ফাঁক-এর মন্ত্র পেয়ে গিয়েছিল বনমালী। সাহেবের মুগ্ধ-দৃষ্টি মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছিল সে: একে সহজে কাজে লাগানো চলবে না। কে জানে এখনো ঠিক সেই সময় এসেছে কি না।

হঠাৎ বনমালী চমকে উঠল, কয়েকটা কুকুর রাস্তার ওপর কোথায় সমস্বরে কেঁউ কেঁউ করে উঠেছে। ইস্‌, কত রাত্রি হয়েছে। কিন্তু সাবিত্রী এখনো এলনা কেন—বনমালীর মনের ভেতর খট করে উঠল। একবার ও ভাবলে, তার কাজ শেষ হয় নি এখনও। কিন্তু তার পরই কান পেতে শুনলে, সব চুপচাপ হয়ে গেছে এবং সাবিত্রী হয়ত শুয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে ভেতরের বারান্দায় উঠে গেল ও, বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে, 'ছোটকী, এ ঘরে একবার আয়। আমি বসে আছি তোর জন্যে···'

ফিরে আসতে আসতে চোখ দুটো জলে উঠল ওর, সাবিত্রীর, না কি, নিজের ওপর আক্রোশে। আগামী কাল রাত্রে দামুনিয়াতে তারা তিন সাঙাৎ মিলে পিকনিক করতে যাবে—রব্‌বানি (তারই গাড়িতে যাবে ওরা), সুরেন সাহা আর সে নিজে। সেটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর প্রতি বনমালীর বুকের

ভেতরটা কঠিন হয়ে উঠল। মেয়েটা আজকেই কি না সব মাটি করতে বসেছে? লীলার বিয়ে হোক বা না হোক, তাকে নিয়ে কি করা হবে না হবে, তাতে সাবিত্রীর কি আসে যায়। তার এত মাথা-ঘামানো কেন।

শক্তুর চেয়ারটায় বসে ঐ আক্রোশের ওপরই ঠোঁট বাঁকাল বনমালী। উনি আবার রাগ করেছেন! বালির ওপরকার জলের মতো এখনই চুইয়ে নিচে পড়বে। একটা বিড়ি ধরাল ও, কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে উষ্ণ হয়ে উঠল ও, এবং এক সময় আবার উঠতে হল ওকে। মুহূর্তের জন্য সংশয় এল ওর মনে, কিন্তু তারপরে আবার শোবার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হল।

দরজায় শব্দ পেয়ে উঠে এল সাবিত্রী, কাপড়-চোপড় সামলে বনমালীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে বললে, 'আমার ঘুম নাই, আমি জেগে আছি। কিন্তু তুমি কেনে জেগে আছ, কাল সকালে তুমার কারখানা নাই? তুমি যাও···আমি যাব নাই বলেছি ত যাব নাই···'

বনমালী চমকে উঠল, এমনি থমথমে কণ্ঠস্বর সে আশঙ্কা করে নি। মুহূর্তের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও, তারপর তোষামুদির স্বরে বললে—কোন প্রতিকূলতার সামনে স্বতই যে-ভাবটা ওর চোখে-মুখে আর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠে—'ছোটকী, আমার দোষ হইছে, কিন্তু তাই বলে কি তার ক্ষালন নাই। আমি তোকে কথা দিচ্ছি, কাল দামুন্যা থেকে ফিরে এসে বড়-খুকির সব ঠিক করে ফেলব···তোর দিব্যি বলছি···'বলতে বলতে সাবিত্রীর হাত দুটো ধরলে ও, লীলার ভাগ্য নিয়ে ভাবী কোনও চাল ঠিক তখনই তার মনের মধ্যে এল হয়তো।

কয়েক মুহূর্তমাত্র। বনমালীর হাত থেকে সাবিত্রীর হাত দুটো ছিটকে যেতে চাইল, কিন্তু হাত দুটো কাঁপছিল ওর, তারপর থেমে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল। সাবিত্রী স্বামীর হাতে হাত রেখে বাঁ-দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে লাগল। বনমালী ওকে জড়িয়ে টেনে নিলে, তারপর তার ঘরে নিয়ে গেল ওকে।

সাবিত্রীর এই প্রথম বিদ্রোহ, আর প্রথমেই এমনি করে তার পরিণতি হ'ল। কিন্তু তার জন্যে বনমালীর প্রবঞ্চনা হয়তো দায়ী নয়। নারীর বিশ্বাস তার বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। অনুনয়ের—হোক কামার্ত, তবু আর্ত হৃদয়ের আবেদন মমতাময়ী পাশ কাটিয়ে যেতে পারল না।

অধ্যায় ৪

শেষ পর্যন্ত নিজের গোঁ বজায় রেখেছে বেলা, বিয়ে-বাড়িতে সে আসে নি, লীলাকে একাই আসতে হয়েছে। বনমালীও আসতে পারে নি, কেন না আজ রাত্রেই দামুনিয়ায় পিকনিক করতে যাচ্ছে তারা, কিন্তু বিয়ে-বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে লীলাকে। ওকে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ আর স্নেহ দেখিয়েছে সে, এবং কিছু দূর থেকে চলে যাবার সময় আদর করে বলেছে, একদিন ওকে ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

৩৪″ মিলের ফিনিশিং বে'র এ্যাসিস্ট্যান্ট্ রোলার রাখালচন্দ্র রায় মেয়ের বিয়েতে জাঁকিয়ে ছিল ভাল। তার অতি-সংকীর্ণ ভাড়া-বাড়িতে বিয়ে হতে পারে না, সেই জন্যে জুনাপুর-আরানসোল রোডের ধারে এক ভদ্রলোকের দোতলা খালি বাড়িটা কয়েকদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিল ও। ছাতনাতলা হয়েছে ভেতরের উঠোনে। বাড়ির সামনের মাঠে সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে অঢেল চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে, অভ্যাগতদের বসবার জন্যে। লীলা সন্ধ্যার মুখোমুখি বাড়ির ভেতরে ঢুকে বিহ্বল হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। অজস্র বিজলীর আলোই কেবল তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল তাই নয়, এত বিচিত্র-বেশ ছেলে-মেয়ে, মেয়ে-পুরুষ, তাদের হাসি উৎসাহ, কলরব, এসবের মধ্যে সে যে কি করবে বুঝতে পারল না।

সিঁড়ির পাশে ওরই সমবয়সী একটি মেয়েকে ও অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, শেফালি···মানে, যার বিয়ে হবে, সে এখন কোথায় বলতে পারেন···'

সে কিছু বলার আগেই সিঁড়ির বাঁকের মাথা থেকে আর একজন কাপড়ে-গয়নায় ঝলমলানো, বিবাহিতা মেয়ে তরতর করে নেমে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। যেন মনে মনে কোনো কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে এমনিভাবে লীলার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ও। তার সকৌতুক ভাবটা কেমন ম্লান হয়ে এল যেন, বললে, 'তোমার নামটি কি ভাই, লীলা পাল?'

লীলা উত্তর দিতেই আবার সে বললে, 'ওপরে এস তুমি। তোমার বন্ধু তার বরের থেকে তোমার কথাই বেশি ভাবছে। তা ভাববার মতন বন্ধু

বটে…'বলে ও লীলার থুতনিতে আঙুল দিয়ে নেড়ে দিলে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে লীলার দিকে চোখের কোণে তাকিয়ে নিজের পরিচয় দিলে, 'আমার নাম বীণা, আমি শেফালির পিস্তুত দিদি…' বলে ও মুচকে হাসলে, যেন এতক্ষণে নিজের আসল ভাবটা ফিরে পেয়েছে ও।

চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের এই মেয়েটির বিয়ের আগের থেকে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিয়ের আগে যে মেয়েকে দেখা যায়, উচ্ছল, হাসি-খুশি, বিয়ের ঠিক এক বছর পরে দেখা যাবে কেউ যেন তার সবটুকু নিংড়ে নিয়েছে। উদ্বিগ্ন, ক্লিষ্ট মুখ, ভীত চকিত দৃষ্টি, ম্লান দেহশ্রী। কিন্তু বীণার ঠিক উল্টো। ওকে এখন ওর বন্ধুরা বলে, 'দারোগা-গিন্নীর উপযুক্ত চেহারা করেছিস!' ওর খোকার বয়স আট মাস, এই সেদিন অন্নপ্রাশন হয়েছে। শ্বশুর-বাড়িতে ওর সমস্ত খাটা-খাটুনি বন্ধ। এখন স্বামীর থেকে আদর পাবার পরিবর্তে আঙুর-বেদানার ঠোঙা পাচ্ছে আর চুষে-চুষে শরীর সারাচ্ছে।

লীলা পরিচয় পেয়ে আগেকার মতো অস্ফুটে বললে, 'ও, আপনি বীণাদি, আপনার কথা শুনেছি…'

লীলার এই সলজ্জ, ঈষৎ-বিমূঢ় ভাবটা ভাল লাগল বীণার, একটু আগেকার অস্বস্তিটা উবে গেল যেন। বললে, 'আর বল কেন ভাই, এরা বিয়ে-বাড়ি নামিয়েছে, কিন্তু কিছু যদি ঠিক আছে। যা না দেখছি তাই হচ্ছে না…' বলে গর্বিত, পূর্ণ দৃষ্টিতে লীলার দিকে ও তাকালে, বলতে চাইলে যেন বিয়ে-বাড়ির একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে যা বয়স্করা ঠিক বুঝতে পারে নি, আর যা ওর কাছে অস্পষ্ট নেই।

বীণার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেমন একটা আবেগ অনুভব করছিল লীলা, যা ও নিজেই বুঝতে পারছিল না। বীণার কথাগুলো সত্যি বলে মনে হচ্ছিল ওর কাছে।

দোতলায় শেফালির ঘরে নিয়ে গেল ওকে। অনেকখানি চেষ্টা করে ভিড় কাটিয়ে শেফালিকে দেখতে পেল ওরা। কয়েকজন মেয়ে শেফালিকে সাজিয়ে তোলার কাজ আরম্ভ করেছে। আরও একদল ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, যে-কোনো সময় কাজে হাত দিতে প্রস্তুত এমনি ভাব নিয়ে। উৎসাহ এবং মন্তব্য প্রকাশ করে সাজানোর কাজটাকে মন্থর করে তুলছে ওরা। ওদের পেছনে এবং দরজার মুখে আরো কয়েকজন রয়েছে, যারা অতখানি ঘনিষ্ঠ হতে চায় না অথচ সাজানোর ব্যাপারটাও ছেড়ে যেতে পারছে না। ওদেরকে পেরিয়ে

যাবার সময় ওদের মুখের ওপর চোখ পড়ল লীলার। সকলের মধ্যে একই ভাব দেখতে পেলে ও—একটা প্রত্যাশা আর খুশির ভাব ফুটে উঠেছে।

বীণা লীলার হাত ধরে এনে শেফালির কাছে ছেড়ে দিলে, 'নাও, এই নাও তোমার বন্ধু। বাব্‌বা, আমাকে খেয়ে ফেলছিলে তুমি!' বলে ও একটু হাসল এবং সগর্ব দৃষ্টিতে অন্যদের দিকে তাকালে। শেফালি মাথাটা একজন মেয়ের হাতে তেমনি করে রেখে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বললে, 'আয়, আয়, বস…' লীলা বন্ধুর দিকে চোখ রেখে ঠিক ওর পাশে গিয়ে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের থেকে কয়েকটা রুষ্ট দৃষ্টি এসে পড়ল ওর ওপর, যেন বলতে চাইলে, 'তুমি কে হে বাপু, ওখানে গিয়ে বসছ আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি…,' কিন্তু পর মুহূর্তেই লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই দৃষ্টিতেই একটা বিস্মিত সমর্থন ফুটে উঠল: 'মেয়েটা কে রে, কনের বন্ধু?' লীলার সেদিকে লক্ষ্য করার মতো অবস্থা ছিল না, শেফালির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ওর অপরিচিতের মতো মনে হচ্ছিল। তার ডাকের মধ্যে সেই পুরাণো ঘরোয়া আন্তরিকতার ভাবটা খুঁজে পেলে না ও।

বীণার এখানে এসেই চলে যাবার দরকার ছিল, যাবার সময় ওর চুড়ি-কঙ্কণ-ঢাকা হাত বাড়িয়ে শেফালির থুতনিটা নেড়ে বললে, 'দেখি, কেমনটি হল, নিম্‌কিতে কামড় দেবার মতো হয়েছে কি না…'। শেফালি ঝনকে উঠে কি বলতে গেল, কিন্তু ফেটে-পড়া হাসির হল্লোড়ে তার কৃত্রিম প্রতিবাদ কোথায় ভেসে গেল। লীলাও হাসল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল, এটা আসলে পরিহাস নয়, এর অন্য কোনও অর্থ আছে।

একটা পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে নিজের চিবুকে আঙুল লাগিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এক সময় বললে, 'আচ্ছা, বিয়ে বুঝি প্রথম রাত্রে হবে?'

শেফালির খোঁপায় একটা রূপোর কাঁটা গুঁজে একজন বিয়ে-হওয়া মেয়ে ঠোঁট মুচকে বললে, 'হ্যাঁ, প্রথম রাত্রে হবে, কিন্তু শেষ রাত্রেও লগ্ন আছে, সাবধানে থেকো…'

সকলে হেসে উঠল। 'যাঃ…' চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মহা বিব্রত হয়ে পড়ল মেয়েটি, মুখখানা লাল হয়ে উঠল ওর।

কতক্ষণ এখানে ছিল লীলা, তারপর উঠে গেল। এই বাড়িতে পা দিয়েই যা মনে হয়েছিল ওর সেই ভাবটাই চেপে ধরল ওকে। সব কিছুই ওর চোখ দুটোকে টানতে লাগল, বুঝতে পারল এ-সবের মধ্যে তার খুশি হওয়া উচিত,

কিন্তু কোথায় যেন বাধছিল ওর। নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিল না।

সেই সময় মদন বাগুলি আর তার বন্ধু পলটা মণ্ডল বাইরেকার আসরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই পলটাই সেদিন পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় তার দল সমেত লীলার পিছু নিয়েছিল। তখনও সে জানত না যে এ মেয়ের সঙ্গেই তার বন্ধুর বিয়ের কথাবার্তা এক রকম ঠিক হয়ে রয়েছে। পরে যখন জানতে পারে, তখন তার লজ্জা আর অনুতাপের অবধি ছিল না। তাদের দলের বিমান কথাটা জানত, কিন্তু কেন সে কথাটা বলে নি তখন, এই নিয়ে পলটার কী রাগ। সাত দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলে নি সে এবং পরে শাসিয়ে বলেছে, 'শালা, তোর যখন বউ হবে, তখন দেখবি আমরা যেয়ে ফষ্টিনষ্টি করব।' মদনের কাছে পলটা ক্ষমা চেয়েছিল, কিন্তু হলে কি হবে, এইটে মদনকেই খুব সংকুচিত করেছে। যেন সে নিজেই অপরাধ করেছে পলটার কাছে এমনি করে এড়িয়ে গেছে।

কোথায় বসা যেতে পারে একটুখানি চোখ চারিয়ে দেখবার পর এগিয়ে গেল ওরা। মদনের ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবিতে খোলতাই দেহসৌষ্ঠব মুহূর্তে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাঞ্জাবির পকেটে আতরের ফোঁটা দিয়ে এসেছিল মদন, তারই মৃদু সুগন্ধ যাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ও তাদেরকে সচেতন করে তুলল। বয়স্করা অনিমেষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভাবলে, 'ফুলবাবু শিমুল ফুল!' যুবকরা ওর দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলে এবং উদাসীন হয়ে উঠল। পলটা যে-কোন লোকের থেকে মাথায় উঁচু এবং মদনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিচের দিকে তাকাতে হচ্ছিল ওকে। আশে পাশে কারা রয়েছে সেদিকে তাকাবার অবসর ছিল না ওর, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবার সময় যেমন হয়।

'তা কি করে হবে···না-না, সে আমি পারব না, আমার মুখে কথা বেরুবে না···' একটু পেছনের দিকে একটা চেয়ারে বসতে বসতে মদন বললে, পাশেরটায় পলটাকে বসতে ইঙ্গিত করে। 'আর এ বাড়িতে ওদের নেমন্তন্ন হয়েছে কি না কে জানে!'

'আলবাৎ হয়েছে, ওকে ওর কাকার সঙ্গে আসতে দেখি নি আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে?' পলটা একটা সিগারেট মদনের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্যাকেটের ওপর ঠুকে ঠুকে আর একটা ধরালে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'তাছাড়া ওর সঙ্গে তুই তো আগেও কথা বলেছিস?'

মদন'ও সিগারেট ধরিয়েছিল, কিন্তু ছোকরারা প্রথম সিগারেট ধরিয়ে পথ হাঁটবার সময় যেমন করে, অন্তদের মুখের দিকে কুণ্ঠিতভাবে তাকাচ্ছিল ও। পল্টুর কথার উত্তরে বললে, 'না রে, আমি কেবল ওর বোন বেলার সঙ্গেই কথা বলেছি, আর কাকিমার সঙ্গে। এক কাজ কর পল্টা, তুইও আমার সঙ্গে চল।'

'হ্যাঃ, আমি থাকব তোর সঙ্গে আর ও কথা বলবে!' সিগারেটটা ঠোঁটে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে দুই হাতের তেলো উল্টে একটা বিচিত্র ভঙ্গী করল পল্টা। 'আগে তুই বিয়ে কর, তারপর বৌদির কাছে যেয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নেব, তবে অন্য কথা…' সিগারেটটা মুখ থেকে হাতে নিয়ে হঠাৎ কাছাকাছি হয়ে ঘনিষ্ঠ স্বরে পল্টা বললে, 'আচ্ছা, শিববাবুকে নিয়ে কি ব্যাপার জানিস? সেদিন দেখলম ত সব! উনি ডাকলেন আর এরা সুড়সুড় করে চলে গেল…'

কথার মাঝখানে বাধা পড়ল ওর। তিনটি মেয়ে চা পরিবেশন করছিল, তাদের মধ্যে যে-টি কনিষ্ঠা, তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়সের ফ্রক-পরা মেয়েটি দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। রোগা-রোগা দু'টি হাত, লম্বা চিবুক, কপালে কুঙ্কুমের তিলক, চোখ দুটি অল্প আনত। মদনের মুখে স্বতই একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠল, তাড়াতাড়ি হাত বাড়াতেই পল্টাকে লক্ষ্য করে মেয়েটি বললে, 'না, আপনি আগে নিন।' মদন ওর বাঁ-দিকে ছিল, তাই পল্টা চা নেবার পর বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে কাপ নিয়ে তারপর মদনকে দিলে। মদন মৃদুস্বরে বললে, 'বাঃ, বেশ ত, তোমার নামটি কি?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সপ্রতিভভাবে বললে, 'উহুঁ, নাম বলব না…'

'বলবে না, এ্যাঁ?' পল্টা কথাবার্তার সূত্রটা নিজের হাতে নিয়ে বললে, 'না বলবে তো এই নাও, একটা এলাচ খাও। আমাদের চা খাওয়ালে তুমি, আমাদের থেকে কিছু নাও।'

মেয়েটির চোখ দু'টি ঝিকিয়ে উঠল, কানের দুল নেড়ে বললে, 'আপনারা খান, আপনাদের থেকে আজ আমাদের কিছু নিতে নেই।'

'কিন্তু আমি তোমার পল্টাদা, আমি বলছি নিতে হয়।'

'হুঁ, আমি আপনাকে চিনিই না, আপনি আবার আমার পল্টাদা হবেন…' বলে হঠাৎ ফিক করে হেসে পালিয়ে গেল মেয়েটি।

মদন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি চলে যেতেই পল্টার পিঠে ঠেলা দিয়ে বললে, 'এই, তুই আবার লাগতে গেলি কেন, কি ভাববে?'

'আরে যাঃ, বিয়ে-বাড়ি, একটু-আধটু ফোড়ন না দিলে হয়…'

হঠাৎ চারদিকে একটা মৃদু' গোলমাল উঠল। মেয়েরা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে শাঁখ বাজাতে বাজাতে। সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি উঠল পেছন থেকে। বরকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে।

পল্টা দাঁড়িয়ে পড়ল, মদনকেও ঠেলা দিয়ে ওঠালে। 'এই, যা। এই সময় সবাই ব্যস্ত, আর ছাতনাতলার এদিকে-ওদিকে কোথাও ওকে পাবি। চল, আমি তোকে এগিয়ে দিই…' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল ও।

অধ্যায় ৫

কতক্ষণ এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছিল লীলা, ওর নিজেরই খেয়াল ছিল না। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে বাজাতে বরকে আনবার জন্য বেরিয়ে যেতেই সেও যেন টানা হয়ে গিয়েছিল, তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। শাঁখের শব্দ, উলুধ্বনি, সব মিলে একটা আকস্মিক, নিবিড় মুহূর্তের সৃষ্টি করল। বর ভেতরের উঠোনে পা দেওয়া মাত্র ওপরের বারান্দা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করল কারা। তাদের চেঁচামেচি শুনে লীলার মনে হল কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে হবে। বরকে যখন পিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলে, কাঁধের ওপর দিয়ে ঝোলানো উড়ুনিটা কোলের কাছে দুমড়ে চেপে ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কে একজন গম্ভীর স্বরে হাঁকল, 'এইবার কন্যা আনা হোক…'। লীলা মুচকে হাসলে, বরটা কী রকম কাঁচু-মাচু করে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ একটা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট সুগন্ধে আশে-পাশে তাকাতে গিয়ে পেছনের দিকে চোখ পড়ল লীলার এবং তৎক্ষণাৎ নিজের অজান্তেই মুচকে হাসলে। তার অল্প একটু পেছনে মদন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর মনে হল মদন ওকে কিছু বলতে চায়, আর মুখ ফিরিয়ে ভাবতে লাগল কথাটা কি হ'তে পারে। এতক্ষণ খাপছাড়া, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল লীলা, মনে হ'ল এখন একজন পরিচিত লোককে পেয়েছে। মদনের সম্পর্কে ওর কাকার কি অভিপ্রায় ছিল সেটা ও জানত না তা নয় কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা ওর মনে হ'ল না। মনে হ'ল, মদন অনেক বারই ওদের

বাড়িতে গিয়েছে আর ওরা কত কথাবার্তা বলেছে পরস্পর (যা সত্যিই একবারও হয় নি)।

উলুধ্বনিটা মাঝখানে থেমে গিয়েছিল, হঠাৎ আবার সজোরে আরম্ভ হওয়াতে ছাতনাতলার দিকে তাকাল লীলা। কনেকে আনা হয়েছে। লাল চেলি পরে, দু'হাতের তেলোয় পান দিয়ে চোখ ঢেকে পিঁড়িতে বসে আছে শেফালি, আর দু'জন দু'দিকে ধরে পিঁড়ি সমেত তাকে সাতবার বর-প্রদক্ষিণ করাচ্ছে। কী রকম কুঁকড়ে বসে রয়েছে শেফালি। এমনি ঘুরপাক খেতে কতক্ষণ লাগল, তারপর মাঝখানে ঘট রেখে বরের বিপরীত দিকে বসাল ওকে। শেফালি মুখের ঢাকা খুলে ফেলেছে, এদিক থেকে তার পুরো মুখটা দেখতে পাওয়া যায়। একটু অন্য রকম, একটু রোগাটে মনে হয় শেফালিকে—হয়তো ঝামেলায় ও শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লীলার মনে হ'ল, শেফালি কী যেন একটা তীব্র, গোপন ভাব চেপে রেখেছে। ওকে নিয়ে কিছু একটা হচ্ছে, তা ঠিক বাইরের এই সব কিছু দিয়ে বোঝা যায় না।

ইস্ ! পেছনের দিকে তাকিয়েই আড়ষ্ট হয়ে উঠল লীলা। যে দু'জন লোক দাঁড়িয়েছিল, তারা চলে গেছে এবং মদন আরও একটু সরে এসেছে। আস্তে আস্তে হাত-পা শক্ত হয়ে উঠতে লাগল ওর, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। সহসা আঁটো-সাটো করে পরা নিজের পোষাকের দিকে চোখ পড়ল, আর মনের মধ্যে ছি-ছি করে উঠল ও। এ কী লজ্জাহীনার মতো পোষাক পরে এসেছে ! মনে মনে নিজের পিঠ, ঘাড়, গলা আর বুকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে ও, আর লজ্জায় অবশ হয়ে ভাবতে লাগল, মদনের চোখের সামনে আর কিছু ঢাকা নেই। তাড়াতাড়ি বাঁ-কাধের ওপর ঝোলানো ভাঁজ-করা আঁচলটা ডান-কাঁধের ওপর টেনে এনে পিঠটা ঢেকে দিতে চাইলে। ওর মনে পড়ল না একটু আগেই মদনকে দেখে ওর কি মনে হয়েছিল। ওর বুকের ভেতরে ভয়ে মুচড়ে ধরতে লাগল এই ভেবে যে মদন এখনই ওর পাশে এসে দাঁড়াবে আর কী বলে ফেলবে। ছাতনাতলার দিকে তাকাল লীলা, সেদিকে একাগ্র হবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেখানে কি হচ্ছে বুঝতে পারল না।

বীণা ওপরে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে দু'এক ধাপ উঠেই লীলার দিকে চোখ পড়ল ওর, তারপর মদনের দিকে। শাড়ি-গয়নার ঢেউ তুলে ওদের কাছে নেমে এল ও, মদনের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর লীলার হাত ধরে সোৎসাহে বললে, 'আরে, তুমি এইখানে, আমি তোমাকে কত খুঁজে বেড়াচ্ছি···

এস, এস…' বলে টেনে নিয়ে গেল ওকে। যাবার সময় মদনের বিমূঢ়, নিরাশ মুখের ওপর আর একবার সকৌতুক দৃষ্টি হেনে গেল ও। সিঁড়ির মাঝামাঝি আসবার লীলার কানে ফিসফিস করে বললে, 'কি, ছেলেটার সঙ্গে চেনা আছে না কি?'

লীলা আহত দৃষ্টিতে বীণার মুখের দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ওর ভেতরটা যেন জ্বলে উঠে মুহূর্ত পরে ওকে বিকল করে দিয়ে নিবে গেল। বারান্দায় কয়েকটা মেয়ে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে চা খাওয়া শেষ করছিল। একটু আগেই চা পরিবেশন করেছে, এখন তাড়াতাড়ি নিজেদেরটা সেরে নিতে চায়। বীণা বললে, 'এই মেয়েরা, আমাদের দু' কাপ চা দাও তো… বাব্‌বাঃ, ওপর নিচ করে আর পা টানতে পারি নে…'। মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, স্পষ্টত, চা ফুরিয়ে এসেছিল এবং নতুন করে তৈরী করার মতো সময় আর উৎসাহ ওদের ছিল না। একজন বড় গোছের মেয়ে বললে, 'আপনাদের আমরা এক কাপ চা দেব, তার বেশি পারব না…' বলে বীণার পেছনে লীলার উৎকণ্ঠিত, সুন্দর মুখের দিকে তাকাল ও।

বীণা তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা নিয়ে বললে, 'এতেই হবে আমাদের…,' লীলাকে বললে, 'চল, আমরা ছাদে যেয়ে বসিগে, আর ছোটাছুটি করতে পারিনে…'

চাঁদের আলোয় খোলা ছাদের একটা কোণে কতকগুলি মেয়ে জটলা পাকাচ্ছিল। এরা সকলেই বীণার বয়সী বা তার থেকেও বড় হবে। তাদেরই মধ্যে এসে বসল বীণা, এবং একটু পরেই লীলাকে ভুলে গেল ও। লীলা ওদেরই পেছনে সবার অলক্ষ্যে এবং কাউকে লক্ষ্য না করে নির্জীবের মতো বসে পড়ল। যতক্ষণ বীণা টেনে আনছিল ওকে, ততক্ষণ বুকের ভেতর তবু কী একটা স্বস্তি অনুভব করছিল ও, কিন্তু সে যখন ওকে ছেড়ে দিল তখন ওর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। ওর পাশেই মেয়েরা কি কথা বলছে বুঝতে পারল না লীলা, ছাদটা অনেকখানি বড় আর খোলা-খোলা, আর নিচে বিয়ের আসর থেকে আসা ঈষৎ-অস্পষ্ট কোলাহল অর্থহীন মনে হ'ল ওর কাছে। বুকের ভেতর একটা কান্নার মতো লাগল ওর এবং বীণার ওপর একটা অস্পষ্ট আক্রোশ অনুভব করতে লাগল ও।

কতক্ষণ পরে যখন সচেতন হয়ে উঠল ও, দেখলে ওরা কি একটা কথা নিয়ে মশগুল হয়ে রয়েছে। একটা মাঝবয়সী মেয়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে (লীলার

কাছে এটা তৎক্ষণাৎ অসঙ্গত ও কুৎসিত (কেবল) সোৎসাহে বলছে, 'আর বোলো না! ও মেয়েকে যখন কলকাতা নিয়ে গেল, পাড়ায় রটাল অলপেটে জল জমেছে, তাই রোগা হয়ে গেছে, হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। এদিকে জানেন ন'মাস…'। বীণা হাতের তেলোয় চিবুক রেখে ঝুঁকে পড়েছিল, অস্ফুট আগ্রহে বলে উঠল, 'তাই না কি, বিলুর শেষ কালে এই হ'ল! তুমি জানতে সব!… আচ্ছা, কী ক'রে এমনি হ'ল…'। অন্য মেয়েগুলিও ঝুঁকে পড়েছিল, তাদের চোখেও একই রকম তীব্র আগ্রহ ফুটে উঠল।

'তা আর জানি না, আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে। তা ভাই, সত্যি কথা বলব, ঐ মেয়ের দোষ নেই। বাবাটাই যত পাপের মূল…আহা, কি তাকাবার ছিরি…তোর কাছে মেয়ের থেকে বড় সাহেব বড় হ'ল! চাকরীতে প্রমোশনটাই বড় হ'ল!'

'প্রমোশন হ'ল বুঝি?' কে একজন চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলে।

মনে হ'ল, কথয়িত্রী বাধা পাওয়াতে বিরক্ত হয়েছে। ভুরু কুঁচকে বললে, 'তা পাবে না, মেয়ে ঘুষ দিলে পাবে বই কি…' তারপর বীণার দিকে আবার ঘুরে বললে, 'শুন ব্যাপার। কি না, বাবা মেয়েকে নিয়ে রাত্রিতে যাচ্ছে বড় সাহেবের বাংলোয়। কেন, না, বড় সাহেবের অসুখ, সঙ্গে মেয়েছেলে নাই, সেবা-সুস্থ করতে। একদিন বড় সাহেব নিজে গাড়ি করে নিয়ে গেল মেয়েকে, কি, না, বড় সাহেবের জন্মদিন, বিলুরানী গান গাইবেন…'

হঠাৎ হেসে ফেলল লীলা, আর তার পরও তেমনি ফ্যাক্-ফ্যাক্ করতে লাগল। সবাই পেছন ফিরে তাকাল ওর দিকে। লীলার খাটো নাকটা স্ফুরিত, কোঁচকানো চোখ দুটো ঝিকিয়ে উঠেছিল। ওদের চোখে একটা মৃদু তিরস্কার ফুটে উঠতে গিয়ে থেমে গেল, কিন্তু ওর হাসির কারণটা কী হতে পারে বুঝতে পারল না।

অধ্যায় ৬

সেই রাত্রিতে সাড়ে নটা দশটার সময় একটা ট্যাক্সি জুনাপুর থেকে বেরিয়ে এসে আড়াই মাইল উত্তরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর পড়ল। ডাইনে পূর্বদিকে পড়ে রইল আসানসোল শহর। রেলোয়ে ব্রিজের কাছে বাঁহাতি পশ্চিম দিকে বেরিয়ে

গেল ওটা। একেবারে আধুনিক কালের বেবি ট্যাক্সি, ছোটেও মন্দ নয়। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ঢেউ খেলানো রাস্তা, পালাক্রমে চড়াই উৎরাই ভেঙে ছুটেছে গাড়িটা। যতক্ষণ না চোখের সামনে একেবারে ঝাপসা হয়ে আসছে, ততক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে, খুশিতে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে যেন সাঁতার কেটে চলেছে।

রাত্রিতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু'পাশে চোখের ভোজ লেগে যায়। সারি সারি দেয়ালীর আলো জেলে দিয়েছে যেন। শিল্পাঞ্চলের এই আলোর সারি প্রদীপের মতো কাঁপে না, কম বেশি হয় না বাতাসে, স্থির আত্ম-বিশ্বাসের মতো জ্বলতে থাকে। এই আলোর সারি কখনো কাছে, কখনো বহু দূরে দেখা যায়। কোথাও অল্প একটু জায়গা জুড়ে কোথাও বা বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে। কখনও গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। আবার যেখানে রাস্তার একেবারে পাশেই ঘন বন, সেখানে চোখ বাধা পায়, আবার পরক্ষণেই প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এরও মাঝে মাঝে ফার্নেসের আগুন আকাশের গায়ে লালচে নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দেয়। কোথাও কোলিয়ারীর লিফ্‌ট মাথা তুলেছে। একটু পরেই কয়লা বোঝাই মালগাড়ি সুতীক্ষ্ণ কোঁচ কোঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে কোলিয়ারীর থেকে যেন লাইনের দিকে এগোচ্ছে। অন্ধকারে ওর সবটা চোখে পড়ে না, কেবল চাকার শব্দে বহুদূর বিস্তৃত আদিম সরীসৃপের মতো ওটার অস্তিত্ব বোঝা যায়। তারপর আবার নিকটে নিস্তব্ধ পরিবেশ, আর দূরে আলোর সারি।

মাইল পাঁচ ছয় এইভাবে যাবার পর হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিল ট্যাক্সিটা। এটা পিচের রাস্তা নয়। ইঁট-সুরকির বাঁধানো পথ। গাড়ি ছুটলে ধুলো ওড়ে, কিন্তু অমসৃণ নয় বলে ঝাঁকুনি নেই। রাস্তাও চওড়া নয় অতখানি, দু'পাশে ঘন বন—এই রাত্রিতে একান্ত নির্জন। হঠাৎ একটা খরগোস সামনে পড়ল, গাড়ির উজ্জ্বল আলোতে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ল ওটা, তারপর যে-দিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই ছুটে পালাল। গাড়ির গতি কমে এসেছিল, কেবল খরগোসটার জন্য নয়, সামনে একটা চড়াই। মুড়াল পাহাড়ের একটা অংশ এদিকে ছিটকে এসেছে। এটার বাঁ দিকে খাদ ডান দিকে বন। চড়াই যেখানে শেষ হল, সেখানটা শো-দেড়েক ফুট উঁচু হবে, তারপর আবার ডান দিকে কোণাকুনি করে পথ নেমে গেছে। চড়াইয়ের থেকে উৎরাই কম খাড়া, আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গেছে। চড়াইয়ের মাথায় আর একবার আসানসোল শিল্পাঞ্চলের এলাকাটা চোখের ওপর ভেসে উঠল, তারপর মিলিয়ে গেল পেছনে। আর

একটা আলোও চোখে পড়ল না। আরো মাইল দুয়েক গিয়ে গাড়িটা থামল, দামুনিয়ায় এসে পড়েছে।

বাংলা দেশের আর এক রূপ মুহূর্তে ফুটে উঠল চোখের সামনে। পেছনে ফেলে আসা রূপের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বরং বিরোধ আছে। একটি হচ্ছে আধুনিক বাংলা দেশ আর বাঙালী জীবনের ভিত্তিভূমি, আর একটি প্রাচীন জীবনেরই অবশেষ। কিন্তু বিরোধ আছে বলেই অবহেলা নেই প্রকৃতির। বাঙালী তার এই রূপ সম্বন্ধে ভুলে গিয়েছিল, এখন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। দামুনিয়া এখন আধুনিক বাঙালীর ক্রীড়াভূমি। তার আমোদের খোরাক যোগায় দামুনিয়ার এই অরণ্য-উদ্যান। কেবল গ্রীষ্মকাল ছাড়া বছরের আর সব সময় আধুনিক নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী এখানে পিকনিক করতে আসে। কখনো এমনিই বেড়িয়ে যায়। আধুনিক কবি-শিল্পীদের সৌন্দর্য-চর্যার খোরাক যোগায় দামুনিয়া। আবার কখনও বা দামুনিয়ার নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে এমনি ধরনের কোনো আধুনিক যান কর্কশ হর্ন বাজিয়ে উপস্থিত হয়। তখন আমোদ-প্রমোদের ধারাটা বয় অন্য খাতে, তীব্র উত্তেজনা আর উল্লাস দামুনিয়াকে চমকে কাতরে দিতে থাকে।

দামুনিয়ার ওপর পূর্ণিমার আলো ঝলমল করছে বললে ভুল হবে। আলো যেন চাপ-চাপ হয়ে রয়েছে : পরিষ্কার আকাশের গায়ে আর মাঠের ওপর। কয়েক হাত দূরে যে বটগাছটা ঝাঁকড়া হয়ে রয়েছে তার ডগার ডাল-পালায় রূপোর প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে যেন। আর মাঠের ওপারে স্পষ্ট করে গাছ-গুলিই দেখা যায় না, মনে হয় কোনো কিছুর মধ্যে ডুবে রয়েছে। পাশের কোনও গ্রামের থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে—তাও যেন সমুদ্রের গভীর তলা থেকে ডুব দিয়ে উঠছে : ধিত্‌আং-ধিত্‌আং-ধিত্‌আং-এ, গিদ্‌কি-গিদ্‌আং-গিদ্‌আং-লে।

এই দামুনিয়ায় ট্যাক্সি থেকে নামল তিন জন নৈশ-বিহারী। প্রথম জন এক-চোখ কাণা 'নারায়ণ কেবিন'-এর মালিক সুরেন সাহা। পেছনের সিটের ডান দিকে বসেছিল ও। গাড়ি মাঠের মধ্যে থামবা মাত্র ও দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল। দু'দিকে দুই হাত মেলে দিল ও, হালকা পায়ে কিছুটা ছুটে গেল, তারপর হা-হা-হা করে হাসল খানিকক্ষণ। ও যখন থামল, তখন জ্যোছনায় ঢাকা চারদিকটা যেন ঝিমঝিম করছে।

ততক্ষণে বেরিয়েছে ড্রাইভার রব্‌বানি, তারই গাড়ি এটা। জুনাপুর আরান-

লোকের মধ্যে গাড়িটা ও ভাড়ায় খাটায়। ওর একটা পুরাণো মডেলের পন্টিয়াক ছিল, গাড়িটার খুঁটিনাটি সে মেরামতি লেগেই ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটা বিক্রী করে দিয়ে মাস তিনেক আগে এইটে কিনেছে। নতুন গাড়ি, ভাড়াটাও একটু কম, আজকাল ওর খদ্দের হচ্ছে। তাই বলে, আগেকার গাড়িটাকে যেমন ও অভিসম্পাত দিত না, এটারও তেমনি যত্ন করে বটে, কিন্তু তোষামুদি করে না। রব্বানি খুব রাশভারি লোক। ও হাসে না, হাসবার উপলক্ষ্য হ'লে ঠোঁট মুচকে নরম চোখে তাকিয়ে থাকে। ফর্সা, লম্বা চেহারা, মাথায় খাকি টুপি, পাজামা আর লম্বা ঢিলে শার্ট পরে থাকে। সুরেন সাহা বেরিয়ে যাবার পর রব্বানি চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলে, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে মাডগার্ডের ওপর বাঁ পাটা তুলে দিয়ে ও দাঁড়াল। ঢিলা শার্টের পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটা ধরালে। তারপর দুই কনুই দিয়ে গাড়ির ছাদের ওপর হেলান দিলে, যেন এখনই যে নাটকটা অভিনীত হতে চলেছে তাতে ওর ভূমিকা কেবল নীরব দর্শকের।

গাড়ির বাঁ-দিক দিয়ে বেরোল বনমালী পাল। ওর বাঁ বগলে ইতিমধ্যেই বোতল। নামতে গিয়ে ঝুলে পড়া ধুতিতে পা আটকে পড়তে পড়তে রয়ে গেল। একটা হিন্দী গানের সুর জড়িয়ে জড়িয়ে টানছিল ও। কতকগুলো লোক আছে যারা যতখানি না খায়, তার থেকে মাতলামি করে বেশি। বনমালীকে দেখলে মনে হবে, ওর শরীরের সন্ধিগুলো যেন সব ঢিলে হয়ে গেছে আর ওর কাহিল শরীরটা নড়বড় করে ঝুলে পড়তে চাচ্ছে। ডান হাতে ও একটা বিড়ি বের করে ঘুরে এসে রব্বানির কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'সাহেব, দাও, মাচিসটা দাও …নট্, নট্, মাচিস চাই না…' বলে ও রব্বানির ডান হাতে ধরা জলন্ত সিগারেটটার কাছে মুখ এনে বিড়িটা ধরিয়ে নিলে। রব্বানি কেবল চোখ নামিয়ে ওর দিকে তাকাল মাত্র। বনমালী বিড়িতে একটা টান দিয়ে ফিরে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ বিড়িশুদ্ধ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'সুরেন ভাই, টেনে তুল…টেনে তুল…তুমার মতন ছুটতে লারব…' বলে যেন টানা হয়ে চলেছে এমনিভাবে পা ফেলতে ফেলতে ওর দিকে এগিয়ে গেল।

এর কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, গাড়িটা থেকে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে ওরা জমিয়ে নিয়েছে। রব্বানি আর সুরেন সাহা বসে আছে জমিতে। গাড়ির ওপর যেমন দুই কনুয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রব্বানি, তেমনিভাবে দুই হাত পেছনের মাটিতে ঠেকনোর মতো রেখে হেলান দিয়ে বসেছে ও। পা দুটো

ছড়ানো, মুখে তেমনি একটা নির্লিপ্ত, উদাস ভাব। সুরেন সাহা হাঁটুর ওপর পা তুলে দিয়ে বরকর্তার মতো বসেছিল। তার পাশে একটা বোতল দাঁড় করানো (এর আগে একটা শেষ হয়েছে), ডেক্‌চিতে চিংড়ির কালিয়া, আর একটা পাত্রে নাড়ি-ভুঁড়ির চাট। তারই কেবিন থেকে 'ইস্‌-পেশাল' তৈরী হয়ে এসেছে। বনমালী একবার বসেছিল এদের সঙ্গে, এখন এদের চারদিকে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন একটা ভঙ্গী করছে যেন পেছন দিকে এখনই উল্টে পড়বে, তারপর আবার সামনের দিকে ততখানি ঝুঁকে পড়ে টাল সামলে নিচ্ছে। ও জড়িয়ে-জড়িয়ে বলছে, 'মাইরি আর কি, দুনিয়াটা তুমার অত সহজ লয়··· বনমালী পাল বাপের বেটা আছে। হাতটি বাড়ালে আর টুক করে···' ও হাত দিয়ে প্রক্রিয়াটা বোঝাবার ভঙ্গী করলে, 'টুক করে ফলটি পড়ে গেল, তা হবেক নাই। বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ দেখ নাই···'

নড়বড় করে, সামনে-পেছনে টাল খেতে খেতে বনমালী সুরেনের কাছে এগিয়ে এল, ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বললে, 'দাদা সুরেন, তুমি একটো বাত কহ ··নট্‌···তুমি একটো গানা গাও, গাও·· ' বলে ও নিজেই চেঁচাতে লাগল। 'শালা কুম্পানীকা মাল, দরিয়ামে ঢাল···' সুর টানতে টানতে বোতলটা টেনে নিয়ে মুখে ঢালবার ভংগি করলে কিন্তু ঢাললে না। তারপর একটা চিংড়ি মাছ মুখের ওপর শূন্যে তুলে ধরে ও বলতে লাগল, 'কুম্পানী, তুমি শালা লয়, তুমি বাবা আছ। তুমি বাবা আছ বটে, লেকিন তুমাকে এখন আমি বুঝে লিয়েছি। এখন আমি তুমার বাবা হইয়েছি···আমি যদি বলি বাঁ-দিকে যাও ত বাঁ-দিকে যাবে, যদি বলি ডান দিকে যাও ত ডান দিকে যাবে। রেডি, এক-দো-তিন···আভি ইধর আও, মুখকে অন্দরমেঁ···' বলে মাছের টুকরোটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে।

সুরেন সাহা ওর ভংগি দেখে ওকে উৎসাহ দেবার জন্য মাঝে-মাঝে হাসছিল খ্যাক-খ্যাক করে। বনমালী চিংড়িটা মুখে পুরে দিতেই বললে, 'বহুৎ আচ্ছা···' কিন্তু বনমালীর মত্ততায় ও নিজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ল। একটা চটুল খেমটার গান ধরলে ও। বোঝা যায়, আগে কোন এক সময় ওর গাওয়ার অভ্যাস ছিল, এখন ভাঙা-চোরা কিছু আছে। 'দাগা দিয়ে গেলে এ প্রাণে, বঁধু হে···' মাঝে মাঝে রব্‌বানির কাছে ব্যাখ্যা করে বলছে, হাতে গানের তালটা রেখে, 'বুঝলে না সাহেব, দিলমেঁ দাগা দিয়া গিয়া, বঁধু হে···'। বনমালী পকেট থেকে ওর চাবির গোছাটা বের করে বোতলের গায়ে ঠুকে তাল দিতে

লাগল, কিন্তু সহসা হ্যা-হ্যা করে ফুৎকার দিয়ে গানটা ছেড়ে দিলে সুরেন। 'আরে ধ্যুৎ, গানে-বালী নাই, হেঁড়ে গলায় কি গানা হয়…' বলেই ও বোতলটা টেনে নিয়ে গেলাস ভর্তি করতে লাগল। রব্বানির দিকে এগিয়ে দিতেই ও পেছনের হেলানটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল, বললে, 'পীও, পীও, চাচা, তুম পইলে পীও…'। সুরেন চায়ের মতো চুমুক দিয়ে দিয়ে খায়, আর যদিও বনমালীর মতো মাতলামি করে না, তবু মাঝে মাঝে হা-হা করে হাসতে লাগল ও।

গেলাস শেষ করে রব্বানির জন্য ঢালতে যাচ্ছিল সুরেন কিন্তু হাত নেড়ে রব্বানি বারণ করল। বোতলটা ও টেনে নিলে কোলের কাছে। কাঁধ থেকে তোয়ালেটা নিয়ে বোতলের গাটা মুছতে লাগল। তারপর বোতলের গলায় তোয়ালেটা জড়াল ও, তোয়ালে শুদ্ধ বোতলের গলাটা ডান হাতে চেপে ধরলে। বনমালী যেন ওর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছে এমনি করে চোখের ভারি পাতা তুলে বললে, 'হ্যাঁ? বহুৎ আচ্ছা…চলুক…'

রব্বানি ঠোঁট দিয়ে বোতলের মুখটা চেপে ধরল, তারপর ঘাড়টা পেছনে বেঁকে গেল ওর। টুপিটা খসে পড়ে লম্বা চুল লটকে পড়ল। বোতলটা ও মুখের ওপর উল্টে ধরেছে। এরা বাহবা দিলে। সুরেন বললে, 'বহুৎ আচ্ছা, মিয়া সাহেব। এ মরদকা মাফিক পীনা হ্যায়…'

রব্বানি বোতলের ভেতর বুজবুজি তুলতে তুলতে টানছে। আস্তে আস্তে বোতলের মুখের কাছে নেমে এল পানীয়টা, তারপর শেষ হয়ে গেল। ধীরে-সুস্থে বোতলটা নামাল রব্বানি, তারপর চাট চুষতে লাগল। মুহূর্ত পরেই আগুন ছুটতে লাগল ওর চোখে মুখে। কপালের ওপর কয়েক গাছি চুল লটকে পড়ল। সুরেনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ও, মনে হ'ল ওর চোখ দুটো ভাসছে।

সুরেন ওকে জিজ্ঞেস করলে, 'আউর চলেগা, মিয়া সাহেব?'

রব্বানি ডান হাতটা ওপরের দিকে তুলে একটা মেজাজ নিয়ে বললে, 'হাঁ…,' যেন কোন নবাব তার অনুগামী ভক্তের আবেদন মঞ্জুর করছে।

সুরেন আর একটা বোতলের মুখ খুলে এগিয়ে দিলে। যেমন খেলা করে, তেমনি দুহাতে করে খোলা বোতলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল রব্বানি। ডান হাতে শূন্যে তুলে জ্যোৎস্নায় বোতলের লেবেলটা দেখল একবার, তারপর মুখের মধ্যে পুরলে। একটু পরে হঠাৎ সুরেন চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান,

মিয়া সাহেব…'। বোতলের অর্ধেকটা শেষ হয়ে এসেছিল, কিন্তু রব্‌বানির মাথা নড়ে গেল। রব্‌বানি জিব দিয়ে বোতলের মুখটা বন্ধ করে দিলে। নিজেকে সামলে নিলে ও। স্থির ভঙ্গী, কিন্তু ওর গলার শিরা দুটো ফুলে উঠেছে। তারপর আবার আস্তে আস্তে আরম্ভ করলে ও।

বনমালী ডান হাঁটু গেড়ে উঠে বসেছিল, ভংগীটা যোদ্ধার শরসন্ধানের মতো করে। রব্‌বানির বোতলের দিকে লক্ষ্য করে রয়েছে ও। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মন্তব্য করতে লাগল, 'হাঁ, আউর থোড়া…ঠিক যায়গা…যাতা, যাতা হ্যায়… আউর…ওয়ান-টু…সাবাস!'

রব্‌বানি আস্তে আস্তে বোতলটা নামিয়ে রাখলে, তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখটা চেপে ধরল।

অধ্যায় ৭

শেষ রাত্রে ওরা ফিরবার জন্যে গাড়িতে এসে উঠল। সুরেন ডেকচি, বোতল-গুলো এনে গাড়িতে তুললে। সিটের নিচে ওগুলো ঢুকিয়ে বাঁ-পাশে নেতিয়ে পড়ল ও। ওর মাথার খানিকটা অংশ গাড়ির বাইরের দিকে শূন্যে লটকে পড়ল। এদের মধ্যে বনমালীই বোধ হয় সব চেয়ে সচেতন ছিল। ও গাড়িতে এসে স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল। রব্‌বানি ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের পেছনে দুই হাত মুড়ে হাই তুললে। তারপর গাড়িতে ঢুকতে গিয়ে বললে, 'বনমালী বাবু, আপনি সরুন…'

'মিয়া সাহেব, আজ হাম ড্রাইব করেগা…' জড়িত স্বরে বনমালী বললে, যেন এখনও সে আগেকার মজার মধ্যে রয়েছে।

'আপ! আপ কেঁও করে গা…'

'আপ ডরতে হেঁ…' বনমালী গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে সাদা দাঁত বের করলে।

রব্‌বানির শরীর শক্ত হয়ে এল। ও গম্ভীর গলায় বললে, 'হাম গাড়ি কিসীকো ড্রাইব করনেকো নহী দেতে…'

বনমালী ততক্ষণে এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছে। ও দুই হাত বাড়িয়ে রব্‌বানির হাত জড়িয়ে ধরলে, 'কেঁও গোলমাল করতে মিয়া সাহেব, হাম ভী ড্রাইবার থা এক রোজ…'

সুরেনের এই সময় তন্দ্রা কেটে গেল। ও মাথা তুলে ব্যাপারটা বুঝলে, তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'আরে বনমালী, উয়ার গাড়ি উয়াকে ছেড়ে দাও...'

ঘাড় ফিরিয়ে বনমালী চিৎকার করে উঠল, 'আরে, তুমাদের হল কি! দেখনা, গাড়িটা ত জলে পড়ছে নাই...'

রব্‌বানি সেই প্রকৃতির লোক, কথা কাটাকাটি করে সে নোংরামি করতে চায় না। ও শেষবারের জন্যে বনমালীর প্রতি একটা কঠিন দৃষ্টি হেনে পেছনের সিটে বসে গা এলিয়ে দিলে।

পেছনে একরাশ চিংড়ি মাছের খোসা, মাংসের হাড় পড়ে রইল। আর বাতাসে ছড়িয়ে রইল একটা উগ্র, উত্তেজক গন্ধ। আর কিছু পরেই দামুনিয়ার পাখিরা আর কাঠ বিড়ালীরা জেগে উঠবে। খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এই-গুলোই ঠুকরে গাছের ডালে নিয়ে গিয়ে বসবে।

রাত্রি ফিকে হয়ে এসেছিল। চাঁদের আলো তখনও চারদিকের মাঠে আর গাছের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সেটা কেমন প্রাণহীন। কয়েক ঘণ্টা আগেকার মত্ততা যেন আর নেই, সংকুচিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া সমস্ত উষ্ণতাকে যেন ঢেকে দিয়েছে।

মুড়াল পাহাড়ের চড়াই দিয়ে ছুটছে গাড়িটা। এদিককার চড়াইটাকে চড়াই না বলাই ভাল, একটু দূরে না তাকালে চড়াই বলে বোঝা যায় না। থার্ড গীয়ারের ওপর ছুটে চলেছে গাড়ি। স্থির, স্বচ্ছন্দ গতি। রাস্তা সংকীর্ণ, কিন্তু সিধা চলে গিয়েছে। কেবল চড়াই শেষ হয়ে ওদিকে রয়েছে খাড়া উৎরাই।

দুর্ঘটনা ঘটল যেখানে চড়াই শেষ হয়েছে তারই মাথায়।

দু'জন আদিবাসী লোক গায়ে ঝাপড়ি-ঝুপড়ি চাপিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়েছিল। স্পষ্টত, ট্যাক্সির আলোও দেখতে পায় নি ওরা, শব্দও শুনতে পায় নি। হঠাৎ ধাবমান প্রচুর আলোকের সামনে একবার ডান দিক, একবার বাঁ-দিক করতে লাগল। তারপর এক সময় জঙ্গলের দিকে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল। গাড়িটাও ছিটকে পড়ল নিচে, খাদের মধ্যে। আদিবাসী লোক দুটোর গলা দিয়ে আঁ-আঁ করে অতি তীব্র, আর্ত চিৎকার আপনিই বেরিয়ে আসতে লাগল।

দুর্ঘটনা অহরহ ঘটছে, এই সৃষ্টির মধ্যে দুর্ঘটনা খুবই সহজ আর স্বাভাবিক। মানুষ চিরদিনই এই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন, এই যান্ত্রিক যুগে তার রীতির বোধ হয় একটু পরিবর্তন হয়েছে। আগে মানুষ মার খেত প্রকৃতির হাতে, এখন তার নিজের গড়া উপকরণই তাকে মার দিতে আরম্ভ

করেছে। মুহূর্তে এটা মানুষের জীবনের তুচ্ছতা প্রকাশ করে দেয়, কিন্তু কখনও কখনও মানুষের স্বরূপও ফুটে ওঠে এর মধ্য দিয়ে। বনমালীর ক্ষেত্রেও তাই হল।

ট্যাক্সিটা খাদের মধ্যে পড়ে চুরমার হয়ে গেছল তো বটেই, পেট্রল-ট্যাংকে আগুন লেগে অনেকটা পুড়েও গিয়েছিল। দুটি আরোহী একেবারে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেঁচে গেল অক্ষত শরীরে বনমালী। গাড়ি ছিটকোবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির থেকেই ছিটকে পড়েছিল ও। বনমালী জীবনে বেঁচে গেল শুধু তাই নয়, বেঁচে গেল এই দুর্ঘটনা ঘটাবার দায়িত্ব থেকেও। আরানসোল হাসপাতালে দশ-ঘণ্টা অচেতন হয়ে পড়ে থাকবার পর ও চোখ খুললে। পাশে আরানসোল থানার এস-আই, হাসপাতালের সার্জন, নার্স। বনমালী ওদের দিকে তাকিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে আপন মনে বললে, 'এ রব্বানি, তুম্ কেয়া কিয়া!' বলে ও কপালে হাত ঠেকালে।

পুলিশ দুর্ঘটনার কোনো সূত্রই খুঁজে পাচ্ছিল না। কেবল এটুকু উদ্ধার করেছিল যে গাড়িটা ছিল রব্বানির আর দামুনিয়া যাবার লাইসেন্স ছিল না এ গাড়ির। বনমালীর কথায় এস-আই রিপোর্ট দিলেন, গাড়ির মালিক গাড়ি চালিয়ে আসার সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

এইটেই আশ্চর্য—বনমালী কি করে একথা বলতে পারলে! চেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে সে রব্বানির নাম উচ্চারণ করতে পেরেছিল। সে জানতও না, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য সুরেন সাহা বা রব্বানি বেঁচে নেই। এই কুটিলতা, এই পাপ তাহলে মানুষের সহজাত, এমনি আকস্মিক আর অকাট্যভাবে তার প্রমাণ ঘটে।

অধ্যায় ৮

১৭ই মার্চ দিনটি জুনাপুর কারখানার শ্রমিকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। জেনেরাল ম্যানেজার মিঃ টমসন নতুন করে বিভিন্ন সেকসনের আরো ষাট জনকে ছাঁটাই করেছিলেন, কারখানায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং 'স্লো ডাউনে যোগ দিব না' এই মুচলেখায় সই না দেবার জন্য। এ্যাকশন কমিটি নির্দেশ দিয়েছে এই আদেশ অমান্য করতে হবে, তা সফল করার দায়িত্ব সমস্ত

শ্রমিকের। স্থির হয়েছে ১৭ই মার্চ সকালে এ-শিফ্‌ট্‌ ডিউটি করতে যাবার সময় সমস্ত শ্রমিক শোভাযাত্রা করে ঐ বাট জনকে নিয়ে কারখানায় ঢুকবে।

তার আগের দিন রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ পুরাণা হাটের অপি সাউ তার দড়ির খাটিয়াটা বের করে বারান্দার নিচে ফেলেছে রাস্তা বাঁচিয়ে আর এই মাত্র মুখে জ্বলন্ত বিড়ি গুঁজে বালিশের ওপর বাঁ-হাত মুড়ে তার ওপর মাথা রেখে শুয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, মনে হয় একটু পরেই চাঁদ উঠবে, মাথার ওপর আকাশটা স্বচ্ছ হয়ে আসছে। প্রথম চৈত্রের হাওয়া সমস্ত আবহাওয়াটাকে সুখোষ্ণ করে তুলেছে। অপি বিড়িটাতে একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়াটা চোখ বুজে ভেতরে আটকে রাখলে।

যেদিন চন্দ্রকান্ত ঘর বয়ে এসে অপিকে মর্মান্তিক অপমান করে গিয়েছিল সেদিন অসহ্য ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করেছিল ও, 'শালাঃ, যদি আমি বাপের বেটা হই ত এই অপমানের শোধ লিব, লিব, লিব…।' তখন ছিল অগ্রাণ মাস, শীত তখন জুনাপুরে জেঁকে বসছে, তারপর তিন-চার মাস চলে গেছে, এখনও অপি কিছু করে উঠতে পারে নি। তাই বলে তার বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলছে সেটা নিবে গেছে তা নয়, বরঞ্চ কিছু পোড়াতে না পেরে সেটা আরো তীব্র, আরো একমুখী হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আরো দুটো-একটা ঘটনা ঘটেছে। চন্দ্রকান্ত বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছিল কিন্তু পৌষ-সংক্রান্তির দিন আবার জানিয়ে দিয়েছে, তার কোনো দরকার নেই। লোকটা নিজেই এক পা পিছিয়ে গেছে। তারপর, মাসখানেক হ'ল তারই বেটা—যে বেটা নিয়ে গুমোর করেছিল চন্দ্রকান্ত আর অন্যকে পায়ে মাড়িয়ে যেতে দ্বিধা করে নি—সেই বেটাই এখন হ্যাংলার মতন যাতায়াত আরম্ভ করেছে। ওদিকে এ্যাকশন কমিটির মোড়লি করছেন ছোকরা, আর এদিকে মেয়ে-পাগলা, বিয়ের জন্য 'গৌরচন্দ্রিকে' করছেন! মুখরা কানু আজকাল চুপ করে গেছে, শিবলালের আসা নিয়ে মহা-খুশি। ঘেন্না, ঘেন্না, মানুষ এতটা ছোট হয় কি করে! ঐ শিবলাল, ঐ কানু। তবুও কানুকেও- নিষেধ করে না অপি, শিবলালকেও না। ছোকরা আরো একটু ডুবুক, তারপর চন্দ্রকান্তর নাকে ধরে এনে দেখাবে, নাক থেঁতো করে দেবে। কিন্তু তার আগে আরো কিছু দরকার। অপি বিড়-বিড় করে ওঠে ঃ ও যা ভাবে, তা কি কোন কালে সম্ভব হবে না?

কারখানার অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠছে রোজ-রোজ। ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে স্লো-ডাউন চলছে, কতগুলো সেকসনে ছড়িয়ে পড়েছে এখন হিসেব রাখাও

মুস্কিল। ব্ল্যাস্ট্ ফার্নেসে এখনও হচ্ছে না, কিন্তু হতে কতক্ষণ। 'হ্যাঁ, ইখেনে··· আমাদের সেকসনে এসে গেলেই, ব্যস, কেল্লা ফতে···' ভাবতে ভাবতে অপির ঠেলে-আসা চোখের তারা দুটো ঘুরে ওঠে, মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোয়। জেনেরাল ম্যানেজারও বসে নেই, যথাশক্তি ঠেলা মারছেন, কিন্তু হলে কি হবে, কোমরের জোর নাগাল পাচ্ছে না। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি (ঠিক তারিখটা মনে নেই অপির) জেনেরাল ম্যানেজার আদেশ জারী করলেন, সমস্ত শ্রমিককে বণ্ড সই করে কারখানায় ঢুকতে হবে: 'আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে বর্তমানে কারখানার কোনো কোনো বিভাগে কিছু সংখ্যক শ্রমিক বেআইনী উৎপাদন-মন্থর ধর্মঘট চালাইয়া যাইতেছে তাহাতে আমি যোগদান করি নাই এবং ভবিষ্যতেও করিব না। শ্রমিকদের কোনও দাবী দাওয়া থাকিলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহা লাভ করাই সঙ্গত বলিয়া আমি মনে করি।' এ্যাকশন কমিটির পাল্টা নির্দেশ এল এবং শ্রমিকরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। এতটা সাফল্য এ্যাকশন কমিটির নেতারাও আশা করতে পারেন নি—একটি মজদুরও সই করল না। অপি সেদিনকার দৃশ্য মনে করতে পারে: ওয়ার্ক্‌স্ ম্যানেজার মিঃ পি.কে. চ্যাটার্জী বগলে এক বাণ্ডিল ছাপা কাগজ আর সহকারী অল্প-বয়স্ক ফিরিঙ্গি মিঃ ম্যালকমকে নিয়ে শ্রমিকদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ম্যালকম কম বয়সের চৌকোশ ছোকরা, সরকারী কায়দাকানুন আয়ত্ত করেছে, কাগজ এগিয়ে দেবার সময়ও সে-কায়দার কমতি নেই। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জী প্রবীণ, অভিজ্ঞ লোক, নাকে নস্যি গুঁজে অপির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'কি হে, তুমিও ধম্মোঘট কচ্ছ? বাবা, ওষুদটা কড়া দিয়েছে, একটু চিনি মিশিয়ে দাও। নাও, সই কর···'। অপি তৎক্ষণাৎ আভুমি নত হয়ে সেলাম করে বলেছিল, 'স্যার, কারখানায় কাম করতে এসেছি, দাসখত দিতে আসি নাই···'। তারপর আরো কয়েকদিন কেটে গেছে, ১লা মার্চ হঠাৎ নোটিশ পড়ল, কারখানায় গোলমাল সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন মিল থেকে ষাট জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে এ্যাকশন কমিটির সদস্যও কয়েকজন আছেন। হঠাৎ এইটে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিকরা কারখানায় যাচ্ছে, সেখানে যেমন স্লো-ডাউন চলছিল তেমনি চলছে কিন্তু শ্রমিকরা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, জি-এম একটা দগদগে আঘাত দিয়েছেন ওদের। তারপর গত পরশু দিন এ্যাকশন কমিটি নির্দেশ দিয়েছে, ছাঁটাই অমান্য করতে হবে। আগামী কাল সকালে ঐ ষাট জনকে নিয়ে শ্রমিকরা কারখানায় ঢুকবে। প্যারী ময়দানে আজ বিকেলে মীটিং ছিল এ নিয়ে, বি-শিফট ডিউটির জন্য অপি যেতে পারে নি।

'গবা, গবা…' অপি বাঁ-দিকে ঘাড় কাত করে হাঁক দিলে।

কাত্তুরা তখনও রান্না-ঘরে ছিল। মেনকা ভেতর থেকে বললে, 'গবা ঘুমি' গেছে, বাবা। কি বলছ…'

'দি'শালাই আর একটা বিড়ি দে। আমার জামার বুক পকেটে আছে, দেখ…'

অপি ঘুরে উপুড় হয়ে শুল। মাথার মধ্যে অস্পষ্ট, ঘোলাটে চিন্তা এলোমেলো পাক খাচ্ছে। গেল বৃহস্পতিবার দামুনিয়ার এ্যাকসিডেণ্টের কথা মনে পড়ল ওর। সমস্ত জুনাপুর ঐ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। বনমালী লোকটা আশ্চর্য। লোকটাকে আগেই জানত অপি। মাস পাঁচ ছয় আগে জেনেছিল এরই ভাই-ঝিকে বিয়ে করার ব্যাপার নিয়ে শিবলালের সঙ্গে তার বাবার ঝগড়া। 'এ রবুবানি, তুম কেয়া কিয়া!' অপি বুঝতে পারে না একটা মানুষ এতখানি শয়তানি করতে পারে! তাহলে ও যতক্ষণ অচেতন হয়ে পড়েছিল এ-শয়তানি তখনও কাজ করছিল!

'বাবা, বিড়ি নাও তোমার…'

অপি একটু কাৎ হয়ে মেনকার দিকে না তাকিয়েই বিড়ি দেশলাইটা নিলে। চকিতে মনে হ'ল ওর এই মেয়েটার জন্যই তাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। একটা ধারালো কথা ওর মনের মধ্যে ঝিকঝিক করে উঠল, 'কিরে, আজ শিবলাল এসেছিল?' কিন্তু বলতে পারল না। কেমন কাঁচুমাচু করে দাঁড়ায় মেয়েটা। অন্ততো, ওই গুণটা আছে, গবার মতো গবেট নয়। আজকাল বোধ হয় একটু সুন্দর হয়েছে। 'হঃ, ছিরি ফিরছে বিটীর, ছিরি খুলছে…' মনে মনে ঘড়-ঘড় করতে লাগল অপি। শুয়ে শুয়ে বিড়ি ধরালে।

'আরে, অপি বাবু, আপনি শুইয়েছেন…'

'কে, কে…' বলতে বলতে উঠে বসল অপি। মেনকা চলে গেল। 'কে, লছমী ভায়া, এস। কি ব্যাপার, এত রাত্রে বাসায় ফিরছ? আমি ভাবছিলম যে তুমি ঘুমিয়েই পড়েছ…'

'হাঃ-হাঃ, ঘুম চলিয়ে গেছে, অপি বাবু, আজ ক্যা হুয়া সুনা নহী?' উৎসাহের সঙ্গে বলতে বলতে লছমীকান্ত খাটিয়াটার ওপর বসে অপির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

অপিও হেসে উঠল, পরিহাস করে বললে, 'হবে আর কি, আজ তুমার বহুর সঙ্গে তুমার ঝগড়া হয়েছে! পাঁচ-ভাজা খাইয়েছ বহুকে? হাঁ, পাঁচ-ভাজা সমঝা?'

লছমী নিজের সব কথাই আলোচনা করে অপির সঙ্গে, সরসতিয়া

অন্তঃসত্ত্বা হওয়াতে নিজের খুশির কথাও বলেছে। মাঝে মাঝে অপিও এই নিয়ে ঠাট্টা পরিহাস করে, 'বেশ আছ ভাই, ছেলে পাবার জন্যে এত পাগল কেনে। তোমার ভাগ্য যদি আমার মত হয়, তাহলে কি হবে ?'

অপির কথা শুনে খ্যা-খ্যা করে হাসল লছমীকান্ত, জিব দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট চাটতে লাগল। কিন্তু তেমনি হঠাৎ আবার গুম খেয়ে গেল, গম্ভীর স্বরে বললে, 'জান ভাই, আজ মীটিং ভেঙে দিল জেম্‌স্‌ সাহেবের লোক…'

'মীটিং ভেঙে দিল ! কোন্‌ মীটিং, প্যারী ময়দানের মীটিং না কি ?'

'হাঁ-হাঁ, আমি নিজে ছিলম ময়দানে…দশ-বারো মাইক চিল্লাতে লাগল…'

লছমীকান্ত বিকেলে এ্যাকশন কমিটির মীটিং ভেঙে যাওয়া নিয়ে যে বিবরণ দিলে তা এই রকম। নেতাদের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন, মনোতোষ বাবু, শেখর বাবু, সমীর বাবু সবাই। কেবল শিবলাল আর ইসমাইল ছিলেন না। শেখরের বলার পর সমীর বলতে উঠেছে, তেমন সময় এক সঙ্গে বারোটা জোর পাওয়ারের লাউড-স্পীকার এক সঙ্গে গর্জন করে ওঠে। হয়েছে কি, গাছের ডালে ওরা লাউড-স্পীকারের চোঙ ঝুলিয়ে দেয়। সকলেই মনে করেছিল, এ্যাকশন কমিটির মীটিংএর পর জেম্‌স্‌ সাহেবের মীটিং হবে। কেবল ওরা যখন আক্রমণ করল তখনই ওদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল। এরা কিছু বলতে আরম্ভ করলেই ওরা আরো জোরে চেঁচাতে আরম্ভ করল। মনোতোষ বাবু সভা শান্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুটো লাউড স্পীকার কখনো বারোটার সমান হতে পারে না। জেম্‌স্‌ সাহেব তাঁর সভায় কালো-পতাকা দেখানোর কথা ভুলে যান নি, আজ তার শোধ নিলেন।

এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল ওরা। শেষ কালে লছমীকান্ত বলল, 'লেকিন, আচ্ছা ভেলকি লাগল দেখছি। এ্যাকশন কমিটি আর জেম্‌স্‌ সাহেব…'

'আরে ছোঃ, সে লিয়ে তুমার মাথা ব্যথা কেনে। যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। এ্যাকশন রাজত্ব পেলে আমাদের কি হবে, যেই কে সেই। তুমার প্রেসিডেন্ট্‌ সাহেবের তড়পানি দেখ নাই ? তবে হ্যাঁ…' অপির ব্যঙ্গাত্মক স্বরটা একটু গম্ভীর হয়ে এল। বললে, 'কাল সকালে যদি মজদুররা শোভাযাত্রা করে তাতে আমরাও যাব, দালালি করতে পারব নাই। গরীব হ'তে পারি আমরা, কিন্তু মান-ইজ্জত আছে ত। এই সেদিন দাসখত লিখে দিতে বললে, তুমিও দাও নাই, আমিও দিই নাই…হ্যাঁ, ওই কথা !' নিবে-যাওয়া বিড়িটা ধরিয়ে নেবার জন্যে অপি দেশলাই জ্বাললে।

অধ্যায় ৯

অপিকে বিড়ি-দেশলাই দিয়ে মেনকা ফিরে আসতেই কাহু ভেতরের বারান্দা থেকে ডাকল, 'কিরে মেনি, ভাত-টাত খাবি না কি। রাত যে দুপুর হয়ে এল...'

'যাই, মা...' মেনকা মৃদুস্বরে বললে, কিন্তু কি কারণে ঘরের মধ্যে ইতস্তত করতে লাগল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে, লছমীকান্তর সঙ্গে বাবা খুব আগ্রহের সংগে কি কথা বলতে আরম্ভ করেছে। ওদিকে কান দেবার জন্য একবার চেষ্টা করল মেনকা, তারপর মত বদলে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে নিজের থালার কাছে গিয়ে বসে পড়ল।

কাহু খাওয়া আরম্ভ করেছিল। উঠোনের দিকে উদলা পিঠ করে বসেছিল ও, যতটুকু হাওয়া উঠোনের পেঁপে গাছটার ওপর দিয়ে বয়ে এসে লাগছে, ততটুকুই ঢের। পরিশ্রান্ত কাহু ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে বললে, 'তোর বাবার সঙ্গে কে কথা বলছে রে...' কিন্তু মেনকার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে পর-ক্ষণেই আবার বললে, 'তোর শিবুদা ত আজও এল না, কি হল বল দিকি?' শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বরে একটা উদ্বেগের আভাস ফুটে উঠল।

মেনকা মায়ের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে, মনে হল ওর মুখখানা মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে তারপর নিভে গেল। মায়ের প্রথম কথাটারই উত্তর দিলে ও, 'লছমীকাকা এসেছে, তার সঙ্গে কথা কইছে।'

'লছমীকাকা, আর লছমীকাকা, বলি ঐ মেড়ো-হিন্দুস্থানীটার সঙ্গে এত মাখামাখি কেনে, বাপু...' কাহু ভাতের থালাটার মুড়ি ধরে কোলের দিকে একটু টেনে নিয়ে বললে। 'ইদিকে বউটো আর-এক খণ্ডাত, ছুঁচি-বাই দেখলে হাসি পায়...মনে আছে তোর, কেমন ঝগড়া করেছিল সেই কলতলায়? হ্যাঁ রে, ছেলে হবে কোথা, এখেনে, না যাবে কোথাও? আজকাল মাগি কেমন চিক্কণ-চাকন হয়েছে দেখেছিস...'

মেনকার খাওয়া থেমে গিয়ে ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। মনে হল, ও একটা কথা বলতে চায় এবং নিজের ভেতরে সেইটে নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে ওকে। 'মা...' ওর গলাটা ধরে এল, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠে ও বললে, 'কেনে তুমি ওনাকে নিয়ে অমনি করছ, বাবার ত মত নাই...'

ভাতের থালা থেকে মুখ তুলে তাকাল কান্থ, ওর কথাগুলো আগেই থেমে গিয়েছিল। ও তৎক্ষণাৎ বুঝলে, কি নিয়ে কথা বলছে মেনকা, কিন্তু কেন বলছে তা বুঝতে পারল না। ভাবলে, 'মেয়েরা বিয়ের আগে অমনি বলেই থাকে...,' প্রকাশ্যে বলে উঠল, ওর ফর্সা বড়-হানো মুখে একটা বিচিত্র ভঙ্গী ফুটিয়ে, 'কেনে, বাবার মত নাই তুই কি করে বুঝলি হতচ্ছাড়ী...মেয়ের আমার সব দিকে নজর!' 'হতচ্ছাড়ী' কথাটার ওপর ওর সমস্ত স্নেহ যেন ঝরে পড়ল। আবার ভাত মুখে তুলতে গিয়ে হাতে রেখেই বললে, 'তুই কিছু ভাবিস নাই। দেখনা, আমি তোর মা হই, এই আমি বলে দিলম, শিবুর সঙ্গে যদি তোর বিয়া না হয় ত আমি বাপের বিটী লয়...' কান্থ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে, একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল ওর মুখে।

'মা...'

মেনকার ভারী কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে কান্থ ওর দিকে তাকাল। মেনকার খাওয়া থেমে গিয়ে হাতটা কোলের দিকে টানা হয়ে এসেছে, মুখ নীচু করে কান্না চাপছে ও। উদ্বিগ্নস্বরে কান্থ বললে, 'কি...কি হইছে..'

মেনকার চোখ বাধা মানল না, টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল কোলের ওপর ঝরে পড়ল। কান্না মেশানো, জড়ানো গলায় ও বললে, 'মা, তুমি ছেড়ে দাও ওনাকে...বলে দাওনা কেনে। আমার জন্যে তুমাদের মধ্যে...বাবার আর তুমার মধ্যে...আমি কি দেখতে পাই না?'

যে-দুশ্চিন্তা হাসি-খুশি দিয়ে চেপে রেখেছিল কান্থ, সেইটে ছাই-সরে যাওয়া আগুনের মতো হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল যেন। স্বামীর সঙ্গে সত্যিই যেন একটা রেষারেষি চলছে তার, আর মেনকাই সেটার কারণ। অথচ, কিছুদিন আগেও তা ছিল না। এই নিয়ে বুকের ভেতরটায় যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসে ওর, বুঝতে পারে তার এই একরোখামি হয়তো ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু কেন জানি কিছুতেই সরে আসতে পারে না ও।

মেনকা আবার বললে, 'না-না, বাবা ঠিক বলেছে, আমার ওখেনে হবেক নাই। মা, আমি সব দেখতে পাই, যেদিন থেকে বিয়ার কথা হয়েছে, সেদিন থেকেই বাবার সঙ্গে তুমার মন গরম চলছে। বাবা ঠিক বলছে...আমারও মন তাই বলে, আমি ওনার যোগ্য লয়...তোমরা কেনে কাল-মেয়েকে ধরে ওনার হাতে দিবে?'

এইটে কান্থকে রুষ্ট করে তুললে। ও ঝামটা মেরে মেনকাকে থামিয়ে

বললে, 'দেখ মেনি, পাকামি করিস নাই। তোর বাবার সঙ্গে আমার মন-গরম চলছে···তুই সব জানিস! মেয়ে আমার-যুদ্যি কি লয় তা আমি জানিনা এক কোঁটা মেয়ে তুই জানিস। ফ্যাক্-ফ্যাক্ করিস নাই, তোর বাবা আর তুই ঐ অমঙ্গলে কথা ধরেছিস···' বলতে বলতে মুখ বেঁকিয়ে ফিরিয়ে নিলে ও।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত নিঃঝুম হয়ে বিছানায় পড়ে রইল মেনকা। একটা বা দুটো কত সময় হয়েছে বুঝতে পারল না। বাইরে খাটিয়ার ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে গিয়েছে অপি, এখন রীতিমতো নাক ডাকছে। ওকে ডেকে ঘরে আসতে বলার সাহস পায় নি ওরা, ঘুম ভাঙার জন্য পাছে খেপে ওঠে। কাদুও অনেক-ক্ষণ শুয়েছে, কিন্তু মেনকা জানে, মাও এখনও ঘুমোয় নি। একপাশে শুয়ে শুয়ে বাঁ-দিকটা আড়ষ্ট, টনটনে হয়ে উঠেছে, কিন্তু ওদিকে ফিরতে পারছে না, পাছে মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়, আর সে যে জেগে আছে মায়ের কাছে তা ধরা পড়ে যায়।

মেনকা বুঝতে পারে তাকে নিয়ে ওদের পরিবারে একটা অশান্তি পাকিয়ে উঠছে। বাবা আর মাকে সে দেখে আর ওর বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে। আগে এমন একদিনও যায় নি যেদিন ওনাদের মধ্যে ঝগড়া না হয়ে কেটেছে। ওদের চিৎকার, গবার হাঁকানি, মারধোর—সমস্ত পাড়াটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত একে-বারে। এখন সে-সব কিছু নেই। বাবা এখন মার সঙ্গে একটা কথাও বলে না, কাদুও কেমন গুম খেয়ে রয়েছে। কেন এমনি হচ্ছে মেনকা তা বুঝতে পারে। ছি-ছি, মরণও হয় না তার।

তারপর রয়েছে গোবিন্দ, সুযোগ পেলেই ওকে জ্বালিয়ে মারতে চায় সে। সেদিন বিকেলে চুল বাঁধতে বসেছিল মেনকা, সামনের দিক থেকে আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে গোবিন্দ বলে উঠেছিল, 'মেনিদি, তুই আর চুল বাঁধিস নাই। তোকে যা দেখতে হইছে না···'। কাদু রান্নাঘর থেকে তাড়া করে এসেছিল, 'কি রে গবা, তোর যত বড় মুখ লয় তত বড় কথা। যা ইখেন থেকে, ছি-ছি, দিদি হয় না···'। গোবিন্দ ওখান থেকে সরে গেল, কিন্তু দরজার মুখে তার কণ্ঠস্বরে আর দেহে একটা নাচের ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে বলতে লাগল, 'আশুত পাতা ধনে, মেনি দিদি কনে, শিবু দাদা বর, টাকডুমাডুম বাজি বাজে কদম-তলায় ঘর···,' বলে হো-হো করে হেসে পালিয়ে গেল ও। কিন্তু এটাও মেনকার তত লাগে না, এই রকম ঘটনার পর মা যখন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকায়, আর মৃদুমৃদু হাসতে থাকে, তখন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে ওর।

মেনকা আর পারল না, খুব আস্তে আস্তে ডান দিকে পাশ ফিরে শুলে। তখন, অন্ধকার ঘরে ঢুকবার কিছুক্ষণ পরে যেমন করে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, তেমনি আর একটা ইচ্ছা ওর মনের মধ্যে জেগে উঠল। শিবলাল যখন আসে, তখন ও সহজ হয়ে আচরণ করতে পারে না কেন? কেমন একটা অকারণ ভয় ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরে। সেদিন শেষ যখন এসেছিল শিবলাল তখন প্রতিজ্ঞা করেছিল ও, তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলবে। চা দিতে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছে, গিয়ে বলবে, 'আপনার চা-টা নিন,' বা খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার চায়ে চিনি কম পড়ে নি তো?' কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে ওর চোখ দুটোই আনত হয়ে আসি নি শুধু, গলাটাও কেউ বন্ধ করে দিয়েছিল যেন। শুধু তাই নয়, চা-টা নামিয়ে দেবার সময় কাপ থেকে অনেক-খানি চলকে পড়ে গিয়েছিল, হাত কেঁপে গিয়ে। শিবলাল কি সেটা লক্ষ্য করেছে? যদি করে থাকে তো কী লজ্জা!

সহসা অস্থির হয়ে উঠল মেনকা, আর ভাবতে পারল না। সব ঝিনুকে ফেলে দিতে চায় এমনি করে মনের মধ্যে না-না করে উঠল ও। শিবলালের ওপর একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে উঠল ওর। কেন উনি বারবার এমনি করে আসেন, মাকে এমনি করে লোভ দেখান? তারা গরীব, তারা সামান্য লোক, সে কালো কুচ্ছিৎ, এসব তো উনি জানেন। তবু কেন উনি আসেন?

একটা টব ঢাকা-দেওয়া বাচ্চা গাছের মতোই মাথা কুটতে লাগল মেনকা— যে গাছ বাড়বার জন্যে মাটির থেকে রসের যোগান পেয়েছে কিন্তু মাথা তুলে ছাড়া পেতে গেলেই বাধা পাচ্ছে।

অধ্যায় ১০

দিন পনেরো-কুড়ি যাবৎ সেখ ইসমাইল জুনাপুরে ছিলেন না। গরম পড়তে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেটের ব্যথাটা বেড়েছিল এবং সেই জন্যে জুনাপুর থেকে মাইল বারো দূরে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের ধারে জামাডিহিতে তাঁর বোনের বাড়ি গিয়েছিলেন, বিশ্রাম নেবার জন্যে। ২৫শে মার্চ শিবলাল তাঁকে আনবার জন্য জামাডিহিতে নিজে চলে এল, জুনাপুরে এখন ইসমাইলের থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিল ও। বেলা চারটে নাগাদ জামাডিহির বাস-স্ট্যাণ্ডে

পৌঁছাল ওরা। ওরা আসবার একটু আগেই একটা বাস বেরিয়ে গেল। এর পরে আর এক ঘণ্টার মধ্যে বাস নেই। একটা শাল গাছের নিচে এগিয়ে গেলেন ইসমাইল, শিবলালকে আসবার ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমাকে নিয়ে এসে অযাত্রা করেছেন, শিববাবু। প্রথমেই গাড়ি ফেল করলেন…'। শিবলাল এ' কথার উত্তরে মুচকে হাসল কেবল, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইস্, সাড়ে সাতটার আগে জুনাপুরে পৌঁছতে পারব না। এই বাসটা ধরতে পারলে ভাল হ'ত…'

ইসমাইলের পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি, চোখে চশমার ওপর কালো গগল্স। শিবলালের শার্ট-পাতলুন নিভাঁজ, পরিপাটি—মনে হয় যত্ন করে পোষাক করে এসেছে। ইসমাইলের হাতে তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগটা ছিল না, মনে হয় জুনাপুর থেকে আনেন নি। বগল থেকে খবরের কাগজ নিয়ে মাটির ওপর পেতে বসলেন, শিবলালকেও বসতে বললেন।

বাস স্ট্যাণ্ডের দু'ধারে ছোটখাটো কয়েকটা গুমটি, তার কোনোটাতে চা-দোকান, কোনটা পান-বিড়ির, একটা ছোট মনোহারী দোকানও আছে। দোকান-গুলো দুপুরের নিদ্রার পর সবে জেগে উঠেছে। কারও কারও চোখ পড়ল এদিকে, বড় শালগাছটার নিচে অপেক্ষমাণ এই যাত্রী দু'টির ওপর। পোষাকের আর চেহারার অনেকখানি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মনে হয় উভয়ের মুখই একই রকম ক্লিষ্ট, ভেতরে সব সময় কিসের যন্ত্রণা বোধ করছে। মুহূর্তের জন্য ভাবলে, 'ওঁরা কোথা থেকে এসেছেন, যাবেন কোথায়…' কিন্তু তারপর ভুলে গেল ওদের।

'শিববাবু, নিন একটা সিগারেট··' পকেট হাতড়ে একটা দুমড়ানো প্যাকেট বের করলেন ইসমাইল। কাঁপা-কাঁপা হাতে মুখটা খুলে শিবলালের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে থমকে গেলেন, 'ও, আপনার আবার চলে না…,' বলে নিজেই ধরালেন।

জুনাপুরে শ্রমিক-আন্দোলনের অবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। শ্রমিকরা এক বাক্যে রায় দিয়েছে: একজনও বণ্ড সই করে নি। এ্যাকশন কমিটির নির্দেশে এই সেদিন, ১৭ই মার্চ, শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করে ষাট জন ছাঁটাই শ্রমিককে নিয়ে কারখানায় ঢুকেছে। কিন্তু জয় শুধু এক তরফা নয়, এরই মধ্যে ভাঙনও দেখা দিয়েছে। এত দ্রুত আর অপ্রত্যাশিত ঘটনা সব ঘটছে যে প্রস্তুত মনও তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। শেষতম ঘটনা ঘটেছে গতকালই: জেম্স্ সাহেব সেদিনকার প্যারী ময়দানের মীটিং ভেঙে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে লেবার গেট আর স্টীল গেটে যে মীটিং হচ্ছিল এ শিফ্টের পর, তার একটাকে চেষ্টা করেও ভাংতে পারেন নি, অন্যটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন।

সেবার গেটের মীটিং-এ শিবলাল নিজে ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির অমরনাথ মুখার্জী রেলোয়ে ব্রিজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, মাঝে চুলের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে। অমরনাথবাবু ঈষৎ উত্তেজিত, ঘামে বুকের ওপর গলার কাছে শার্ট ভিজতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তাঁর সহজ গাম্ভীর্য তাঁকে একটা মর্যাদা দিয়েছিল।

অমরবাবু যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলেন, সেখান থেকে গজ দশেক দূরে কারখানার দুটি কামিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল। এরা সোজাসুজি কারখানার কর্মী নয়, কোম্পানীর কনট্রাক্টররা এই সব মেয়েদের নিয়োগ করে। ওরা মাল বোঝাই করে, মাল খালাস করে। কনট্রাক্টরের গাড়িতে করে কাজের জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। গাড়ীতে বসে-বসে সুর ভাঁজে, কখনো ঘুমোতে ঘুমোতে যায়। ওরই মধ্যে হাসি-মস্করা, ঠাট্টা-তামাসা চলে।

যে-দুটি কামিন দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি কমবয়সী, পঁচিশের বেশি বয়েস হবে না। হাল্কা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ চেহারা। চোখে কাজল, কপালে কাঁচপোকার টিপ। দ্বিতীয় জনা চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, তবু শরীরের বাঁধুনি যায় নি। হেলে দুলে ঢেউ দিয়ে-দিয়ে কথা বলতে পারে। ও ফিক ফিক করে হাসছিল। পাশের লোকটি হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললে, 'এ্যাই, চুপ কর না, কেনে ফ্যাক ফ্যাক করছিস?' বলে পুনরায় সে বক্তৃতার দিকে মন দিলে। তখন মেয়েটি বাঁ হাতে তার ডান হাতের কব্জির কাছে ধরলে। ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললে, 'আমার নাম মনরাঙানী, আমায় তুই ঠেলে দিলি…'। পুরুষের মনে এই প্রৌঢ়ারও লাস্য কৌতুকের সৃষ্টি করল। ও কি বলতে গেল, কিন্তু কিছু না বলে সরে দাঁড়ানোই ভাল বলে মনে করল।

মনরঙ্গিনী হায় হায় করে উঠল, 'হ্যা দ্যাখ গো, আমার বকুল ফুল চলে গেল…'

এখন অন্য কয়েক জন ওর দিকে আকৃষ্ট হল। একজন জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁ মাসি, তুমার সঙ্গে উটি কে?'

'হঁ রে, মুখপড়া, চোখের মাথা খেঁয়েছিস। আমি তুর মাসি হলম রে… আমার বয়স কি এত গেছে?'

একটা ছোটখাট হাসির লহর উঠল। যে বক্তৃতাটা এদের কানে এসে পৌঁছাচ্ছিল সেটা ব্যাহত হল। হাসি থামতে না থামতেই অন্য একজন বললে, 'হ্যাঁ, দিদিঠান, আমাকে বল, উটি তুমার কে।'

যার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সেটির তখন কপালের টিপের সঙ্গে চোখ দুটিও ঝকঝক করে উঠেছে। আর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছে। সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে মনরঙ্গিনী বললে, 'উটি আমার বোনঝি···'

একজন জোয়ান গোছের লোক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে পিতলের আংটা, বোনঝিটির দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে একটু এগিয়ে এল। বুকে হাত দিয়ে বললে, 'থালে মুই তুর কে হই বল, মুই তুর···'

ওর কথা শেষ হল না, বোনঝি ওর দিকে কটাক্ষ করে বললে, 'মরণ, মুখ-পোড়া মদ্দ···'

মনরঙ্গিনী লোকটির চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে বললে, 'তুই, তুই আমার পাঁড়-কান্ত, বুকের মধ্যে রাখি তোমায়···' শেষের দিকে ওর কথায় সুর এসে গেল।

এবার কেবল হাসি নয়, এদের মধ্যে আর একটা প্রবৃত্তি জেগে উঠল। সামনের দিক থেকে ফিরে দাঁড়াল কেউ কেউ। কেউ বা সামনে তাকিয়ে থাকলেও মনটা পড়ে রইল পেছনে। মুহূর্তের মধ্যে বাঁধা তার আলগা হয়ে গেল। ওদের চোখের সামনে ঝকঝক করতে লাগল কাঁচপোকার টিপ-পরা একটা মুখ।

মনরঙ্গিনী তখনও হেসেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ও সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বক্তৃতারত অমরনাথ বাবুকে দেখিয়ে বললে, মিটিমিটি হাসতে হাসতে, 'উই, উই আমার কে হয় জানিস ?'

এদের কণ্ঠস্বরে আর মুখভঙ্গীতে আগ্রহ ফুটে উঠল। ও বললে, 'উটি আমার জামাই।'

ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লোকটি এর মধ্যে বোনঝির গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছিল। ও খেপে গিয়ে বললে, 'তুর ঐ বুড়া জামাই পছন্দ হল ? আমি জুয়ান মরদ আছি।'

বোনঝির মুখে আরও খানিকটে কাপড় উঠল, কিন্তু ওর সমস্ত শরীর রুদ্ধ হাসিতে দোল খেতে লাগল। হাসির লহরার মধ্যে একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মাসি, তুমার জামাই থালে উথানে কেনে, ঘরে লিয়ে যাও।'

তখন মনরঙ্গিনী ডান হাতে আঁচলটা তুলে ধরে নাচের ভঙ্গিতে একপাক ঘুরে নিলে, ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলতে লাগল, 'জামাই কি মোর অন্য পর, খুলে দিব মোর সদর ঘর···'

শিবলাল আর পারল না। ও এতক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল, ভেবেছিল

জিনিসটা আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু হ'ল না। যে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অমরবাবু বলছিলেন, তারই পাশে দাঁড়িয়ে যখন ও এটা দেখলে তখন ওর মাথার মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। কিছুই বুঝতে বাকি রইল না ওর। ও কয়েকবার জনতাকে শান্ত হবার জন্য আবেদন জানাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলে সেটা শান্ত হবার নয়। পরিশেষে তা যখন বেড়েই গেল, সমস্ত জনতার মধ্যে ক্রোধ আর নিকৃষ্ট উল্লাস পাশাপাশি টগবগ করতে লাগল, তখন নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারল না। ও কি করল বুঝবার মতো অবস্থা ছিল না ওর, কিন্তু ও লাফ দিয়ে জনতার মধ্যে পড়ল। জনতা ওকে পথ করে দিলে, নয়তো ওর বেগে দু'দিকে ছিটকে গেল—শিবলাল একেবারে মনরঙ্গিনীর কাছে হাজির হল। ওর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত, কণ্ঠস্বর কর্কশ, হাত দুটো ঝাঁকিয়ে ওকে বললে, 'কেন তুমি এই সব করছ? করে তোমার লাভ?'

শিবলাল আর মনরঙ্গিনীকে ঘিরে একটুখানি ফাঁক হয়ে গেছল, জনতা একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। মনরঙ্গিনীও থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটু পরেই সামলে নিয়ে ও বললে, 'আমি নয়, আমার এই বোনঝি…'

বোনঝির মাথার কাপড় খসে গিয়েছিল। ওর এই উল্লেখে মুখে কাপড়-চাপা দিয়ে আবার হেসে উঠতে গেল, কিন্তু শিবলাল ওর সামনে হাত জোড় করে ধরলে। ও অনুনয় করে বললে, 'বোন, তুমি কেন এমনি করছ। আমি বলছি তুমি বাড়ি যাও…'

সেই ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লোকটি কয়েক জনের পেছনে সরে গিয়েছিল। সে টিপ্পনী কাটলে, 'উ কিন্তুক আমার বুন লয়, বুনের ঠাকুরঝি…'

ঢেউ উঠতে গিয়ে ভেঙে এলিয়ে পড়ল। মনরঙ্গিনীর মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল। ও ধমক দিয়ে বললে, 'আ মর আবাগীর বেটা, কাকে কি কথা কইতে হয় জানিস নাই। ভদ্দলোকের সামনে কথা কইতে শিখ। আয় লো আয়, খাঁদি, ঘর যাই…' বলে ও বোনঝিকে টেনে নিয়ে ভিড় কেটে বেরিয়ে গেল।

যখন লেবার-গেটে ওরা এই আক্রমণ কাটিয়ে উঠছিল, তখন স্টীল-গেটে মারামারি হয়ে গিয়েছে। রতন, সমীর, ওরা নিজেরাই উপস্থিত ছিল। যখন মীটিং চলছে তখন কয়েক জন মাতাল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ করে। তারপর ইট ছোঁড়াছুঁড়ি, হট্টগোল আর মীটিং ভেঙে দেওয়া—এসব খুব কঠিন কাজ হয় নি।

অধ্যায় ১১

কিন্তু শুধু এই ঘটনার জন্যই শিবলাল জামাডিহিতে ছুটে আসে নি, যে-জন্যে এসেছে এটা তার প্রধান কারণও নয়। জেম্‌স্‌ মাধবন যে এ্যাকশন কমিটির বিরুদ্ধতা করবেন এটা অস্বাভাবিক নয়, তার উপায় যত নীচই হোক না কেন। তবুও শিবলাল এরই মধ্যে—প্যারী ময়দানের আক্রমণের পর জেম্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে তাঁর ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্বে দেখা করেছে। তাঁর কাছে সুস্থ, সম্মানজনক প্রতিযোগিতামূলক ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানিয়েছে : 'মিঃ জেম্‌স্‌, আসুন আমরা সৎপথে এগোই, তাতে শেষ পর্যন্ত হারি-জিতি মাথা পেতে নেব…', কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। জেম্‌স্‌ মাধবন তাঁর সীমাহীন আক্রোশ চাপতে চাপতে, শিবলালের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি বলতে চান, যারা জুনাপুরে এই অশান্তির সৃষ্টি করছে সেই এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আমরা পীসফুলি কাজ করব? জেনে রাখবেন, ঐ গ্যাংটাকে যতক্ষণ না আমরা শায়েস্তা করতে পারি, ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই…'। মুহূর্তে শিবলালের মুখ চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আত্মস্থ হবার চেষ্টা করে ও বললে, 'দেখুন, ধরেই নিলাম এ্যাকশন কমিটির নেতারা গুণ্ডার দল, কিন্তু এ্যাকশন কমিটির মধ্যে বহু শ্রমিক রয়েছে যারা আপনার পুত্রতুল্য, তাদের প্রতি আপনার কর্তব্য আছে…'। জেম্‌স্‌ সবেগে হাত নেড়ে শিবলালকে থামিয়ে বলেছিলেন, 'মিঃ ডাস, আমার যদি পুত্র থাকত, আর সে বিপথগামী হবার সাহস পেত, তাহলে আমি তাকে শ্যুট করতাম নিজের হাতে; কিন্তু এ্যাকশন কমিটির মজদুররা আমার পুত্র নয়, আই রিগ্রেট্‌!'

কিন্তু এটাকেও অপমান বলে মনে করে নি শিবলাল, তার বড় বেদনার জায়গাও এটা নয়। আঘাত এসেছে অন্যদিক থেকে। জেম্‌সের এই মীটিং-ভাঙা কার্যক্রম এ্যাকশন কমিটির মধ্যে একটা সর্বনেশে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছে। তা যদি হয় নিজের পায়েই কুড়ুল মারা হবে। মনোতোষ, শেখর, রতন, এঁরা সবাই ঠিক করছেন, জেম্‌স্‌ যদি একটা ঘা মারেন তাহলে তার বদলে দুটো ঘা ফিরিয়ে দিতে হবে। ছি-ছি, তাহলে লোক হাসির আর বাকি কি থাকবে। তার থেকে আন্দোলন থেকে এই মুহূর্তে সরে আসা ভাল।

'তাহলে জেম্‌স্‌ সাহেব এখন 'আপনাদের, মীটিং ভাঙতে আরম্ভ করেছেন।' প্যাসেঞ্জার-ভর্তি হয়ে যে বাসটা এই মাত্র আসানসোল থেকে এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল সেটার দিকে চোখ রেখে ঈষৎ উচ্চ-স্বরে বললেন ইসমাইল। উচ্চ-স্বরে—কেননা ঐ ছোট্ট স্ট্যাণ্ডে ইতিমধ্যে বেশ চাঞ্চল্য আর কোলাহল জেগে উঠেছিল এবং যারা একটু আগেই ওদের দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল তারা আগত ও বিদায়ী যাত্রীদের জন্য নানা রকম সুর ধরে চিৎকার করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। 'আপনি' এখন অহিংসার সাধনা আরম্ভ করেছেন···সমস্ত জুনাপুর থামিয়ে রেখেছেন মশাই। আমি হলে তো আগে জেম্‌স্‌ সাহেবের মাথাটা ফাটিয়ে দিতাম। তা নয় আপনি কি না তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করলেন···এদিকে আবার মনোতোষ বাবুদের সামলাতে হচ্ছে আপনাকে!'

চকিতে শিবলালের মনে হল, ইসমাইল ওকে ঠাট্টা করছেন, বারবার 'আপনাদের,' 'আপনি' এই সব বলছেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে, না, উনি পরীক্ষা করছেন। এইটে আরো খারাপ লাগল ওর—যখন শিবলাল কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তখনও উনি এমনি পরীক্ষা করার ভাব নিয়ে কথা বলেছিলেন। ইসমাইলের রুগ্ন, ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিবলালের মুখে একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক হাসি ঝুলে পড়ল, যেমনটি তার পূর্বে প্রায়ই হত এবং এখন যা ভুলেই গিয়েছিল সে। 'আপনি জুনাপুরে থাকলে যা করতেন, আমি তাই করেছি···', বলে এক কথায় ব্যাপারটা সেরে দিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে গেল শিবলাল। ইসমাইলও গা-মোড়া দিয়ে উঠলেন। খবরের কাগজটা তুলে নিলেন, দরকার হলে গাড়িতে পাতা যাবে। সামনের আসনে আগে ইসমাইলকে উঠিয়ে দিয়ে শিবলাল উঠে বসল, বাইরে রাস্তার দিকে চোখ মেলে রইল ও।

জামাডিহি-আসানসোলের বাসখানা এখানে পৌঁছে যাত্রী খালি করবার সঙ্গে-সঙ্গে নতুন যাত্রীতে ভর্তি হয়ে গেল। একটু পরেই ছেড়ে দিল বাসখানা। 'খালি গাড়ি, খালি গাড়ি·· ছেড়ে দিল···আরে, দৌড়কে আও, এ্যাই···ঠিক হ্যায়, চলিয়ে···' কণ্ডাক্টার বাসের গায়ে টিকিটের বাণ্ডিল-চেপে-ধরা মুঠি দিয়ে পেটাতে লাগল।

শিবলাল যখন জেম্‌স্‌ সাহেবের অফিসে দেখা করতে যায়, তখন অবশ্য এ্যাকশন কমিটির অফিস-রক্ষক করালী বারুই (যে তার ঘরখানা এ্যাকশন কমিটিকে দান করেছিল) তার সঙ্গে গিয়েছিল। যাবার আগে বলেছিল সে,

'বাবু, উখেনে জেমস্ সাহেবের সঙ্গে যত খুশি বাতচিত্ত করবেন, কিন্তু খাবেন নাই কিছু⋯'। 'কেন ?' প্রশ্ন করেছিল শিবলাল কিন্তু পরক্ষণেই তার অর্থ বুঝতে পেরে বিস্ময়ে আর ক্রোধে হতবাক হয়ে গিয়েছিল ও। কতক্ষণ করালীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'খাবনা কেন, বেশ করব খাব। ভদ্রলোক এক কাপ চা দিলে না বলতে হবে ? ছি-ছি, আমরা না মানুষ⋯'

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ঢেউ খেলানো রাস্তার ওপর ওদের গাড়িটা ছুটে চলেছে হর্ণ আর কণ্ডাক্টারের চিৎকার ছড়াতে ছড়াতে। দু'পাশের গাছগুলির দিকে তাকিয়ে শিবলাল সহসা ভাবলে, 'আচ্ছা, মানুষ মানুষকে অবিশ্বাস করবে কেন ?' গেল শীতকালে যখন সে রামবাঁধে বন্ধুর বাড়িতে যায় সেদিন এবং এ্যাকশন কমিটি গঠনের আগে-পরে অনেক বারই তার বুক চিরে-চিরে এই প্রশ্ন উঠেছে, 'মানুষ প্রতারণা করবে কেন ?' এ্যাকশন কমিটি গঠনের ব্যাপারে মর্মান্তিক যন্ত্রণাও পেয়েছিল ও। কিন্তু এখন ঠিক বিপরীত দিক থেকে ওর মনকে চেপে ধরল : 'আসলে আমরাই ভীষণ দুর্বল, তা না হলে অবিশ্বাস করতে যাব কেন। জেমস্ সাহেব এ্যাকশন কমিটির মীটিং ভাঙতে আরম্ভ করেছেন, এটা অবিশ্বাস ছাড়া আর কি ? তারপর, এ্যাকশন কমিটির ওনারাও তার প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছেন⋯ এটা শুধু অন্যের ওপর অবিশ্বাস নয়, নিজেকেও অবিশ্বাস করা ⋯' শিবলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে। অথচ, আন্দোলন করতে নেমেছিল কেন তারা ? যতটুকু বুঝেছিল সে—শ্রমিকদের ভালো হওয়াই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, কারো ক্ষতি না করে। কিন্তু এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে কি রকম ? এখন সবাই সবার শত্রু : শ্রমিকের শত্রু মালিক, মালিকের শত্রু শ্রমিক, শুধু তাই নয়, ভাইয়ের শত্রু ভাই। 'আঃ⋯না-না, তা হতে পারে না⋯' শিবলাল নিজের মনেই যন্ত্রণায় ঘাড় নাড়লে।

বিষয়টা থেকে মন সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল শিবলাল। সামনে শেষ বিকেলের আলোতে কর্মব্যস্ত গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড পড়ে রয়েছে, তারই দু'পাশে গাছগুলি পথ করে দিয়ে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। শিবলালের মনে হল (সহসা সম্ভ্রমপূর্ণ, আনত আর একখানি মুখ ভেসে উঠল ওর সামনে), মেনকাদের ওখানে বেশ কয়েক দিন যাওয়া হয় নি, ফিরে ওদের ওখানে একবার যেতে হবে। এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত, স্নিগ্ধ আনন্দ অনুভব করল শিবলাল, সে যে ওদের ওখানে যায়, যাবার জন্যে মনে মনে নিজের অজান্তেই অপেক্ষা করে থাকে এইটে খুব ভাল লাগল ওর। 'কিন্তু⋯কিন্তু ও কি

আমার জন্যে অপেক্ষা করে!' নিজের মনের মধ্যে এই প্রশ্ন করে মুচকে হাসতে গিয়ে থমকে গেল শিবলাল, তার ভাবাবেশটুকু খুব টান-করে-বাঁধা তারের মতো ছিঁড়ে গেল যেন। 'আমি ওকে ঠকাচ্ছি না তো···ওর কাছে অবিশ্বাসের কাজ করছি না তো···' শুকনো বুকে প্রশ্ন করল শিবলাল। বনমালী পালের ভাইঝি-সংক্রান্ত সেদিনের সেই ব্যাপারটা ছুরির ফলার মতো ঝিকঝিক করতে থাকে ওর সামনে। 'কে জানে···কে জানে···হয়তো এমনি করেই অনিশ্চয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে ওকে, আমাকে, সবাইকে। তার বেশি দাবী করতে পারি না হয় তো···'

হঠাৎ একটা গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে নিজেকেও ঝাঁকানি দিয়ে বসল শিবলাল। এসব কি চিন্তা করছে সে? ওদের গাড়িটা পুরানো, কিন্তু খুব জোরে ওপর ছুটছিল ওটা। একটা নতুন বিরাটকায় প্যাসেঞ্জার বাসকে পেরিয়ে গেল ওটা। কিন্তু পেরিয়ে গেলে কি হবে, প্যাসেঞ্জার নাবার দরকার ছিল, গাড়িটার গতি একটু কমে আসতেই নতুন গাড়িটা হুস করে ওটাকে ছাড়িয়ে গেল। ওটার কণ্ডাক্টার দুয়ো দিয়ে দিলে।

শিবলাল অস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারলে, এই দৌড়ের প্রতিযোগিতা আগের থেকেই চলছে। একবার এটা এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ওটা যাচ্ছে এগিয়ে। শেষবার যখন দুয়ো দিয়ে নতুন বাসটা এগিয়ে গেল, তখন এটার রোখ চেপে গেল। ড্রাইভার স্টিয়ারিংএর ওপর ঝুঁকে পড়ল একেবারে। মিনিট খানেকের মধ্যে পাশে গিয়ে পৌঁছাল এটা। নতুন বাসটা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল, ওটাও স্পীড দিলে বাড়িয়ে। কিছুতেই এটাকে এগিয়ে যেতে দেবে না। একটু পরে দুটো গাড়িই টপ-স্পীডে পাশাপাশি একেবারে সমান-সমান ছুটতে আরম্ভ করলে। দুটোর মাথাই সমান, কোনটাই একচুল এদিক ওদিক নয়। হু-হু ক'রে গরম বাতাস শিবলালের মুখখানা ঝলসে দিতে লাগল। চুলগুলো পেছনে টানা হয়ে ঘাড়ের পেছনে উড়তে লাগল। পাশের গাছপালা, লাইট-পোস্ট যেন কেউ ছুঁড়ে-ছুঁড়ে পেছনে ফেলছে। নতুন বাসটার কণ্ডাক্টার ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। আর এটার কণ্ডাক্টার ঢুকবার দরজায় পা-দানির ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে কী যে চিৎকার করে বলে চলেছে বোঝা মুস্কিল। গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—মুখে কৌতুক কিন্তু চোখে একই রকম প্রতিযোগিতার ভাব আর উদ্বেগের ছায়া। হঠাৎ অবস্থাটা বদলে গেল। এক চড়াই শেষ করে যখন উৎরাইয়ে নামছে এ-দুটো, বিপরীত দিক থেকে আর-একটা বাস তেমনি টপ-স্পীডে ছুটে আসছে

দেখা গেল। অবস্থাটা কী হবে কেউ বুঝতে পারল না। যদি এদের মধ্যে কেউ একজন পিছিয়ে যায়, তাহলে বেঁচে যাবে সব কটা, তা না হলে তিনটেই ছিটকে চুরমার হয়ে যাবে। সামনেরটার থামার কোনো দরকার নেই কেবল এদের একজন থামলেই হ'ল। শিবলাল পাশ ফিরে দেখলে, ড্রাইভার একটা শক্ত কাঠের মতো স্টিয়ারিংএর ওপর পড়ে আছে, কেবল চোখ দুটো জ্বলছে। ওই রোগা, অপরিচ্ছন্ন ড্রাইভারটা কি করতে চায় এতগুলো লোককে নিয়ে? আর এক সেকেণ্ড···কিন্তু ড্রাইভারটা একটা কিছু করলে। ওর নড়বড়ে গাড়িটাই যেন লাফ দিয়ে নতুন গাড়িটাকে পেরিয়ে গেল। তারপর একটা দুলুনি দিয়ে বাঁ-দিক নিতে পারল ওটা। উত্তেজিত কণ্ডাক্টার চিৎকার করতে লাগল, 'দুয়ো···দুয়ো··· শালাঃ···শালী রাধারানী (নতুন বাসটার নাম)···'

মিনিটখানেক পরে শিবলালের শরীরটা শিথিল হয়ে এল। ও লক্ষ্য করলে, বাঁ-হাতে প্রাণান্ত চাপ দিয়ে ও দরজাটা চেপে ধরেছিল, ছেড়ে দিতেই হাতটা জ্বালা করতে লাগল। ফিরে ইসমাইলের দিকে তাকাল ও। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারল না শিবলাল। কুঁকড়ে, আধ-বোজা চোখে পেছনে হেলান দিয়ে বসেছিলেন উনি। হয় এই গতি-প্রতিযোগিতার সম্বন্ধে তাঁর কোনো চেতনা ছিল না, নয়তো এই প্রতিযোগিতার পরের জিনিস কি, যার জন্যে এই দৌড়ের পাল্লা, সেটাতেই নিমগ্ন হয়ে ছিলেন।

অধ্যায় ১২

সেইদিন সন্ধ্যার পর শিবলাল যখন মেনকাদের বাসায় খাবার জন্যে প্রস্তুত হল, তখন আগেকার সব কিছু বিতর্ক, সংশয় সব ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, তখন ভারি ভালো লাগল ওর। দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে বাইরের চত্বরে এসে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াল শিবলাল। স্বচ্ছ অন্ধকার হাল্কা কাজলের মতো আব-হাওয়াটাকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে। চোখ তুলে ও একবার তাকাল, পরিচ্ছন্ন বিস্তৃত আকাশে তারাগুলো ঝিকঝিক করছে, মনে হচ্ছে সকৌতুকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। কিন্তু যেটা ওর সমস্ত শরীরে একটা হাল্কা খুশির আমেজে ভরে তুলতে লাগল, সেটা হচ্ছে চৈত্রের হাওয়া। মনে হয়, এগিয়ে যাবার পুরস্কার প্রতিমুহূর্তে পাওয়া যায়, চলার মধ্যে। বাতাসটা এলোমেলো বইতে

থাকে, কাণায়-কাণায় ভরা অনিশ্চিত হৃদয়ের মতো। শিবলাল হাঁটে আর বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। একটু আগে স্নান করে এসেছে ও, একবার মনে হয় সাবানের মৃদু সুগন্ধ পাচ্ছে, পরক্ষণেই মনে হয়, রাস্তার পাশের ঐ কি ফুলের থেকে সুগন্ধ ভেসে আসছে। স্নানের পর পোষাক বদলে এসেছিল ও, হাল্কা পাঞ্জাবিটা গায়ের ওপর সুখস্পর্শের মতো পড়ে রয়েছে, কোথাও বাতাসে ঈষৎ নাড়া খাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল শিবলাল কিন্তু স্টেশন রোড পেরিয়ে পুরাণা হাটের রাস্তায় পড়তেই সহসা ও যেন অস্থির হয়ে উঠল, খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে ও। কেমন করে ওর মনে হতে লাগল ওদের বাড়ি সত্যিই অনেক দিন যায় নি সে, না যাওয়াটা অন্যায় হয়ে গেছে। আর আশ্চর্য, এই অনুতপ্ত হওয়াটাই ভাল লাগল ওর।

একটু পরেই ওদের দরজার সামনে এসে হাঁক দিলে, 'কই হে, গোবিন্দ আছ…'

মনে হল, ওরা ভেতরে কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখনই কেউ উত্তর দিল না। আর একবার ডাকার পর কাদু মাথায় কাপড় টানতে টানতে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

'গোবিন্দ কোথা? ওরা ফেরে নি বুঝি…আমি একটু আগেই চলে এসেছি…' ঈষৎ লজ্জিতস্বরে শিবলাল বললে। একটু আগেই যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সেটা মনে পড়ল না ওর।

'সে কি কথা, বাবা…এসেছ, বেশ করেছ। এ তো তোমার নিজের ঘর …এস, বাবা…' গদগদস্বরে কাদু বললে, মেঝেতে মাদুর পেতে দিতে দিতে। ওরই মধ্যে চোখের কোণাটা আঁচল দিয়ে মুছে নিলে ও।

সাড়ে ন'টার ঘণ্টা পড়ল কোথায়। অনেকক্ষণ আগে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল শিবলাল, তারপর ভুলেই গেছে। এতখানি সময় কী ভাবে যে কেটে গেল বুঝতে পারল না ও। মাঝেমাঝে কাদু রান্নাঘর থেকে এসে বসছে, আবার চলে যেতে হচ্ছে ওকে। মেনকার ছোট ভাইটাকে নিয়ে একটু আগে নাড়াচাড়া করছিল শিবলাল, ওর একটা আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু আগে শিবলাল কাদুকে বলছিল, 'এ বাড়ির বেশ, দুই ছেলে এক মেয়ে, এই ভাল…।' কাদু ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'কই আর ভাল, বাবা। গোবিন্দ ত হাতের বার হয়ে গেল, একটা দোকানে দিয়েছে বটে, ত ঐ পর্যন্ত, ধর কাছি ত ধরে আছি…তারপর ঐ মেয়ে, কি করে পার

করব, রাত্রে ঘুমোতে পারি না, বাবা…'। শিবলাল এ কথার জবাব দেয় নি. অথচ তারই সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এ'কথার। বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে ভেবেছে, এ'কথার উত্তর দেবার নয়, এটা একদিন সত্য করে তুলতে হবে।

একটু আগে মেনকা চা দিয়ে গেছে। শিবলাল জানে, আর কিছু পরে ও খেতে দেবে, কিছুতেই তার আগে আর আসবে না। তাছাড়া বারবার দেখতেও চায় না ওকে শিবলাল। মেনকা দেখবার মতো মেয়ে নয়, [illegible] আসে না সে। কিন্তু আশ্চর্য স্নিগ্ধ ওর মুখখানা। মেনকার মুখে যে একটা বিষণ্ণ ভাব আছে, সেটা শিবলালের নিজের মায়েরই মতো। অনেকবার তাকিয়ে তাকিয়ে ও সেটা বুঝতে পেরেছে। তখন ওর মনে হয়, আহা, মা যদি বেঁচে থাকতেন! তাহলে এই মেয়েকে নিয়ে কারও কাছে তার জবাবদিহি করতে হ'ত না। কেবল শিবলালের মুখের দিকে তাকিয়ে একে ঘরে তুলে নিতেন।

আর লীলা? লীলার সম্বন্ধে ওর মনের মধ্যে একটা নতুন চিন্তা আর সামঞ্জস্য গড়ে উঠেছে। আগে লীলার প্রসঙ্গ উঠলেই মনে হত বনমালী তাকে মর্মান্তিক অপমান করতে চেয়েছে, আর বাবা তার সমস্ত কামনা, তার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু অন্যকে দোষ দিতে এখন তার নিজেরই লজ্জা করে। আসলে, অপমান যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা তার নিজের মধ্যেই আছে। পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় সেদিনকার কথা মনে হলেই জঘন্য গ্লানিতে ওর সমস্ত মনটা ঢেকে যায়। আর এই মেয়েটি, এই শ্রীহীন, নীরব মেয়েটি তার সমস্ত গ্লানি ঘুচিয়ে দিয়ে আনন্দে তাকে পূর্ণ করে তুলেছে। মেনকার কাছে জীবনে-মরণে সে কৃতজ্ঞ—এ কৃতজ্ঞতা সে প্রকাশ করেও বলতে পারে না।

কান্থ মাথায় কাপড় টেনে ঘাম-ঘাম মুখে বেরিয়ে এল। বললে, 'বাবা, তুমাকে একা-একা বসে থাকতে হয়েছে…আমার হয়েছে সব দিকে জ্বালা, যে-দিকে না দেখব, সেদিক হবার জো নাই। খুকিকে বলছি, তুই রান্নাটা একটু দেখ, কি, ঘরে যেয়ে তোঁর দাদার কাছে বোস, ত মুখপুড়ী এখেনেও আসবেক নাই লজ্জায়, আবার রান্নাতেও হাত দিবেক নাই, পাছে তুমি নিন্দে কর…' বলে একটু হেসে, ভেতরের বারান্দার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে কান্থ শিবলালের থেকে একটু দূরে ঘুমন্ত ছেলেটার পাশে বসে পড়ল।

শিবলালও মৃদু হাসলে, কিন্তু টলটলে ভরা দীঘিতে ঢেউ উঠে যেমন প্রকাশ করে সেটা কতখানি ভরা, তেমনি এ-হাসি তার ভরা মনটাকেই প্রকাশ করে

দিলে। ও বললে, 'মাসিমা, আমি একলা বসে থাকলেও আমার খারাপ লাগছে না। তাছাড়া, আপনি তো মাঝে-মাঝে আসছেন…' কিন্তু একথা বলতে বলতেই শিবলালের মনে হল, ওর হৃদয়ের সব কথাই তো এর দ্বারা বলা হয় নি। ঈষৎ গাঢ় স্বরে বললে, 'দেখুন, মানুষ যখন জানে যে সে তার নিজের লোকের মধ্যেই রয়েছে, তখন আর তার একলা লাগে না। মানুষের বিশ্বাসটাই তো সব…'

'সে কথা ঠিক, বাবা। মানুষকে আশা করে ঠকতে হলে তার বেশি আর কিছুতেই লাগে না…'

একই রকম কথা বলছিল ওরা, কিন্তু উভয়েই তা করছিল নিজের বুকের ভেতর তাকিয়ে সামঞ্জস্য খুঁজতে খুঁজতে, বিভিন্ন উৎস থেকে বয়ে এসে দুটি স্রোতস্বতী যেমন করে মেলে। শিবলালের মনে এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, যতই প্ররোচনা আসুক, যতই আঘাত আর ভাঙন আসুক না কেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস করা যায়। আর সে-বিশ্বাস সে রাখতে পারবে। কানুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম—মেনকার বিয়ে নিয়ে সে সত্যিই মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যেন এতেই তার নারী-জীবনের সার্থকতা। যেদিন প্রথম চন্দ্রকান্তর থেকে এবং তার পরে স্বামীর থেকে মর্মান্তিক আঘাত পায় ও, সেদিন থেকে নিজের অজান্তেই এই পণ করেছিল সে। সবার কাছেই বিশ্বাসের দাবী করছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর যাবার সময় কানু বললে, 'তুমাকে কত কি কথা বলে ফেলি, বাবা, কিছু মনে কর নাই। সবাই মিলে…কত দোষ-ত্রুটি হয় আমাদের, রাগ কর না।'

শিবলাল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে বললে, 'মাসিমা, এখানে এসে আনন্দ পাই, সেই জন্যই আসি। আর কি না, রাগ করব আমি!'

কানু বোধ হয় চোখের জল চাপবার জন্য তাড়াতাড়ি চলে এল ভেতরে।

* * *

ওখান থেকে ফিরে অনেক রাত্রে ওদের খুপরীর সামনে খাটিয়া পেতে শুল শিবলাল। এখন পর্যন্ত অনেকেই বাইরে শুতে আরম্ভ করে নি। এই তো এপ্রিলের প্রথম, রাত্রির প্রথম দিকে গরম থাকলেও শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে যায়। অবশ্য সে ছাড়া আরো একজন শুয়েছে বাইরে, চত্বরের ওদিকে।

বালিশের ওপর দু'দিকে কনুই ছড়িয়ে দুই হাতের পাতার ওপর মাথা রেখে পড়েছিল শিবলাল। বাঁ-হাটুর ওপর ডান পায়ের পাতাটা দিয়ে মাঝে-মাঝে

দোলাচ্ছে, আবার চুপ করে ভাবছে। আকাশটা খুব পরিষ্কার, কারখানার লাল আলোর জ্যোতিতে মৃদু-মৃদু কাঁপছে। আলোর আস্তরণটাও তেমনি চঞ্চল, ঢেউয়ের মতো দোল খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে মনে হয় খুব সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়ের মতো—ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলো ঝিকঝিক করছে। এদিকে দক্ষিণের বাতাস এসে সিরসির করে চুলের ওপর লাগে, ওর ভাঁজকরা বাহুতে ছোঁয়া দেয়, তারপর ওর বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

শিবলাল আলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কারখানার কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে ওর চোখের সামনেকার আলো সরে যায়, সেই জায়গায় ওর মনের মধ্যে আর-এক প্রকৃতির আলো জ্বলে ওঠে। হট-মিলেই প্রথম স্লো-ডাউন আরম্ভ হয়েছিল। তারপর সেই আন্দোলন—তার জন্যে উৎসাহ আর উত্তেজনা আর হট-মিলেই সীমাবদ্ধ নেই, কারখানার মজদুরদের মধ্যে, সমস্ত মজদুরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন প্রথম স্লো-ডাউন আরম্ভ হল, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে শিবলালের। অন্যান্য মিল থেকে হট-মিলে মাঝে-মাঝে লোকজন আসছে আর দেখা করে যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক মিল থেকে এদের জন্যে উপহার পাঠাচ্ছে শ্রমিকরা—ফুল, দুধ, মিষ্টি, ফল। রতনের সঙ্গে হরনাম সিং, সেই দৈত্যাকার ছেলেমানুষ পাঞ্জাবীটি—তার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে ওকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিল, 'আই গিভ্ ইউ ফ্লাওয়ার, মিঃ ডাস…।' কিন্তু ও কেবল ফুল দিতেই আসে নি, ও মিষ্টি খাওয়াতেও এসেছিল। ওদের উপহার পাওয়া মিষ্টি। ও যখন শিবলালকে বাঁ-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ডান হাতে করে একসঙ্গে এক-জোড়া সন্দেশ ওর মুখে পুরে দিয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল দুদিকের চাপে দম বন্ধ হয়ে ও মরবে।

আঠারো নম্বর মিলের জনাব আব্দুল এসেছিলেন হট মিলে। উনি বলে গিয়েছিলেন, 'ভাই, আপনারা আগাইয়া যান, যা করবার দরকার হবে আমরা আছি পিছনে। মজদুরদের লেগে খোদাতালার মর্জি আছে…'

শিবলাল চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শুলে। ও এরপর বোধ হয় ঘুমোতে চায়। ওদিকে যে শুয়েছে তার নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে। ওর ঐ নিশ্চিন্ত নিদ্রা খুব ভাল লাগল শিবলালের। সুস্থ মানুষের স্বচ্ছন্দ বিশ্রাম এমনিই হয়। কিন্তু সবাই কি অমনি করে ঘুমোতে পারে? 'আচ্ছা, জুনাপুরের সব মানুষ ঠিক এই মুহূর্তে কে কি করছে…' একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজেরই মনের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন হাসি ফুটে উঠল। পুরাণা-হাট, বরসিংবাঁধ,

চাঁতা, চাঁতা ডাঙাল—অজস্র কুলি-বস্তি, কোম্পানীর দেওয়া কোআর্টার? কিন্তু তখন সেটা আর শিবলালের নিছক কৌতূহল হয়েই থাকে না। হাসিমুখ টান হয়ে পড়ে, বিস্ময়ে ও নিস্পন্দ হয়ে আসে। এত অসহ্য দারিদ্র্য, ভাঙন, প্ররোচনা, এত অপমানের মধ্যেও এই তেজ, এই উৎসাহ আসে কোথা থেকে! মানুষ কত সংকীর্ণ, কত সামান্য ব্যাপার নিয়ে মজদুরদের মধ্যে হানাহানি হয়ে যায় তা তো শিবলালের অজানা নয়। তারই মধ্যে এই অসাধারণ বিশ্বাস এল কি করে—যেখানে তারা সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত!

শিবলাল আবার চিৎ হয়ে শুলে—আজ ওর ঘুম আসবে না। কপালের দুই রগ, কান আর বুকের ভেতর গরম মনে হচ্ছে ওর। দুই হাতের তেলো সুখোষ্ণ, পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করতে চায় যেন। সমস্ত শরীরের মধ্যে স্ফূর্তির মতো একটা আনন্দ বিছিয়ে রয়েছে যেন। তখন আস্তে আস্তে একখানা মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কালো মুখখানা, খসখসে গায়ের রঙ। মেয়েলি লাবণ্য আর চাঞ্চল্য কিছুই নেই তাতে। দুটি চোখ নিচু-করা, কিন্তু কপালে একটি টিপ। আশ্চর্য বেদনা আর মমতা মাখানো!

শিবলালের নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়, কান বোধ হয় ঝিঁ-ঝিঁ করে, আর বুকের ভেতরটায় কেমন অস্পষ্ট রকমের অসহ্য লাগে, টিপটিপ করতে থাকে।

অধ্যায় ১৩

বনমালীর নেশা দামুনিয়াতে সেদিন রাত্রে হয় নি। নেশা আরম্ভ হয়েছিল এ্যাকসিডেন্টের পর অজ্ঞান অবস্থা থেকে চেতন হবার পরে, এখন সেটা পুরো মাত্রায় জমেছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ যখন জুনাপুরের আবহাওয়া এবং আন্দোলনের অবস্থা দুই-ই খুব গরম এবং জুনাপুরের বিভিন্ন শক্তি প্রাণান্ত দৌড় দিচ্ছিল নিজের নিজের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে এবং সকলেই এমন একটি সার্বভৌম ফলকে সত্য করে তুলছিল যা তারা হয়তো কেউই চায় নি—তখন বনমালীও একই রকম করে ভাসতে আরম্ভ করেছিল। এই তো সে যা চায় তা হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। তার সাঙাৎরা যখন তার নসীবের প্রশংসা করত সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে বলে, তখন তার বসা-বসা চোখে নীরবে হাসত বনমালী। তখন লোকগুলোর ওপর করুণা হত তার, এই ভেবে যে

ওরা কেবল তার থলিয়ার বাইরের রঙচঙটারই তারিফ করছে, ভেতরে কি আছে তা ওরা ভাবতেও পারে না। অথচ এখনই তা খুলে দেখাবারই উপায় নেই ওর।

এ্যাকসিডেন্ট করার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়েছে বনমালী, কেননা, প্রমাণই হয় নি যে সে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। 'আর যদি ধরতেই পারত ওরা, তাহলে আমার 'অমুক' করত···বাব্বা, পাঁকাল মাছ, ঠিক বেরিয়ে যেতম···' চিবিয়ে চিবিয়ে বলত বনমালী। সম্ভবত, তখন তার শ্রী ব্যানার্জীকে মনে পড়ে থাকবে। এই সময় তার কেবলই মনে হত, তার না-পাওয়ার মতো কিছু নাই, এখন সে যা-খুশি টেনে আনতে পারে। কেবল ওর এই খুশি-খুশি মনের অবস্থা আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সুরেন সাহা আর রব্বানির মৃত্যুর ও কোনো সামঞ্জস্য করতে পারত না। কিন্তু মনের মধ্যে এইটে খচখচ করে উঠলেই তৎক্ষণাৎ এও মনে হত ওর, কথাটা নিয়ে ওর ভাববার কিছু নেই এবং একটু পরেই তা ভুলে যেত।

এমনি সময় একদিন দুপুর বেলা কারখানা থেকে ফিরে রান্না-ঘরে খেতে বসার সময় সাবিত্রীকে বনমালী বললে, 'সব ঠিক করে ফেললম, ছোটকী। মদনের দাদা, রাধাবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা সব হল আমার। মাসখানেক পরে··· ধর, বৈশাখের শেষ কি জষ্ঠির প্রথম বিয়েটা ধরে দিব···'

'তাই না কি? হে ভগমান, হে মা কালী···' বলতে বলতে বসে পড়ল সাবিত্রী, তরকারীর বাটিগুলো ধরে দিতে ভুলে গেল।

বাইরের ঘরে খেয়ে-দেয়ে বসবার পর লীলা পান দিতে এল। বনমালী ঈষৎ নিম্নস্বরে, যেন একটা গোপন কথা বিশ্বাস করে শোনাচ্ছে এমনি করে বললে, 'জানিস, আজ সন্ধে বেলা তোকে নিয়ে ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোয় যাচ্ছি, তুই তৈরী হয়ে থাকবি। ওস্তাদজীকে তোর মনে আছে ত?' বনমালী সেই কুস্তি-প্রতিযোগিতার দিনটার কথা মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছিল ওকে।

'ওঃ, সত্যি?···বেশ হবে তাহলে···' যেন হাত-তালি দিয়ে উঠবে এমনি একটা ভঙ্গী করল লীলা, কিন্তু তা না করে সাগ্রহে তাকিয়ে রইল বনমালীর দিকে।

লীলার এমনি একটা উৎসাহ দেখবে বনমালী যেন আশাই করে নি। ভেবেছিল লীলা হয়তো রাজীই হবে না, আজকাল মেয়েটা যে-রকম অন্যমনস্ক আর ছিষ্টিছাড়া হয়ে উঠছিল। মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল ও, কিন্তু পরক্ষণেই

মনে মনে হেসে ভাবলে, 'ঐ গুলো ঐ রকম। একটু আগে উমার কাকি মদনের সঙ্গে বিয়ার কথা শুনে ঐ রকমই লাফি' উঠেছিল!' মুখে বললে, 'হ্যাঁ রে, বেশ হবে। ওস্তাদজী আচ্ছা আদমী আছেন। ওরকম পুরুষ হয় না রে⋯উনি তোকে যেতে বলেছিলেন এক দিন ⋯'। লীলা ঘাড় নাড়ল, কিন্তু তার দ্বারা ও কি বোঝাতে চাইল বোঝা গেল না।

সমস্ত দুপুর আর বিকেলটা একটা অস্থির প্রত্যাশা নিয়ে কাটাল লীলা। ওর কেবলই মনে হতে লাগল, সন্ধ্যা হতে এত দেরি হচ্ছে কেন। বনমালী ওকে তৈরী হতে বলে গিয়েছিল, সন্ধ্যার কাছা-কাছি একবার পোষাক বদলাবার কথা ও ভেবেওছে, কিন্তু যে একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র অনুভব ওর বুকের মধ্যে পাক খেয়ে উঠেছিল, সেটার তুলনায় কাপড়-চোপড়ে হাত দেওয়া ওর কাছে অর্থহীন বলে মনে হ'ল।

ওর বন্ধু শেফালির বিয়ের পর থেকে সমস্ত দিন-রাত্রি, ঘর-কন্না ওর কাছে এক-ঘেয়ে আর অসহ্য মনে হচ্ছিল। বনমালী কারখানায় যায়-আসে, কাকিমা ককিয়ে-ককিয়ে চিৎকার করে আর কাজ করতে থাকে। ও জানে কোন্ সময় কাকিমা কোন্ কথা বলবে, কী ভাবে নেতিয়ে পড়বে। বেলা যেদিন স্কুল কামাই করে, সেদিন নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে কেমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নানা-রকম কথা বলতে থাকে। এ সবই তার আগের থেকে জানাই মনে হয় না কেবল, তার গা ঘিন-ঘিন করে ওঠে। ওরা কি জঘন্য আর অর্থহীন। ওদের খিড়কির দরজা খুললেই ছোট মাঠটার ওপর একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ঝামরে রয়েছে দেখা যায়। কোনও সকালে ঈষৎ-উত্তপ্ত রোদ যখন গাছটার ওপর পড়ে তখন চকিতে ওর মনটায় দোলা দিয়ে উঠতে গিয়েই চুপসে যায়। হঠাৎ সেই বিয়ের রাত্রির কথা মনে পড়ে, শেফালির বাণীদি ওকে টেনে নিয়ে যেতেই যেমনি নিভে গিয়েছিল ও। বারবার করে মদনের সম্বন্ধে ওর মনে হয়, 'ও কেন দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে⋯কি বলতে চাইছিল ও⋯,' কিন্তু সাহস করে নিজের মনে উচ্চারণ করতে পারত না, 'ও কিছু করল না কেন⋯', কেবল তৎক্ষণাৎ বুকের ভেতর রুদ্ধ, কঠিন হয়ে উঠত।

এমনি সময় বনমালী যখন ওকে ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোয় বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা বললে তখন একটা ফুল-ফোটা ডালে দক্ষিণের হাওয়া লাগলে যেমন হয়, ওর বুকের ভেতরটা তেমনি অস্থির, তেমনি আবেগে অন্ধ হয়ে উঠল। বনমালী ওকে কেন নিয়ে যাচ্ছে সে-কথা একবারও মনে হ'ল না ওর, বনমালী

যে শীঘ্রিই টিণ্ড্যাল থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যানের পদে উন্নীত হ'ল এটাও সে জানতে পারল না, সে-সম্বন্ধে কোনো কিছু ভাববার মতো ক্ষমতাও ছিল না ওর। এমন কি কুস্তি-প্রতিযোগিতা দেখে ফিরবার সময় ব্যানার্জী সাহেবের সেই ফুল দেবার কথাও চিন্তা করতে পারল না, কেবল সেটা অস্পষ্ট হয়ে ওর মনের মধ্যে ফুটে রইল।

কিন্তু ব্যানার্জী সাহেবের ওখানে 'যাওয়া'-টাই ওর কাছে একটা অদ্ভুত আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। যদি ওকে বলা হত, আজ রাত্রে দামোদর-বীচে পিকনিক করতে যাবার জন্য, তাহলেও বোধ হয় এমনি একটা তীব্রতা অনুভব করত ও। ওর কেবলই মনে হতে লাগল, ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোতে এর আগেও ও গিয়েছে, এবং সেখানে কি হবে, কি করবে সেইটেই মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল ও।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই যখন বনমালীর সঙ্গে ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোতে উপস্থিত হ'ল লীলা, তখন সেটা চেনা কি অচেনা তা মনে হ'ল না ওর। বনমালী ওকে বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং অনেকক্ষণ ধরে কী কথাবার্তা বলতে লাগল। রাত্রিতে বাংলোটা যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সজ্জিতের রূপ ধারণ করে, ঠিক তেমনই ছিল, কেবল লোক-জনের হুল্লোড় ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এর থমথমে ভাবটা আরো ঘন হয়ে উঠেছিল যেন। সামনের বাগানের গাছগুলোর ওপর বৈদ্যুৎ আলো পড়ে একটা আবছা কালো-কালো ভাবের সৃষ্টি করেছে। সিরসিরে বাতাসে গাছের মাথা, ডাল-পালা এলো-মেলো দুলে উঠছিল। সব কিছু যেন একটা কিছু বলতে চাইছে, কিছু একটার জন্য যেন প্রতীক্ষা করে রয়েছে। লীলা সেইটে বুকের মধ্যে না-চেনা অথচ পুরাণো অনুভূতির মতো বোধ করতে লাগল, কিন্তু বুঝতে পারল না। হঠাৎ একটা স্বস্তির মতো (যা ওর কাছে সমান অসহ্য বলেও মনে হতে লাগল) ওর মনে পড়ল, শেফালির বিয়ের রাত্রে ছাদের কোণায় বসে বিলু নামে যে-মেয়েটির কথা শুনেছিল সে: বড় সাহেব তাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন গান গাইবার জন্যে। ওর মনে হতে লাগল, ঠিক সেই ঘটনাই এখন ঘটতে চলেছে ওর জীবনে। এখনই একটা অদ্ভুত কিছু ঘটবে ('সেটা' এখনও ঘটছে না কেন?—অপেক্ষা করতে করতে ওর বুকের ভেতর আড়ষ্ট, কঠিন হয়ে উঠতে লাগল), যা সমস্ত জীবন ধরে আর পাবে না লীলা।

বনমালী দরজার সামনে এগিয়ে এল এবং হাসি-মুখে ওকে ডাকলে। হাসিটা

ব্যানার্জী সাহেব ওকে যে প্রসাদ দিয়েছিলেন তারই জন্যে, মুখ থেকে সেটা মুছে যায় নি। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল লীলা, ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর গিয়ে পড়ল। ওদিক থেকে ক্লান্ত, সকৌতুক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আরে, আবার কি, বনমালী ? ও, তোমার সেই ভাইঝি…' কিন্তু পরক্ষণেই সেই কৌতুক-শিথিল কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে গাঢ় হয়ে উঠতে চাইল যেন। 'এতক্ষণ ও কোথায় ছিল, কী আশ্চর্য…' শঙ্কিত, শ্রী ব্যানার্জীকে বনমালী লীলার কথা এতক্ষণ জানায় নি।

বনমালী সেলামের ভঙ্গীতে কেবল মাথা নোয়ালে কিন্তু কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ও।

শ্রী ব্যানার্জী ঈষৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। লম্বা হাতল-ওয়ালা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে গা-সহা গরম জলে পা ডুবিয়ে বসেছিলেন উনি। বোতাম-খোলা শার্টের ফাঁকে তাঁর ফর্সা, লোমশ বুকখানা দেখা যাচ্ছিল। পা-জামা হাঁটুর নিচে পর্যন্ত গুটানো, কেদারার বাঁ-দিকের হাতায় তোয়ালে রাখা। খালেক ওঁর পাইপে তামাক ভরছিল এতক্ষণ, শ্রী ব্যানার্জীর হাতে দিয়ে দেশলাইটা তোয়ালের পাশে হাতলের ওপর এগিয়ে দিলে ও। তারপর লীলার দিকে একবার তাকিয়েই চলে গেল।

লীলার রূপের অনিবার্য-প্রভাব শ্রী ব্যানার্জীর ওপরও কাজ করছিল, তাঁর কৌতুহল উদ্রিক্ত করছিল, তা না হ'লে তিনি বিস্মিত হতেন না লীলার ঘরে ঢোকার পর। কিন্তু যেমন করে হঠাৎ বেরিয়ে গেল বনমালী, তাতে বিরক্ত হয়ে উঠলেন উনি। বনমালী কি ভেবেছে তাঁর সম্বন্ধে ? এর একটা অর্থই হতে পারত এবং চকিতে সেটা তাঁর মনকে ছুঁয়ে গেল। লোকটার স্পর্ধায় গা-টা রী-রী করে উঠল ওঁর। ভাবলেন, এখনই মেয়েটাকে চলে যেতে বলেন, কিন্তু তাতে বনমালীর ইঙ্গিতটাই স্বীকার করে নেওয়া হবে। ব্যঙ্গ-স্পৃষ্ট কিন্তু গভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, 'ও হে, শোন…কি নাম তোমার…ব'স আমার কাছে…' বলে উনি না-ধরানো পাইপ শুদ্ধ ডান হাতটা ঠুকলেন হাতলের ওপর।

লীলার এগিয়ে আসার মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। যেন শ্রী ব্যানার্জী তাঁর কেদারার হাতলের ওপর ওকে বসতে ইঙ্গিত করেছেন এমনি করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এসে হাতলের ওপর বসে পড়ল লীলা। গরম জলের থেকে পা উঠিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছতে লাগলেন শ্রী ব্যানার্জী। মেয়েটার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন কি, ওর এগিয়ে এসে বসার রকম দেখে সমস্ত ব্যাপারটাকে তাঁর সাজানো, ছেলে-

মানুষি বলে মনে হ'ল এবং তিনি হঠাৎ সকৌতুক হয়ে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরটা ঈষৎ কোমল হয়ে এল। বললেন, 'পড়া-শুনা করছ তুমি? না? নয় কেন…'

চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে লাগলেন শ্রী ব্যানার্জী, আর সব সময়ই তাঁর মনে হতে লাগল, 'এই মাত্র বনমালী আমার কাছ থেকে প্রমোশন নিয়ে গেছে, সে কি তারই পুরস্কার দিতে চায় আমাকে? আর, এই বিবশ ছোট্ট মেয়েটিও…এ্যাণ্ড্ সে ক্যান্ থিঙ্ক্ ইন্ টার্মস্ অব হ্যাট্…'। তথাপি, যেমন গভীর রাত্রিতে খেয়ে-দেয়ে গা এলিয়ে দেবার পর পরিশ্রান্ত ডাক্তারের কাছে ডাক এলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও আবার স্টেথসকোপটা হাতে তুলে নিতে হয়, তেমনি করে বললেন উনি, 'তুমি ম্যাট্রিকটা পাশ করে নাও, তারপর তোমাকে আমাদের হাসপাতালে নার্স করে দেব…'

শ্রী ব্যানার্জী মুখ তুলে তাকালেন লীলার দিকে। ওর বাঁ-হাতের কনুয়ের ওপর বাহুতে ধরে নিজের দিকে ফেরাতে চাইলেন একটু: 'জানতো, তোমার মতো সুন্দর আর লক্ষ্মী মেয়েরাই ভালো নার্স হয়। তাদের দেখে আর মিষ্টি কথা শুনে…'

বোধ হয় শ্রী ব্যানার্জী ওকে ঘোরাবার সময় টান দিয়ে ফেলেছিলেন একটু, লীলার পক্ষে সেটুকু সামলানও সম্ভব হ'ল না। ও গড়িয়ে শ্রী ব্যানার্জীর ডান বাহুর ওপর পড়ল। শ্রী ব্যানার্জী বাঁহাত দিয়ে ওকে ঠেলে তুলতে তুলতে প্রায় অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'আরে, ইউ রীয়েলি এ্যাস্টনিশ্ মী…' বুঝতে পারলেন না, এই অল্পবয়স্কা তরুণীটির মধ্যে এটা কেমন করে সম্ভব হ'ল। কিন্তু নিজের অজান্তেই অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, একরকম করে তাকালেন মেয়েটির দিকে। তাঁর সহসা-কোঁচকানো চোখে একটা শুকনো জ্বালা দপ করে উঠল।

তাঁর দুই হাতের মধ্যে পড়েছিল অর্ধ-বিবশ মেয়েটি। ওর পোষাক বিস্রস্ত। ছোট্ট নরম বুকখানা ওঠা-নামা করছে, গলার কাছটা ধুকধুক করছে অতি দ্রুত-বেগে। ঠোঁট দুটি চেপে বসেছে টান হয়ে যাওয়া মুখের ওপর। স্ফুরিত, খাটো নাক, নিমীলিত দুটি চোখ, কেবল সাদা অংশই দেখা যায়। বোঝা যায়, তার মধ্যে ওর প্রাণ থরথর করে কাঁপছে।

শ্রী ব্যানার্জী অস্থির হয়ে উঠতে চাইলেন। কি বলবেন, না কি, কি করবেন—মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শ্রী ব্যানার্জী লীলাকে উঠিয়ে আস্তে আস্তে আবার হাতলের ওপর বসিয়ে দিলেন।

অধ্যায় ১৪

শ্রী ব্যানার্জী ভেবেছিলেন খালেক ঘরে ঢুকবে কিন্তু ঢুকল পায়জামা পাঞ্জাবি ঢলঢল করতে করতে এ্যাকশন কমিটির শেখর মুখার্জী।

'আরে তুমি? এস, এস···কিন্তু এরই মধ্যে তোমাদের মীটিং শেষ হয়ে গেল? কী খবর বল···' পরপর প্রশ্ন করে গেলেন শ্রী ব্যানার্জী। স্পষ্টত, বনমালীরা আসবার আগে থেকেই শেখরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন উনি, কিন্তু এত আগেই এ্যাকশন কমিটির মীটিং শেষ করে ও আসবে সেটা প্রত্যাশা করেন নি।

শেখর সামনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, চোখ দুটো আলতো করে সব কিছুর ওপর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেল ওর: দেয়ালে টাঙানো পেন্টিং আর ফটোগ্রাফ এবং মেঝের ওপর টেবিল আর ফুলদানি পর্যন্ত। মনে হ'ল লীলার ওপর মুহূর্তকালের জন্য চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল ওর, তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বললে, 'খবর আছে, স্যার। জেনেরাল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা চালাবার জন্য কমিটি গড়ে দিয়ে এলাম, স্যার···' কৃত্রিম নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল শেখর মুখার্জী, ও পুরোপুরি জানত, প্রভু এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন।

'সুতরাং জি-এম'এর প্রস্তাব তোমরা মেনে নিচ্ছ বল···' শ্রী ব্যানার্জী তাঁর নৈরাশ্যের ভাবটা চেপে রাখতে পারলেন না, হয়তো এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিলেন বলেই। 'আলোচনা কমিটিতে কে কে আছে?'

শেখর বললে, 'সেক্রেটারী দু'জন, প্রেসিডেন্ট মনোতোষবাবু এবং আমি···'

'বেশ···' মনে হল শ্রী ব্যানার্জী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'লেন কিন্তু পরক্ষণেই ভিন্ন স্বরে বললেন, 'বাট হোআই ডু ইউ চুজ্ ছাট্ ইয়ং চ্যাপ শিবলাল, এ্যাণ্ড নট ইসমাইল, অর···'

শেখর তার লম্বা, অনড় মুখের ওপর হাসির ভঙ্গী এনে বললে, 'আপনি জানেন না, স্যার, হিন্দু-গেরস্থের গিন্নীদের একটা ডুরি-বাঁধা ব্রত আছে, সবচেয়ে প্রিয় বৌমার হাতে সেই ব্রত তুলে দিয়ে তবে গিন্নীর নিস্তার। ইসমাইল এখন শিবলালের হাতে সেই ডুরি দিয়েছেন···'

শেখর যা আশা করেছিল তা হ'ল না। 'আই সী··' সংক্ষেপে কথা দুটো

বলে শ্রী ব্যানার্জী এক রকম করে তাকালেন ওর দিকে। তারপর আবার কী বলতে গিয়ে শেখরের দৃষ্টি অনুসরণ করে লীলার ওপর চোখ পড়ল ওনার। সহসা করুণায় ওঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল যেন, (শ্রী ব্যানার্জী তখনও জানতেন না, এই করুণা, মানুষের সহজাত শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি যা মানুষকে সত্যকার ভালোবাসার পথে এগিয়ে দেয়—তা তাঁর মধ্যে কি ভাবে এল) বললেন, 'কি, তোমাকে খুব টায়ার্ড মনে হচ্ছে। খাবে তুমি কিছু?…' তারপর ওর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই ডাক দিলেন খালেককে। বললেন, 'এই দিদিমণিকে নিয়ে যাও, খাইয়ে দাও কিছু…শরবৎ দিও ওকে। আর, হ্যাঁ, শোনো, বনমালীর ফিরতে দেরি হয় যদি, ওকে পৌঁছে দিও…বরসিংবাঁধের ভেতরে গাড়ি ঢোকে আজকাল…', সম্ভবত শ্রী সেনগুপ্তকে নিয়ে সেই বস্তিতে ঢোকার কথা মনে পড়ল তাঁর।

দরজা পর্যন্ত লীলার সঙ্গে এলেন শ্রী ব্যানার্জী, ওকে থামিয়ে ওর কাঁধের ওপর ছুঁয়ে সহাস্যে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আজ গল্প করা হ'ল না, কাকুর সঙ্গে এস আর এক দিন…' বলতে বলতে থমকে গেলেন শ্রী ব্যানার্জী। লীলা পুরো দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছে। একটু আগেকার সেই মেয়েটির সঙ্গে এর যেন কোনও মিল নেই। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য, তারপর চলে গেল লীলা। বারান্দায় খালেক তার ঝোঁকানো শরীরটা আরও একটু নুইয়ে বললে, 'আসেন দিদিমণি, এই ঘরে আসেন…'। 'দিদিমণি কথাটা অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করল খালেক, শ্রী ব্যানার্জীর 'দিদিমণি' বলাটা লক্ষ্য না করে পারে নি ও। এই ভঙ্গীতে যেন ও বোঝাতে চাইলে, 'বনমালীকেও জানি, আর তার ভাইঝিকেও জানলাম।' কিন্তু এসব লক্ষ্য করার মতো অবস্থা লীলার ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। ও অস্ফুটে কী বললে আর খালেক একটু পরে গাড়ি বের করে ওকে নিয়ে গেল পৌঁছে দেবার জন্যে।

শ্রী ব্যানার্জী সমস্ত মেঝেটা অতিক্রম করে ফিরে এসে, যে-কেদারাটায় বসেছিলেন তিনি তার পেছনে দাঁড়ালেন, আসবার সময় টেবিলের ওপরকার কাগজ-চাপাটা একটু সরিয়ে দিয়ে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমাদের জি-এম ভেবেছেন, এ্যাকশন কমিটির সামনে টোপ ফেলবেন আর ওরা ছুটে গিয়ে গিলতে আরম্ভ করবে। হোঃ…সেই জন্যে এ্যাকশন কমিটি গড়ি নি আমি। বুঝলে?' রুষ্টস্বরে বললেন শেখরকে যেন সে-ই মিঃ টমসনের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে।

শেখর শ্রী ব্যানার্জীর মাথার ওপর দিয়ে পেছনে দেয়ালের ওপর তাকালে,

যেখানে স্যার টমাস এবং স্যার মুখার্জীর ছবি টাঙানো ছিল। বুদ্ধিমান শেখর তৎক্ষণাৎ বুঝল, শ্রী ব্যানার্জী কি বলতে চান : মিঃ টমসনের প্রস্তাব গ্রহণ করা চলবে না। আলোচনা-কমিটিকে সেইভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বললে, 'ইয়েস স্যার, আলোচনা কি করে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় আমরা তা জানি।'

সহসা শ্রী ব্যানার্জী বললেন, 'সাধারণ শ্রমিকদের মনোভাব কী দেখলে? এ্যাকশন কমিটির সভ্যরা কী বলে…'

'ওরা ড্যাম গ্ল্যাড্, স্যার। এইমাত্র খেয়ে এলাম, স্যার, সিঙাড়া আর কফি। দুই সেক্রেটারী ভাগ করে মেম্বারদের খাইয়েছেন…' এমনভাবে শেখর কথাগুলো বলল, যেন সেই খাওয়াটাকে, আনন্দ করাটাকে সে নিতান্ত ছেলে-মানুষি মনে করে। 'জি-এম'এর প্রস্তাবকে একটা বড় জয় বলেই মনে করে ওরা।'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে শ্রী ব্যানার্জী শেখরের কাছে এসে ওর বাহুতে ধরলেন : 'এসো, কি করতে হবে তোমায় বলি…' বলে পাশের সোফাটায় বসলেন ওকে নিয়ে। যতক্ষণ কথা বললেন, ততক্ষণ নেপথ্য-আলোর মতো একটা চেতনা ওঁর মনের মধ্যে কাজ করতে লাগল। লীলার সেই দৃষ্টিটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল ওনার : 'যাবার সময় অমন করে ও তাকাল কেন, কী বলতে চাইছিল ও…' !

* * *

যে নব-গঠিত আলোচনা কমিটি নিয়ে ওঁরা কথা বলছিলেন, এ্যাকশন কমিটির তরফ থেকে তা গড়ে ওঠার কারণ ছিল এই রকম :

শাস্তি-মূলক ব্যবস্থার একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। যতক্ষণ কর্তৃপক্ষ অধিনস্থকে না মেরে, না ধমক দিয়ে চালাতে পারেন ততক্ষণ খুবই ভাল। কিন্তু একবার ঘা দিতে আরম্ভ করলে পরপর ঘা দিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। কিন্তু ওপরওয়ালাকে যদি ওপরওয়ালাই থাকতে হয় তাহলে জানা দরকার, ঘোড়া বিগড়ে থাকলেও তবুও ঠিক কোন্ সময় চাবুক বন্ধ করতে হবে। মিঃ টমসন ১লা নভেম্বরের শীট মিলে আকস্মিক ধর্মঘটের জন্য সাত জন শ্রমিককে বরখাস্ত করেছিলেন, শ্রমিকরা তার উত্তরে ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে স্লো ডাউন ধর্মঘট করেছে। স্বভাবতই মিঃ টমসনকে আবার চাবুক কষতে হয়েছিল : সমস্ত শ্রমিককে বণ্ড সই করবার নির্দেশ দিলেন। মজদুররা এই নির্দেশ অমান্য করল। আবার চাবুক ওঠালেন মিঃ টমসন, এবারেও হাত কাঁপল না তাঁর—দিলেন ষাট জনকে বরখাস্ত করে। কিন্তু এখন থেকে মাসখানেক আগে যেদিন

শ্রমিকরা সেই ষাট জন বরখাস্ত মজদুরকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে কারখানায় ঢুকল, সেদিন হাত উঠিয়েও নামিয়ে নিলেন তিনি, বুঝলেন এবার থামতে হবে। তাঁর হাত দুর্বল করে দিল আরও একটি ঘটনা, ওআর্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জেম্‌স্‌ মাধবন এ্যাকশন কমিটির মীটিং ভাঙতে আরম্ভ করছিলেন।

এমনি যখন অবস্থা চলছে তখন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ শেষ হবার পর মিঃ টমসন তাঁর পার্সন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে বললেন, 'মিঃ এস-আর, তুমি এ্যাকশন কমিটিকে লিখে দাও, কতকগুলি শর্তে কোম্পানী তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে রাজী আছেন···'

মিঃ এস-আর শর্তগুলি নোট করে নেবার জন্য পকেটে কলম হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, 'এ তো এ্যাকশন কমিটিকে স্বীকার করে নেওয়া হ'ল···'

'ইয়েস···', মিঃ টমসন তাঁর কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন, তাঁর বসবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো বৃহৎ ফটোগ্রাফগুলোর ওপর তাকিয়ে রইলেন এক রকম করে। যেন তিনি যা করতে চলেছেন তার জন্যে সমর্থন চাইছেন তাঁর পূর্বতন জেনেরাল ম্যানেজারদের কাছ থেকে। পরক্ষণেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, তিনটি শর্তে আলোচনা চালানো সম্ভব—মানে, শর্তগুলো আমাদের উভয় পক্ষের জন্যই—শিফ্‌ট্‌ সাইকেলের প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়েছিল, এখন কোম্পানী তা প্রত্যাহার করবেন। দুই, ১লা ফেব্রুয়ারীর (স্লো-ডাউন আরম্ভের তারিখ) পর থেকে যে সমস্ত শ্রমিকের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা প্রত্যাহৃত হবে। তৃতীয়ত, ১লা ফেব্রুয়ারীর আগে যে সমস্ত বরখাস্ত শ্রমিকের জন্য এ্যাকশন কমিটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তাদের সম্বন্ধে ট্রাইব্যুন্যাল দেওয়া হবে।'

টুকে নেওয়া শেষ করার আগেই মিঃ এস-আর বললেন, 'এতে জেম্‌সের ডান হাত ভেঙে দেওয়া হবে···' মিঃ টমসনের ওপর কথা দেবার জন্যে নয়, যেন তাঁর (মিঃ টমসনের) মনের সংশয়গুলিই প্রকাশ করছিলেন তিনি। মনে হ'ল, মিঃ টমসন তাঁর ভেতরকার উদ্বেগ আর বিরক্তিটা চেপে রাখতে পারলেন না, তাঁর পাতলা মুখখানার ওপর ঈষৎ কেঁপে কেঁপে গেল। বললেন, 'মিঃ মাধবন আমাকে অবাক করেছেন। যে-সময় সব চেয়ে শান্ত থাকা দরকার, সে-সময় তিনি এ্যাকশন কমিটির মীটিং ভাঙছেন, স্ট্রেঞ্জ!' বলতে বলতে মিঃ টমসনের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, বললেন, 'এখন অবস্থা কি হয়েছে জানেন? এখন যথার্থ শ্রমিক শক্তির জাগরণই আমাদের কাম্য। সেই শক্তির সামনে যদি ওরা—ইয়োর মুখার্জীস্‌ এ্যাণ্ড ব্যানার্জীস্‌—আমাদের দিকে ঝোঁকে। ইফ্‌ পার্হেপ্‌স

লীডস্ হিম নট দেন রেস্ট্‌লেসনেস উইল থো। হিম টু মাই ব্রেস্ট…সেই কবিতা, ‘গিফ্‌ট্‌স অব গড্‌’ …পড়েন নি?’ বলে অধীর হয়ে ওখান থেকে উঠে গেলেন মিঃ টমসন। মিঃ এস-আর লেখা শেষ করতে করতে নিজের মনে বললেন, ‘সেই জন্যেই এই প্রস্তাব, এ্যাকশন কমিটির জন্যে নয়!’

অধ্যায় ১৫

সন্ধ্যার পর স্নান সেরে সমীর মোহন সেন তার বাইরের ঘরের মেঝেতে বসে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেছে। ওর গৃহ-সজ্জার একটু অদল-বদল হয়েছে। বাইরের থেকে ঘরে ঢুকলেই ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে চেয়ার কটি সাজানো, খানিকটা অপাংক্তেয়ের মতো। বাঁ-দিকের দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে মাদুর পাতা, সেখানেই সমীর বসেছে সামনে শুভ্র ঢাকা দেওয়া ডেস্ক আর তার ওপর খাতা, ঝর্ণা-কলম নিয়ে। সমস্ত মেঝেতে তাছাড়া আর কিছু নেই, নিরাভরণ, ঝকঝকে। বাড়তির মধ্যে আরও একটা বুক শেল্‌ফ্‌ এসেছে, সমীর যেখানে বসেছে তার বিপরীত দিকে দেয়ালের পাশে রাখা হয়েছে, নতুন বইতে ভর্তি। বোঝা যায়, এ্যাকশন কমিটির কাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও বাড়িয়েছে সমীর।

খুব হাল্কা পোষাক সমীরের, সাদা পাজামা আর গেঞ্জি। একটু আগে স্নানের পর মৃদু প্রসাধনও করে নিয়েছে সে, ফর্সা সুপুষ্ট কাঁধে আর গলায় পাউডারের দাগ এখনো ঘামে মুছে যায় নি। তবু ওর ভুরু কোঁচকানো, ঠোঁটের ভঙ্গীতে একটা অস্বস্তি, অস্থিরতাই ফুটে উঠেছে। ও লিখছিল:

‘৫ই মে, ১৯৫৩। গতকাল জেনেরাল ম্যানেজার মিঃ টমসনের সংগে শেষবারের জন্য আমরা (অর্থাৎ এ্যাকশন কমিটির আলোচনা কমিটি) সাক্ষাৎ করেছি এবং আগামী কাল এ্যাকশন কমিটির পূর্ণ অধিবেশন—এই দুয়ের মাঝ-খানে কী করতে হবে বুঝতে পারছি না। বড়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের সব আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে! পর্বত-প্রমাণ আশা করেছিলাম আমরা, জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম, আর এখন…’

এই পর্যন্ত লিখে থেমে গেল সমীর, এরপর কী লিখবে? নিজের চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে ও একটা সঙ্গতি রাখতে চায়, কোথাও জোড়াতালি দিয়ে সারতে চায় না এই জন্যেই সে ডায়েরী লেখে। কিন্তু আজ এইখানে যেন খেই হারিয়ে

এই চেয়েছিলাম, কিন্তু তা ঠিক পথে আত্ম-প্রকাশ করছে কি?' এর পর, মনোতোষ বাবুর প্রস্তাব সম্পর্কে কয়েকটা মন্তব্য করার পর চন্দ্রকান্তর আকস্মিক অসুস্থতা সম্বন্ধে লিখেছে :

'মীটিং থেকে ফিরে এ্যাকশন কমিটির অফিসের দিকেই আসছিলাম আমরা, হঠাৎ শিববাবুকে চলে যেতে হ'ল। ৩৪"-মিল ফার্ণেসে ব্রেক-ডাউন হয় আজ দুপুরে, বি-শিফ্‌ট আরম্ভ হবার ঘণ্টা খানেক পর। শিববাবুর বাবা সেটা সারিয়ে তুলবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছিলেন উত্তেজিত ভাবে, তারপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। স্নায়বিক উত্তেজনা এতটা উঁচুতে ওঠে যে তাঁর দুর্বল দেহে সেটা সহ্য করতে পারেন নি। যে রকম রিপোর্ট পাওয়া গেছে, চন্দ্রকান্ত বাবুর যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ চেষ্টা করেছেন।...কিন্তু যে জন্যে ওটার কথা আমি লিখে রাখছি এবং এর পরেও চিরকাল মনে রাখবো, সেটা হচ্ছে ওঁদের আন্তরিকতার কথা। তাঁর সঙ্গে অন্য শ্রমিকরাও সমানে কাজ করেছে এবং তার পরেও করেছে। এটাই হচ্ছে আসল কথা: কারখানায় স্লো-ডাউন চলছে আর বিপর্যয়ের মুখে ওঁরা সর্বোচ্চ কর্ম-তৎপরতা দেখিয়েছেন। লাভ অব্ লেবার... কেউ শ্রমিকদের বুঝতে চাইলে এই ঘটনাটা মনে রাখেন যেন। ওঁরা কি স্লো-ডাউনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন? না, সেটাকে পেরিয়েই গিয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণী স্বার্থের উর্ধ্বে, তারা আন্দোলনের উর্ধ্বে।...'

আস্তে আস্তে ডায়েরীর থেকে চোখ তুলল সমীর, আলিস ভাঙবার ভঙ্গীতে পেছনের দেয়ালে ঠেশ দিলে। চশমাটা খুলে পাশে রেখে দু'হাতের তেলো দিয়ে চোখ ঘসতে লাগল ও, তারপর ঠেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। খালি চোখে ওর চওড়া মুখখানা কী রকম বিষণ্ণ দেখাতে লাগল। 'আচ্ছা, এই তো সেদিন পর্যন্ত আমি এই লিখে রেখেছি, আর আজকে কি লিখতে হবে? কি লিখব এখন?' নিজের মনে প্রশ্ন করল সমীর। ওর এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল, ওরা সকলেই একটা নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে এগোচ্ছে এবং লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবে না।

ঘরে ঢুকল মীনাক্ষী। ওর মন্থর, ভারী-ভারী চলার ভঙ্গীতে তৎক্ষণাৎ গর্ভিনীকে চেনা যায়। বুকের ঠিক নিচেই শাড়ি পরতে হয়েছে ওকে, সেই জন্য ওর উর্ধ্বাঙ্গ কেমন ছোট আর অসহায় দেখাচ্ছে। সমীরকে এই অবস্থায় দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল ও, তারপর মুচকে হেসে, যেন দুষ্টুমি করতে চায় এমনি করে পা টিপে টিপে এগিয়ে সমীরের পাশে বসল। নীরবে শুয়ে পড়তে

যাচ্ছিল এমনি সময় সমীর চোখ না খুলেই বললে, 'এস, স্নান হ'ল তোমার?'

খিলখিল করে হেসে উঠতে গেল মীনাক্ষী, দুর্বলতার জন্য পারল না। গালে টোল পড়তে গিয়ে মিলিয়ে গেল। বললে, 'কি করে বুঝলে আমি এসেছি?'

'কেন, গায়ের গন্ধে···না-না, সুগন্ধে···'

'হ্যাঁ, তাইত···' আবার মৃদু হাসি ফুটে উঠল মীনাক্ষীর মুখে। 'কিন্তু কার ধ্যান করা হচ্ছিল, শুনি?' বলতে বলতে এলিয়ে পড়ল মীনাক্ষী, অর্ধেকটা মাদুর আর অর্ধেকটা মেঝের ওপর।

সমীর চোখ খুলে ঝুঁকে পড়ল, মীনাক্ষীর নাকটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বললে, ধ্যান করছিলাম মিঃ টমসন আর আমাদের প্রেসিডেন্টের। গতকাল মিঃ টমসনের সঙ্গে শেষ মীটিং করেছি আমরা, তাতে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এ্যাকশন কমিটিকে একমাত্র শ্রমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। মিঃ টমসন বলেছেন, এই দাবী কেবল অসঙ্গত নয়, ছেলেমানুষিও···' বলতে বলতে সমীর দুই হাতের তেলো দিয়ে মীনাক্ষীর চিবুক বেড় দিয়ে ওর মাথাটা কাছে টেনে আনছিল। '১০ই মে পর্যন্ত সময় দিয়েছেন তিনি, তাঁর প্রদত্ত শর্তে আলোচনা চালাতে এ্যাকশন কমিটি রাজি না থাকলে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে···' স্পষ্টত, মীনাক্ষীকে কথাগুলো বলে নিজের বুকের ভেতরটাই হাল্কা করতে চাইছিল সমীর।

মীনাক্ষী সমীরের হাত ছাড়ানোর মতো করে বলে উঠল, 'এই, ছাড়ো, দরজা খোলা আছে না?' কিন্তু হাতখানা ধরে তেমনি করে পড়ে রইল।

সমীর ওর হাতখানা কোলের ওপর টেনে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। মুখখানা শুকনো, একটু টান হয়ে গেছে যেন। তৎক্ষণাৎ সমীর বুঝলে, মীনাক্ষী এর আগে তার কোনো কথা শোনে নি, আর পরেও শুনবে না। কিন্তু একটা পুরো বিশ্বাস ওর ঈষদায়ত, ক্লান্ত চোখে দেখতে পেলে, যা বলতে চায়, 'তুমি আমায় এ-কথা বলছ কেন, আমি শুধু তোমাকেই জানি, যে কখনো ভুল করে না, যার কোনো সংশয় নেই।' এ বিশ্বাস কি করে আসে তা বুঝল না সমীর, বুঝল না যে একমাত্র প্রেম থেকেই এ বিশ্বাস উৎসারিত হ'তে পারে, তবু মীনাক্ষীর এই ভাবটা ভাল লাগল ওর। অন্য মনে মীনাক্ষীর মোটা, নরম আঙুলগুলো নিজের আঙুলে জড়াতে লাগল।

অধ্যায় ১৬

পরের দিন সন্ধ্যায় এ্যাকশন কমিটির মীটিংএ পৌঁছতে সমীরের একটু দেরীই হয়ে গেল। সমস্ত চত্বরটা মজদুরে ভরে গিয়েছে, রাস্তা পর্যন্ত ভিড় ঠেলে এসেছে। দূর থেকে ওদের উত্তেজিত গোলমাল শুনতে পেল সমীর। কাছে আসতেই শ্রমিকরা হর্ষধ্বনি করল, কিন্তু সেই যেদিন জি-এম'এর প্রস্তাব ওদের কাছে আসে, সেদিন-কার উল্লাসের থেকে আজকের তফাৎটা মুহূর্তে বুঝতে পারল ও। অনেকে লক্ষ্যাই করল না ওকে, নিজেদের মধ্যে চিৎকার করতেই লাগল। যারা ওকে সম্বর্ধনা করল, তাদের কণ্ঠস্বরও কেমন অস্বচ্ছ, শুকনো। কেউ কেউ অনর্থক দাঁত বের করে একটা হাসবার ভঙ্গী করলে। স্পষ্টত, নেতাদের মধ্যে যে বিভেদ চলছে সেটা এদের অজানা ছিল না। উত্তেজিত, বিমূঢ়, বিভ্রান্ত মজদুরদের মধ্যে পথ হাঁটতে কেমন লজ্জা করতে লাগল ওর। একজন বলে উঠল, 'আজ যা হয় একটা হবেক, তা নালে আমরা গেছি···'। তৎক্ষণাৎ আর এক জন তীক্ষ্ণ স্বরে যোগান দিলে, 'হয় শিববাবু লয় মনোতোষবাবু, ইস্পার লয় উস্পার, হাঃ হাঃ···'। সমীর তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেল। দিন কুড়ি আগে, যেদিন জি-এম'এর প্রস্তাব প্রথম আসে, সেদিনও এদেরকে দেখেছিল সে, আর আজ? ভেঙে সব চুরমার হয়ে গেছে। এখন আত্ম-বিভেদের গ্লানিতে সেই উজ্জ্বল মুখশ্রী রুক্ষ, সংশয়ী হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঢুকেই দেখলে, শেখর মুখার্জী বক্তৃতা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। টাইপ-রাইটারের পাশে যে টুলটা ছিল সেইটে একটু টেনে নিয়ে এক পা উঠিয়ে দিয়েছে ও। উপস্থিত সভ্যদের কারুর দিকেই ও তাকাচ্ছে না, সামনে ঢুকবার দরজার দিকেই নিবদ্ধ। সমীর ঢুকতেই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। শেখর তৎক্ষণাৎ চোখ সরিয়ে নিলে। ওর শার্টের হাতাটা কনুই পর্যন্ত ওঠাচ্ছিল-নামাচ্ছিল শেখর। সমীর বুঝলে এটা ওর সত্য নয়, ও একটা উত্তেজনার ভান করছে। টেবিলের ওদিকে চেয়ারে মনোতোষবাবু কঠিন ভঙ্গী নিয়ে বসে আছেন। তাঁর কালো মুখে একটা অদ্ভুত রকমের বিরক্তি ফুটে উঠেছে, মাঝে মাঝে ভ্রূকুঞ্চিত করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, যেন বলতে চান, 'তোমরা মীটিং কর, আর যাই কর, যা আমি চাই তা তোমাদের মেনে নিতেই হবে। সুতরাং

অনর্থক এই পরিশ্রম আর গলাবাজি কেন…'। সমীর এগিয়ে গিয়ে মনোতোষবাবুর পাশে মেঝের ওপর বসে পড়ল আর টেবিল থেকে খাতা-পত্র নামিয়ে দেখতে লাগল। সহসা শিবলালের দিকে চোখ পড়ল ওর, মাথা ঝুঁকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। 'উনি কি ওঁর অসুস্থ বাবার কথা চিন্তা করছেন এখন!'—সমীর মনে মনে ভাবলে। এইটে কেমন বিষণ্ণ করে তুলল ওকে।

শেখর মুখার্জী বলছিল—ওর বক্তৃতার মাঝখানে মনোযোগী হল সমীর—'এ্যাকশন কমিটির ডাকে জুনাপুরের শ্রমিকেরা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে। কোম্পানী যতবার তাদের ওপর আক্রমণ করেছে ততবারই প্রতিরোধ করেছে তারা। কোম্পানীর ভাড়াটিয়া ইউনিয়ন আর তার ভাড়াটিয়া প্রেসিডেন্টের কোনও রকম ঘৃণ্য প্ররোচনা তাদেরকে বিচলিত করতে পারে নি। (শেখর বেমালুম চেপে গেল যে, প্ররোচিত হবার সব রকম আয়োজনই তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ করে এনেছিল এবং এ পর্যন্ত এক পক্ষই মার দিয়েছে, শিবলালেরই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এখনও ইউনিয়ন আর এ্যাকশন কমিটির মধ্যে মারামারি হয় নি) তারপর কোম্পানীর কথা ধরুন। আপনারা জানেন, যখন শ্রমিকদের সামান্য দাবী আমাদের প্রেসিডেন্ট জি-এম'এর কাছে পাঠিয়েছিলেন, মেনে নেবার জন্যে, তখন কী উন্নাসিক ভাবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন! আর আজ, আজ দেখছি সেই কোম্পানীই…' কৃত্রিম আবেগে এইখানে শেখর তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে আনলে। তাড়াতাড়ি বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ, শ্রমিকরা তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসবে সেটা আশ্চর্যের বিষয় কিছু নয়, কিন্তু সেই উদ্ধত মিঃ টমসন যেখানে এ্যাকশন কমিটিকে আবার আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান, শর্ত পেশ করেন, সেখানেই আমাদের বিরাট জয় হয়েছে…'

এইখানে একটা হাততালি কিংবা উল্লাস-ধ্বনি আশা করা যেতে পারত, কিন্তু সভ্যদের অনেকেই মাথা নিচু করে রয়েছেন, আর যাঁরা মাথা তুলে রয়েছেন তাঁদের চোখে কঠিন দৃষ্টি, সুতরাং সে-রকম কিছু হল না। সকলেই চুপ করে রইলেন এবং কয়েকটা তালপাতার পাখা নড়তে লাগল।

শেখর বললে—এবারে ওর কণ্ঠস্বর ক্লান্ত মনে হল এবং দ্রুত সবার উপর একবার চোখ চারিয়ে নিয়ে এল ও— 'কিন্তু জি-এম'এর এই প্রস্তাবে আসল জিনিসটাই বাদ দেওয়া হয়েছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, এই প্রস্তাবে এ্যাকশন কমিটিকে শ্রমিকদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় নি। আমি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রেসিডেন্টকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই

যে তিনি এটা ধরতে পেরেছেন এবং সেই দাবী উপস্থিত করেছেন। এখন দুটি বিকল্প ব্যবস্থার একটি আমরা গ্রহণ করতে পারি। আমরা জি-এম'এর প্রস্তাব গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকব, নয় তো এ্যাকশন কমিটিকে যতদিন না স্বীকার করে নেওয়া হয় ততদিন বজ্র-মুষ্টিতে লড়াই চালিয়ে যাব। সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজকের এই মীটিংএ আপনারা গ্রহণ করবেন। এ্যাকশন কমিটি, জিন্দাবাদ।'

শেখর মুখার্জী বসে পড়ার পরও অবস্থা একই রকম রইল। গরমে ওঁরা দরদর করে ঘেমে যাচ্ছিলেন, পাখা নেড়েও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। রুমাল দিয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুখ, ঘাড় মুছে নিচ্ছিলেন ওঁরা। এরপর কে বলবে এবং কি বলবে?

একটু আগে থেকেই মনোতোষবাবু অস্থির হয়ে উঠছিলেন। শাইত, এই সব বক্তৃতায় উনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। উনি ঘনঘন কাঁধের চাদরটা ঠিক করে ফেলতে লাগলেন। তারপর সবেগে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ভেতরের অনুভূতি এতই তীব্র এবং তাঁর সহকর্মীদের এই সব 'ছেলেমানুষি' এত অবজ্ঞা করেন যে বলতে উঠেও তিনি কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর, বাঁধ ভেঙে গেলে সহসা যেমন জলের তোড় এসে পড়ে তেমনি করে গর্জে উঠলেন, 'না, এসব চলবে না। এটা দাও, ওটা দাও বলে দাবী করলে চলবে না, ছেলে-মানুষের মতো আবদার, নাকি কান্না…' আবার এক মুহূর্ত থামলেন মনোতোষ, তাঁর উদ্দীপ্ত চক্ষু ঘূর্ণিত হল। সহসা ডান হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ করে সামনে ছুঁড়ে দিলেন তিনি এবং সেই অবস্থায় সভ্যদের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রেখে বললেন, 'যদি এই মুষ্টির জোর থাকে, তাহলে আমরা যা চাই তা যা মেরে আদায় করে নিতে পারব। আমি বলতে চাই, এ্যাকশন কমিটিকে আগে জি-এম স্বীকার করে নিন, তা না হলে তাঁর মতো সুর করে আমিও বলব, নৈব নৈব চ। অন্য কোনো কথা শুনতে চাই না।' বলে উনি যেমনি আকস্মিকভাবে উঠেছিলেন, তেমনি নাটকীয়ভাবে বসে পড়লেন।

এতক্ষণ এঁদের পাখা নাড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার চলতে আরম্ভ করল। মানুষের সমস্ত শরীর জ্বালা করতে থাকলে যেমন একবার অস্থিরতা এবং একবার অতি-স্থিরতা তাকে পাগল করে তোলে, এঁদের অবস্থাও তাই হয়েছিল। এমনি সময় শিবলাল উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণকার উত্তেজনার পটভূমিতে সহসা একটা বিরোধী সুর এনে উপস্থিত করল যেন ও। ওর শুকিয়ে যাওয়া শরীর, উদ্বিগ্ন, রেখাপড়া কপাল, কিন্তু ওর চোখে সেই কোমল, শান্ত দৃষ্টি। সব কিছুর মধ্যে,

সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যেও তাহলে এই বিশ্বাস সম্ভব এবং এই বিশ্বাসকে বিশ্বাস করা যায়।

শিবলাল বললে, 'বন্ধুগণ, আমার কথাগুলি আপনাদের কাছে উপস্থিত করবার জন্য আমি কিছুটা সময় চাই। প্রথমেই আমার মূল বক্তব্যটা বলে নিচ্ছি: জেনেরাল ম্যানেজার যে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, আমরা তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি। আমি মনে করি এই প্রস্তাব আমাদের জয়ের সূচনা করে। আমি অবশ্য স্বীকার করব যে আমাদের সমস্ত দাবী মেটে নি, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। মানুষের অভিজ্ঞতা মাত্রেই বলবে যে জয় কখনো পুরোপুরি আসে না, তার মধ্যে ফাঁক থেকেই যায়। সেই ভেবে যদি আমরা সমস্তটা বর্জন করি তাহলে সেটা নির্বুদ্ধিতাই হবে।'

শিবলাল একটু চুপ করল। সভ্যদের মধ্যে একটা শিথিল, তৃপ্তভাবের সূচনা হ'ল যেন।

'তাছাড়া, এ্যাকশন কমিটি প্রথম যে দাবী করেছিল সেগুলো নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। মিঃ টমসন সেগুলোই স্বীকার করে নিয়েছেন। শিফ্‌ট সাইক্লের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়েছে। মিঃ টমসন ট্রাইব্যুনালের নীতি স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা যদি এই 'চমৎকার' দাবী ছাড়ি যে এ্যাকশন কমিটিই একমাত্র শ্রমিক-সংগঠন এই কারখানার ··, তাহলে বোনাসের দাবীও উনি স্বীকার করে নিতে পারেন।' 'চমৎকার' কথাটার ওপর একটা অদ্ভুত মোচড় দিলে শিবলাল।

জি-এম'এর প্রস্তাব যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিনকার আবহাওয়া আর একবার ফিরে এল যেন। মাঝখানের ক্রমাগত বিতর্ক, সংশয় আর পরস্পরের প্রতি আক্রমণ এবং অতি উত্তপ্ত ঘূর্ণি থেকে মুহূর্তের জন্য রেহাই পেল যেন ওরা। একজন বললে, 'একথা সঙ্গত বটে···' বলতে গিয়ে বক্তার ঘাড় নড়ে উঠল এবং মুখভাব কোমল হয়ে এল।

মনোতোষ মুখার্জী সভ্যটির ওপর অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কী মনে করে চেয়ার ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন মনোতোষ এবং শিবলালের দিকে একটা কঠিন, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলেন, যেন ঐ বালখিল্যটাকে আরও একটু হাত-পা নাড়তে দেবেন তিনি, তারপর নিজের বক্তব্য পেশ করবেন।

শিবলাল তার পূর্বকথার সূত্র ধরে বলতে আরম্ভ করলে, 'জেনেরাল ম্যানেজারের প্রস্তাব গ্রহণ করার আরও হেতু আছে বলে আমি মনে করি। আপনারা

জানেন, যুদ্ধের রীতি হচ্ছে এই রকম যে শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করতে গিয়ে একটানা খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে নেই, মাঝে মাঝে ঘাঁটি করে থামতে হয়। তা না হলে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে শত্রুপক্ষ পাশ থেকে পাল্টা আক্রমণ করে হঠাৎ কাবু করে দেয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জেম্‌স্‌ সাহেবের ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়ন যে-কোনো রকমে আমাদের প্রচেষ্টা পণ্ড করে দিতে চায়। তাছাড়া, এ্যাকশন কমিটির সামনে বিভেদের চোরাবালির আশংকা উপস্থিত হয়েছে। একটা কথা আমি বলতে চাই···ব্যক্তিগত দায়িত্বেই আমি কথাটা বলছি···ক্রমে ক্রমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আমাদের এ্যাকশন কমিটি একেবারে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন···'

আকস্মিক বিদ্যুতের আঘাত খেলে যেমন হয়, সভ্যদের অবস্থাও তেমনি হয়ে দাঁড়াল। শিবলালবাবু আজ কি বলছেন? কিন্তু এই বিদ্যুতের আঘাত মৃত্যু হানল না, ওদের সংশয়ী, বিতর্কত্রস্ত, ক্লান্ত জীবনে আশার সঞ্চার করলে। কিন্তু, অন্যদিকে, মনোতোষ গর্জন করে উঠলেন এবং শেখর মুখার্জী উঠে দাঁড়াল, একই সঙ্গে। শ্রী মুখার্জী সামনে দুই হাত ছুঁড়ে মুখ বেঁকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কি বলছেন, শিববাবু, আপনি প্রকৃতিস্থ নেই। আপনি এ্যাকশন কমিটির অপমান করছেন! আপনি স্পষ্ট করে বলুন আপনি কি বলতে চান। আপনি নিশ্চয়ই নাম জানেন, বলুন···'। শেখর বললে, তার চঞ্চল দৃষ্টি সভ্যদের মুখের ওপর দিয়ে পতপত করে ঘুরতে লাগল, 'আমার অত্যন্ত দুঃখ এই যে শিববাবুর মত কর্মীর বিরুদ্ধে আমাকে কথা বলতে হচ্ছে। তাঁর প্রস্তাব সঙ্গত কি না মাননীয় সভ্যবৃন্দ তার বিচার করে দেখবেন কিন্তু এ্যাকশন কমিটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। তিনি বিভেদের আশঙ্কা করছিলেন, কিন্তু তিনিই বিভেদ সৃষ্টি করছেন ··'

চট করে রতন ধর দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর চোখে ধারালো ব্যঙ্গ ঝকঝক করছে। কেটে-কেটে বললে, 'সভাপতি মশয় শিববাবুকে নাম কইতে বলছেন। এখন আমার কথা—সব জিনিস কি কওয়া যায়? মানুষের দু'রকম ভাষা, এক মুখের আর এক চোখ-মুখের। আপনারা চোখ-মুখের ভাষা বুঝে নেন···' সভ্যদের দিকে একবার তাকিয়ে, যেন তাঁদেরকে বুঝে নেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে, বসে পড়ল রতন।

এর মধ্যেও কারও কারও হাসি আসে, কিন্তু তা কেবল মুহূর্তের জন্যে।

পরক্ষণেই মনোতোষ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি কেন আমার মহামান্য সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের মতভেদ হয়। বেশ, শিববাবু তাঁর বক্তব্য বলুন, তারপর আমার বক্তব্য আমি বলব।' বলে উনি আবার বসে পড়লেন।

সমীর এই সময় উঠে বললে, 'আমিও তাই বলি। আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে প্রত্যেকেই যেন তাঁর বক্তব্য উত্তেজিত না হয়ে বলেন। আমাদের ভুললে চলবে না যে আজই আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।'

শিবলাল শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল, মাঝখানকার এই সব বাধার জন্য সে যেন আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিল। যেখানে ছেড়েছিল সে, ঠিক সেখান থেকেই আবার আরম্ভ করল ও। বললে, 'আমি সেইজন্য প্রস্তাব করি, জি-এম'এর বর্তমান প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করতে হ'বে। তা না করে আমরা যদি কেবল ছেলে-মানুষের মতো এ্যাকশন কমিটিকে স্বীকার করে নাও বলে চিৎকার করি তাহলে আমাদেরই ঠকতে হবে।'

মনোতোষ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি চান না যে এ্যাকশন কমিটিকে কোম্পানী স্বীকার করে নিক?'

শান্ত শিবলালকে এইটে উষ্ণ করে তুললে। ওর চোখ দুটো ধ্বক্ করে উঠল, গম্ভীর স্বরে ও বললে, 'আমি চাই না নয়, আপনি চান না। কিন্তু এ' কথার জবাব আপনাকে দিচ্ছি না আমি, এ্যাকশন কমিটির সভ্যদের কাছে দিচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, গেল ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে যখন এ্যাকশন কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়, তখন আমাদের সহকর্মী রতন ধর প্রস্তাব এনেছিলেন এ্যাকশন কমিটিকে রেজিস্ট্রী করবার জন্য। তখন কে বাধা দিয়েছিলেন? আমাদের মাননীয় সভাপতি মশায়ই দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব আমি আবার ওঠাচ্ছি, আগামী কালই এ্যাকশন কমিটিকে রেজিস্ট্রী করবার জন্য দরখাস্ত পাঠানো হোক। তারপর দেখুন, এখনও সভাপতি মশায় এ্যাকশন কমিটিকে স্বীকার করিয়ে নেওয়ার নামে আসলে তার বিরোধিতাই করছেন। আমি বলছি জি-এম এ্যাকশন কমিটিকে স্বীকার করেই নিয়েছেন। তিনি যখন আলোচনার জন্য এ্যাকশন কমিটিকে ডেকেছেন, তখনই তা করা হয়েছে। মাননীয় সভাপতি মশাই যে তা বুঝছেন না এবং ক্রমাগত একটা দাবী নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছেন, তাতে তাঁর সম্বন্ধে দু'টি সিদ্ধান্ত করা যায়। হয় তিনি 'অপ্রকৃতিস্থ'…' এই কথাটার ওপর জোর দিলে শিবলাল, মনোতোষ বাবুরই

একটু আগেকার মন্তব্য লক্ষ্য করে। '···যাতে বিচার করবার শক্তি হারিয়েছেন তিনি, নয়তো তাঁর গোপনীয় কোনো উদ্দেশ্য আছে, সেটা যতক্ষণ না সিদ্ধ হয় ততক্ষণ তিনি এটা স্বীকার করতে পারছেন না···'

দুই পায়ের ওপর লাফিয়ে উঠে দুই হাত সামনে ছুঁড়ে নাড়তে লাগলেন মনোতোষ। তাঁর কাঁধের ওপর থেকে চাদরটা গড়িয়ে চেয়ারের হাতলে পড়ল। কর্কশ স্বরে বললেন, 'না-না, আমি কিছু বলতে চাই না, আমার কিছু বক্তব্য নাই। আমি দালাল···আমি ভোটে দিতে চাই···স্পষ্ট কথায় আপনি আমাকে দালাল বলছেন···ইউ সেক্রেটারী, ইউ পুট দিস্ টু ভোট, হয় কমিটি আমার প্রস্তাব মেনে নিক, তা না হলে আমি এই মুহূর্তে পদত্যাগ করছি···' বলে উনি চেয়ারের কোলে ঢলে পড়লেন আর হাতপাখাটা ঘন ঘন নাড়তে লাগলেন।

সমীর কিছু বলবার জন্যে উঠল, কিন্তু শিবলাল হাত বাড়িয়ে ওকে থামিয়ে বললে, 'আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। মাননীয় সভ্যগণ, এ্যাকশন কমিটি মান-অভিমানের জায়গা নয়। আমি সেভাবে কোনো জিনিস আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি না।' আপনারা স্থিরভাবে সব কিছু বিচার করবেন, আপনাদের বিচার-বুদ্ধির ওপর সব কিছু আমি ছেড়ে দিচ্ছি। যাক, যে-কথা বলছিলাম। এ্যাকশন কমিটির দায়িত্ব অনেক, কেবল লড়াই করা নয়। এ্যাকশন কমিটিকে গঠনমূলক কাজও করতে হ'বে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : মজদুর ভাই-দের অনেক ছেলে-মেয়ে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা তাদের সামান্য একটু আক্ষরিক শিক্ষাও দিতে পারি। এমন আরও কাজ হতে পারে। এটা কারও কারও কাছে খুব সামান্য কাজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই সব সামান্য কাজ দিয়েই আসলে বড় কাজ হবে। কেবল উত্তেজনায় বড় কাজ হয় না···' এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বসে পড়ল শিবলাল, কে জানে সেই সময় বহু মজদুর-সন্তানদের সঙ্গে মেনকার ভাই গোবিন্দর কথাও ওর মনে পড়ছিল কি না।

পরপর কয়েকজন সভ্য উঠে দাঁড়ালেন এবং শিবলালের প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর—শ্রী মনোতোষ নিজে দাঁড়ালেন না, তাঁকে ঠেলে উঠিয়ে দিলে যেন কেউ। অসহ্য ক্রোধ আর অভিমানে তাঁর গলা বসে গিয়েছিল, ধরা গলায় বলতে লাগলেন, 'বন্ধুগণ, শিববাবু যে কথাগুলো বলে গেলেন তা ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়। এ্যাকশন কমিটিকেও তিনি আক্রমণ করেছেন। এটা

কেবলমাত্র তাঁর ক্ষমতা দখলের লোভ, তিনি এ্যাকশন কমিটিকে হাত করতে চান। তাঁর কথার অর্থ বোঝা মুস্কিল। জি-এম'এর প্রস্তাবে, বিদেশী মালিকের আন্তরিকতা দেখে তিনি লাফিয়ে উঠেছেন। কিন্তু তিনি কি আমাকে জানাবেন, সেই জি-এম'ই কি করে ফিরিঙ্গি জেম্‌স্‌কে গুণ্ডামি করবার জন্যে লেলিয়ে দেন ?'

শেখর বলে উঠল, 'হিয়ার, হিয়ার··'

শ্রী মনোতোষ কিছুটা আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন যেন। বলে গেলেন, 'ব্যক্তি-গত কুৎসা করতে আমি এখানে আসি নি, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে কয়েকটা কথা বলতে হবে। মাননীয় শিববাবুর পিতা এই কারখানার একজন বিশিষ্ট কর্মী। তাঁর ইংরেজ-প্রীতি লোকের অজানা নয়। পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি মিঃ টমসনের কাছে লাগিয়েছিলেন। আমি এখন বুঝতে পারছি, ইংরেজ-প্রীতি তাঁদের বংশগত। তা না হলে শিববাবুই বা এত গদগদ হবেন কেন, আর মিঃ টমসন··· আলোচনার সময় আমি স্বচক্ষে দেখেছি···মিঃ টমসনই বা শিববাবুকে এত প্রশংসার চক্ষে দেখবেন কেন ?'

সারা ঘরটা রুদ্ধ-নিঃশ্বাস হয়ে উঠল, মনোতোষ এর পর কি বলবেন ?

'আমি এখানেই থামতাম, কিন্তু শিববাবুকে আপনাদের চেনা দরকার। আমি কি সকলের সামনে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন শিববাবুকে ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে জেম্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে ফিস-ফিস করতে দেখা যায় ? এ সম্বন্ধে লোকে যদি বলে, তাঁর কোনও 'গোপনীয় উদ্দেশ্য' আছে তাহলে তার জবাবে তিনি কি বলবেন ?'

যাকে কেউ কখনও কথা বলতে শোনে নি, সেই করালী বারই উঠে দাঁড়াল। ও এ্যাকশন কমিটির সভ্য নয়, কিন্তু এই ঘরের মালিক এবং অফিস-রক্ষক বলে সব সভাতেই এক কোণে বসে থাকে। একেবারে বোবা-কালা মানুষ বলে কেউ আপত্তিও করত না। কথা বলতে উঠে ও থরথর করে কাঁপতে লাগল, কিন্তু না বলেও পারল না ও। 'কি বলছেন বাবু, মিছা কথা বলছেন কেনে ! মানুষ ভাল হলেই এমনি হয়। আমি নিজে ওনার সঙ্গে গেছলম···'

তুমুল হট্টগোল, বাগবিতণ্ডা যেমনি উঠল স্বাভাবিক ভাবে, তেমনি আস্তে আস্তে তা শান্ত হয়ে এল। শেষে ঠিক হ'ল, বিষয়টা ভোটে দেওয়া হবে। তখন একটা ঘটনা ঘটল। সমীর সেন যদিও মাঝখানে একবার বলতে উঠেছিল, তবু এতক্ষণ কিছুই বলে নি সে। 'উই আর লস্ট, আমাদের কিছু হবে না···' বারবার মনে-মনে উচ্চারণ করছিল ও, কিন্তু একেবারে বিভ্রান্তির শেষ সীমায় এসে

হঠাৎ ওর মনে হল, এখনও হয়তো কিছু করা যায়। এ্যাকশন কমিটিকে বিভেদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

ও বললে, 'এই ভোটে দেওয়ার নীতি আমি সমর্থন করতে পারছি না। সভ্যদের আমি এটা পুনর্বিবেচনা করতে বলি। কেননা, শ্রমিকদের সামনে আমাদের মত-ভেদটাও তুলে ধরতে চাই না, একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হোক। আমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ এ প্রশ্ন থাক, আমরা কতটা ছাড়তে পারি আর অন্যকে কতটা মেনে নিতে পারি সেইটে দেখা দরকার। আমি প্রস্তাব করছি, আগামী পরশু আবার আমাদের কমিটির মীটিং ডাকা হোক, এবং তখন আমরা যাতে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি, আজ থেকে তার চেষ্টা করব।'

সমীর ঘুণাক্ষরেও জানত না সে কী সর্বনাশ করল। যে শুকনো ডালটা আর একটা আঘাত দিলেই ভেঙে পড়তে পারত, জোড়াতালি দিয়ে সেটাকেই সে রেখে দিলে। আর ঠিক এই মুহূর্তেই সেই আঘাত দেওয়া চলতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না। যে সামঞ্জস্য সে আনতে চায়, এর পর কোনো ভাবীকালেই সেটা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। সেই জন্য শিবলালদের সঙ্গে এতটা একসঙ্গে এসেও শেষ পর্যন্ত সে এগোতে পারল না, ওদেরও একটা পা খোঁড়া করে দিলে।

কিন্তু শিবলাল—কেন সে এই সভা স্থগিত রাখবার জন্যে সম্মতি দিলে? এ্যাকশন কমিটিতে খাঁটি শ্রমিক-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনে ঠিক শেষ মুহূর্তে তার হাত অবশ হয়ে গেল কেন?

সমীর সেন যখনই তার বক্তব্য শেষ করলে, তখনই ইসমাইল এবং রতন ধর উঠে সেটার বিরুদ্ধতা করলেন। আজই বিষয়টাকে ভোটে দিতে চাইলেন তাঁরা। ইসমাইল এমনও বললেন, যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আর এক মুহূর্তও দেরী হয়, তাহলে কি হবে বলা যায় না। শ্রমিকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। বিচক্ষণ ইসমাইল ঠাট্টা করে বললেন, 'এই ভোটে দেওয়া হবে কি না সেটাই না হয় আগে ভোটে দেওয়া হোক, তাতেও আমি রাজি…'। এমনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু এমনিভাবে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে যাবার পর শিবলাল উঠে বললে, 'থাক, আজ না হয় থাক। আমরা সবাই উত্তেজিত অবস্থায় আছি। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়াই ভাল। শ্রমিকদের কাছে জোর গলায় বলতে পারব আমরা…'

স্ট্রেঞ্জ আর দি ওয়েজ্ অব গড্। সমস্ত ঘটনা যা ঘটতে থাকে, সমস্ত ব্যক্তি-

গত ইচ্ছা বা সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টা, সব কিছু মিলিয়ে এবং সব কিছু ছাড়িয়ে তাঁর ইচ্ছাই যথাসময়ে প্রকাশিত হতে থাকে। তখন সমস্ত ঘটনা আর ব্যক্তিত্বের গতিপথই বদলে যায়। সেই ভাবী প্রকাশের জন্য কি এই ঘটনা অনিবার্য ছিল? ঈশ্বরের কি এটাই অভিপ্রেত যে শিবলালেরা এখন মার খাবে, কেননা আরও বৃহৎ, আরও শ্রেষ্ঠ কিছু তাদের দিয়ে ভবিষ্যতে করানোর প্রয়োজন ছিল?

অধ্যায় ১৭

এর পরের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি—শিবলাল ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। চত্বরের দিকে নয়, ঘরের দিকেই মুখ ফেরানো ওর। দরজাটা ও খুলে বেরিয়ে এসেছিল, শেকলটা এখনো নড়ছে। ঠিক্‌-ঠিক্‌ করে শব্দ হচ্ছে, আস্তে আস্তে কমে আসছে দুলুনিটা।

সন্ধ্যার অন্ধকার থমকে রয়েছে। এরই মধ্যে অন্ধকারটা বেশ ঘন, কিন্তু এর প্রকৃতিটা অন্যরকম। পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছে, একটা একটা করে দল বেঁধেছে, সন্ত্রস্ত হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন। মেঘলা আকাশ, আবহাওয়া গুমোট, ভারি বাতাস—মনে হয় দম আটকে যাবে। কয়েকদিন ধরেই এমনি চলছে।

'শিববাবু···'

ডাক শুনেই শিবলাল চমকে ফিরে দাঁড়াল, 'কে···কে···'

ইসমাইল বিস্মিত হলেন। বললেন, 'ভয় পেলেন আপনি?'

শিবলালের বুক ঢিপঢিপ করছিল। ও বললে, 'না-না···কিন্তু আপনি কখন এসে একেবারে পেছনে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারি নি।' ইসমাইলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল শিবলাল, এখন লক্ষ্য করে বললে, 'কিন্তু আপনাকে কেমন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। কোন খারাপ খবর আছে?'

ইসমাইল উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। 'আজ সারাদিন আপনাকে পেলাম না, ভেবেছিলাম···' সতর্ক দৃষ্টিতে শিবলালের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গ বদলাতে বদলাতে বললেন তারপর।

'বাবার অবস্থা খারাপের দিকে, আজ বেরোতেই পারি নি···'

'তাই না কি? কেমন আছেন উনি? শুনেছিলাম একটু ভাল আছেন···'

ইসমাইলের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠল। যে-কথাটা বলতে এসেছিলেন উনি, সেটা এই সংবাদের পর আর বলা যাবে কি না বুঝতে পারলেন না।

'মাঝখানে দিন চারেক তো ভালই ছিলেন। আজ সকাল থেকে···একটা নতুন উপসর্গ···' শিবলাল নিজেকে সম্বরণ করতে করতে চন্দ্রকান্তর অবস্থাটা ইসমাইলকে বোঝাল।

ইসমাইল সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'শিববাবু, আপনার পারিবারিক দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এখন আপনি ছাড়া বাসায় আর কে আছেন?'

'কেবল একটা চাকর আর তার মা। হরির মা—এই ক'দিন হ'ল এসে রয়েছে, কিন্তু···ও যদি না আসত তাহলে কী হত তাই ভাবি, এই অবস্থায়···'

'আচ্ছা, ওদের হাতে আপনার বাবার সেবা-শুশ্রূষার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?'

শিবলাল হঠাৎ ঘা খেয়ে সজাগ হয়ে উঠল যেন। ইসমাইলের মুখের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ও তাকালে এবং সেখানে সেই আশঙ্কাই দেখতে পেলে। 'কি, কি হয়েছে বলুন···আপনি···আমাকে আর সন্দেহের মধ্যে রাখবেন না···'

ইসমাইল আস্তে-আস্তে বললেন, 'দেখুন, কর্তব্য সবাইকে করতে হবে, আপনাকে, আমাকেও। সেই জন্যে আপনাকে যদি এমন কথা বলি যাতে আপনি আঘাত পাবেন, তাহলে মাঁপ করবেন আমাকে। আজ রাত্রির ভোরেই আপনাকে গ্রেপ্তার করবে···'

'ওঃ···' শিবলাল বললে, যেন অনেকখানি আশঙ্কা করে এই সামান্য কথাটা শুনতে হয়েছে সেই জন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ও। অনেকক্ষণ কিসের জন্যে চুপ করে রইল শিবলাল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'সেখ সাহেব শুধু গ্রেপ্তার কেন, আরো বেশি কিছুর জন্যে মনে মনে আমি প্রস্তুত। কিন্তু এখন···বাবার এই অবস্থায়···আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করা দরকার মনে করল ওরা?' শিবলালের কণ্ঠস্বরে একটা কাতরানি ফুটে উঠল।

'আশ্চর্য হচ্ছেন, শিববাবু? কারণটা বুঝতে পারছেন না? কাল প্রেসিডেণ্টের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা কে করেছেন? আর একটু হলেই প্রেসিডেণ্ট মার খেয়ে লুটিয়ে পড়তেন, তার জন্যে কে দায়ী, আপনি না? আর আপনিই তো বলেছিলেন, অ্যাকশন কমিটির মধ্যেই বাইরের শক্তি কাজ করছে···সে-শক্তির পক্ষে এটা কি অসম্ভব?'

'বলেন কি ?' শিবলাল কথা দুটো উচ্চারণ করতে গিয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠল। রুদ্ধস্বরে ও বলতে আরম্ভ করলে, 'বলেন কি···এতখানি, এতখানি বিশ্বাস করতে হবে ? আমরা তাহলে হাতের পুতুল মাত্র ! যখন খুশি নাচান যায়, আর যখন খুশি ছুঁড়ে দেওয়া যায় ?' তারপর, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি করে বললে, 'সেখ সাহেব, গ্রেপ্তার হ'তে আমি ভয় পাই না, কিন্তু আগামী কালের মীটিং ? আপনি ঠিক জানেন আমাকে কাল নিয়ে যাবে ?'

একজন প্রবীণ নেতা, অন্যজন তাঁর উত্তরাধিকারী। তবু এঁরা মাঝে-মাঝে নিজেদের ওপর নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেন। ইসমাইল বাষ্প-জড়িতস্বরে বললেন, 'সেই মীটিংয়ের জন্যেই তো এই ব্যবস্থা হয়েছে। আর শুধু তাই নয়, খোদার মর্জি, আগামী কাল মীটিংএ আমাদের কত জন উপস্থিত হতে পারবেন কে বলতে পারে।'

হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল শিবলাল, 'সেখ সাহেব, চুপ করুন, চুপ করুন। উঃ, আমি কি করেছি ! আপনি বলতে চান, এই আন্দোলন ভেঙে যাবে ? এই জয়ের মুহূর্তে এসে ? এই সব কিছু, যা আমরা তিল তিল করে গড়ে তুলেছি তা ঐ লোকটার হাতের পুতুল হয়ে থাকবে ? আর···আর বলুন, সেখ সাহেব···আমিই কাল এইটে করেছি, লোকটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি ! না-না, এটা ভুল নয়, আমি সর্বনাশ করেছি···'

'বিচলিত হবেন না, শিববাবু, বিচলিত হবেন না। কিন্তু আপনি এসব কি বলছেন···' ইসমাইল শিবলালের সামনে তাঁর হাতটা সবেগে নাড়তে লাগলেন। তারপর নিজেকে সংযত করতে করতে বললেন, 'শিববাবু, আসল কথাই এখনো আপনাকে বলা হয় নি, আপনার গ্রেপ্তার হওয়া চলবে না। আপনাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হবে। আর ঘণ্টা দুই পরে আপনাকে এসে নিয়ে যাব ···সব বন্দোবস্ত করে দেব আমরা। আপনি সেখান থেকেই কাজ করতে পারবেন।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'শিববাবু, শুনেছি আপনার এক ভগ্নী আছেন। আপনি এর মধ্যে তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিন, আমি লোক পাঠিয়ে দেব, কাল এসে যাবেন। আপনার বাবার সমস্ত দেখাশুনা আমরা করব, কোন চিন্তা নাই।'

হ্যাঁ, এ একটা নতুন আর আসল কথা বটে। শিবলাল ফ্যাল ফ্যাল করে ইসমাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু সহসা এক কাণ্ড করে বসল ও, ফোঁস করে কেঁদে ফেলল। দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে

লাগল ওর। ইসমাইলের হাত দুটো ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আপনি আমাকে এ কি বলছেন, সেখ সাহেব, বাবাকে আমি ছেড়ে যাব, এই অবস্থায়? বলেন কি করে···কিন্তু···কিন্তু আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গেছি, না? আমাকে তো নিয়ে যেতই গ্রেপ্তার করে···বেশ, আপনিই নিয়ে চলুন। আমি জানি এতেও কিছু হবে না, আমি অপয়া, যেখানে যাব, সেইখানেই অমঙ্গল হবে···না, চলুন।'

সন্ধ্যার অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এসেছিল। শিবলালদের সামনের চত্বরটা তেমনি নির্জন, একটা লোকও বেরোয় নি। ওরা বোধ হয় কোথায় গেছে। আবহাওয়া তেমনি গুমোট, কেবল ধিক-ধিক করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কে জানে মেঘ আরো ঘন হয়ে উঠবে কি না।

অধ্যায় ১৮

ইসমাইল বলে গিয়েছিলেন, ঘণ্টা দুই পরে তাঁর লোক আসবে, কিন্তু ঘণ্টা তিনেকের ওপর হয়ে গেল শিবলালের কাছে কেউ এল না। বি-শিফ্‌ট্‌ শেষ হয়ে সি-শিফ্‌ট্‌ আরম্ভ হওয়ার মুখে ওদের দরজায় কে টোকা দিলে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই কম্যুনিস্ট পার্টি অফিসের আনন্দ ওকে নমস্কার করলে, 'আপনার খানা-পিনা হয়ে গেছে, শিববাবু?'

খানা-পিনা তো দূরের কথা, কোন কিছুতে মন দেবার মতো অবস্থা শিবলালের ছিল না। আনন্দ-এর কথার জবাব দিল না ও, সোদ্বেগে বললে, 'আমাকে কি এখন যেতে হবে?' আনন্দ জানত না যে কিছুক্ষণ আগেই বাবার কথা শুনে কী রকম কাতর হয়ে উঠেছিল শিবলাল, জানতে পারলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকত না।

আনন্দ বললে, 'আপনার এ পোষাকে হোবে না, বাবু। যেমন কারখানায় যাচ্ছেন এমনি তৈয়ার হয়ে আসুন···'

শিবলাল বিনা বাক্যব্যয়ে তৈরী হয়ে এল। আনন্দ ওকে নিয়ে কারখানার লেবার গেট দিয়ে ঢুকল ভেতরে। প্যান্টের দুই পকেটে হাত ভরে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল শিবলাল। দূরে এবং কাছে কমজোরী আলোগুলো মিট মিট করছে। এ আলোতে যেমনি দেখা যায় কিছু, তেমনি দেখাও যায় না, আলো

আঁধারি জমাট বেঁধে থাকে। আশে-পাশে, একটু দূরে, উঁচুতে নিচুতে—সব জায়গাতে ঠিক একই রকম। নাম না মনে করলে মনে হয় অতিকায় কালো কিছু নিদ্রাহীন, জ্বালা-ধরা চোখে তাকিয়ে আছে। এও এক রকম স্থিরতা, কিন্তু শান্ত নয়। ভেতরে ভেতরে আর্তনাদ করে উঠছে। কখনো মনে হয় ক্রেনের শব্দ, কখনো মনে হয় লোকোমোটিভের, সব মিলে কি যে শব্দ হয় বোঝা যায় না।

কেন কারখানার ভেতরে শিবলালকে নিয়ে গেল, সে প্রশ্ন করল না শিবলাল। ও ভাবছিল আনন্দ্-এরই কথা। এই আনন্দই একদিন তাকে চিরকুট দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি অফিসে ডাক দিয়েছিল। আজ তারই হাতে নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দিলে ও।

একটু পরেই হঠাৎ আর এক জগতে এসে পৌঁছে গেল যেন ওরা। আনন্দ চোখের সামনে আড়াল দিলে। শিবলাল আড়াল দিলে না, কিন্তু ওর চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। অতি উজ্জ্বল আলো দগদগ করে নাচছে, আর সমস্ত জায়গাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একটু আগে মিটমিটে আলোয় কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না, আর এখন অতি উজ্জ্বল আলোতে আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝাপসা চোখে ভালো করে কিছুই দেখা যায় না।

ডুপ্লেক্স্ প্ল্যাণ্টে ব্লোয়িং হচ্ছে। চুল্লীর মুখ থেকে তুবড়ি-বাজীর মতো লোহার জ্বলন্ত কণা ছুটছে ওপরের দিকে, আর একটু পরেই গ্যাস জ্বলতে আরম্ভ করবে।

শিবলাল আনন্দকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে গিয়েই থেমে গেল। মনে হল, আনন্দকে চেনাই যায় না। এই অন্য রকমের আলোয় ওকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ওর বুক-খোলা শার্ট, মাথায় গামছা দিয়ে বানানো পাগড়ী, এ রকম চেহারা ওর কখনো দেখেছে বলে মনেই হয় না। চকিতে ওর মনে হল, আশ্চর্য তো, মানুষের আবার এমনি আকার হয়! তখন ও নিজের দিকে তাকাল। ওর কালো জুতোর এখন ঠিক কী রঙ হয়েছে বোঝা মুস্কিল। ওর প্যাণ্ট পায়ে লেপটে গিয়েছে, আনন্দ্-এর মতো নিজের সম্বন্ধেও ওর একই ধারণা হল। পোষাকটা যেন আর এক রকমের দেখাচ্ছে। পা দুটো কেমন আগে পেছনে করে এগোচ্ছে ও, মনে হয় এর আগে এমনি করে কখনও হাঁটে নি। ওর হাঁটার ধরণটাই এই রকম নয়।

প্ল্যাণ্টের অনেকখানি কাছে চলে এসেছিল ওরা, শিবলাল অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

ব্ল্যাস্ট ফার্ণেস্ থেকে খনিজ লোহা যখন তরল ধাতু-লোহা হয়ে বেরিয়ে

আসে, তখন তার বিশুদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু মানুষের সংস্কার গিয়েও যেমন যায় না, তেমনি ব্লাস্ট ফার্নেসের গলানো লোহায় তখনও পর্যন্ত কিছু খাদ থেকে যায় : কিছু ম্যাঙ্গানীজ, কিছু সিলিকা, আর কিছু কার্বন থাকে তখনও। স্ট্যেন্জ্ প্ল্যান্টে তার এই শেষতম শুদ্ধিও ঘটে, তারপর তাকে ইস্পাতে পরিণতি দেবার জন্য মেল্টিং শপে পাঠানো হয়। শিবলাল যেন সেই শেষতম বিশুদ্ধির রূপটা বিস্মিত চোখে দেখে নিচ্ছিল।

আনন্দ হাত কয়েক দূরে একটু এগিয়েই দাঁড়িয়েছিল। ও ফিরে তাকাতেই শিবলাল বললে, 'হ্যাঁ, চলুন…বোধ হয় দেরি হয়ে গেল।' মনে হল সে-ও ঐ ধাতু-লোহার মতো সম্পর্ক-চ্যুতির নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে। তার পরিবারের সঙ্গে শেষ সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছে সে।

আনন্দ ওকে আরও কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়ে বললে, 'চলুন, এখন আমরা বাহার যাব…'। সে শিবলালকে লেবার গেট দিয়ে নয়, স্টাফ গেটের দিকেই নিয়ে এল। গেটের কাছাকাছি আসবা মাত্র শিবলালকে সে থামালে। মাথার পাগড়িটা খুলে এর মধ্যে সে হাতের মধ্যে নিয়েছিল, কপালের ঘাম মুছে সেটা আবার মাথায় চড়ালে। বললে, 'শিববাবু, আপনি দেখিয়ে নিন। ডাইনে এ গলিকা ভিত্তর চলে যাবেন, আপনি সিধা যেয়ে ডাইনে ঘুম যাবেন, উহাঁ বক্সি সিং থাকবে, ও আপনাকে রাখবে…'

আনন্দ্-এর কথার প্রথম দিকে শিবলাল তেমনি অন্যমনস্ক ছিল, কিন্তু শেষ করবার আগেই ও চমকে উঠল। 'কেয়া? আপ কেয়া বোলতে হেঁ…আমাকে বক্সি সিং রাখবে! আমাদের 'বোরখা সিং'?' শিবলালের তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল ওর খুপসুরৎ বহুকে নিয়ে ওরা কত ঠাট্টা করেছে। টাকা না শোধ করার জন্য বনমালীকে হিড়হিড় করে টেনে আনার কৌতুককর দৃশ্যও ওর মনকে ছুঁয়ে গেল।

'জী, হাঁ…' আনন্দ বললে, শিবলালের কথার উত্তরে।

'আরে, আমাদের বোরখা সিং…আমরা ওকে নিয়ে কত…নাঃ, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। না কি, তাই যদি হয়, তবু কারখানার ভেতরেই লুকিয়ে থাকা যায়? কিন্তু…' শিবলাল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আনন্দ্-এর স্থির ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে তো তো করে বললে, 'নাঃ আজ আমি আর কিছু বলব নাই, কি করতে হবে বলুন…'

'আপনাকে তো হাম বোলিয়েছে বাবু…আপনি সিধা গলি বরাবর চলিয়ে যাবেন, ডাইনে বক্সি সিং থাকবে।'

শিবলাল আনন্দ্-এর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। হঠাৎ ওর মনে হল যে সবাই মিলে ওর সঙ্গে একটা কৌতুক করতে আরম্ভ করেছে, আনন্দ্‌ও তাতে যোগ দিয়েছে। সে যেন খুবই অবাঞ্ছিত বালক, গতকালকার এ্যাকশন কমিটির মীটিংএ মনোতোষ মুখার্জী তাকে জোর ধমক দিয়েছেন, সে যখন অভিমানে ফুলছিল তখন ইসমাইল এসে তাকে মিষ্টি কথা বলে সরিয়ে দেবার মতলব করেছেন, আর আনন্দ্ এসে তাকে বের করে দিলে। আর যেই মাত্র এই কথাটা তার মনের মধ্যে চেপে বসল, তখন সেটা তাকে অস্থির করে তুললে।

আনন্দ্ শিবলালের নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। শুকিয়ে ওর মুখখানা কেবল টানটান হয়ে পড়েছে শুধু তাই নয়, এমন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে যে ও হাঁপিয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। আনন্দ্ কিছু একটা বলতে গেল, তারপর যেন সে-কথাটা চেপে গিয়ে অন্য একটা দরকারী কথার মধ্যে এসে পড়ল। বললে, 'শিববাবু, আপনি বোলছেন কারখানার ভিত্‌তর ক্যায়সে লুকিয়ে থাকবেন। ও তো বহুৎ সুবিধা আছে। ওদের আঁখ্‌কে উপ্‌পর ফাঁকি দিবেন।'

শিবলালের বুকের ভেতরে মুচড়ে উঠল। যা তাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, এ দিকের সেই সমস্ত কিছু তার কাছে মুহূর্তে অস্পষ্ট হয়ে এল। আনন্দ্-এর কথাগুলোও ঠিক মতো বুঝতে পারল না ও। কেবল ও বললে, 'হাম যাতা হ্যায়···' বলেই ও ছিটকে গলিটার ভেতর গিয়ে পড়ল। নাক মুখ চাপা-পড়া মানুষ বাতাসের জন্যে যেমন করে, ওর তেমনি মনে হল, কোনো রকম করে এদেরকে ঠেলে ফেলতে পারলেই ওর অসহ্য যন্ত্রণার অবসান হবে, নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারবে ও। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে গলিটা পেরোতে লাগল ও।

গলিটা পেরিয়ে ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে আঁস্তাকুড়। একটা খেঁকি কুকুর কেঁউ কেঁউ করতে করতে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে পালাল। শিবলাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু অন্ধকারে আরও একজন এসে ওর হাত ধরলে।

'আইয়ে শিববাবু, হামারা বহুৎ বড়া নসীব হ্যায়···আপ হামারা ডেরেমে আয়ে হ্যায়···হাম বহুৎ গরীব আদমী আছে, বাবু··' বক্তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, আবেগে কথাগুলো ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারছিল না। শিবলালকে নিয়ে আঁস্তাকুড়ের পাশেই খিড়কির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল বক্‌সি সিং, এতক্ষণ ওখানেই সে অপেক্ষা করছিল। ছোট একটা উঠোন, সেই উঠোন পেরিয়ে ওকে একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেল বক্‌সি। নিয়ে গিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'বৈঠিয়ে ইহাঁ পর, বাবু···আপ বৈঠিয়ে বিস্তারেঁকে উপ্‌পর। ছোটী, তু যা, পানি লে আ। আরে, পংখা কাঁহা···'

শিবলাল দু'হাত দু'পাশে রেখে ধপাস করে বিছানার ওপর বসে পড়ল। বকৃসি ততক্ষণে বাতাস করতে আরম্ভ করেছে।

অধ্যায় ১৯

ব্যানার্জী সাহেবের বসবার ঘর থেকে লীলা বেরিয়ে আসতেই খালেক তাকে খাবার-ঘরে যাবার জন্যে বলেছিল। লীলা যদি রাজি হত তো ভাল হত। অথবা, ব্যানার্জী সাহেবের বাংলো থেকে নিজেও ফিরে আসতে পারত সে। কিন্তু ও অস্ফুটে বললে, 'আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিন···'। সহসা ওদের সেই ঘরটি, সেই তক্তপোষের ওপরকার বিছানা, দেয়ালে কালী মায়ের পট, কাকিমার স্নেহনীড়ের কথা ওর মনে পড়ে থাকবে। কিন্তু সেটাই ওর পক্ষে কাল হয়ে উঠল।

মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা, কিন্তু লীলার কাছে মনে হল এ রাস্তা ফুরোবেই না। পেছনের সীটে শক্ত মুঠিতে দরজা ধরে বসেছিল ও। ওর চোখ বাইরের-দিকে, মাঝে-মাঝে লাইটপোস্টের আলোতে ওর ফ্যাকাশে মুখখানা প্রেতবৎ দেখাতে লাগল।

বরসিংবাঁধে ওদের বাড়ির দরজার মুখে সাবিত্রী, একধাপ নিচে সিঁড়ির ওপর বেলা আর শেফালি দাঁড়িয়েছিল। বেলার মুখ রাস্তার দিকে কিন্তু শেফালি কাকিমার সঙ্গে কি কথা বলছিল তখনও। ও দু'দিন আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে, আর লীলারা বেরিয়ে যাবার পরই এদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে।

গাড়ির উজ্জ্বল আলো পড়তেই চকিতে তাকাল ওরা, কিন্তু গাড়িটা যখন হর্ণ দিয়ে এই বাড়ির সামনেই দাঁড়াল তখন অবাক হয়ে গেল। লীলা পা বাড়িয়েছে, পুরোপুরি ওর মুখ দেখবার আগেই বেলা ওকে চিনতে পারলে। ফ্রকের খুঁট ছেড়ে দিয়ে, 'এই যে দিদি,' বলে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু তারপরই গাড়ির ভেতরকার অন্ধকারে খালেকের অপরিচিত মুখ আর গাড়িটার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থমকে দাঁড়াল। কী করবে বুঝতে পারল না।

লীলা নামতেই গাড়িটা পেছোতে আরম্ভ করলে, পেছনে একটা বাঁকের মাথায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। হেডলাইটের আলোটা সিঁড়িতে শেফালির ওপর পড়ল। এই মাসখানের মধ্যেই ও মুটিয়েছে বোঝা যায়। শাড়ি-গয়নায় ও ঝলমল করে উঠল যেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর চোখের দৃষ্টিও একটা বিজাতীয় সন্দেহে ঝল্‌কে উঠল, বললে, 'বাব্‌বা, তুই তো বেশ মেয়ে, সেই সন্ধে থেকে আমি তোর জন্যে বসে আছি...'

মুহূর্তের জন্য ওর দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল লীলা, যেন ওর ভাষা বুঝতে পারছে না। সঙ্ক্ষেপে বললে, 'ও...'

'কিন্তু তুই গিয়েছিলি কোথা যে কাকিমা শুদ্ধ জানে না?' শেফালি ওর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল, যেন ওর মুখে ওর মনের ভেতরটা পড়ে নিতে চায়।

'বেড়াতে গেছলাম, ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোয়...' হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠল লীলা, ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে।

'ব্যানার্জী সাহেব! সে আবার কে ভাই...' তীব্র কৌতূহল চাপতে চাপতে শেফালি জিজ্ঞেস করলে।

'কিন্তু তোর কাকা কোথা? একসঙ্গে গেলি তোরা...' প্রায় একই সঙ্গে ওকে পথ করে দিতে দিতে সাবিত্রী বলে উঠল।

লীলা তখন ভেতরের দরজা পর্যন্ত চলে গেছে, ও এদের জবাবে কী বলল শোনা গেল না।

'আমি আজ আসি, কাকিমা...ওর জন্যে এসেছিলাম...' শেফালি লীলার গমন-পথের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি রেখে বললে। লীলার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা আরো একটু জানবে, না কি, যা দেখেছে কাউকে গিয়ে বলবে বুঝতে পারল না। 'ওর শরীর বোধ হয় খারাপ, আমি আর একদিন আসব, আজ যাই, কাকিমা...' তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে গেল শেফালি।

এর ঘণ্টাখানেক পরে কী কাজে সাবিত্রী শোবার ঘরে ঢুকে দেখলে, লীলা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। দেখেই জ্বলে উঠল ও, 'কি গো ধাড়ী মেয়ে, ঘরকে এলে রাত দশটার সময়, এসেই শুয়ে পড়ে গায়ে বাতাস লাগাচ্ছ! হাত-পা ধুয়া নাই, বিছানার উপর যেতে লজ্জা করল নাই?'

লীলা একটুও ঘুমোয় নি। ও বললে, 'কাকিমা, আমার জ্বর হয়েছে।'

'জ্বর! বলিস কিরে...' সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের ভঙ্গীটা উবে গেল, তাড়াতাড়ি তক্তপোষের কাছে এসে ওর গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'তাইত রে,

ই যে গা পুড়ে যাচ্ছে একেবারে, ইঃ…'। কিন্তু তারপরেই ভাঙা-ভাঙা স্বরে বকতে আরম্ভ করলে সে, যে স্বর তারই নিজস্ব, যা দিয়ে বোঝা যায় না যে সে কষ্ট পাচ্ছে না কি স্নেহ করছে। 'আমার পোড়া কপাল! এ্যাই দেখনা, আমি কি করি। আমার বড়-জা ভাগ্যিমানি, স্বগ্‌গে গেছেন…তাও বলি, বেটী যে পিছনে রইল, দেখবে কে। স্বগ্‌গে যেতে তোর লজ্জা করল নাই…' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ও। কতক্ষণ পরে এক হাতে বার্লির বাটি আর এক হাতে জলের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। 'লে বাপু, এইটুকু খেয়ে লে দিকি…' বিছানার একটা কোণা তুলে তক্তপোষের ওপর বাটি-গেলাসটা রেখে লীলার গায়ে হাত দিয়েই ও চমকে উঠল। 'কিরে, এখন ত জ্বর নাই। এই ত ঘাম দিচ্ছে দেখছি…কিন্তু তা হোক, আজ ভাত পাবি নাই। বার্লি এনেছি, তাই খা…'

'তোমার পায়ে পড়ি, কাকিমা, আমি আজ কিছু খাব নাই। খিদে নাই আমার। আমি শুধু এক গেলাস জল খাব··' ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল লীলা, গেলাসটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে শেষ করলে, তারপর কোনো কথা না বলে এবং কোনো কথার অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়ল ও।

তারপর দিন, সকাল বেলায় স্বাভাবিকভাবেই ঘুম ভাঙল ওর এবং রোজকার মতো কলতলায় বাসন নিয়ে বসল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার উঠে দাঁড়াল ও। সাবিত্রী শোবার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়ে বললে, 'কি হল রে তোর?' বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে ওর। লীলা বললে, 'কাকি, আমার বোধ হয় আবার জ্বর আসছে…'। সাবিত্রী নেমে আসতে আসতে বলতে লাগল, 'আসছে ত হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, উঠে এস…' লীলার হাত থেকে ছাই-ঘসা গেলাসটা কেড়ে নিয়ে নামিয়ে রাখল সাবিত্রী, তারপর ওর হাতে জল ঢেলে ধুইয়ে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

লীলার অসুখটা সেদিন কেন, তারপর কয়েকদিন ধরেও ভাল হ'ল না এবং কবে যে ও ভাল হয়ে উঠবে তাও বোঝা গেল না। অথচ, অসুখটা যে কি তাও ধরবার উপায় নেই। বনমালীকে বললে সে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে লাগল (এই অসুস্থতার কারণটা মনের মধ্যে ঠিক ধরে নিয়েছিল সে), তাছাড়া এত কম সময়ের জন্যে আজকাল সে বাড়িতে আসত যে তাকে কোনো কিছু বলাই অসম্ভব হয়ে উঠল। এমনি সময় মদন একদিন ওদের বাড়িতে এল, আর

সাবিত্রী হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে যেন। 'বাবা, তুমি একটুন কিছু ব্যবস্থা করে দাও···কাকে কি বলি আমি···' বলতে বলতে চোখে কাপড়-চাপা দিল সাবিত্রী।

মদনের আগ্রহ আর আনন্দের অন্ত ছিল না। ও স্টেশন রোডের 'রাইবাবু'র কাছ থেকে ওষুদ এনে দিলে। ডাক্তার বাবু একটা মিক্‌শ্চার দিয়েছেন, দরকার হলে কয়েকদিন পরে একটা পেটেন্ট ওষুদ দেবেন বলেছেন। মদন প্রায় রোজই একবার করে আসে। প্রথম-প্রথম ওর সাহস হ'ত না, এখন এটা-ওটা, ফল-মিষ্টি কিনে এনে দেয়। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মদনের স্বাস্থ্য আরো ভালো হয়েছে, ওর ফর্সা রঙের ওপর রক্ত থেবে উঠেছে যেন। পোশাক-পত্রে ওর আগেকার ছিমছাম ভাবটা বদলে গেছে। সব সময় সেজেগুজে থাকার অভ্যেসটা আর নেই। চুল আঁচড়ায় কিন্তু কখন সেটা উস্কোখুস্কো হয়ে যায় তার খেয়াল থাকে না। পাঞ্জাবির হাতাটা কনুয়ের নিচে পর্যন্ত গুটানো, তাতে যে কাজই ও করুক না কেন, আগ্রহের ভাবটাই প্রকাশ পায়। শেফালির বিয়ের রাত্রে লীলার সঙ্গে একটা কথা বলবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল ও, এখন তার কোনো বাধা নেই। কিন্তু তবু এটা সে এড়িয়ে চলে। বরঞ্চ, পাছে ওরা কিছু মনে করে, এই জন্যে সব সময়ই একটা সম্ভ্রমের ভাব নিয়ে থাকে। বনমালীর সঙ্গে এ-বাড়িতে ওর দেখাই হয় না বাকি সবাই লীলার অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন। মদনের নিজের উদ্বেগও কম নয়, লীলার জন্যে সত্যিই সে চিন্তিত, কিন্তু এই উদ্বেগ, এই চিন্তিত হওয়া আর ওদের কিছু কাজে লাগা সব কিছুই ওর ভেতরটায় সুধায় ভরে দিতে থাকে। অন্য রকম হলে বোধ হয় এটা সম্ভব হ'ত না। এরই মধ্যে বনমালী যখন তার দাদার সঙ্গে দেখা করে আগামী ২৯শে বৈশাখ আশীর্বাদী এবং জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললে, তখন ওর পক্ষে এদের বাড়ি আসা আর স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলা অসম্ভব হয়ে উঠল।

অথচ লীলার অসুখটা রইল আগের মতোই। তাই একদিন বেলার সঙ্গে যুক্তি করে মদন সাবিত্রীকে কিছু না বলেই ডাক্তার রায়কে এনে হাজির করলে। রাই বাবু দেখে শুনে 'হুম্' করে হাত গুটিয়ে বসলেন এবং দরজার কোণায় জড়োসড়ো সাবিত্রীকে উদ্দেশ করে, চশমার ওপর দিয়ে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'মাসি, বিটীর বিয়া দাও গো। ওই হচ্ছে উয়ার রোগ···'। বেলা এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে রাই বাবুর স্টেথসকোপ এবং ভারিক্কি মুখের দিকে তাকিয়েছিল, এ কথায় ফ্যাক করে হেসে ফেলল। মদন দুই হাত পেছনে মুড়ে

বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, পাছে বেলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় এই জন্যে হঠাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সেদিনই বিকেলে লীলার চুলে হাত দিল সাবিত্রী। ভালো করে বেঁধে দিয়ে বললে, 'বড়-খুকি, চল দিকি, আজ একটু বেড়াতে যাই, রাখাল বাবুদের ঘর। সেদিন শেফালি এসেছিল···তোকে আজ দি' যাই চল···'

শেফালিদের বাড়ি বেশি দূরে নয়, কিন্তু এইটুকু আসতেই সাবিত্রী হাঁপিয়ে পড়ল। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁপানো ভাবটা বেড়েছে। মুখের ঘাম মুছে, শেফালির মার কাছে বসতে বসতে ও নিজেই বললে, 'সেই কবে একবার পায়ের ধুলো দিছলেন আপনি, তারপর আর দেখা নাই। তাই ভাবলম, যাই একবার ঘুরে এসি···'

বারান্দায় শেফালি আর তার মার সঙ্গে, শেফালিরই সমবয়সী একটি অবিবাহিতা মেয়ে বসে গল্প করছিল। শেফালির মার চেহারা শেফালির ঠিক বিপরীত, গোলগাল, ঈষৎ কালো। তাছাড়া, ওর চেহারা আর চোখে-মুখে এমনি একটা শিথিল, খসখসে ভাব আছে যে ওকে শেফালির মা অপেক্ষা অনেক বেশী বয়স্কা বলে মনে হয়। এদের তিন জনের মধ্যে বয়স আর সম্মানের যতই তফাৎ থাক, লীলাকে দেখবা মাত্র সকলের মুখেই একই রকম একটা ভাব ফুটে উঠল; যা মুহূর্তে ওদের মনে করিয়ে দিলে যে 'ঐ মেয়েটা' ওদের থেকে পৃথক এবং ওরা তার থেকে শ্রেষ্ঠ; যা নিতান্ত অকারণেই ওদের মধ্যে একটা গোপন অথচ নিশ্চিত জিঘাংসা জাগিয়ে তুললে। লীলার দিকে চোরা-দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারপর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা, আর নিজের কথাটাই অন্যের মুখে দেখতে পেলে।

'এই বুঝি তোর বন্ধু, নিম্‌কি···' বলে লীলার দিকে তাকিয়ে দাঁতে শাড়ির খুঁট চেপে ধরল অবিবাহিতা মেয়েটি। কিন্তু তারপর আর নিজেকে সামলাতে পারল না ও, একটু পরেই শেফালিকে বললে, 'চল, ও-ঘর থেকে একবার ঘুরে আসি আমরা···' শেফালিকে এক রকম করে টেনে নিয়ে—ঘরে নয়, বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

একথা-ওকথার পর শেফালির মা বললে, 'ভাসুরঝির বিয়ে দিচ্ছ কোথা, শত্তুর মা? একবার শুনি চন্দ্রবাবুর ছেলের সঙ্গে, আবার শুনি পাড়াতেই হচ্ছে?'

'হায় মা, আমিই কি সে-সব জানি, সে ওরা জানে আর ভগমান জানে···' বলে সাবিত্রী একটা হাই তুললে।

'যাই হোক, একটা বিয়ে দিয়ে দাও। মেয়েটি এত বড় হয়েছে···অবশ্য আমার শেফালির থেকে ছোট, কিন্তু সব মেয়ের কি আর মন-মতি সমান···' শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর অর্থপূর্ণ হয়ে এল।

কেন জানি, লীলা ঘামতে আরম্ভ করেছিল। সাবিত্রীকে ও বলতে চাইলে, 'কাকীমা, আমাকে বাড়ি নিয়ে যান, আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে,' কিন্তু এই মাত্র এসে বসেছে ওরা, কিছু বলতে পারল না। শেফালির মাকে বললে, 'দেখুন, আমি একবার কলতলায় যাব।'

'তা যাও না, ওইত ঢুকবার দরজার মুখেই আছে, যাও···'

পাছে শেফালির মায়ের মুখে কিছু শুনতে হয়, এই ভয়ে উঠে গেল লীলা, কিন্তু এক এড়াতে গিয়ে আর একের মধ্যে এসে পড়ল ও। ভেজানো দরজার ওপাশেই শেফালি আর সেই মেয়েটির কথাবার্তা শুনতে পেলে।

'যাঃ, মাইরি, আমার বিশ্বাস হয় না। ওকে দেখলে তা মনে হয় না···'

শেফালি ওকে ঝটকা মেরে বললে, 'তুই থাম। আমাদের বীণাদি স্বচক্ষে দেখেছে, বিয়ে বাড়িতে মদনদার সঙ্গে সে কি ঢলাঢলি!'

'মদনদার সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তাই। আর, সুন্দর ছেলে দেখলে তুইও অমনি করতিস!'

'তুই বলছিস, লেবার অফিসারের কাছে ও মেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে না? তুই যদি দেখতিস! মোটরে করে এল···আমার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারল না। তাছাড়া, দেখ, ওর কাকা ছিল টিণ্ডাল, হয়ে গেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান, হল কি করে?'

লীলা একবার ভাবলে ফিরে যাবে, একবার ভাবলে কল থেকে জল নিয়ে চোখে-মুখে ছিটিয়ে দেবে। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েই মাথা ঘুরে গেল ওর, যেখানে দাঁড়িয়েছিল অস্ফুট শব্দ করে সেখানেই বসে পড়ল।

অধ্যায় ২০

এ বাড়িতে একজন মদনকে ভাল চক্ষে দেখতে পারত না, সে হচ্ছে শম্ভু। ক্লাশ নাইনে উঠে তার সেই আত্মম্ভরি, খোঁচানো ভাবটা যেন বেড়েছে। মনে হয় ও আরো একটু লম্বা এবং ওর গোঁফের রেখা আরো একটু কালো হয়েছে।

কেমন করে ও ধরে নিয়েছিল যে লীলাদির সংগে শিবলালেরই বিয়ে হবে। নিজের মনের কথা যে কখনও কাউকে বলে না, সেও যেদিন কুস্তি-প্রতিযোগিতা দেখতে নিয়ে যায় বোনদের, সেদিন বেলাকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল শিবলালের সংগে লীলাদির বিয়ে হবে কি না। তারপর যখন মদনের নামই উঠতে লাগল এবং লীলার অসুখ উপলক্ষ্য করে মদন যাতায়াত আরম্ভ করে দিলে, তখন সেটা অসহ্য হয়ে উঠল ওর কাছে।

বেলা একদিন বলছিল, 'জানিস দাদা, মদনদার সংগে দিদির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল…'

একটা কুকুর আর একটাকে দেখলে যেমন করে তেমনি দাঁত বের করে শম্ভু বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তা হবেক বই কি। অমন রূপে কার্তিকটি, বাটারফেলাই গোঁফ ছাঁটে, সেণ্ট ছড়ায়…'

'কি রে, কি হইছে…' সাবিত্রী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলে। শম্ভুর আক্রমণাত্মক কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছিল ও।

'না, কিছু না…' শম্ভু চকিতে চোখে-মুখে একটা নিস্পৃহভাব ফুটিয়ে তুললে, যেন একটু আগেই সে কাউকে কিছু বলে নি। তারপর হঠাৎ 'এই তোমরা সব দিদির বিয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করছ তাই বলছিলম…' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ও।

এই সেদিন পর্যন্ত লীলার দিকে কেমন এক রকম করে তাকাত ও, যে দৃষ্টির সামনে লীলা সংকুচিত হয়ে পড়ত। মনে হত কোথায় এবং কখন সে কী অপরাধ করে ফেলেছে এবং সেটা ওর দৃষ্টিতে লুকানো নেই। লীলার সৌন্দর্য অন্য সবার মতোই শম্ভুকেও সচেতন করে তুলত, কিন্তু সেটা তার কাছে অন্য রকম মনে হত, যা লোকে দেখে তা নয়। এখন মদনের ওপর তার সেই দৃষ্টি পড়েছে। নিজের অজান্তেই মদনকে অস্থির করে তোলে ও। এমনিতেই মদন সব সময়েই একটা সংকোচের ভাব নিয়ে থাকে, সেই অবস্থায় শম্ভুর সংগে একটু কথা বলতে হলে বা ওর সামনে থাকলে (এইটে তার কাছে সত্যিই আশ্চর্য লাগে) কেমন অস্বস্তি বোধ করে ও।

মদন সম্বন্ধে শম্ভুর এই মনোভাব, কিন্তু লীলার সম্বন্ধে ঠিক তার বিপরীত হয়েছে। দিদির অসুস্থতা, তার বিবাহ-প্রসঙ্গ সব মিলে আজকাল তার ওপর কেমন করুণা হয় ওর। ওর মনে হয়, মদনের সংগে যে বিয়ের কথাবার্তা চলছে তাতে দিদির ওপর ভীষণ অন্যায় করা হচ্ছে, যদিও স্পষ্ট করে জানত না অন্যায়টা কী এবং কোথায়।

যেদিন শেফালিদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে লীলা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, তারই দিন দুই পরে শম্ভু খবর নিয়ে এল, 'জানিস দিদি, জ্যাঠা মশয়ের, মানে শিবুদার বাবার খুব অসুখ…কারখানার কত লোক দেখতে যাচ্ছে…'

'আঁ…' একটা অস্ফুট শব্দ করেছিল লীলা। 'তুই কী করে জানলি?'

আরো কয়েকদিন পরে শম্ভু এসে বললে, 'দিদি, শিবুদা ফেরার হয়েছেন। বাড়িতে কেউ নাই, এক ঝি ছাড়া। জ্যাঠা মশয়ের কি হবে…'। শম্ভুর মনে হতে লাগল, এই সব খবরের সংগে লীলার কোথায় যোগ আছে এবং তাদের কিছু করা দরকার।

লীলার সেদিন মূর্ছা হওয়াতে সাবিত্রীর বুকের ভেতরটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছল। ওর মনে হত, লীলার অবস্থার জন্যে ওরাই দায়ী। যে কোনো রকম করে বিয়েটা এর আগেই দেয় নি কেন সেটাই মনে হতে লাগল ওর। আর ২৯শে বৈশাখের আশীর্বাদীর দিনটার জন্যে ও একেবারে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু ও জানত না, শেফালিদের বাড়ির ঘটনাটা লীলার পক্ষে কতখানি ভাল হয়েছিল।

প্রচণ্ড দুর্যোগের পর আকাশ যেমন করে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে, আর উজ্জ্বল আলোতে হাসতে থাকে, তেমনি মুহূর্তে নিজেকে চিনতে পারল লীলা। সেই চেনাটিও তেমনি সুস্পষ্ট আর উজ্জ্বল। কত আগে থেকে তার বুকের মধ্যে খুব নীরবে যা দেখা দিয়েছিল—না, তার সমস্ত সত্তা ধরে যা এতদিন আস্তে আস্তে ফুটে উঠছিল, যা তারই মধ্যে ছিল অথচ যা তাকে সব সময়েই এড়িয়ে গেছে, আজ সেটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল ও। ওর সব গ্লানি, সব যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। 'কাকে চেয়েছিলাম আমি, চেয়েছিলাম কাউকে?'—এ প্রশ্ন উচ্চারণ করল না সে, কিন্তু তার সমস্ত চেতনায় এটা জেগে উঠল যেন। মুচকে হাসল লীলা, তারপর নিজের দিকে ফিরে তাকাল। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে লজ্জায় বিবশ হয়ে উঠল। দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার কাছে এগিয়ে গেল ও, কিন্তু না দেখেই ফিরে এল। বুঝলে, রোগা হয়ে গেছে সে, মুখে কালি পড়েছে, শুকিয়ে গেছে। তবু নিজের দুই বাহুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে এল ও, ভারী সুন্দর মনে হল নিজেকে! 'কাউকে চেয়েছিলাম আমি?' তার সমস্ত দেহ, সমস্ত সত্তাকে যেন চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রশ্ন করলে ও। বালিশের ওপর দুই হাতের তেলো বিছিয়ে তাতে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ল লীলা। অনুভব করল, নিজেকেই অতি নিবিড়ভাবে অনুভব করল সে: এ লতার অনেক

শিকড়, অনেকের থেকে জীবন রস নিয়েছে কিন্তু এর বৃন্তে একটি ফুলই ফোটে, আর এক জনের হাতেই তা তুলে দেওয়া যায়। একটা মুখ মনে পড়ল ওর, খুব ছোট থেকে যে মুখ দেখেছে সে। শ্যামবর্ণ, লাজুক মুখ, চোখে কালো কালো নরম দৃষ্টি, বাবা ডাকতেন শিবু শিবু বলে। লীলা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে পড়ে রইল।

* * * *

২৯শে বৈশাখের আর মাত্র দুটি দিন বাকি আছে। সন্ধ্যার কাছাকাছি ওদের শোবার ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বেলা আর লীলা বসেছে আর তক্তপোষে দুই হাঁটু বেড় দিয়ে ধরে বসে মদন ওদের সংগে টুকিটাকি কথাবার্তা বলছে। কয়েক দিন ধরে ভালই আছে লীলা, কাল থেকে বোনের একটা জামা নিয়ে কাজ করছে। এইটে সাবিত্রীর খুব ভাল লাগছে এবং এই আশীর্বাদী আর বিয়ের দিনটা পর্যন্ত যাতে ভালভাবে কেটে যায়, তার জন্য দিনরাত ঠাকুরকে জানাচ্ছে।

এখন মদনের সঙ্গে কথা বলতে একটুও সংকোচ বোধ করছে না লীলা, বরঞ্চ সোজাসুজি ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে। তার সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠতে থাকে এবং ভাবে, যদি ওর একটা কোনো কাজ করে দিতে পারে সে। কিন্তু ও কেন আসে, তাও অজানা নয় তার। এইটে তাকে কষ্ট দিতে থাকে। কি করে মদনকে তার নিজের কথাটা জানাবে বুঝতে পারে না, অথচ বলারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আরও একটা ব্যাপার তাকে বাধা দিতে থাকে, কাকিমা যেমন করে আশীর্বাদীর দিনটাকে ধরে পড়েছে তাতে কি করে তার আশাভঙ্গ করবে বুঝতে পারল না।

'মা, বেলি, শুন ইদিকে··' সাবিত্রী বাইরের বারান্দা থেকে ডাক দিলে। 'যাই মা···' বলে বেলা উঠল এবং মদনকে একটা ভেংচি কেটে দিয়ে রান্না-ঘরে ছুটে পালাল। সাবিত্রী কেন বেলাকে ডেকে নিলে তার কারণটা এদের দু'জনের কারো কাছে অজানা রইল না। মদন গম্ভীর হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে, আর ওর চোখে সুখ উপচে পড়তে লাগল। কিন্তু বেলা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লীলাও উঠে পড়ল। বললে, 'আপনি বসুন, বেলার এই জামাটা সেলাই করছিলাম আমি। তা না হলে ও পরতে পারছিল না···' বলে ও চলে গেল।

চকিতে মদনের মুখখানা কালো হয়ে উঠল। হঠাৎ ওর মনে হ'ল, ওকি তাহলে সব ভুল করে এসেছে? প্রথম থেকে যে ধারণা নিয়ে ও এগোচ্ছিল, সেটা তাহলে ভুল! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কথা আর ঘটনা চোখের সামনে ভেসে

উঠল ওর, আর ওর মন বলে উঠল, 'না, কখনো এত সব ভুল হ'তে পারে না।' অনেকক্ষণ ঠায় বসে রইল ও, তারপর উঠে বাইরের ঘরে গেল।

কিন্তু সেলাই-নিরত, আনতচক্ষু লীলাকে দেখে এখন যেন চোখ খুলে গেল ওর। মনে হল, লীলা একটা কিসের যন্ত্রণায় ভুগছে। কেবল অসুখে তো এমনি হয় না। ডান-হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী চেপে ও যে হাতল ঘুরোচ্ছিল মনে হল সেটাও সে আর পারছে না। এমনি দুর্বল হয়ে গেছে।

ওর সামনে বসে মদন বললে, 'লীলা, তোমার কি শরীর খারাপ···তোমার কষ্ট হচ্ছে?' আগ্রহে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছিল মদন। তার সমস্ত ভঙ্গীর মধ্যে সেই সরল প্রীতির ভাবটা ফুটে উঠল। লীলা সেদিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলে, মুহূর্তের জন্য বুকের ভেতরটা দুলে উঠল ওর। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ও বুঝলে, আর দেরি করা চলবে না, এখনই মদনকে তার কথাটা বলতে হবে। আস্তে আস্তে ও বলতে আরম্ভ করল, 'মদনদা, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে বিয়ে করে আপনি সুখী হবেন না···' কিন্তু একটু বলেই হাঁপিয়ে উঠল ও, আর বলতে পারল না।

'সে কি, কি বলছ তুমি···'

লীলা যেন জোর দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'আমি ভাল মেয়ে নয়, আমাকে আপনি ছেড়ে দিন···' বলতে বলতে কেমন অবসন্ন হয়ে পড়ল লীলা। একটু আগে সে কি ভেবেছে, কি সান্ত্বনা পেয়েছে তা সব ভুলে গেল। মদনকে সে আঘাত করতে ভয় পাচ্ছিল সেটাও মনে রইল না ওর, কেবল নিজেকে অত্যন্ত অসহায় এবং তুচ্ছ বলে মনে হত লাগল ওর। নিজেকে সত্যিই হীন বলে বিশ্বাস হল ওর। 'আমি কারও কাজে লাগতে পারলম নাই···' বুকের ভেতর একটা বেদনা স্পষ্ট করে অনুভব করলে ও। এই ক'দিন শিবলালের কথা ও ভেবেছে, বলেছে, 'এই ফুল তাঁকেই দেব···,' কিন্তু এখন মনে হল এই ফুল শুকনো, কারও হাতেই একে দেওয়া যাবে না।

মদন অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর এক রকম করে হেসে বললে (অনেক কষ্টের সময়ও মানুষ হাসে), 'তুমি নিজেকে খারাপ বলছ, লীলা, কিন্তু আমিও কেউ-কেটা নয়। একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। সেই বিয়ে বাড়িতে তোমার সংগে···আমি কি তাহলে ভুল বুঝেছি সব?'

লীলার হাত চলছিল না। মুখখানা ফ্যাকাশে, চোখের দৃষ্টি নিঃস্পন্দ। বললে, 'মদনদা, আমার মনের ভিতর কি হয় আমি বুঝাতে পারব নাই। কিন্তু

আপনাদের পায়ে পড়ি···আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমি আর কথা বলতে পারব নাই···আপনারা যেমন করে পারেন, কালকের আশীর্বাদী বন্ধ করে দিন···' বলে ও ফিরে বসল।

অধ্যায় ২১

সমস্ত ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি হল তার পরের দিন সকালে। কিন্তু যে দিক দিয়ে বিপর্যয় আসাটা স্বাভাবিক ছিল সে দিক দিয়ে এল না। লীলাময়, সাবিত্রীর দিক থেকেই ঘটনাটা ঘটল আর তাতেই এই পরিবারের দু'টি স্ত্রীলোককে —সাবিত্রী আর লীলাকে দু'দিকে ছিটকে দিলে।

মদন যখন সাবিত্রীকে প্রণাম করে চলে যায়, তখন সে কিছুই বুঝতে পারে নি। সন্ধ্যা-রাত্রিটা হাসি-খুশি করে কাটিয়েছে ও, সকালেও একই ভাবে কাটছিল। কিন্তু খানিকটা বেলা হতে না হতেই বনমালী যখন হঠাৎ ফিরে এল তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। বাইরের ঘরে বেলা আর শম্ভু পড়তে বসেছে, ভেতরের ঘরে লীলা কী করছিল। বনমালী বাইরের ঘরে ঢুকেই গুম-ধরা গলায় ডাকলে, 'ছোটকী···', আর অপেক্ষা না করেই ভেতরের বারান্দায় এসে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি ও কখনও ফেরে না। সাবিত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে, বনমালীর চোখ জ্বলছে, রাগে শরীর কাঠ হয়ে উঠেছে, কুস্তি লড়বার সময় প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে যেমন হয়। 'তোরা কী বলেছিস মদনকে, কাল আশীর্বাদী হবেক নাই? বিয়া ভেঙে দিয়েছিস···' বলতে বলতে খিঁচিয়ে-ওঠা মুখে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়তে লাগল বনমালীর।

'সে কি, কি বলছ তুমি···বিয়া কি ভেঙে গেছে, হঁ···' সাবিত্রী একটা ঢোক গিললে, কিন্তু ওর মুখখানা ভয়ে বিস্ময়ে তেমনি হাঁ হয়ে রইল। সেদিকে লক্ষ্য করার মতো অবস্থা ছিল না বনমালীর, ও গাঁক করে উঠে বললে, 'বুড়া ধাড়ী মেয়ে ঘরে পুষে রেখেছিস···তোর লজ্জা নাই? পাঁচ জনে পাঁচটা কেলেঙ্কারী তুললে তখন কি হবেক···তখন সামলাতে হবেক কাকে?' সাবিত্রীও সমানে চেঁচিয়ে উঠল, 'হঁ মোর কপালে ছাই, কি হইছে আগে বল গো, তারপর চিল্লাবে···।' বনমালী ঘাড় দুলিয়ে ঠিক ঐ রকম স্বরে বললে, 'আ ন্যাকা চৈতন, তুমি কিছু জান নাই!

এমনি কিছুক্ষণ চলার পর আসল অবস্থাটা যখন দু'জনের কাছেই পরিষ্কার হল, তখন বনমালী দাঁত চেপে বললে, 'হয় এই বিয়া হবেক, তা না হলে ঘর ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব…'

সাবিত্রীর কোনো কিছু বলার মতো অবস্থা ছিল না, কিন্তু ওর হাঁ হয়ে ওঠা মুখে ঠোঁট দুটো কোঁচকাতে লাগল অদ্ভুত ভাবে।

এর পর কি হত বলা শক্ত, কিন্তু হঠাৎ একটা ফোঁপানো, বিকৃত কান্নার শব্দে চমকে উঠল ওরা। শম্ভু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেছে, ওর সমস্ত শরীর কাঁপছে থরথর করে। বেলাও উঠে এসেছিল। স্পষ্টত, ও কিছুই বুঝতে পারে নি, কেবল একটা হতভম্ব, ভীত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওর চোখে।

'আ ম'ল, তোর আবার হল কি…' খেঁকিয়ে উঠতে গেল বনমালী, কিন্তু আপনা-আপনিই ওর কণ্ঠস্বরটা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। সত্যিই, অত বড় ছেলেকে কাঁদতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ও। তাছাড়া, শম্ভু ছেলেটা কী রকম কাঠখোট্টা, উন্নাসিক। কোনো কারণে যে সে কাঁদতে পারে এটা কেউ ভাবতে পারত না।

'শম্ভু, কী হল তোর, কী হইছে…' বিহ্বল সাবিত্রী জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কথাগুলো।

শম্ভুর চোখ মুখ স্ফুরিত, লাল হয়ে উঠেছে। ও দরজার কাছ থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বললে, 'বাবা, দিদির বিয়া দিয়ে দাও। আর, তা না হলে আমাকে আর ইস্কুলে পাঠাও নাই…'

'ই আবার কি, হারামীর বাচ্চা, কি বলবি ঠিক করে বল…'

শম্ভু থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু এই কটূক্তিই যেন তাকে খানিকটা ধাতস্থ করে দিলে। বললে, 'দিদির নামে ছেলেরা সব বলাবলি করে…পাড়ার লোকেও বলে সব…' এইখানে একটুখানি থামল শম্ভু, যে কথাটা বলতে চায় সেটা গলায় আটকে গেল যেন ওর। কিন্তু ভয়ে, লজ্জায়, আক্রোশে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ছেলেটা। বলে উঠল, 'তুমি নাকি দিদিকে ব্যানার্জী সাহেবের ঘরে নিয়ে গেছলে…তুমি এ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান হয়েছ…'

'চোপ রও, শুয়ার কী বাচ্চা…' ফ্যাকাশে হয়ে উঠছিল বনমালী কিন্তু হঠাৎ গর্জন করে উঠল। 'কে এই কথা বলেছে, পাড়ার কোন আদমী…দেখি শালার হিম্মৎ কতখানি…'

যেমন করে এসেছিল বনমালী, ঠিক তেমনি করেই বেরিয়ে গেল। যেন সেই কুৎসা রটনাকারী লোকগুলোর ওপর প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে।

সাবিত্রী কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারল না। ওর বিহ্বল মূর্তি, কণ্ঠস্বর তেমনি জড়ানো-জড়ানো, সব কথা ও ভালভাবে বলতেও পারছিল না। ও একবার লীলাকে ধরছিল, তারপর আবার শম্ভুকে। লীলাকে বললে, 'বড়খুকি, তুই এতদিন আমাকে ক'স নাই কেনে। কি হইছিল তোর, তোকে লিয়ে গেছল?'

সাবিত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে লীলার নিজের যন্ত্রণাও তুচ্ছ মনে হ'ল। কিন্তু ওর মুখে একটা কথাও এল না। সাবিত্রী ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, মা, আমি তুমার গভ্ভধারিণী লয় বলে কি আমাকে বল নাই...এঁ্যা, বল না?' ও এমন ভাবে ওর দিকে তাকাতে লাগল যে, যেন বনমালী নয়, লীলাই ওকে ঠকিয়েছে।

তারপর শম্ভুকে বললে, 'হ্যাঁ রে, পাড়ায় কি কোথাও তুই এসব শুনিস নাই? তাহলে আমাকে বললি নাই কেনে?' একটু পরে ও নিজেই বললে, 'জানি আমি, কেনে বলিস নাই...আমাকে তোরা মানুষ বলে ভাবিস না। আমি তোদের পায়ের ধুলা, তোরা পা দিয়ে থেঁতলে যাস...তোরা যে দু'বেলা দু'মুঠো আমার উদরে দিস, সেই ভাল...'

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ও নিঃঝুম হয়ে এল, আর এক সময় চুপ করে গেল।

অধ্যায় ২২

বেলা দশটার সময় শম্ভু না খেয়ে ইস্কুলে চলে গিয়েছে। তারপর এগারোটা, বারোটা, বেলার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল একেবারে। বাইরের ঘরে দিদি, আর শোবার ঘরে মা নিঃঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে। ওরা ঘুমোচ্ছে কি জেগে আছে ও বুঝতে পারল না। ওদের কাছে গিয়ে কোনও কথা জিজ্ঞেস করবে এটাও পারল না, আর নিজের থেকে কিছু করবে সে-রকম সাহসও ছিল না ওর। এখনও রান্না চড়ে নি, আদৌ রান্না চড়বে কি না কে জানে। রান্নাঘরে গিয়ে একবার দাঁড়াল ও, সকালের দিকে যে-বাসনগুলো সে মেজে রেখে গিয়েছিল সেগুলো তেমনি পড়ে রয়েছে। জল তোলা হয় নি, ভাতের হাঁড়ি ধোয়া হয় নি এখনও। গালে হাত দিয়ে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল বেলা। তারপর উঠে গিয়ে মুড়ির টিন থেকে হাতড়ে বাটিখানেক মুড়ি বের করলে ও। একটা

গেলাস হাতে করে কলতলায় নেমে জল আনতে গেল, কিন্তু তখন কলের জল চলে গিয়েছে। ফিরে এসে উঠোনটায় আবার বসল ও, বাটিটা কোলের কাছে করে। দু'একমুঠো মুড়ি ও বোধ হয় মুখেও তুলেছিল; কিন্তু কিসের জন্য ওর শরীরটা কেঁপে উঠতে লাগল, আর তার পরই ও গুমরে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে।

লীলা এই সময় উঠে এসে ওর পাশে বসে ওর কাঁধে হাত রাখল। 'বেলি, চুপ কর, কি হয়েছে তোর···'

বেলা ওকে জড়িয়ে ধরল। এই পরিবারের লোকগুলির বুকে যে যন্ত্রণা বেজেছিল সেটা ঠিকই অনুভব করেছিল ও, কিন্তু ও কেবল বললে, 'দিদি, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, ঘরে জল নাই···,' যেন ঠিক সেই জন্যেই ও কেঁদে উঠেছিল।

'দাঁড়া, আমি জল দিচ্ছি···' বলে লীলা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে গেল, কিন্তু আসল অবস্থাটা বুঝে নিতে ওর একটুও দেরি হ'ল না। ও আবার ফিরে এসে বেলাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসল। বললে, 'বেলি, এখন চল দিকি, আমার কাছে একটু শুয়ে পড়বি। বেলা তিনটের সময় জল এনে আমরা দু'জনে রান্না চড়াব···' বলতে বলতে লীলার কণ্ঠস্বর স্নেহে ভারী হয়ে এল। বোনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কোথায় সান্ত্বনা পাচ্ছিল ও। মনে হল, কি একটা সংকল্প ভেতরে ভেতরে ওকে স্থির করে তুলছে।

সাড়ে চারটে পাঁচটা নাগাদ সাবিত্রী বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরোল। শেষ দিকে ও ঘুমিয়েও পড়েছিল। ভারি একটা সুন্দর আর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল ও। তাই, ও যখন ঘুম ভেঙে উঠল তখন দেখা গেল ওর মুখখানা শান্ত হয়ে উঠেছে। ও স্বপ্ন দেখছিল, ওর খুব ছেলে বেলাকার কথা। তখন ও কত ছোট ছিল? এখন ঠিক মনে করতে পারে না সাবিত্রী। ওদের উঠোনে তুলসী মঞ্চের পাশে কয়েকটা লাউ বীচ পুঁতেছিল সাবিত্রী, তার মধ্যে দুটো খুব তেজ করে উঠেছিল। একটু বাতাস দিলেই হিলহিল করে উঠত। একদিন বিকেলে ওর মা একখানা প্রমাণসাইজ, ডোরা-কাটা গামছা ওকে শাড়ির মতো করে পরিয়ে দিয়েছিল। চুলে ঝুঁটি বেঁধে, কাজল দিয়েছিল চোখে। ওদের সামনের ডোবা থেকে একটা ছোট্ট মাটির কলসীতে বয়ে জল এনে ঢালছিল ও, তারপর লাউ-মাদার পাশের আগাছাগুলো তুলছিল। ও বুঝতেই পারে নি ওর বাবা কখন মাঠ থেকে হাল ছেড়ে ফিরে এসেছে আর হাসি-মুখে হাল-ছড়ি হাতে নিয়ে ওর পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও ফিরতেই বাবা ওকে একেবারে দু'হাতে করে বুকের ওপর তুলে নিলে। আদরে আদরে ওকে কেমন করে দিয়েছিল। বলছিল, 'মা, তুই আমার

মা কিনা, সেই লেগে গাছ লাগাইছিস, আমাকে খাওয়াবি। মা, আমার এখন খিদে পেয়েছে, ম্যানা দে দিকি…' বলে ওর বুকে মুখ রেখে চুকচুক করছিল। ওর বুড়ী ঠাকুরমা বেরিয়ে এল, 'হঁরে লবকিষ্ট, তুই কার ম্যানা খাইছিস রে…কে তোর মা হইছে? লি' আয় দিকি সেই মাগিটোকে, গলায় পা দিয়ে মারি…'। সাবিত্রী বুঝতে পেরেছিল, ঠাকুরমা কিছু করবে না, তবুও ভয়ে দু'হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।…

সাবিত্রী যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন শম্ভু আর বেলার খাওয়া হয়েছে। লীলার তখনও স্নান হয় নি, রান্নাবান্না করে এদের খাইয়েছে মাত্র। রান্নাঘরেই ছিল সে। শম্ভু আর বেলা মাকে বেরোতে দেখেই দিদির কাছে চলে গেল, ভয়ে ওদের বুক টিপটিপ করছিল। সাবিত্রী বেলাকে ডেকে বললে, 'আমাকে একটু ছাই দে, মা, দাঁত মাজব আর এক ফোঁটা তেলও দিস, একেবারে চান করে ফেলি…'। স্নান করে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ও যখন রান্না-ঘরে এল, তখন ওকে আরও শান্ত আর প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। লীলাকে বললে, 'আমাকে দু'টি ভাত দে, খুব খিদে পেয়েছে। সব সইবে, পোড়া পেট কখনো সইবেক নাই…' বলে ও একটু হাসল। খেতে বসে লীলাকে বললে স্নান করে আসতে। তারও তো খাওয়া হয় নি এখনো।

শম্ভু আর বেলা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, কিন্তু লীলা ভুল করল না। ও দরজার বাইরে এসে আড়াসে দাঁড়িয়ে কাকিমার খাওয়া দেখতে লাগল, এর পেছনে কি আছে বুঝবার জন্যে। খেতে খেতে সাবিত্রী বললে, 'বেলি, তোর মামা-ঘর যাবি?' বেলা প্রথমটা চুপ করে রইল, অবিশ্বাসী, সতর্ক দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর বয়স্কার মতো পরিহাসের ভঙ্গীতে বললে, 'হ্যাঁ, তুমি আবার যাবে!' শম্ভুকে সাবিত্রী বললে, 'তোকে বাবা এই কাজটি করতে হবেক… আজ রাত দুপুরের গাড়িতে আমরা যাব, কাল সকাল বেলায় ওঁদাগ্রামে ঠিক পৌঁছে যাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি, দি' এসবি আমাদিকে…'

শম্ভু ভয়ে ভয়ে বললে, 'সেই ভাল, মা। তুমি চলে যাও কিছুদিনের জন্যে। এই অশান্তির সংসারে থেক নাই…'

সাবিত্রী এ'কথারও জবাব দিলে না। বেলাকে বললে, 'আচ্ছা বেলি, তোর বাপ যদি না যেতে দেয় তোকে?'

'না, দিবেক নাই! আমি ঠিক যাব…দেখবে তুমি…আমি ঠিক তোমার সঙ্গে চলে যাব।'

সাবিত্রী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে টেনে টেনে বললে, 'তোরা যদি কেউ নাই যাস, তবু আমি একলা চলে যাব। নাই বা গেলি তোরা। আর তোরা কেনেই বা যাবি···তোদের কি!'

সন্ধ্যা বেলায় লীলা শোবার ঘরে ঢুকে দেখলে সাবিত্রী তার পুরাণো তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছোচ্ছে। এই তোরঙ্গটা তার বিয়ের সময়কার, বাবা কিনে দিয়েছিল। এতদিন পরেও ওটা শক্ত আছে। লীলা বললে, 'তুমি সর, কাকিমা, আমি দেখছি।' সাবিত্রী আপত্তি করল না। মুখ নিচু করে কাজ করতে করতে এক সময় লীলা বললে, 'কাকিমা, কাকা তো আসে নি এখনো, তুমি কি তাকে বলে যাবে না?'

'তিনি যদি আসেন ত বলব। তা না হলে তোরা রইলি, তোরা বলবি···'

লীলা তাড়াতাড়ি করে বললে, 'আমিও থাকব নাই, কাকিমা। কাল সকালে চলে যাব।'

সাবিত্রী নিজের যাওয়া নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে লীলার দিকে খেয়ালই ছিল না তার। ভুরু কুঁচকে লীলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই কোথা যাবি আবার?'

'কাকিমা, তুমি যদি চলে যাচ্ছ, তাহলে আমি কোথায় থাকব।'

খুব একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল সাবিত্রী, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে। ও এখন রাগ করতে চায় না। বললে, 'কেনে, এই ঘরেই থাকবি, তার আবার কি।'

সাবিত্রীর এই রকম কথায় লীলা কষ্ট পেল, কিন্তু ও বললে, 'থাকব এখানেই কিন্তু কাল সকালে আমি জ্যাঠা মশায়দের বাড়ি যাব···' এক মুহূর্ত সংকোচ করে বললে, 'চন্দ্র জ্যাঠা মশায়দের বাড়ি। তুমি মত দাও।'

'সে কি, তুই তেনাদের ঘর যাবি কেনে, আর আমি মত দিবার কে যে মত দিব···'

'কাকিমা, জ্যাঠা মশায়ের খুব অসুখ, বাড়িতে কেউ নাই। শিবুদা ফেরার হয়েছেন, কে দেখবেন তাঁকে? আর, আমার মতন মেয়েকে তিনিই ত পায়ে ঠাঁই দেবার জন্যে এসেছিলেন। আমি এখন সেখানে যাব না ত কি···' ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

একটু থেমে ও আবার বললে, 'কাকাকে তোমার যাবার কথা বলব। কিন্তু তুমি যদি না মত দাও, তাহলে আমি কি করি। কাকিমা, তোমার কাছে

অনেক অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর তুমি…' বলে সাবিত্রীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

এর সামনে সাবিত্রী কি করবে। ও চোখের ওপর আঁচল … ঢাকা দিলে।

অধ্যায় ২৩

জুনাপুরে প্রতি বৎসরই খুব গরম পড়ে, কিন্তু এ বৎসর সবকেই ছাড়িয়ে গেছে। যে দিন শিবলালকে (৭ই মে) বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়েছিল সেদিন তাপের পরিমাণ ছিল একশো নয় ডিগ্রী। তারপর আরো কিছুদিন একই রকম কেটেছে, সাতের নিচে নামে নি, ন'য়ের ওপরও ওঠে নি। মে মাসের বাইশের পর থেকে তরতর করে তাপ মাত্রা উঠে যেতে লাগল। ২৯শে মে তাপের মাত্রা উঠল কিছু কম ষোল ডিগ্রী। এরপর আরো কি উঠবে?

অবশ্য প্রতিদিনই আকাশে বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটে না… মেঘ উঠতে থাকে। খুব ঘন কালো নয়, পাতলা পাঁশুটে রঙের মেঘ, কারখানার ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাবার মতো। মানুষের আশাও জেগে ওঠে, কিন্তু রাত হতে না হতেই সেই মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ তামাটে হয়ে ওঠে। এমনি অবস্থা রোজই ঘটতে থাকে। শেষে এমনি হয় যে, তাপ ঝলসানো মানুষ মেঘ দেখলেই আশা করে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে জানে যে সে আশা পূর্ণ হবে না। মনের ভেতরটা কেমন ভোঁতাটে হয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে জুনাপুরে ছায়াবাজির মতো ঘটনা ঘটতে লাগল এবং গুজব ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শোনা গেল, এ্যাকশন কমিটি মিঃ টমসনের প্রস্তাব …কচ করে দিয়েছে, অবশ্য তার আগেই জেনেরাল ম্যানেজার তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এ্যাকশন কমিটির অফিস এখন কখনও খোলে, কখনও খোলে না। শিবলালের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বা হেসে উড়িয়ে দেয়। কেউ বলে, তিনি বাংলা দেশের সীমানা পেরিয়ে চলে গেছেন এবং তাঁর বর্তমান আস্তানা হিসেবে একটা গ্রামের নামও উল্লেখ করে। কেউ বলে, কোম্পানী নয়, মনোতোষবাবুর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া ছিল, তিনি তাঁকে 'গাপ' করে দিয়েছেন।

মনোতোষবাবুর সম্পর্কেও নানা কথা ছড়ায়। এমন কি তাঁর সম্বন্ধে এই

সংশয়ও উপস্থিত হয় যে তিনি জুনাপুরে আছেন কি নেই। কেউ বলে, 'আরে, তা আর পালাবেন না! নিজের স্থবিধা করার জন্য এসেছিলেন, স্থবিধা হ'ল না, চলে গেলেন…'। কেউ বলে, তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, সরকারী মহলে ঘোরাঘুরি করার জন্য। সরকারী মহলে তাঁর অনেক বন্ধু, এমন কি কর্মশিষ্য রয়েছেন, তাঁদের দিয়ে জুনাপুরের ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু এতেও সংশয় থেকে যায়, এই জন্যে যে, তিনি তাহলে ফিরে আসছেন না কেন। কেউ বলে মনোতোষবাবু জুনাপুরে আর ফিরবেন না, কলকাতার কোনো গলিতে জেম্‌স্‌ সাহেবের লোক তাঁর মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেছে।

জুনাপুরে ইতিমধ্যে আর একটা ঢেউ উঠতে থাকে। চাঁতা ডাঙালের একদল শ্রমিক বলে দিয়েছে যে তারা কোনো নেতাকেই বিশ্বাস করে না। তারা নিজেরাই আন্দোলনের ভার নিয়ে একটা মীমাংসা করতে চায়। এই নিয়ে তারা একটা ঘরোয়া মীটিংও করেছে এর মধ্যে।

* * *

আসল অবস্থা ছিল কতকটা এই রকম। মনোতোষবাবু দিশে-হারা হয়ে মে মাসের দিন দশেক কলকাতায় সত্যিই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সব মহলেই ঘোরাঘুরি করেছিলেন তিনি, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। অনেক অপমান আর দুঃখের মধ্যেও অট্টহাস্য করে নিজের মেয়ে শংকরীকে বলেছিলেন তিনি, 'জানিস বেটী, আমি কি করতে পারি? তোর জি-এম থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ঐ পোর্টফোলিও-হোল্ডার ভদ্রলোকেরা—সব ক'টাকে বিভীষিকা দেখাতে পারি আমি। হ্যাঁ, পারি…এবং তা আমাকে করতেও হবে। এখনই। এটাই আমার লাস্ট্‌ ওয়েপন্‌…'

৩১শে মে রাত্রে শেখর মুখার্জী আরানসোল থেকে ছুটে এসেছিল, রিভার-সাইড রোডে শ্রী ব্যানার্জীর বাংলোতে এই খবরটা দেবার জন্য। 'স্যার, মনোতোষবাবু একটা ডিসাইসিভ প্রোগ্রাম নিয়েছেন। এখন অবস্থা এমনই, যারাই আগে ঘা দিতে পারবে, তারাই জিতবে।'

শ্রী ব্যানার্জী ভ্রূকুটি করে তাকালেন। কিছুদিন থেকে মনোতোষবাবুরা এ্যাকশন কমিটির ভেতরে এবং বাইরে যে ভাবে মার খেয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে যাবার উপক্রম হয়েছে। বললেন, 'আবার কি নতুন প্রোগ্রাম, শুনি…তাও আবার ডিসাইসিভ!'

শেখর মুখার্জী দমে গেল না, মনোতোষবাবুর প্ল্যানটা পরিষ্কার করে জানাল।

শুনবার সময়ই 'উফ্-আফ্' করছিলেন শ্রী ব্যানার্জী। শেষ হবামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শেখরও উঠেছিল, কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলেন, 'হোআট্, মিঃ মুখার্জী, ইউ সে ছাট্, এ্যাণ্ড্ ইয়োর প্রেসিডেন্ট সেজ্ ছাট্!'

মানুষের মন কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়। এই একটু আগেই নতুন প্রোগ্রামের কথা শুনে ঠাট্টা করছিলেন শ্রী ব্যানার্জী, আর পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মনোতোষবাবুর পরিকল্পনা তাঁর কাছে এত অভিনব এবং কার্যকরী বলে মনে হল যে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'তাহলে তোমরা এই দু'দিনেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারবে? আর তোমাদের কমিটি?'

'কাল কি পরশু আমরা কমিটি-মীটিং ডাকছি। সেই মীটিং-এ মনোতোষবাবু তাঁর কলকাতার রিপোর্ট পেশ করবেন। বলবেন, 'আশানুরূপ ফল হচ্ছে, তবে একটু দেরি হতে পারে।' এবং আরো কয়েকদিনের জন্যে তাঁর কলকাতায় থাকা দরকার। সম্ভবত, কাল রাত্রেই তিনি কলকাতা চলে যাবেন।'

'আর তোমরা এদিকে হাজতে গিয়ে ঢুকবে, তোমরা···বাকি সব নেতারা! ওয়েল, ওটা আমি করিয়ে দিতে পারব। তোমাদের এ্যারেস্ট করানোর ভারটা আমি নিতে পারি, ইয়েস!'

দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন শ্রী ব্যানার্জী, আবার ফিরে শেখরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওর মুখের দিকে এমন করে তাকালেন যেন সেটা আরও স্পষ্ট করে দেখতে চান। বললেন, 'শেখর, আমি ভাবছি কি, লোকটা তো আশ্চর্য! প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা আমাদের মোটেই ভুল হয় নি। হাউ এক্সেলেন্ট এ হেড্ হী ক্যারেজ্ অন হিজ্ শোল্ডারস্···চলো, অমি এখনই গিয়ে তোমাদের প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি।'

এতেও খুশি হতে পারলেন না শ্রী ব্যানার্জী, কথাটা বোধ হয় ভুলেই গেলেন। বারান্দা থেকে বাগানের মধ্যে একটু এগিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এলেন। কোমরে দু'হাত দিয়ে শেখরের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে উঠলেন হাঃ-হাঃ করে। জোরালো হাসিতে আবহাওয়াটা যেন কাঁপতে লাগল। শেখরের বলার কিছুই ছিল না, ও অপেক্ষা করতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে শ্রী ব্যানার্জী বললেন, 'তাহলে তোমাদের প্রেসিডেন্ট যাচ্ছেন কলকাতায়, আর তোমরা যাচ্ছ জেল-

কাস্টডিতে। আর এদিকে···ডেভিল টেক্‌স্‌ আপ দি জুনাপুর ওআর্কস্‌!'··· হাঃ-হাঃ···এ্যাণ্ড্‌ উইথ্‌ ইট্‌ জি-এম, টু!' 'আবার উনি হাস্য করতে লাগলেন।

অধ্যায় ২৪

সেখ ইসমাইলের শরীর ভাল নেই। অবশ্য, মোটামুটি চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম, সবই করছেন। লিভারের ব্যথাটা যে আবার বেড়েছে তাও নয়। কিন্তু উনি বুঝতে পারছেন, অসুখটা তাঁকে চেপে ধরেছে। কিছুতেই একটু স্বস্তি পাচ্ছেন না, মনে হয় সব সময়েই মাথার মধ্যে অসহ্য ভার হয়ে রয়েছে। হাত পা ঝিমঝিম করছে আর বুকের মধ্যে একটা জ্বালা-জ্বালা ভাব রয়েই গেছে।

ইসমাইল তাঁর বাড়ির উঠোনে আরাম কেদারা পেতে বসেছিলেন। হারিকেনের আলোটা তাঁর চোখে লাগছিল, মেয়েটা এক টুক্‌রো কাঠের তক্তা আড়াল করে দিয়ে গেছে। ওরা বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়েছে। ইসমাইল ডান হাতে চেপে-ধরা সিগারেটটার ছাই ফেলে দিয়ে একটা টান দিলেন। সিগারেট খাওয়া তাঁর বারণ। ডাক্তার বলেছেন, তাঁর সিগারেট খাওয়া চলবে না, নিতান্ত অপারগ হলে এক-আধটা ভরা-পেটে খাওয়া চলতে পারে। ইসমাইল তখনই হেসে বলেছিলেন, 'আপনি আমার চিকিৎসা করতে পারবেন না। রোগী যা চায় তাই দিয়েই আপনাকে রোগ সারাতে হবে। আমিও সেই ভাবে চিকিৎসা করি।' ডাক্তার ছোট্ট ছেলের মতো হেসে ফেলেছিলেন।

সিগারেট খাওয়া তাঁর চিরকালের অভ্যাস। ক্রমাগত সিগারেট খেয়েছেন তিনি, এখন না খেয়ে পারবেন কি করে। একটা টান দিয়ে মুখ ভর্তি করে নিলেন তিনি, তারপর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে, চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আজকাল প্রায়ই তিনি এমনি করেন, এমনি ছেলে-মানুষি করতে তাঁর ভারী ভাল লাগে। কিন্তু এমনি করলে তাঁর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, সেটা তাঁকে কষ্ট দেয় কিন্তু তার লোভও সামলাতে পারেন না। তলপেট থেকে জ্বালাটা আরম্ভ হয়, কখনও তলপেট আর দুই বাহুর মাঝখান থেকে। তারপর সিগারেটের আগুন যেমন পুড়িয়ে পুড়িয়ে এগিয়ে আসে, তেমনি করে ওঁর সমস্ত শরীর বেয়ে জ্বালাটা মাথার দিকে ওঠে। দমটা ছেড়ে দেন ইসমাইল, বুকের ভেতরটা মৃদু-মৃদু কাঁপতে থাকে। বুঝতে পারেন, আস্তে আস্তে তাঁর শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে।

কিন্তু এত সময় লাগে কেন, এত দিন ধরে? ভেতরে এমন কী-ই বা আছে, পুড়ে যেতে এত সময় লাগে।

ইসমাইল পাশের দিকে তাকালেন, ইঁদুরের মতো কি খড়খড় করছে। মিন্টুর মা কুমড়ো আর শশা গাছ লাগিয়েছেন। গাছ ক'টা ডগা মেলে উঠেছে, পাতাগুলো বেশ বড়। চারদিকে বাতাস নেই কোথাও, কিন্তু ওদিকের কুমড়ো ডগাটা নড়ছে। কিসের জন্যে অস্থিরতা বোধ করছে ওটা। কিছুক্ষণ পরেই আবার মনে হল ওঁর, সেই আগে যেটা খড়খড় করছিল সেটা গেল কোথায়?

ইসমাইল চোখ ফিরিয়ে আবার পড়ে রইলেন। আজকাল কেন তাঁর এমনি ফাঁকা মনে হচ্ছে? হঠাৎ মনে হল, তিনি নিজের কোনো কথা কখনও বলতে পারেন নি। কাউকেই বলেন নি। সব কথাই তাঁকে শুনতে হবে, নাড়াচাড়া করতে হবে, বুকের মধ্যে চেপে রাখতে হবে, কিন্তু বলতে হবে খুব কম। কেন তাঁর এই অবস্থা হল। চেপে রেখে রেখে তিনি কেমন জীর্ণ হয়ে পড়েছেন। হয়েছেনই তো—উঠে দাঁড়ালেন ইসমাইল। দুর্বল শরীরে হঠাৎ উত্তেজনা এলে যা হয়, ইসমাইল অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। সব সময় বসে বসে কাটিয়েছেন তিনি, উঠে নড়াচড়া করলেন কই। আজ সন্ধ্যায় রতন এসেছিল, কিন্তু রতন জোর দিয়ে কথা বলতে পারে, তারো বেশি জোর দিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু রতনকে জোর করে কথা বলতে পেরেছেন তিনি?

নেতৃত্ব—আশ্চর্য। প্রতিটি মুহূর্ত মায়ের মতো স্নেহে, মায়ের মতো নিষ্ঠুরতায় তাকিয়ে থাকতে হবে। নিদ্রা নেই, তন্দ্রাহীন চোখ—দেখতে হবে, দেখে দেখে অন্ধ হয়ে যাবেন ইসমাইল। আর পারছেন না। অথচ যাকে কে চেনে···আর তাই বা কেন। চিনলেও তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে? অসম্ভব। তার থেকে প্রেয়সী—আত্মপ্রিয়া ভালো, অন্ধ মোহে সে যেমন চালিয়ে নিতে পারে, তেমনি রসাতলে নামিয়েও দেয়। তার লোভ দুর্দমনীয়, তার প্রীতিও অসহ্য।

রতন খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছে। ইসমাইল যেমন উদ্বেগে পুড়ছেন, তেমনি আক্রোশে পুড়ছে ও। ইসমাইল দেখেছেন ওর চেহারা ঝলসে গেছে। ও সোজাসুজি বলছে, 'সেখ সাহেব, আমি এখন কিছু বুঝতে পারছি না। হয়তো আমাকে কম্যুনিস্ট-পার্টি ছাড়তে হবে। কিছু কাজ তো করা চাই···'। ইসমাইল বলেছিলেন, 'কাজ করবার জন্যে আপনার মতো মেম্বারকে যদি পার্টি ছাড়তে হয়, তাহলে বুঝতে হবে কাজটা খুবই বড়!' রতন বললে, 'হু', ভলান্টিয়ার তৈরী করছি। এর আগে আমি তো আপনাকে বলেছি, তোষণ করে কিছু লাভ নাই। নিজের জোর

চাই, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' রতন কি বলতে চায় বুঝতে পারলেন, শিউরে উঠলেন ভেতরে ভেতরে। ইসমাইল তৎক্ষণাৎ বুঝেছিলেন, যদি রতন এই সর্বনাশের পথে যায়, তাহলে তার বিরোধিতা করতে হবে।

কিন্তু এখন কী রকম ক্লান্ত, বিভ্রান্ত বোধ করছেন। অদ্ভুত। কেন এমনি হয়। ইসমাইল রতনের সেই বিদ্রোহী, তীক্ষ্ণ চোখের কথা ভাবছেন। তাঁর অস্থিরতা বেড়েই যাচ্ছে। ওরা যখন এগোয়, তখন বুক উঁচু করে এগোয়। যখন কোনো কিছুর ওপর পড়ে, তখন উল্কার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর এই পদে পদে সাবধানতা, সতর্কতা, সারা রাত ধরে ড্যাব-ড্যাব করে অর্থহীনভাবে তাকিয়ে থাকা—হোক তা মমতা মাখানো, তবু অন্তহীন এই সতর্কতার অর্থ কী।

ইসমাইল আবার ফিরে নিজের জায়গায় বসলেন। দুই হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে নেতিয়ে পড়লেন তিনি। গরমটা আস্তে আস্তে ভারী হয়ে বসল। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। তাঁর সামনেকার দেওয়াল পেরিয়ে একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছ মাথা তুলেছে, কয়েকটা জোনাকি আস্তে আস্তে সরে সরে বসছে। অনেক রাত্রি হয়েছে, কত আগে যেন বারোটার ঘণ্টা শুনেছিলেন ইসমাইল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে, চোখের পাতা আর শরীর ভার হয়ে আসছে। ইসমাইল হাই তুললেন।

কতক্ষণ এইভাবে কাটার পর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন ইসমাইল। কোথায় কি একটা শব্দ হয়েছে। প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলেন না তিনি, ভাবলেন ভুল হয়েছে। আবহাওয়াটা হঠাৎ খুব থমথমে মনে হল তাঁর। মনে হল, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছিল, তাঁকে উঠতে দেখেই চুপ করে গেছে। স্বচ্ছ অন্ধকার, কোথাও কিছু নেই, ওদিককার রান্নাঘরের ভাঙা জানালা থেকে আরম্ভ করে এদিকে কুমড়ো গাছগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। তাহলে কি হল।

কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ হল, ইসমাইল তড়াক করে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। প্রথমটা কাউকে দেখতে পেলেন না উনি, তারপর কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে জমাট অন্ধকারে কয়েক জনকে জড়ো হতে দেখলেন। কিন্তু উনি যেমন দেখেছিলেন ওদের, ওরাও তেমনি দেখেছিল ওঁকে। ভরাট, বিস্বর গলায় একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'হোই, কৌন হ্যায়?' সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল তাঁর মুখে। ইসমাইল চোখের সামনে হাত আড়াল দিয়ে মুখ নিচু করলেন। জনা চারেক সিপাহী ছুটে এসে দরজার সামনে ঘিরে দাঁড়াল।

একজন অফিসার অপেক্ষাকৃত কম জোরে পা চালিয়ে সামনে এসে বললেন, 'আপনার নাম সেখ ইসমাইল ? ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট্…'

তখনও পর্যন্ত ইসমাইলের চোখের ওপর টর্চের আলো ফেলা ছিল। ইসমাইলের রোগা মুখখানা আরো শুকনো দেখাতে লাগল। ওর ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। উনি বললেন, 'আপনি আলোটা আগে নামিয়ে নিতে বলুন…'

অফিসার চাপা গর্জন করে উঠলেন, 'ইউ, ডাউন ইয়োর টর্চ্!' তারপর একটু মোলায়েম করে বলতে আরম্ভ করলেন, 'আওয়ার ডিউটি ইজ্ সাচ এ ডিফিকাল্ট জব…'

বাধা দিয়ে মৃদু হাস্য করে ইসমাইল বললেন, 'আমাকে কি এখনই যেতে হবে ? কিন্তু আমার তো তৈরী হয়ে নেওয়া দরকার।'

'ও হো, নেভার মাইণ্ড্, আপনাকে কেবল থানায় নিয়ে গিয়ে তারপর ছেড়ে দেওয়া হবে। ওপরওয়ালার মর্জি, মশাই, কি করি বলুন। বিছানাপত্র কিছুই নিতে হবে না…'

রসিকতা করছেন এমনি ভাবে ইসমাইল বললেন, 'দেখেছেন তো, কেবল লুঙ্গি পরে রয়েছি। হাজার হোক, ভদ্রলোকের ছেলে তো। আপনারা অবশ্য আমাদের ভদ্রলোক বলে মনে করেন না। জামা-কাপড় পরে নিতে দিন।'

বোঝা গেল, অফিসারটি আমতা-আমতা করছেন। 'আজ্ঞে, আপনাকে তো আর আমরা ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'তাহলে আপনার একজন লোক যাক, আমি বলে দিচ্ছি কোথায় জামা-কাপড় আছে, আনুক।'

'মুস্কিল, আমাদের আবার সব দিকে বিপদ। রাত্রে কোনো বাড়িতে ঢুকবার উপায় নেই আমাদের।'

'তাহলে চলুন, এই অবস্থাতেই যাচ্ছি।'

তখন অফিসারটির ভাব বদলাতে আরম্ভ করল। সকাতর অথচ সতর্ক স্বরে বললেন, 'দেখুন, আমাদের চাকুরী খাবেন না। আপনি ভেতরে যান, তৈরী হয়ে আসুন।'

ইসমাইলকে অফিসারটি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু তাঁর বুক টিপটিপ করতে লাগল। খামকা নিজের ওপর আর সিপাহীদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। দরজার থেকে রাস্তার ওপর সরে গিয়ে পায়চারি করতে করতে ঘন ঘন ঘড়ির

দিকে তাকাতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, বারো মিনিট—তেরো মিনিট গেল। উনি আর পারলেন না—অস্থিরভাবে এসে অল্প-খোলা দরজাটা ফাঁক করে ভেতরের দিকে তাকালেন। সামনেটা একেবারে ফাঁকা, খুব বড়ো উঠোন। ওদিকে তাকিয়েই ইসমাইলকে দেখতে পেলেন।

ইসমাইল তৈরী হয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু স্থির, নিস্পন্দ হয়ে বারান্দার নিচেই ছাঁচ-তলায় মাথা নিচু করে ছিলেন দাঁড়িয়ে। আর তাঁর থেকেও আরও নিস্পন্দ-ভাবে বারান্দার ওপর খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন—ইসমাইলের স্ত্রী। দু'জনের মধ্যে কেউই কিছু বলছেন না। মনে হয়, এর আগেও ওঁরা কিছু বলেন নি, পরেও বলবেন না।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অফিসারটি সরে এলেন, এই নীরব বিদায়ের দৃশ্য সহসা তাঁকে অস্থির করে তুলল। আরও মিনিট দুই পরে ইসমাইল বেরিয়ে আসা মাত্র অফিসারটি গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের ডিউটি এত বিচ্ছিরি জিনিস···আপনি জানেন আমাদের কত অপ্রিয় কাজ করতে হয়।'

ইসমাইল ওঁর দিকে তাকালেন একবার। এ কথার অর্থ কি বুঝতে পারলেন না।

ইসমাইলের বাড়ির সামনেকার রাস্তাটা সংকীর্ণ, সেই জন্য দরজা পর্যন্ত পুলিশভ্যান আসতে পারে নি। একটু দূরে বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে ইসমাইলকে গাড়িতে ওঠানো হবে। এইটুকু রাস্তা ওঁকে হাঁটিয়েই নিয়ে গেলেন। হাত-কড়া ছিল ওঁদের সঙ্গে, কিন্তু সেটা লাগাবার কথা ভাবতেও পারলেন না অফি-সার। মাঝে মাঝে এমনি গোলমাল হয়ে যায় ওঁদের।

একটু গিয়েই বড় রাস্তার মোড় পাওয়া গেল। লাইট পোস্টের আলোটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। লাইট পোস্ট পেরিয়ে একটা শিরিষ গাছের তলায় অন্ধকারে পুলিশভ্যান দাঁড় করানো, হঠাৎ কেউ দেখতে পাবে না বোধ হয় এই উদ্দেশ্যে। গাড়িটার পেছনের দরজা খোলা। খোলা দরজার পাশে রতন ধর দাঁড়িয়ে। কয়েকজন কনস্টেবল্ ভ্যানটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ইসমাইল হেসে বললেন, 'এই যে, আপনি আগেই এসেছেন দেখছি।'

পেছনে দুই হাত দিয়ে শক্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল রতন। সিংহকে খাঁচার মধ্যে পুরলে যেমন হয় ওরও অবস্থা হয়েছিল তেমনি। ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'আপনি আসবেন, আর আমি না এসে পারি?' যেন ওর এই অবস্থার জন্য ইসমাইলই দায়ী।

ইসমাইল হয়ত কিছু বলতেন, কিন্তু তার আগেই গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সমীর সেন নমস্কার জানালে ইসমাইলকে। ইসমাইলের মনে খট্‌ করে উঠল, উনি অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি!' কিন্তু ওঁর আরো অবাক হবার পালা ছিল। শেখর মুখার্জী ভেতর থেকে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল। নিচে নেমেই নমস্কার করে বললে, 'আসুন, আসুন, এক যাত্রায় আর পৃথক ফল কেন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

শেখর কি বললে ইসমাইলের কানে গেল না। ওঁর পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গিয়েছিল যেন। মুহূর্তে সমস্তটা বুঝতে পারলেন তিনি! জুনাপুরের নিরীহ শ্রমিকদের নিয়ে একটা ছিনিমিনি খেলা চলবে। প্ল্যান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অসম্ভব। বিদ্যুতের মতো ভেবে নিলেন তিনি, 'অসম্ভব, ওদেরকে ছেড়ে এখন আমি কোথাও যেতে পারি না।'

চোখের সামনে তাঁর যে-টুকু ঘটনা ছিল সেটা তো অতি সামান্য। তার যে-কোনো ব্যাখ্যা মনে আসতে পারত। কর্তব্য কি হবে, এ নিয়ে বিতর্ক আর চিন্তাও আসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইসমাইল ছিলেন নেতা। শিল্পীর মতো তাঁর কাছে আর কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন মনে হল না। অতীতের অসংখ্য ঘটনা যেন একটা সুতোয় গাঁথা হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হল, আর ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ঘটনা-গুলোও তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল যেন।

ইসমাইলের সহকর্মীরা কিংবা তাঁর প্রহরীরা কেউ বুঝতে পারল না, তাঁর ডান হাতটা শক্ত হয়ে উঠল, পোর্টফোলিও ব্যাগটা বগলে জাপটে ধরলেন তিনি। তাঁর শরীরে শক্তি আর লঘুতা দুই-ই সঞ্চারিত হল, কে জানে কি ভাবে। তিনি একটা চাপা চিৎকার দিয়ে কল্‌কে ফুলের বনে লাফিয়ে পড়লেন, বলে গেলেন, 'রতনবাবু, পারেন তো পালান, দেরি করবেন না।'

এদের যখন বিমূঢ় ভাবটা কাটল, তখন অন্ধকারে একজন বেটনটা ছুঁড়ে মারলে। একজন কলকে ফুলের বনে লাফিয়ে পড়েই আটকে গেল, গাছের ডাল ভাঙতেই দেরি হয়ে গেল ওর। অফিসারটি চকিতে এসে আগে রতনকে ধরলেন, ওদের সবাইকে ঠেলা মারতে মারতে দরজার দিকে নিয়ে গেলেন। আরো কয়েকজন সিপাহী লাফিয়ে পড়ে ঠেলা মারতে লাগল। 'ইউ, পিছন যাও, পিছন যাও…' অফিসারটি লাফিয়ে উঠতে লাগলেন। তারপর, দরজা বন্ধ করার পর ইসমাইলের অনুসন্ধান আরম্ভ হ'ল।

অধ্যায় ২৫

অবশেষে জুনাপুরে ৩রা জুনের সেই দিনটির প্রভাত হল। এর আগে অসংখ্য ঘটনা ঘটে গেছে। কখনো ঘটেছে খুব দ্রুত গতিতে, একই দিনে এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরপর তা ঘটেছে। আবার কখনও বা অনেকখানি ফাঁক দিয়ে, অনেকগুলি শিথিল পদক্ষেপের পর আকস্মিক একটা দ্রুততা দেখা দিয়েছে। এই ঘটনাগুলির প্রকৃতিও এক রকম নয়। কোন একটি হয়তো চোখেই পড়ে নি, এমন কি কর্মীদের চোখও এড়িয়ে গেছে। আবার কোন কোন ঘটনা জুনাপুর ছাড়িয়ে বাংলা দেশ, ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তের লোকের কাছেও গিয়ে পৌঁছেছে। তাই বলে এদের গুরুত্ব আবার আনুপাতিক নয়। যে ঘটনা সকলের কাছেই পৌঁছায়, যা সকলেই দেখতে পারে, তাই যদি গুরুত্বপূর্ণ হবে তাহলে নেতার প্রয়োজন কি।

আবার, মানুষের উৎসাহবোধও এক রকম নয়। কখনও কখনও সামান্য ঘটনাতেই মানুষ উত্তেজিত হয়েছে, উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আবার যখন তার সবচেয়ে সজাগ হওয়া দরকার তখন হয়তো নেতিয়ে পড়েছে। এদের কি যুক্তিবোধ নেই ? অতি তী সু-সম্বদ্ধক্ষ যুক্তি আছে এদের, এরা তা প্রয়োগও করে। কিন্তু মাঝে মাঝে তা চাপা পড়ে, অন্ধ ভাবাবেগে মানুষ চলতে থাকে।

কিন্তু এও তো মাত্র ঘটনাই। এই সব ঘটনার কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগ নেই। হয়তো একটার সঙ্গে কখনো আর একটার সাদৃশ্য থাকে, একটা হয়তো আর একটার পরিপূরক। কখনও একটা অন্যটার বিরোধী। সম্পূর্ণ খাপছাড়া, অপ্রত্যাশিত। লোক-সাধারণের কাছে এসব ঘটনা হচ্ছে ঢেউএর মতো, ঢেউ চলে গেলেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই সব কখনও স্তূপাকার, কখনও বিচ্ছিন্ন আর ছড়িয়ে-পড়া ঘটনা পেরিয়ে আরও একটা ঘটনা রয়েছে। এই ঘটনা বিশুদ্ধ, গতিশীল একটা এ্যাবস্ট্রাকশন। বাইরের ঘটনা ঘটে, কিন্তু এই ঘটনা হয়ে উঠতে থাকে, প্রতিমুহূর্তে তা হয়ে উঠছে। অসংখ্য সদৃশ আর বিসদৃশ, তুচ্ছ আর গুরু, সমস্ত ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এটা গড়ে ওঠে, সকলকে ছুঁয়ে সকলকে পেরিয়ে যায়। এই ঘটনাই সার্বভৌম, কিন্তু অসংখ্য বস্তুগত ঘটনার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরঞ্চ এরই জন্যে অসংখ্য বস্তুগত ঘটনার কোনোটিই অর্থহীন নয়। এরই আলোতে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

এই ঘটনা একটা গতিশীল, বিশুদ্ধ সত্তা, কিন্তু তাই বলে এটা একটা সঞ্চরমান বিন্দু মাত্র নয়, যা অপরিবর্তিত, আর যা অন্তহীন পথে এগিয়ে চলেছে। জীবনের মতো তারও একটা সূচনা আছে, বৃদ্ধি আছে, উচ্চতম বিন্দু আছে। তারপর তার আবার ভাটা আছে। পরিণামে সে বিনষ্ট হয় না, আর-একে রূপান্তরিত হয়। সেও নানা সংঘর্ষ আর সামঞ্জস্যের ফলে, আর এক সমন্বয় আর সূচনার মধ্যে মূর্তিলাভ করে।

লোক-সাধারণ বস্তুগত ঘটনাই দেখে কিন্তু যিনি নেতা তিনি বস্তুগত ঘটনা দেখতে দেখতে সেগুলো পেরিয়ে ঐ সার্বভৌম ঘটনাই দেখেন। তাই কোনো কোনো ঘটনায় লোক-সাধারণ যখন উচ্ছ্বসিত বা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন তিনি সকৌতুকে নীরব থাকেন, তাঁর চোখে একটা মৃদু স্নেহ জ্বলজ্বল করে ওঠে। আর যখন অন্যে বিষণ্ণ, বেদনার্ত, তখনও তাঁর চোখে নিরাসক্তির মৃদু হাসি, যেন এটা পেরিয়েই দূরে একটা আশা দেখতে পাচ্ছেন। নেতার এটাই তো পুরস্কারবিহীন কাজ। তিনি উচ্ছ্বসিত নন, বেদনার্তও নন। তাঁর আপন জনের প্রতি তিনি নিশ্চয়ই আগ্রহশীল, তেমনি অনেক সময় বিরুদ্ধ জনের ওপরও তাঁকে ভরসা রাখতে হয়। সাধারণের, এমন কি শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিরও ভাল-মন্দ প্রায়ই তাঁর কাছে ভাল-মন্দ নয়। যে সার্বভৌম ঘটনার দিকে তিনি অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে থাকেন, সেটাই তাঁর ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ঠিক করে দেয়। এর দিকে তাকিয়েই তাঁর বেঁচে থেকে স্বস্তি নেই, মরে গেলেও ভয় নেই। কারণ, তিনি বাঁচুন আর মরুন, তিনি সেই সার্বভৌম ঘটনাটিকে ঘটাচ্ছেন। তিনি যে দেখতে পান, ঘটাতে পারেন, সেটাই তো তাঁর নেতৃত্ব। এর দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি আত্মত্যাগ করতে পারেন, বস্তুজগতে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে আপোষ করতে পারেন, স্ব-বিরোধী কাজও করতে পারেন। এই জন্যই নেতাদের সব কাজ সব সময় বোঝা যায় না, অনেক সময় অর্থহীন মনে হয়।

কিন্তু নেতারা নেতা হলেও মানুষ। সুতরাং যে সার্বভৌম ঘটনার দিকে চোখ রেখে তাঁরা এগিয়ে যান, সব সময় সেটা তাঁদের চোখের সামনে থাকে না, অনেক সময় ঝাপসা হয়ে আসে, দেখতে পান না, তখন তাঁরা প্রাণহীন দেহের মতো। নিষ্প্রভ, বিভ্রান্ত হয়ে যান, কথা বলতে হলে বিরক্ত হন, শুনতে গেলে মাথা টন টন করে ওঠে। কিন্তু এও সাময়িক, কোনও এক চকিত মুহূর্তে আবার তাঁর চোখের সামনে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সার্বভৌম ঘটনা তাঁর কাছে কেবলই প্রতিভাত হয় তা নয়, সেটিকে তিনি ঘটাতেও থাকেন।

তাহলে কে কার বশ। সার্বভৌম ঘটনা কি নেতার বশ, না কি নেতা সার্বভৌম ঘটনার বশীভূত। এটাই কি সত্য যে নেতা না থাকলে সার্বভৌম ঘটনা ঘটতেই পারে না, তা নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে? না, নেতা না থাকলে সার্বভৌম ঘটনার পরিণতি নেই, উচ্চতম বিন্দুতে তা আরোহণ করে না। বস্তুগত ঘটনা আশ্রয় করে তা উৎসারিত হতে যায়, কিন্তু পারে না, শিথিল হয়ে নেতিয়ে পড়ে। সেই জন্যেই তো ইতিহাসে দেখা গেছে, ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তার সার্বভৌম কোনও পরিণতি নেই। বিপরীতক্রমে, নেতা আছেন ঘটনা নেই অর্থাৎ ঘটনা নিরপেক্ষ নেতৃত্ব তাও সম্ভব নয়। ঘটমান সার্বভৌম ঘটনা নেতৃচিত্তের ওপর প্রতিফলিত হয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, তখন উদ্বুদ্ধ নেতৃচিত্ত সবেগে সেই ঘটমান সার্বভৌম ঘটনার দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছোটে; কিন্তু কেবলই আকৃষ্ট হয় না, তা সেই ঘটমানতাকে দ্রুততর করে, আর্টিস্টের মতো স্পর্শ দেয়, এক কথায় তাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে চায়।

নেতার দৃষ্টি তাহলে সার্বভৌম ঘটনার দিকে। কিন্তু সার্বভৌম ঘটনার একটা বড় অংশও তো নেতার মনের মধ্যে। বরঞ্চ সেটির সম্পূর্ণতার আভাস তাঁরই চিত্তে রয়েছে। এটি অ-সামান্য ঘটনা, কেননা সব চিত্তে তো সেটি প্রতিফলিত হয় না, এমনি স্বরূপে, এমনি পূর্ণতার আভাস নিয়ে। আর এটাই সর্বোত্তম আশ্চর্য। এক বিচিত্র আর ব্যাপক জিনিসের সঙ্গে যে নেতৃত্ব জড়িয়ে রয়েছে, যাদের ওপর তা দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাদের সব কিছু থেকে তা স্বতন্ত্র, তার বিশ্বত্বের মধ্যেই তার একত্ব। সে এত বেশি গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার মতো অনৃণী নেই। সব থেকে বেশি গ্রহণ করে তারও বেশি সে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভূমার দিকে সে প্রসারিত, আর ভূমাকে সে প্রসারিত করছে।

অধ্যায় ২৬

এ্যাকশন কমিটির আশ্রয়দাতা এবং গৃহরক্ষক করালী বারই গরমে ছটফট করতে করতে শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর ঘরের পেছন দিকের ঘুলঘুলির মতো ছোট জানালা দিয়ে এক ঝলক তীক্ষ্ণ রোদ এসে পড়তেই চোখের পাতা দুটো নড়ে নড়ে উঠতে লাগল, একবার ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকালও সে, কিন্তু তার পরে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বেঁটে-খাটো, অপুষ্টদেহ করালী বারইয়ের

মুখের চেহারা এমনিতে ভাবলেশহীন, কিন্তু এখন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। ঈষৎ পুরু ঠোঁট দুটো ক্লান্তিতে একটুখানি ফাঁক হয়ে উঠেছে, রাত্রিতে মুখে আর ঘাড়ে ঘাম চুইয়ে পড়েছিল, এখন চটচটে হয়ে রয়েছে। কপালের ওপর একটা শিরা ফুলে উঠেছে, ভুরু দুটো কোঁচকানো। ঠিক এইটের দিকেই তাকালে মনে হয় লোকটার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা রয়েছে, যেটা কেউ কোনো দিন বোঝে নি। আশ্চর্য এই, লোকটাকে সবাই দেখেছে, কিন্তু ওর মুখে কিছু নেই বলে ওকে দেখেও দেখে না, ভুলে যায়। এ্যাকশন কমিটির অফিসেই ও থাকে, সব মীটিংয়েই বসে থাকে কোণায়, কিন্তু ও যেন একটা চেয়ার বা টেবিল, তার দিকে চোখ পড়ে লক্ষ্য করে না। কেবল সেদিনের মীটিংএ শিবলালের ওপর নিদারুণ মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মনোতোষবাবু যখন আক্রমণ করলেন, তখন একবার প্রতিবাদ করেছিল ও। সবাই চমকে উঠেছিল, তারপর যথারীতি ভুলে গেছে। কিন্তু ওর ওই শিরা-ওঠা কপাল আর কোঁচকানো ভুরু দেখিয়ে দিতে ভোলে না যে তারও একটা কিছু আছে, যার জন্য কামনা প্রতি মানুষের, যা দুর্লভ কিন্তু প্রতি মানুষকে যা চরম সার্থকতা দেয়।

কাল বিকেলে একটা মীটিং হয়ে গেছে এ্যাকশন কমিটির। আর সেটাও আবার একটা মীটিং! শিবলালবাবু নেই, ইসমাইল সাহেব নেই—প্রচণ্ড ঝড়ের পরে ভাঙা ছেঁড়া ডাল-পাতার যেন অর্থহীন মাথা নাড়া। এই এ্যাকশন কমিটির মীটিংয়েই কত জোর তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে, বক্তাদের আত্ম-বিশ্বাস, ক্ষোভ, সংগ্রামী মনোভাব আলোড়ন তুলেছে, আছড়ে পড়েছে। আর গতকালকার মীটিংএ কেবল মনোতোষবাবু ভাঙা-ভাঙা স্বরে কী বললেন কতক্ষণ ধরে। তারপর কলকাতা চলে গিয়েছেন। সেই মীটিং শেষ হবার পর করালী আর বেরোয় নি ঘর থেকে। সভ্যরা বেরিয়ে গেলেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। কী হবে বেরিয়ে? দরজা খুললেই অসংখ্য লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হবে আর হাজারটা প্রশ্ন সঙ্গীনের মতো উঁচু হয়ে আসবে: 'কী হল?·· হল না?···কেন?' যদি সত্যিই একটা উত্তর থাকত, তাহলে কত সহজে ওদের সামনে দাঁড়ানো যেত! কিন্তু ওরই সাথীদের, শ্রমিকদের নৈরাশ্য, তাদের বিভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি সইতে পারে না করালী। এই অসহ্য গরমে কে-টাইপ কোয়ার্টারের অন্ধকূপের মধ্যেই ছটফট করেছে ও। ঘুমোবার ইচ্ছেও ছিল না ওর, কিন্তু শেষ রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল ও তা জানত না।

মানুষের মন আশ্চর্য ধাতুতে গড়া। এই যন্ত্রণার মধ্যেও একটা সুন্দর স্বপ্ন

দেখছিল করালী। বিশ বছর আগে যে ছেলে আর স্ত্রীকে হারিয়েছিল ও, তারাই আবার ফিরে এসেছিল ওর কাছে। খাঁদাটা একটু বড়-সড় হয়েছে, শুধু তাই নয়, বাবুদের ছেলেদের মতো ভালো-ভালো জামা-কাপড় পরে দিব্যি ছটফট করে বেড়াচ্ছে। স্ত্রী নারাণীকে বরঞ্চ খানিকটা রোগা আর কেমন বিষণ্ণ (সমস্ত ব্যাপারটা ও দেখছিল যেন স্ত্রী কিছুদিন বাপের বাড়িতে থেকে ফিরে এসেছে) দেখাচ্ছিল। কিন্তু এ্যাকশন কমিটির ব্যাপার-স্যাপার দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল ও। 'ও মা, ই সব কি করেছ তুমি···' বারবার করে বলতে লাগল ও, আর এ্যাকশন কমিটির সভ্যদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কি সব কথা বলতে লাগল, ঠিক বাবুদের বিবিরা অন্য পুরুষের সঙ্গে যেমন করে কথা বলে। করালীও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও ভাবলে, নারাণীর সামনে ওর কিছু করা দরকার। ও তখন মনোতোষবাবুর চেয়ারে বসে ঠিক তাঁর মতো কখনো হেলান দিয়ে, কখনো টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে সভাপতি হয়ে সভার কার্য পরিচালনা করতে লাগল। শংকরী মুখার্জী তার বাঁ-দিকে টেবিলের ধারে বসে টাইপ করছিল। খাঁদা একজন সভ্য হয়ে অন্যদের মাঝখানে বসে তার বক্তৃতা শুনতে লাগল। করালী নির্দেশ দিলে, এ্যাকশন কমিটিকে এখনই রেজেস্ট্রী করতে হবে এবং জি-এম'এর প্রস্তাব সব মেনে নেওয়া হবে। হঠাৎ ওর খেয়াল হল ওর ঘাড়ে চাদরটা নেই এবং নারাণীকে বাক্স থেকে চাদরটা বের করে দিতে বললে।

'করালী, এ করালী···' হঠাৎ চমকে উঠল করালী বারই, দরজায় কে ধাক্কা মেরেছে। করালী তাড়াতাড়ি করে একজন সভ্যকে বললে উঠে গিয়ে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখের পাতা খুলে গেল ওর এবং ধড়মড় করে উঠে পড়ল করালী। জেগে উঠে প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারল না ও, তারপর বুঝলে সত্যিই দরজার বাইরে উদ্বিগ্ন, ভীত স্বরে কারা ওকে কেবলই ডেকে চলেছে, 'করালী, করালী বারই···এ করালী···'

আতংকে, উত্তেজনায় ওর বুকে সজোরে আঘাত করলে যেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠোন পেরিয়ে এসে দরজা খুলল করালী বারই। রামবিলাস মিশির আর অন্য কয়েকজন প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে। রামবিলাস বোধ হয় ঘুম থেকে সোজা উঠে এসেছে। খালি গা, বিস্রস্ত ধুতিটা কোমরে সেঁটে পরবার মতো সময়ও হয় নি। বাঁ হাতে করে তলপেটের নিচে চেপে ধরেছে। ও কাঁপা-কাঁপা গলায় বলছিল, 'করালী বাবু, এ্যাকশন কমিটিকা সবকো গিরেফতার কর্ লৈ গিয়া, রাতমেঁ···'

আর একজন বললে, 'বড় বড় নেতা সবাইকে নিয়ে গেছে। সমীরবাবু, ইসমাইল, সব…'

করালী বাইরে চৌকাঠ ডিঙিয়ে আসতে আসতে বললে, 'বল কি…কখন নিয়ে গেল…সবাইকে নিয়ে গেছে?'

উত্তেজনায়, ভয়ে আর আক্রোশে রামবিলাস মিশিরের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। ও কর্কশ স্বরে বললে, 'নেহী', দশ আদমীকো গিরেফ্‌তার কিয়া, ফিন্ আউর সব কোইকো গিরেফ্‌তার করতা হ্যায়··'

একজন ঢোক গিলে বললে, 'হাঁ, সবাইকে গ্রেপ্তার করবে। কারখানার ভেতরে শুদ্ধ পুলিশ ঢুকে গেছে!'

সমস্ত অবস্থাটা বুঝবার মতো ক্ষমতা ছিল না করালীর, কিন্তু যন্ত্রবৎ বাইরে চত্বরের ওপর এসে পড়ল ও। বনের ভেতর থেকে সন্ত্রস্ত খরগোস যেমন লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে, তেমনি আতংকগ্রস্ত মানুষ বেরিয়ে আসছিল। চত্বরের ও প্রান্তে রাস্তা পেরিয়ে 'মিলনী' রেস্তোরাঁ, ভিড় করে মানুষগুলি সেদিকে ছুটতে লাগল। হঠাৎ একটা সিপাহী ভর্তি লরী তীক্ষ্ণ হর্ন দিয়ে ভিড়ের মধ্যে হুড়মুড় করে এসে পড়ল যেন। লোকগুলো এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ল, আর লরীটা পুরানা হাটের ভেতর দিকে চলে গেল। কে জানে কিসের জন্য যাচ্ছে কিন্তু বিমূঢ় জনতার কাছে এটা খুবই অর্থপূর্ণ বলে মনে হ'ল।

করালী ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল। 'মিলনী'-তে তখনও জল গরম করবার জন্যে আঁচ দেওয়া হয় নি! সেজন্য কারও কোনও আগ্রহ আছে বলে মনে হল না। সকলেই কোনো একটা আসন্ন ঘটনার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। ছোট ছেলেদেরকে মারবার জন্য হাত ওঠালে তাদের চোখে মুখে যেমন একটা ভীতি তরতর করতে থাকে, এদেরও অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে উঠেছিল। করালী কয়েক জনকে অবস্থাটা সম্পর্কে শুধালে, কিন্তু দু'একটা অসংলগ্ন কথা ছাড়া কেউ কিছু বলতে পারল না। কেউ কেউ কথা বলতে না বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল আর দূরের দিকে তাকাতে লাগল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটত বলা যায় না কিন্তু কে একজন বলে উঠল, 'আমরা কি এমনি কাপুরুষ যে আমাদের নেতাদের আমরা ছিনিয়ে নিতে পারব না? ভাই সব, চলো, এস-ডি-ও'র বাংলো থেকে নেতাদের ছিনিয়ে আনি…'

কেউ যেন এতগুলো লোকের গালে থাপ্পড় দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে একটুখানি, কথা বেরোতে গিয়ে আটকে গেছে। ঠিক

এমনি সময় দূরে কারখানার দিকে কিসের একটা গোলমাল উঠল : একদল লোক উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে চলেছে। বোঝা গেল না এই গোলমাল কিসের। একটানা, বিশৃংখল, একাকার হয়ে যাওয়া, তালগোল পাকানো।

সেই কণ্ঠস্বর এদিক থেকে আবার ধাক্কা মারল, 'ভাই সব, জুনাপুরের সমস্ত মজদুর তাদের প্রিয় নেতাদের ছিনিয়ে আনতে যাচ্ছে, আমরা কি পিছিয়ে পড়ে থাকব? চল, আমরা এগিয়ে যাই। বলিয়ে, বন্দে···'

'মাতরম্···' একটা দমকা আওয়াজ শুকনো পাতার মতো ওদের ছিটকে দিলে যেন। ওরা গাঁকগাঁক করতে করতে রাস্তায় এসে পড়ল।

তার আগেই করালী বারই ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। করালী মানুষটি কম কথা বলে, তার বুদ্ধিও স্থির, সহজে উত্তেজিত হয় না। কিন্তু তাকেই দেখা গেল যেন রাস্তার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র ও কিসের জন্যে একটা প্রত্যাশা আর উত্তেজনা লক্ষ্য করতে লাগল। রাস্তায় লোকজন যাচ্ছে, আসছে। রোজকার যা কাজ সম্ভবত তারই জন্য। করালীর সামনে গেঞ্জি আর পায়জামা পরা লোকটি ব্যাগ হাতে করে বাজারে যাচ্ছে, কিন্তু কেমন গোঁ-ভরে হাঁটছে ও। রাস্তার দু'পাশে দোকানদানি খুলেছে, কিন্তু সব ক'টা দোকানই ফাঁকা। সব কেমন থমকে রয়েছে। তবুও যে দু'একটা কাজ হচ্ছে তা যেন অতি সন্তর্পণে। একটা ছোট্ট মেয়ে দোকানে কি কিনতে এসেছিল, মোড়কটা ফ্রকের আঁচলে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

দেখতে দেখতে করালী 'নারায়ণ কেবিন'-এর সামনে চলে এসেছিল। একবার ভাবলে ভেতরে গিয়ে একটু বসবে। কিন্তু কিছুক্ষণ বসে থাকার মতো মনের অবস্থা ওর ছিল না। কেবিনটা পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল ওকে। পুকার স্ট্রীট থেকে একটা শোভাযাত্রা স্টেশন রোডে এসে পড়েছে। ছোট্ট শোভাযাত্রাটি, জনা বারো তেরোর বেশি হবে না। সামনের লোকটি হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে এগোচ্ছে। ওরা ধ্বনি দিচ্ছে, 'বন্দে-মাতরম্', 'ইনকিলাব-জিন্দাবাদ,' 'নেতাদের এ্যারেস্ট্ করা চলবে না!'

করালী যেখানটায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেখানে আরো কয়েকজন জটলা পাকাচ্ছিল। ঠিক ওদের সামনেই একটা ঘটনা ঘটল। কেউ লক্ষ্য করে নি, একটা ছেলে শোভাযাত্রার পাশে-পাশে এগোচ্ছিল। শোভাযাত্রীদের লাইন থেকে একজন লোক সহসা লাফ দিয়ে এসে ছেলেটাকে পাকড়ে ধরলে। কয়েকটা থাপ্পড় দিয়ে সে চেঁচাতে লাগল, 'অমুকের বাচ্চা, বাঁদর···ফের যদি এসবি ত

লাথ মেরে পেট ফাটি' দুব···'। বাঘের কবলে শিকারের মতো ছেলেটা ওর বাঁ-হাতের থেকে ঝুলতে লাগল। ককিয়ে বলতে লাগল, 'বাবা গো, ছেড়ে দাও, আমি আর তুমার সঙ্গে যাব নাই গো···'। লোকটি পকেট থেকে কয়েক আনা পয়সা বের করে দিয়ে বললে, 'যা, বাজার করে নিয়ে ঘর যা···ভাগ!' বলে ও দৌড়ে গিয়ে আবার শোভাযাত্রায় যোগ দিলে। ছেলেটা মার খেয়ে একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল, থরথর করে কাঁপছিল ও, একটু পরেই ওর মুখের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বাঁ-হাতের তেলোয় চোখের জল মুছতে মুছতে, ফুলতে ফুলতে চেঁচাতে লাগল ও, 'হনুমান, শুয়ারের বাচ্চা, আমাকে মারছে···আর নিজে যাচ্ছে কেনে···নিজের বেলা দোষ নাই, আর আম্মাকে মারছে। শালা এমন মেরেছে, ছিঁচে দিয়েছে একবারে। আমি যাব, দেখি··· ইবারে মারতে এলে ইট মেড়ে কানা করে দিব, হুঁ···' বলে ফুলতে ফুলতে আবার এগোল ও।

আরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল করালী বারুই, তারপর যেন ভেতর থেকে ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে গেল। কারখানার যতই কাছাকাছি হল করালী, ততই ব্যাপারটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওর বুঝতে দেরি হল না যে, মনোতোষ বাবুর খেলা শুরু হয়েছে এবং অনেকগুলি নিরীহ লোককে প্রাণ হারাতে হবে।

কারখানার গেটে লোকজন ঢুকছে কিন্তু বেরিয়ে আসছে তারও বেশি। কয়েক জনকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছিল করালী, এমন সময় ওর নাম ধরে কে ডাকলে। সামনে তাকাতে গিয়ে একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ওর, ও সরে গিয়ে রেলিঙ ঘেঁসে দাঁড়াল। তারপর পথ করে করে সুখনের কাছে এগিয়ে গেল ও। সুখনই ওকে ডেকেছিল। সুখনের মুখখানা শুকনো, কিন্তু একটা ক্ষীণ, বশংবদ হাসি তখনও লক্ষ্য করা যায়। সুখন কিছু বলার আগে উদ্বিগ্ন স্বরে করালী বললে, 'আপ ক্যা সমঝতে হ্যায়? জুলুসমেঁ আপ যায়গা?'

সুখন এই রকম প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ও বিস্মিত হয়ে বললে, 'কেঁও, কেঁও নহীঁ যায়গা? জরুর···'

করালী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ! আপ দেখতা নহীঁ কি, এ দুশমনকা কাম হোতা হায়?'

সুখন আরও বিস্মিত হল, কিন্তু ও মৃদু হেসে বললে, 'বলেন কি করালীবাবু, এ শয়তানকা কাম আছে! লেকিন আছে তো আচ্ছা আছে। আমার নেতাদের শয়তানকা হাথসে ছিনা লেগা নহীঁ?'

ওরা এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছিল না, ঠেলা খেয়ে খেয়ে কারখানার ভেতর দিকে এগোচ্ছিল। ভেতরে গোলমাল আর বিশৃংখলা আরও বেশি। ছোট ছোট দলে সবাই ছড়িয়ে পড়ছে, কে কোন দিকে যাচ্ছে ঠিক নেই। একটা বিপরীতমুখী দলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল ওরা, সেই দলটা পেরিয়েই করালী সুখনের দিকে তাকিয়ে ভাঙা-ভাঙা কিন্তু ঈষৎ উদ্দীপ্ত স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, আপ ঠিক বোলা হ্যায়!' কিন্তু ঠিক একই সঙ্গে সতর্ক, সংশয়ী দৃষ্টিতে লোকগুলোর দিকে তাকাতে লাগল।

অধ্যায় ২৭

সুখন কিন্তু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল করালীর দিকে। সে যে এত তাড়াতাড়ি ওর কথাটা মেনে নিলে তাতেই ও কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। তাছাড়া, আরও একটা কারণ ছিল। দেশের থেকে ওর ভাইয়ের সম্বন্ধে একটা চিঠি পেয়েছে ও, সেইটে করালীকে দেখাতে চায়, কিন্তু পাছে সে কিছু ভাবে সেই জন্য দেখাতেও পারছে না। বুক পকেট থেকে উঁচু হয়ে-ওঠা পোস্টকার্ড খানার দিকে একরকম দৃষ্টিতে তাকাল ও, বাঁ-কপালের কাটা দাগটার নিচে ভুরুটা কুঁচকে উঠল অদ্ভুতভাবে। কার্ডখানা বের করল না ও কিন্তু বলে উঠল, 'হামারা একঠো চিঠ্ঠি আছে···হামারা ভাইকে বারেমে···কিসীকো পাস···'

'চিঠি, কিসের চিঠি?' করালী বললে ওকে, কিন্তু কারখানার ভেতরে তখন চলে এসেছিল ওরা। চলতে চলতে ঘোলাটে অথচ উৎসুক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাচ্ছিল ও, সুখনের কথাগুলো ভুলে গেল।

সুখন সেটা বুঝতে পারল, কিন্তু ক্ষুব্ধ না হয়ে বরঞ্চ ওর মুখখানা প্রসন্ন, মসৃণ হয়ে উঠল। ভালোই হল যে নিজের কথাটা আর ওকে বলতে হবে না। তখন ওর নিজের মনেই যে একটা আলো জ্বলে উঠেছিল, সেটার দিকে ওর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে যেন। ওর ছোটা ভাই বাহাদুর এত দিন পরে একটা নোকরী জোগাড় করতে পেরেছে। গ্রামের মিশিরজীর কৃপায় বোম্বাই চলে গেছে সে, সেখানে দড়ির কারখানায় কাজ করবে। যার সঙ্গে গেছে, সে বলেছে যদি দড়ির কারখানায় অসুবিধে হয়, তাহলে কাপড়ের কলে ঢুকিয়ে দেবে। কোনো ভাবনা নেই। মিশিরজী নিজে এই সব কথা তাকে ভালো করে বুঝিয়ে চিঠি দিয়েছেন। আঃ, কত সুখী সে আজ!

ভিড় ঠেলে করালীর সঙ্গে এগোতে এগোতে ওকে একটা অদ্ভুত চেতনায় পেয়ে বসল। রাস্তায়, আর কারখানায় এত উত্তেজনা, উৎসাহ, ক্ষোভ আর বিভ্রান্তি—একদিকে তার উত্তাপ গায়ে লাগল না তা নয়, সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে ও—কিন্তু অন্যদিকে ভাইটার কথা, বিহারের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার উত্তরে নিজের সেই ছোট্ট গ্রামটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল ও। কত দিন গ্রামে যায় নি সুখন। বাহাদুর চলে যাবার আগে যদি একবার গ্রামে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারত!

'সরে যাও··· আঃ, সরে যাও না···।' স্টীল এলাকা থেকে এক দল মজুর দ্রুত গতিতে এদিকে আসছিল, জোয়ারের ঢেউ যেমন করে তীরের উপর আছড়ে পড়ে সরে যায়, তেমনি হুড়মুড় করে চলে গেল ওরা। পথ করে দিতে গিয়ে করালীর থেকে তফাৎ হয়ে গেল সুখন। আবার তার কাছাকাছি হতে গিয়ে ও ভাবলে: শিববাবু এখন কোথায়? কোথায় চলে গেছেন তিনি? এই সময় তাঁর দেখা পেলে ভাইটার কথা বলতে পারত ও। কত খুশি হতেন তিনি।

'আপ সুনিয়ে, ভাই···' করালী হঠাৎ ধাবমান একজনকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলে। 'আপ কাঁহা যাতে হ্যায়?'

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বাধা পাওয়াতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। 'আঃ, তুম জানতা নেহী? জি-এম'এর অফিস ঘেরাও হবে···' কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ও।

করালী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, এমনি একটা তাচ্ছিল্যের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না ও। কিন্তু সুখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ও যেন বলতে চাইলে, 'দেখিয়ে তো, সব মানুষ কী চায়···তারা কী করতে যাচ্ছে?' কিন্তু হঠাৎ ও একটা কাণ্ড করে বসল। ঠিক করালীর মতই একজনকে থামিয়ে ও একই প্রশ্ন করলে। যাকে জিজ্ঞেস করলে, তার ছোকরা বয়েস, চেহারা আর পোশাকে ছিমছাম। সে তেমনি ধীরভাবে উত্তর দিতে আরম্ভ করল, 'দেখুন, ব্যাপার কি সমস্তটা আমরা বলতে পারব না। নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখতে পাচ্ছি। আপনারাও তা দেখছেন। এখন কারখানার বাইরে যাচ্ছি আমরা, দরকার হলে নেতাদের মুক্তি দাবী করে একটা ডেমনস্ট্রেশন দেব···'

ছোকরাটি একটু অপেক্ষা করে রইল, যেন সুখন আরও প্রশ্ন করবে এবং সে ব্যাপারটা আরো বিশদ করে বলবে। কিন্তু সুখনের দৃষ্টি তখন করালী বারইয়ের

মুখের ওপর নিবদ্ধ। ওর ভাবটা এই, যেন জিজ্ঞেস করছে, 'ক্যা, আপ ইসীকো ক্যা বোলতা হ্যায়? এ শয়তানকা বাত হ্যায়?'

করালী কিন্তু নীরব, অন্যমনস্ক। ওর মধ্যে একটা বোঝা-পড়া চলছিল, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই। ভাবছিল, এই যে এত মানুষ ছুটে চলেছে, এর সবটাই শয়তানের খেলা নয়। আর কোন অর্থ আছে এর। এত উৎসাহ মানুষের মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। হঠাৎ কী একটা শব্দে সচেতন হয়ে উঠল ও আর সুখনের হাত ধরে সামনে খুব উঁচুতে আঙুল বাড়িয়ে দেখাতে লাগল। উত্তেজনায় ওর আঙুলগুলো কাঁপছিল। কোক-ভাটার বাংকারের ওপর একদল লোক উঠে গিয়ে চারদিক দেখছে। দেড়শো ফুটেরও বেশি উঁচু এই বাংকারের ওপর মজুরগুলিকে মনে হচ্ছিল পুতুলের মতো। যেন বাংকারের রেলিঙে ঠেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ওদের, আর ওরা হাত-পা নাড়ছে।

করালী সুখনকে টেনে নিয়ে এগোতে লাগল। তাড়াতাড়িতে, আর এই যে একটা আবেগ অনুভব করল ও, সেজন্য তার কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারছিল না। ও বলতে চাইছিল, এতক্ষণ কোক-ভাটার বাংকারের কথা ওদের মনে হয় নি কেন? ওখানে গেলেই তো সব কিছু বোঝা যেতে পারে।

সাত নম্বর ব্যাটারির সেলারের মধ্যে পৌঁছাল ওরা। ঠিক সেইমাত্র লিফট্-ম্যান বোতাম টিপে ওপরে যাচ্ছিল, করালীকে দেখে নেমে এল। জিজ্ঞেস করল, 'আইয়ে করালীবাবু, উপ্পর যাইয়েগা?'

কোনো উত্তর না দিয়ে করালী লিফ্টের ভেতর এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আলোর থেকে অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা। বাইরের এতক্ষণকার কোলাহল, কারখানার যান্ত্রিক আর্তনাদ এখানে নিস্তব্ধ। কেবল লিফ্ট্ ওঠার একটা কীর্‌র্‌র্ শব্দ হতে থাকে। কিন্তু ভেতরে তেমনি একটা অসহ্য আবেগ ফুলে ওঠে। করালীর বুকের ভেতরটা টিপটিপ করে।

'যাইয়ে···' সুইচ টিপে দরজা খুলে দিয়ে লিফ্ট্ম্যান সরে দাঁড়াল। বাংকারের ওপর এসে পড়েছিল ওরা।

সাত নম্বর ব্যাটারীর এই বাংকারের ওপর থেকে সমস্ত জুনাপুরটা মুহূর্তে চোখের ওপর ভেসে ওঠে। খুব একটা বড় দিগন্ত: কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। জুনাপুর-আরানসোলের শিল্পাঞ্চলের আকাশ সব সময়ই ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন, তার ওপর জুন মাসের গরম। এখনো দশটা পেরোয় নি, এরই মধ্যে কঠিন মাটি থেকে উত্তাপ হিলহিল করে উঠছে। তাতে চোখ ঝলসে দেয়, ভালো করে দেখতে

দেয় না। উত্তর-পূর্ব কোণে আরানসোলের মাথায় ধোঁয়া জড়িয়ে রয়েছে। নিচে অতি-নিচু আর অতি-উঁচু কারখানা আর বাড়ি-ঘরের চেহারা বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের দেখা জিনিসের মতো ঝাপসা, কেবল আকাশ-ফোঁড়া চিমনিগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জুনাচণ্ডী পাহাড়ও মেঘের মতো ঝাপসা, আকাশ-লগ্ন। কালো ঢেউএর মতো চলে গিয়েছে। তার মধ্যে শাদা প্রকাণ্ড পাথরগুলো পাহাড়ের বুকে রোদ লেগে দপদপ করছে। অন্ধকারে শাদা দাঁত বের করা বিদ-ঘুটে হাসির মতো। কারখানার কাছাকাছি এদিকে সাউথ টাউন, ঝলসানো কুঞ্জবনের মতো তার চেহারা। নির্জন, লম্বা পথগুলিতে কখনও ট্যাক্সি, কখনও সাইকেল বয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে ওখানে পথচারীর যাতায়াত চলছে।

নিচে পুব দিকে চোখ রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মজদুরগুলি। যেখানে কারখানার এলাকা শেষ হয়েছে, তার পরে জুনাপুর স্টেশন ছুঁয়ে রেল লাইনের অত্যুজ্জ্বল দু'টি রেখা চলে গিয়েছে আরানসোলের দিকে। তারপরই পথচারী আর ট্রাফিকের জন্য পীচ-ঢালা রাস্তা, ওপর দিয়ে একটা শোভাযাত্রা এগোচ্ছে। কয়েকটা পতাকা জড়াজড়ি করে বেঁধেছে, কেবল কম্যুনিস্ট পার্টির রক্তবর্ণ পতাকা আর রাষ্ট্রীয় পতাকাই চেনা যায়। তাছাড়াও পেছনে আছে পোস্টার।

এই শোভাযাত্রার মুখটাই চেনা যায়, সূচীমুখের মতো তা এগিয়ে চলেছে আস্তে আস্তে। সামনেই রেল লাইনের উঁচু বাঁধ, এই বাঁধ পেরিয়ে এগিয়ে যাবে আরানসোলের দিকে। কিন্তু শোভাযাত্রার মূল কোথায় তা বোঝা যায় না। কেবল একটানা অনেকদূর পর্যন্ত বিছিয়ে রয়েছে তাই নয়, ছোট ছোট শোভাযাত্রা এসে মূল স্রোতকে পুষ্ট করছে। পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত এমনি আসতে দেখা যায়। ক্লাব রোড, স্টেশন রোড, পুরাণা হাট আর এদিকে কারখানা— সর্বত্র ভিড় করে লোকজন আসছে। বিভিন্ন দল, কোনো দল খুব জোরে হাঁটছে, যেটা এগিয়ে ছিল সেটা পিছিয়ে পড়ছে, পেছনেরটা সামনে এগিয়ে আসছে। একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটো দল কখনও এগোতে থাকে। এক এক জায়গায় পথচারী-দর্শক আর শোভাযাত্রীর মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় না। যতদূর দৃষ্টি যায়, কোনো একটা লোককে উল্টো মুখে ফিরতে দেখা গেল না। মোড়ের মাথায়, দোকানের ঝাঁপের নিচে থেকে, বস্তি থেকে কেবলই লোক বেরিয়ে আসছে। এর আর শেষ নেই।

জুনাপুর-আরানসোলের বিস্তৃত দিগ্বলয়ের মধ্যে এই মানুষগুলির পদক্ষেপ আপাতত কত সামান্য মনে হয়। দক্ষিণ-পূর্বের ঝাপসা জুনাচণ্ডী পাহাড়, উত্তর-

পূর্বের শিল্প-শহর আরানসোল, পশ্চিমের রুক্ষ, ঢেউ-খেলানো প্রকৃতি, তারপর ঠিক জুনাপুরের ওপরই এই যান্ত্রিক বিস্তৃতি,—এই পটভূমির ওপর সারি-সারি ছোট-ছোট মানুষগুলি এগিয়ে চলেছে। এত দুর্লঙ্ঘ্য, এত কঠিন আর উদাসীনকে ওরা নড়িয়ে দিতে চায়, ভেঙে ফেলে আবার গড়ে তুলতে চায়। ওরা এত ক্ষুদ্র বলেই, এত কঠিনের বিরুদ্ধে ওদের সংগ্রাম এত সুন্দর। মানুষ এত দুর্বল, তাই জুনাপুর-আরানসোলের নিরাসক্ত, কঠিন পটভূমির ওপর ওদের এমনি সাহসের আভাস। ওরা বাইরে যা, ওরা আসলে তারও বড় বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

যদি জুনাপুর আরানসোল পটভূমির এই পর্দাটুকু মুহূর্তকালের জন্য সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে ওরা চিরকাল এমনি করেই আসছে। ওরা প্রতিকূল প্রকৃতিকে বদলে দিতে চায়, সেই সঙ্গে নিজেদেরও। সেই পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে ওরা ইতিহাস গড়ে তুলছে, সেটাই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। কখনও নিজেদের গড়া ইতিহাসই ওদেরকে ঢাকা দিয়ে ফেলেছে, তখন ইতিহাসকে ভেঙে ফেলবার জন্য আবার আসতে হয়েছে ওদের। আপনাকে বদলাবার জন্য আপনার ওপরই কম ক্রোধ নয় ওদের। আপনারই কণ্ঠ রোধ করেছে কখনো কখনো, আত্মঘাতে সব লণ্ডভণ্ড করেছে, আবার তার মধ্য থেকে এসেছে বেরিয়ে।

করালী বারই রেলিঙ ধরে সামনে তখনও ঝুঁকে ছিল। সুখন ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, 'করালীবাবু, আইয়ে, হাম উতার যায়গা···'। করালী মুখ ফেরাল না, আগ্রহে-আবেগে রুদ্ধস্বরে ও বললে, 'সুখন, ভাইয়া, দেখিয়ে তো, উনি···ঐ মানুষটো কে···ঐ যে বাঁধের উপর···'

'কাঁহা···কৌন্ হ্যায়···হাম দেখেগা ···' বলে সুখনও ঝুঁকে পড়ল। একটু পরেই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সুখন, 'আরে, এতো ইসমাইল সাহেব আছেন। হাঁ, জরুর···'

করালী তখনও সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। যেন অনুনয় করছে এমনি ভাবে বললে, 'দেখুন, ভালো করে দেখুন···'

রেল লাইনের বাঁধের ওপর ইসমাইল আস্তে আস্তে উঠে এলেন। বাঁ-পাটা রেলের ওপর তুলে দিয়ে দাঁড়ালেন উনি। কত ছোট, ঠিক একটা ছোট ছেলের মতো দেখাচ্ছে। ওঁর মুখ দেখা যায় না, এদিকে পেছন ফিরে আছেন। কিন্তু ওঁর সেলুলয়েডের ভারী ফ্রেমের চশমা দেখেই বোঝা যায় এই মুখের আভাস আর কারুরই নয়। ডান বগলে ওঁর পোর্টফোলিও ব্যাগটা চেপে ধরেছেন আর

বাঁ-হাতের আঙুলে সিগারেট। সেই সিগারেট শুদ্ধ হাতখানা নেড়ে নেড়ে শোভাযাত্রীদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন।

করালী আর সুখনের সঙ্গে আর যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সহসা উল্লাসে গর্জন করে উঠল। আওয়াজ দিয়ে উঠল, 'সেখ ইসমাইল, জিন্দাবাদ!' 'এ্যাকশন কমিটি, জিন্দাবাদ!' 'ইনকিলাব...'। পাগলের মতো হাত ছুঁড়তে লাগল ওরা, কেউ কেউ সেখানেই নাচতে আরম্ভ করল। একজনের টুপি নিয়ে আর একজন লোফালুফি করছিল, হঠাৎ ফসকে গিয়ে পড়ল নিচে। কয়েকজন লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়াল লিফ্টে, কয়েকজন বাংকারের ভেতরকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল। এতটা পথ ওরা সিঁড়ি বেয়েই নামতে চায়।

করালী বারই সুখনকে কোলাকুলি করে বুকে চেপে ধরেছিল। জল ভরে এসেছে ওর চোখে, অস্ফুটে বললে, 'আইয়ে, জুলুসমেঁ যাইয়েগা নহীঁ?' সুখনের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, 'চলিয়ে...'। করালী আপন মনে বললে, 'হামারা নেতা হামরা সাথ হায়...হামারা নেতা আ গিয়া...হামারা নেতা...'। লিফ্টে জায়গা হল না, দেরি করাও সম্ভব নয়, ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল।

অধ্যায় ২৮

জুনাপুর বাস স্ট্যাণ্ডের একটু দূরে একটা অশ্বত্থ গাছ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। তার নিচে গোটা দুই গুমটি, পান-বিড়ি বিক্রী হয় সেগুলোতে। গোলমালের আশংকা করে গুম্‌টিওয়ালা দু'জন ঝাঁপ বন্ধ করে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ কেউ গুমটির অনিষ্ট করতে পারে, সেই জন্যে একেবারে চলে যেতে পারছে না। কে বলবে যে মানুষ দুটো যাদের ভয় করছে তাদের মধ্যেই এক সময় গিয়ে পড়বে না।

ওরা যা আশংকা করছিল তাই বুঝি হতে চলল। জুলুস থেকে হঠাৎ একজন বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে গুমটির সামনেকার মাচার ওপর উঠল। আধা-বাঁশের মাচাটা মড়মড় করে উঠল। ও ডান হাত ছুঁড়ে দিয়ে ফুলেওঠা কণ্ঠস্বরে চেঁচাল, 'বলিয়ে, ইনকিলাব ...'। ওর আগে, পেছনে, সামনে একঝাঁক মুষ্টি শূন্যে আঘাত করল। শৌখিন নয়, বজ্রপাতের মতো আওয়াজ উঠল, 'জিন্দাবাদ...'। এক-ঝাঁক কাক আর শালিখ আর্তনাদ করে আকাশে ছিটকে পড়ল। গাছের মাথার

ওপর কয়েকটা পাক দিয়ে নেমে এল বসবার জন্যে, তখন আবার আওয়াজ উঠল, ওগুলোকে আর এক দফা ছিটকে দিলে। পাখির আর মানুষের স্বর একসঙ্গে মিশে গেল।

যে লোকটি মাচার ওপর লাফিয়ে উঠেছিল, তার খাকি শার্ট আর হাঁটুর ওপরকার প্যাণ্ট ঘামে ভিজে গিয়েছিল। একটু আগে চুলগুলো বশ মানছিল না, এখন কপালের ওপর লেপটে রয়েছে। চোখের পাতা, নাক আর গলা বয়ে কেবলই ঘাম ঝরে পড়ছে। ওর আওয়াজ দেবার রকমও বদলে গেল তারপর। হাঁটুদুটো ভেঙে নুয়ে পড়ল, তারপর এমনভাবে লাফিয়ে উঠতে লাগল ও, যেন দেহটাকেই ও শূন্যে উড়িয়ে দেবে। ফোলানো কণ্ঠস্বরে ও যখন গিরগির করে আওয়াজ দিতে লাগল, তখন মনে হল এটা একটা সঙ্কেত : যে বাধাটাকে ও উড়িয়ে ফেলতে চায়, নিজেকে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গী করে তারই একটা রূপ সৃষ্টি করে তুলছে।

'নেতাদের এ্যারেস্ট করা···চলবে না, চলবে না···'

দুর্ধর্ষ শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে এদের হাত উঠল, ইস্পাত-গড়া শক্ত পেশী শূন্যে দুলে উঠল, কঠিন-ভঙ্গিতে 'না' বলে দিলে, তারপর এগিয়ে গেল।

বাঁধ থেকে নেমে কিছু দূর গিয়েই একটা পুরাণো আমলের পাতকুয়া। আগে মজদুররা এটা পানীয় জলের জন্য ব্যবহার করত, এখন সেখানে ধোবীরা কাপড় কাচে। একটু দূর থেকে দেখা গেল, জনৈক মজদুর কুয়োর দেয়ালের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর উত্তেজিতভাবে কী বলছে। দল ভেঙে লোকজন ওখানে গিয়ে ভিড় করছে। একটু পরেই বোঝা গেল, মজদুরটি বালতিতে করে জল তুলে ধোবীদের রঙ-করা টবে ঢেলেছে, এখনো মাঝে মাঝে ঢালছে। ও চিৎকার করে বলছে, 'রুমাল ভিজাইয়া লন, ভাই সব, রুমাল ভিজাইয়া লন···যদি টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে, চক্ষুতে দিবেন! রুমাল ভিজাইয়া লন···'

রেল লাইনের বাঁধের এদিকে পার্বতীচরণ এগোচ্ছিল, এর পর ওকে বাঁধে উঠতে হবে। সেইটে হচ্ছে ওর ভাবনা। ও সবে রোগ থেকে উঠেছে, কেবল কাশছে, কিন্তু কিছুতেই থামবে না। বেরোবার সময় ওর ভাই দুখীরাম ওকে বাড়িতে থাকবার জন্য বলেছে অনেকবার, চূড়ান্ত অপমান করেছে, কিন্তু থামাতে পারে নি ওকে। ও কেবলই বলছিল, 'দুখী, তুই যাবি আর আমি হেথা পড়ে থাকব, কেন···'। দুখীরাম শেষ পর্যন্ত দাঁতে-দাঁতে ঘষে বলেছে, 'আয় তবে, মরবি যদি আয়। আমার সঙ্গে এলে তুই মরবি, মরবি, মরবি।' দুখীরামের সঙ্গে কত-

ক্ষণই বা আর তাল রাখতে পেরেছিল ও, একটু পরেই দুখীরাম ওকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গেল। যতক্ষণ দুখীরামকে দেখতে পাচ্ছিল, ততক্ষণ ওর উৎসাহের অভাব ছিল না, কিন্তু দুখীরাম চোখের আড়াল হওয়া মাত্র ও মুসড়ে পড়ল। একটু আগেই রেল লাইনের বাঁধের ওপারে আড়াল হয়ে গেছে দুখী। ওপারে ওরা কোথায় গেল, কতদূর গেল জানবার কিছু উপায় ছিল না। তখন ও মুসড়ে পড়ে নকুল পাণ্ডাকে ধরলে। নকুল এতক্ষণ ওকে ফিরে পাঠাবার জন্য নানা রকম করে বোঝাচ্ছিল, 'পার্বতী, শুন, তোমার দেহ খারাপ, তুমি ফিরে যাও। হ্যাদ্দ্যাখ, এক বাড়ি থেকে দু'জন যাওয়া ঠিক লয়…'। পার্বতীর সে কথায় কান ছিল না, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'দেখলি, নকুল, ছোট ভাইয়ের কাজ হ'ল দেখলি! বড় ভাইয়ের অসুখ, পেছনে ফেলে চলে গেল। বাঁচল কি মরল দেখল নাই…'

বাঁধের ওপর ওকে ধরে ধরে ওঠাল নকুল। এই 'পাগল' লোকটাকে ফেলে যেতে পারছিল না সে। বাঁধের নিচে নেমেই পার্বতীচরণ হাঁপিয়ে পড়ল, ওর পক্ষে এগোন বোধ হয় আর সম্ভব নয়। নকুলের হাতের ওপর ভারি হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল। এই অবস্থায় একজনকে বয়ে নিয়ে আর একজনের পক্ষে জুলুসের মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্রমে নকুলের কাছে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু পরেই নকুল বললে, 'পার্বতী, তুমি এখন আস্তে আস্তে এস, আমি এগোই…' বলে বাঁ হাত দিকে চলে গেল ও। বুঝল না পার্বতীচরণের কাছে কতখানি নিষ্ঠুর মনে হ'ল তার কাজ।

তবুও পার্বতীচরণ কয়েক পা এগোল। আস্তে আস্তে তার উত্তেজনাটা একটা মূঢ়তায় পরিণত হ'ল। সামনে মাঠটা ধূ-ধূ করছে। এই মাঠটা পেরোতে পারলেই…হ্যাঁ, ও যেটা দেখতে পাচ্ছে, সেটাই 'এস-ডু'র বাংলা। কিন্তু এই মাঠটা আর পেরোতে পারল না সে। মাঠটার দিকে তাকিয়ে থাকতেও পারল না। কপালের ওপর থেকে ঘাম এসে চোখের ওপর গড়িয়ে পড়ে, পাতা বন্ধ করে দেয়। তাছাড়া, আপনিই চোখ বন্ধ হয়ে আসে, জলন্ত ভাটির ওপর যেমন হয় সমস্ত মাঠটা হিল-হিল করে গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। পার্বতীচরণ দূর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। সহসা আতংকে ওর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে ওঠে। এতক্ষণে ও বুঝতে পারে, কি কাজ করতে যাচ্ছিল ও। ওর পাশের লোকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে নালাটা পার হয়ে গেল। একজন জোড়া পায়ে লাফ দিলে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে এল পার্বতীচরণের।

ওর অবস্থাটা ঠিক দুঃস্বপ্নে আটকে যাওয়ার মতো। সবাই পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ও পারছে না। কেবল পা দুটো নয়, সমস্ত শরীর ভারী বজ্জর হয়ে উঠেছে। এমন কি হাতটা তুলে কপালের ঘাম মুছতে পারছে না। 'এ বুড্‌ঢা, তফাৎ যাও …ক্যা দেখতা হ্যায়…' পেছন থেকে একজন ওকে ধাক্কা মারলে। ধাক্কা খেয়ে পার্বতীচরণের চৈতন্য এল, ও টেনে-টেনে পথ থেকে সরে দাঁড়াল। নালাটার পাশেই একটা বুনো আগাছার ওপর বসে পড়ল ও।

অধ্যায় ২৯

করালী বারই আর সুখন একসঙ্গেই আসছিল, কিন্তু এই নালাটা পেরোবার সময় দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। করালী বারই আগে লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেছে কিন্তু মৃদু-স্বভাব সুখন লাফাবার উদ্যোগ করবার আগেই কয়েকজন হুড়মুড় করে এসে পড়ল। কতক্ষণ আটকে যাবার পর যখন পেরোতে পারল ও তখন দেখলে করালী টানা হয়ে কোথায় চলে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, এতে তার মোটেই খারাপ লাগল না, করালী কাছে না থাকলেও তার নিকট সান্নিধ্য অনুভব করতে লাগল। মনে হ'ল, চারদিকের এই লোকজনের মধ্যে কারো না কারো পাশেই সে আছে।

নালাটা পেরিয়ে একটু এগোতে না এগোতে পুরাণো কুয়োটার কাছে এসে পড়ল সুখন। দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে সেই লোকটা তখনও চিৎকার করে যাচ্ছিল, 'ভাই সব, রুমাল ভিজাইয়া ল'ন…'। সুখন সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁট মুচকে একটু হাসল: না, দরকার নেই। কিন্তু ওখান থেকে চলে যাবার সময় আবার করালীর কথা মনে হ'ল ওর, সে কী গামছা বা কিছু ভিজিয়ে নিলে? তাকে এখন খুঁজে বের করতে হবে এবং তারপর ওরা দু'জনে যেখানে ইসমাইল আছেন আরো আগে, সেখানে চলে যাবে।

বেশি দূর এগোতে হল না, ইসমাইলকে পেয়ে গেল সুখন। কেবল ইসমাইলই জায়গাটায় আটকে গিয়েছিলেন তা নয়, সমস্ত শোভাযাত্রাটা এখানে থমকে গিয়ে অগোছালো হয়ে উঠেছিল। পেছন থেকে চাপ এসে পড়ছে, কিন্তু সামনের লোকেরা সবাই ঠিক এগোতে পারছে না, দুমড়ে যাবার মতো হয়েছে। গোলমালটা হচ্ছে বাঁ-দিকে বেশি। ইসমাইল দাঁড়িয়ে পড়ে সেদিকে পরীক্ষার দৃষ্টিতে

তাকিয়েছিলেন, ভুরু দুটো কুঁচকে একটা অদ্ভুত ভংগি ফুটে উঠেছিল। তারপর তাঁর পাশের একজনকে বললেন, 'দেখুন, ঐ ঢিবিটার পাশে আটকে গেছে। আপনারা যান, দেখবেন আরো বাঁ-দিকে জায়গা আছে, ভিড়টাকে ওদিকে সরিয়ে দেওয়া যায়…'

সুখন খুব তাড়াতাড়ি সরে এ'ল, কেন জানি ওর ইচ্ছে করতে লাগল, ইসমাইল যদি ঠিক ওকেই পাঠান। কিন্তু ও আসবার আগেই তাঁর পাশ থেকে তিন চার জন সেদিকে যাবার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢু মারতে লাগল এবং একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ইসমাইল সেদিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে তারপর আবার সামনে এগোলেন। সুখন দেখলে, উনি ইতিমধ্যে রোদের জন্য মাথায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছেন। সেই জন্যে মুখখানা কেমন ক্লান্ত, ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু কত সহজ ভংগিতে, নিস্পৃহভাবে হাঁটছেন তিনি। সুখন কেবল ওঁর দিকেই তাকিয়ে রইল যেন এর আগে কখনো ওঁকে আর দেখে নি।

একটা ব্যাপার দেখে সুখন একটু বিস্মিত হল, একটুখানি ঈর্ষাও বোধ করল যেন। কতকগুলি লোক ইসমাইলের চারদিকে কেবলই ঘিরে রয়েছে এবং অনর্গল কথা বলে চলেছে তাঁর সঙ্গে। লোকগুলোকে দেখলেই কেমন সন্দেহ হয়। দু'এক জনের মুখ চেনা, কিন্তু আর কয়েক জনকে সুখন এর আগে দেখেছে বলে মনে হল না। ওরা কেমন সেখ সাহেবের পাশে পাশে রয়েছে! কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুখনের এটাও মনে হ'ল সেখ সাহেবকে এমনিভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় এখন, যাতে তিনি খোলা মনে সব কিছু দেখা-শোনা করতে পারেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য, ইসমাইল নিজেই ওদের সঙ্গে সমানে হাসছেন আর কথা বলছেন! কে জানে কেন? সুখনের ইচ্ছে হ'ল তাঁর পাশে চলে যায়, আর উনি কিছু বলেন তাকে। আরে যাঃ, তাও আবার হয়ঃ কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল ও, ইসমাইলের কাছে আর যাওয়া হল না।

ইসমাইল নতুন করে সিগারেট বের করলেন। যেন নিজের মনে কৌতুক করছেন এমনি করে তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগটা একবার বগলে রাখলেন, তারপর অসুবিধা মনে করে দুই হাঁটুতে চেপে ধরে দেশলাই জ্বাললেন। পাশের থেকে কয়েক জন লোক হাত বাড়িয়ে হাঁ-হাঁ করে এ'ল, 'ব্যাগটা আমাদের দিন, আমরা ধরি…'

'নাঃ, এই তো হয়ে গেল…'এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ইসমাইল। তারপর ঠিক একই রকম কৌতুকের ভংগিতে বললেন, 'আপনারা বরঞ্চ এই এদের মধ্যে

ঘুরে ঘুরে একটা কথা বলতে থাকুন…' সিগারেট শুদ্ধ বাঁ-হাতটা সামনে তুলে দোলাতে লাগলেন তিনি। 'যাই ঘটুক না কেন, সবাই যেন শান্ত হয়ে থাকে। কোন রকম উত্তেজনা নয়…উত্তেজিত হলেই আমরা মরব…'

'জী হাঁ…', 'আমরা যাচ্ছি…' বলতে বলতে লোকগুলি চলে গেল। নতুন একটা দায়িত্বের চেতনা তৎক্ষণাৎ ওদের মুখে প্রতিফলিত হ'ল, এতগুলি লোকের মাঝখানে মুহূর্তে ওদের বিশিষ্ট করে দিলে যেন।

ওরা যেতে না যেতেই আবার জনা দুই তিন ঘিরে ধরল তাঁকে। তারা ইসমাইলকে এই শোভাযাত্রা থেকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। এর আগেও ঐ একই অনুরোধ শুনেছিলেন তিনি, তখন সবে রেল লাইন পেরিয়ে মাঠের মধ্যে নেমেছিলেন। ইসমাইল স্পষ্ট চিনতে পারলেন, ঐ পাঞ্জাবি-পরা খাটো করে ছাঁটা-চুল লোকটি—যে সব চেয়ে বেশি মুখর হয়ে উঠেছে—সে তখনও সেই দলে ছিল। এবারে একজন ছোকরা (মনে হয় সবে কেরানী হয়ে কারখানায় ঢুকেছে) তার সঙ্গে এসেছে। লোকটি ঘামে-ভেজা পাঞ্জাবির হাতা গুটোতে গুটোতে বলছিল, 'আপ মাৎ বঢ়িয়ে। আপকে ওয়াস্তে ওয়ারেন্ট্ হ্যায়, আভী আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে…'

'কেন, আপনাদের মধ্য থেকে কে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে…' হাসলেন ইসমাইল।

ডান দিক থেকে ছোকরাটি উজ্জ্বল চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি বাইরে থাকলে যে কোনো সময় ওদের হাতে পড়বেন। তার থেকে এখন আমরা আপনাকে নিয়ে যাই…'

তাতেও ইসমাইল যখন টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, তখন ছোকরাটি মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'আপনি অনর্থক বুলেট ফেস করবেন না। প্রসেশানের মধ্যে না গিয়ে আপনি কোন 'ডেন' থেকে আমাদের চালাতে পারবেন…'

কয়েক জন মজুর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। কয়েক বারই ব্যাপারটা ঘটতে দেখছিল ওরা। এবারে একজন উত্তেজিত অথচ কাঁচুমাচুভাবে একেবারে ইসমাইলের কাছে এসে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'আপনি ওদের চেনেন? কে ওরা…'

'কে আবার, কারখানার ওআর্কার…' ইসমাইল জানতেন, কোথায় প্ররোচনা সত্ত্বেও অবিশ্বাস করতে নেই। বললেন, 'যান আপনারা, দেখবেন সবাই যেন শৃঙ্খলা রেখে এগোয়…'

কিন্তু মনে মনে হাসলেন ইসমাইল। কী করে আন্দোলন পরিচালনা করতে

হবে, কখন বুলেটের সম্মুখীন হতে হবে, তার নির্দেশ তাঁকে দেবে ওরা! আর, এইসব কথা বললেই তিনি চলে যাবেন এদের ছেড়ে? আর, এদেরকে বিপথগামী করবে! না, তা পারবে না ওরা।

সুখনের কিন্তু এসব দিকে খেয়াল ছিল না। ভিড়ের চাপেই হোক, অথবা নিজের ভেতরকার তীব্র ইচ্ছার জন্যই হোক, ইসমাইলের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছিল সে। এখন সে স্বচ্ছন্দে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে, তাঁর ব্যাগটা ছুঁতে পারে হাত দিয়ে। কিন্তু পারে বলেই বোধ হয় ঠিক সেইটেই ভুলে গেছে ও। ওর মনের মধ্যে তখন আর এক বিষয়ে আন্দোলন চলেছিল। 'ইয়ে সব ক্যা চলতা হ্যায়…হাম কাঁহা যাতে?' কথাগুলি উচ্চারণ করতে করতে মৃদু মৃদু হাসছিল ও। আর নিজের মনেই উত্তর দিচ্ছিল, 'হাঁ, আজ একঠো কোঁই চীজ হোগা…সবৃসে আচ্ছা কোই করেঙ্গে হাম…'

এই কথাগুলো যখন ওর মনের ভেতর ঢেউএর মতো ওঠা-পড়া করছে তখন পেছনের সমস্ত ঘটনা ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল। 'শিববাবু কোথায়? তিনিও কি সেখ সাহেবের মতো এই জুলুসের মধ্যে আছেন…' কথাগুলো ভাবলে ও, আর মনে পড়ল সেই দিনকার কথা যেদিন রাত্রি জেগে পোস্টার লিখেছিল ও, আর স্টেশনের টিকিট-ঘরের গায়ে সেঁটে দিয়েছিল। যেদিন পুরাণা হাটে মীটিং করতে গিয়ে সব ভেস্তে গেল, সেদিনও শিববাবুর সঙ্গী ছিল সে। যেদিন মনোতোষবাবু মজদুরদের সভায় প্রতারণা করে সভাপতি হয়েছিলেন, কাটা ঘায়ের মতো সেটা এখনো দগদগ করে। তারপর মনোতোষবাবুর সেই উদাত্ত আহ্বান, স্লো-ডাউন আন্দোলনের জন্য—সব কিছু পরপর তার চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ফুটে ওঠে। সুখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত ঘটনাই ওর অনুভূতির মধ্যে নিবিড় হয়ে আসে যেন।

হঠাৎ ওর কাঁধের ওপর কে হাত রাখল, 'ভেইয়া, সুখন…'

সুখন ফিরে দাঁড়িয়ে 'করালী বাবু…' বলে তার মুখের দিকে তাকালে। নিজের মনের কথাটাই যেন তারও চোখে পড়তে পারল ও। করালী ওকে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে উল্লসিত কণ্ঠে বললে, 'সুখন, ভাই, আর আমাদিকে কেউ ঠেকাতে পারবেক নাই, ইবার আমরা ঠিক কিছু করব…'

সুখন কিছু বললে না, কেবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

অধ্যায় ৩০

জুনাপুর থেকে আরানসোল এস-ডি-ও'র বাংলোতে পৌঁছবার একটা ভালো পীচ-বাঁধাই রাস্তা আছে। রেল লাইনের পাশ দিয়ে পূব মুখে কিছুটা এগিয়ে তারপর উত্তরে বাঁকতে হয়, অর্থাৎ জিঙ্কোর কারখানাকে দু'দিকে বেষ্টন করে তারপর চাঁতা ডাঙালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এ পথ অনেকটা ঘোরালো, সোজাসুজি মাঠ ঝাঁপিয়ে গেলে পথটা অনেক সংক্ষিপ্ত হয়। ঠিক সেই জন্যেই হয়তো শোভাযাত্রী শ্রমিকেরা এই মাঠের পথই বেছে নিয়েছিল।

এই মাঠের সবটাই আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি, খানা-খন্দ, টিবি একটার পর একটা সামনে পড়ছে আর ওদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। জুনাপুর শহর থেকে যখন শোভাযাত্রাটা বেরোল, তখন সেটা ছিল সারিবদ্ধ, সূচীমুখের মতো। কিন্তু যতই মাঠের মধ্যে এগোতে লাগল ওরা ততই সেটা আগোছালো, আর তার মুখটা চওড়া হয়ে উঠতে লাগল, জলের স্রোতে বাধা পড়লে যেমন হয়। বাংলোতে পৌঁছোবার আগে একটা খুব বড় খানা এবং তারই পাশে একটা খুব উঁচু টিবিতে আটকে গেল মানুষগুলো। যত দ্রুত সামনের মানুষ এগিয়ে গেলে পেছনের লোক পথ করতে পারত, তা হল না। এক জায়গায় আটকে গিয়ে ফুলে উঠতে লাগল।

এই টিবিটার পেছনে একটু দূরে এসে গিয়েছিল দুখীরাম। এর আগে ও কয়েকবার পেছনে তাকিয়ে দেখেছে। যখন নিশ্চিত হয়েছে যে ওর দাদা পার্বতী-চরণ আর আসছে না, তখন হাল্কা মনে আর দ্রুত বেগে এগোতে পেরেছে ও। অনেকটা দূর থেকেই সামনের টিবিটার মাথার দিকে তাকিয়েছিল ও, কিন্তু টিবি-টার কাছাকাছি এসেই থমকে যেতে হল ওদের। সামনের লোকগুলি আর এগোচ্ছে না। ওরা একটুখানি অপেক্ষা করল, কিন্তু তারও উপায় নেই, পেছন থেকে ঠেলা মারছে। সামনে কেন আটকে গেল জিজ্ঞাসাবাদ করেও বুঝবার উপায় নেই, কেন না সবাই জানতে চায়। আওয়াজ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, পরস্পরের সঙ্গে একটা ঠেলাঠেলি আর গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে দুখীরাম হাঁপাতে লাগল। যতক্ষণ এগোচ্ছিল ততক্ষণ কিছু মনে হয় নি, কিন্তু দাঁড়ানো মাত্র সমস্ত শরীর থেকে কলাগাছের মতো জল পড়তে লাগল। এর

মধ্যে খবর পাওয়া গেল, পুলিশ ওদেরকে সামনে আটকে দিয়েছে। ওরা এগোতে পারছে না। এই খবরটা একটা মানুষের পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক হতে পারে, দুখীরামকে সে সময় না দেখলে বোঝা যেত না। ওর মুখখানা হতাশায় শিথিল আর বিকৃত হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে কি হত বলা যায় না কিন্তু এই সময় দুখীরাম একটা পথ দেখতে পেলে। বাঁ-দিকে কয়েক হাত দূরে একটা ভেরেণ্ডা গাছের ঝাড় ছিল, ঢিবিটা সেটার ওদিকে নিচু হয়ে গেছে। অল্প কয়েকটা লোক সেটার পাশ দিয়ে ওদিকে এগোচ্ছিল। দুখীরাম পাশ কাটিয়ে পিছলে সরে গেল ওদিকে।

ভেরেণ্ডা ঝোপটার পাশেই খানা, সেটাতে নেমে একটু এগোলেই ঢিবিটার ওপারে যাওয়া যায়। দুখীরামের দেখাদেখি আরও কয়েক জন ঢিবিটার ওপারে চলে গেল, খানা পেরিয়ে। দুখীরাম গোঁ-ভরে লোকজনের পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছিল। কোনো রকমে সামনের সারিতে গিয়ে পৌঁছোতে চায় সে। একটু পরে সেখানে গিয়ে পৌঁছোতেও পারল সে কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়েই নিঃস্পন্দ, কঠিন হয়ে উঠল। ওর নিমেষহীন চোখে একটা জ্বালা ফুটে বেরোতে লাগল যেন, যেটা এতক্ষণ ছিল না। সামনে সারি দিয়ে সিপাহীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইফেল উদ্যত করে।

কিন্তু দুখীরামের মতো করালী বারই যখন একই ভাবে শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে এসে উপস্থিত হল, তখন তার অনুভূতিটা হল সম্পূর্ণ অন্যরকম। উদ্যত-অস্ত্র সিপাহীদের সামনে ও আড়ষ্ট তো হলই না, বরঞ্চ এতদিনকার আড়ষ্ট, বোবা করালী কেমন চঞ্চল, খুশি-খুশি হয়ে উঠল। ওরা যেখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে মাঠ শেষ হয়েছে। সামনে পীচ-ঢালা চওড়া রাস্তা, তার ওপারে সিপাহীরা। করালীর দৃষ্টি ওদেরকেও পেরিয়ে গেল। সমস্ত বাংলোটাই ও কেবল দেখল না, তার খুঁটিনাটিগুলোও ওর চোখে পড়তে লাগল। ইংরেজ আমলের বনেদী-গড়ন এই বাংলোটা করালীর একেবারে অজানা তা নয়। আরানসোলে যাতায়াতের পথে কতবার এই বাংলোর পাশ দিয়ে গিয়েছে সে। বাংলোটা দোতলা, এর তিন পাশে খুব চওড়া বারান্দা। সামনে মাঝখানে প্রসারিত ব্যালকনি, তার কার্ণেসের ওপর ত্রিসিংহ মূর্তি, উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পরে নতুন বসানো হয়েছে। এই বাংলো ঘিরে একটা সুপ্রশস্ত এলাকা কলকে-ফুলের গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝের জমিতে রাস্তা বাদ দিয়ে দু'পাশে ফল পুষ্প লতার বাগান।

করালী দেখলে, বাংলোর ভেতরে ধীরে কিন্তু অনিবার্য গতিতে একটা কর্মের ধারা চলছিল। ব্যালকনির ওপর জনা দুই সিপাহী একটা লাউড স্পীকার টাঙিয়ে দিচ্ছিল। আর নিচে লনের রাস্তার ওপর মহকুমা-শাসক এবং এস-আই শোভাযাত্রীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। করালী এস-আই'কে চিনত না কিন্তু দীর্ঘাকার, সুন্দর চেহারার এস-ডি-ও'কে সে জিস্কোর কোনো কোনো অনুষ্ঠানে দেখেছে। তাঁর ঘন নস্যি রঙের স্যুট, বাঁ-হাতটা কোমরের ওপর আলতো করে ফেলা, পাইপটা কখনো মুখে কখনো হাতে রাখছেন—এ ভংগি তার কত চেনা। তাঁর পাশেই এস-আই'এর ওপর চোখ পড়ল করালীর—উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য। প্রৌঢ়-বয়স্ক এস-আই'এর রঙ কালো, ভারী ইটের গড়া দেহ যেন। কড়া ইস্ত্রীর খাকী ইউনিফর্ম, কোমরের বেল্টে রিভলবার ঝোলানো। চোখের ওপর পর্যন্ত নেমে-আসা হ্যাটের আড়ালে কঠিন মুখের অনেকখানিই ঢাকা পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, করালীর কাছে সেটা কোনো দিক থেকে অর্থপূর্ণ বলে মনে হ'ল না। ও ভাবতেই পারল না, তাদের ভাগ্য নিয়ে একটা কিছু পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। ভাবতে পারল না, এই দুই ধরনের চেহারার মধ্যে মূলত একটা কথাই উদ্যত হয়ে উঠছে। বরঞ্চ এর সব কিছুই ওর কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল।

স্বপ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন হয়, যখন মানুষ তার অতি বড় বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়ে তার ভয়ের কথাটা ভুলে যায় শুধু তাই নয়, তার সামনেই সে যদৃচ্ছ বিচরণ করতে থাকে। করালীরও তাই হল। এই শোভাযাত্রায় এসে পড়ার আগে তার মধ্যে যে সতর্ক, সংশয়ী দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল, এখানে সেটা বেমালুম ভুলে গেল সে। এটা তার একান্ত পরিচিত, প্রত্যাশিত বলে মনে হতে লাগল।

যখন কম্যুনিস্ট পার্টির অমর বাবুর নেতৃত্বে শ্রমিকদের কয়েক জন প্রতিনিধি বাংলোর ভেতরে ঢুকলেন এস-ডি-ও'র সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য, তখন করালী স্বতই চিৎকার করে বললে, 'ঠিক হ্যায়, আপলোগ যাইয়ে··', এবং তারপরই জমায়েত মজুরদের সারির সামনে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেন ওদের আলোচনা করবার সুযোগ দিলে ও এবং তারপর ওর নিজের যা করণীয় তা করবে।

কতক্ষণ পরপর আলোচনারত দলটার দিকে তাকাতে লাগল ও এবং কেন জানি ওর মনে হ'তে লাগল যে, ভীষণ দেরি হচ্ছে। এখনো ওরা আলোচনা

শেষ করতে পারছে না কেন? মনোতোষবাবু এখানে নেই, কিন্তু তিনি থাকলে করালী তাঁকেই আলোচনার জন্য যেতে বলত। তিনিই হয়তো ঠিকভাবে আলোচনা করতে পারতেন।

করালী আজ ভোরে যে স্বপ্ন দেখেছিল সেটা মনে পড়ল না ওর। কিন্তু সেই যে মনোতোষবাবুর চেয়ারে বসে সভার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল ও (ওর স্ত্রীপুত্র সমেত), কতকটা সেই রকম অনুভূতি পেয়ে বসল ওকে। ওর মনে হল, এই শোভাযাত্রীদের অভিযান, প্রতিনিধিদের যাতায়াত এর সব কিছুর মধ্যেই তার সমর্থন অসমর্থন আছে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কাজ করছে এখানে।

হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা গুমরানো আওয়াজ উঠল, ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রতিনিধিরা আলোচনা শেষ করে বেরিয়ে এসেছেন। ওঁদের চোখে-মুখে স্পষ্ট নৈরাশ্যের ভাব। একজন হাত উঠিয়ে নেড়ে দিলেন, যেন বোঝাতে চাইলেন, 'নাঃ, হল না!' অমরবাবু তখনও ভেতরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন মহকুমা-শাসকের সঙ্গে। আরও কী বলবার ছিল কে জানে। 'হল নাই তো হল নাই, চলে আসেন কেনে…' অমরবাবুর দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলে করালী, বুঝল না যে এত গোলমাল পেরিয়ে কথাগুলো সেখানে কেন, কারো কানেই যেতে পারে না।

একটু পরেই মহকুমা-শাসককে দেখা গেল ব্যালকনির ওপরে উঠে আসতে। করালী থমকে দাঁড়াল চোখ কুঁচকে, এ আবার কী? মুহূর্তে হাজার হাজার চোখের দৃষ্টি পড়ল ওখানে। ধাবমান গাড়িতে ব্রেক কষলে যেমন হয়, এদের সমস্ত চাঞ্চল্য, উত্তেজনা আর গোলমাল সহসা স্তব্ধ হয়ে উঠল। এত নিস্তব্ধ যে ব্যালকনি পেরিয়ে মহকুমা-শাসক যখন আসছিলেন, তখন তাঁর চলার শব্দ এখানে এসে পৌঁছোচ্ছিল। সামনে এগিয়ে এসে হাতের পাইপটা তিনি পেছনের আর্দালীর হাতে দিলেন, তারপর কার্পেসের ওপর উঠে এলেন। ডান হাতটা মুড়ে রাখলেন অশোক স্তম্ভের ওপর। করালীর মনে হল, আদর করে পোষা সিংহের গলা জড়িয়ে ধরেছেন।

এস-আই (তিনিও উঠে এসেছিলেন পেছনে পেছনে) তাঁর সামনে মাইক্রোফোনের মুখটা এগিয়ে দিতেই একটুখানি কেশে নিয়ে তিনি বললেন, 'জুনাপুর স্টীল ফ্যাক্টরীকা ওআর্কাস্, আপলোগোঁ কে পাস হাম দো-এক বাত এ্যাড্রেস্ করেঙ্গে। আপলোগ ইহাঁ জমায়েৎ হুয়া থা—ইসকে কারণ ইয়ে হ্যায় কি আপলোক আপকো নেতায়োঁ কী মুক্তি মাঙতে হ্যায়। ইস্ লিয়ে হামারা

যো বক্তব্য হ্যায়, আপকো প্রতিনিধিয়োঁকো হাম সমঝা দিয়া। আউর, আপ-লোগোঁকো ভী বোলতে হঁ্যায়। পুলিশ উনকো গিরেফ্‌তার কিয়া, উসকে লিয়ে পুলিশ কা দায়িত্ব হ্যায়, উসকা কৈফিয়ৎ ভী হ্যায়। লেকিন, উসকে লিয়ে জুলুস করনা, বাংলোমে চড়াও কর না, নহী…হাম উসকো ডিসকারেজ কর রহতে হ্যায়। আউর হাম বোলতে হ্যায় কি আপ শান্ত্‌সে ইহাঁসে চলা যাইয়ে। আউর হাম আপকে লিয়ে আশোয়াস দে রহতে কি হাম দেখেগা জিস্‌সে জাস্টিস্‌…ন্যায় বিচার হোনা হ্যায়।'

একটু থেমে, জনতার ওপর তাঁর ভাষণ কী রকম প্রভাব বিস্তার করেছে যেন সেইটে দেখে নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'আউর শুনিয়ে! হাম, আরান-সোলকা এস-ডি-ও, হাম জুনাপুরমেঁ, আউর ইস্ ইলাকামেঁ সেকসন হাণ্ড্রেড্ এ্যাণ্ড ফর্টি ফোর প্রোমালগেট করতে হায়। আপ ইহাঁসে চলা যাইয়ে! হাম আপকো পাঁচ মিনট টাইম দেতে হায়, ইসকে ভিত্‌তর আপ যাইয়ে। হাঁ…,' বলে উনি বাঁ-হাতটা শূন্যে ছুঁড়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তুলে রইলেন। মণিবন্ধে ঘড়ির ওপর রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠল। সময়ের প্রতীকটাই ওদের সামনে তুলে ধরলেন যেন।

অধ্যায় ৩১

এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট…যথারীতি সময় কাটতে লাগল। চারদিক এত নিস্তব্ধ যে মনেই হয় না এর আগে কিছু হয়েছে বা পরেও কিছু হবে। ফুটন্ত জলের কড়াইয়ের নিচে থেকে আগুন সরিয়ে নিলে যেমন হয়, এরা আস্তে আস্তে নিস্পন্দ, শিথিল হয়ে এল। পেছনের থেকে কিছু কিছু লোক ফিরে যাবার জন্য উদ্যোগী হ'ল, সামনের যারা পতাকা বা পোস্টার সামনে রেখে দাঁড়িয়েছিল তারা দণ্ডগুলো কাঁধের ওপর তুলে নিলে চোখ নিচু করে।

কিন্তু ঠিক সেই সময় কেনই বা একজন সিপাহী হেসে উঠল আর পরিহাস করল এদেরকে, এই অপস্রিয়মান জনতার দিকে লক্ষ্য করে? সামান্য একটু পরিহাস, এতো অহরহ লোকে করে থাকে, তা সে না করলেও পারত। কর্তব্যরত সিপাহীর পরিহাস করার কথাও নয়। অথচ ও পরিহাস করল এবং তাতেই এই বিপত্তি ঘটল। এই বিপত্তির জন্য দায়ী কে? ইসমাইল জনতাকে

শান্ত, সংযত রাখতে পেরেছিলেন। মহকুমা-শাসকও ফেরাতে পেরেছিলেন এদের। তবু এরা ফিরতে পারল না কেন? সামান্য পরিহাস তো এর কারণ হতে পারে না। এটা কি পূর্ববর্তী অসংখ্য ঘটনারই পরিণত ফল, না কি, এটা হচ্ছে ইতিহাসের সেই রহস্যময় অজ্ঞাত, সেই আন্‌নোন, যা ক্রমাগত এককে আর করে তুলছে! যা বস্তুগত পরিবর্তনকে গুণগত পরিবর্তনে নিয়ে যায়, যা জীবকোষকে পরিণত করে দেহীতে, যা দেহীকে পরিণত করে মানুষে!

জনতা ক্লান্ত, নতমুখে যখন ফিরবার উপক্রম করেছে তখন একজন সিপাহী হেসে উঠল। পরিহাস তরল কিন্তু অনুচ্চ স্বরে বললে, 'জলদি বঢ়িয়ে ঘরমে যা কর ডাল রোটি খাইয়েগা খোশিসে…'

করালী (এবং তার সঙ্গে আরও দু'য়েকজন) মুচকে হেসে ফেলল কথাটা শুনে কিন্তু লেজ-মাড়ানো সাপের মতো ফোঁস করে ঘুরে দাঁড়াল কয়েকজন মজুর, 'কেয়া?'

একজন ক্রুদ্ধ, আহত স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'ক্যা বোলতা হ্যায়, তুম বুরবক?'

সিপাহীটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, 'হাঁ-হাঁ, ঠিক বোলা হ্যায়…'

এই বচসা হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলতে পারত, কিন্তু করালী লক্ষ্য করলে, ঠিক তার পাশেই কয়েকজন লোক কেন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। একটু আগে এদেরই কেউ কেউ যে ইসমাইলের সঙ্গে ভিড় করে ঘুরছিল, সেটা বুঝবার মতো মনের অবস্থা ছিল না করালীর। বরঞ্চ তাদের দিকে তাকিয়ে সে অপেক্ষা করে রইল, ওরা এরপর কি করবে সেটা দেখবার জন্য।

ওদের মধ্যে একজন লোক গর্জন করে উঠল, 'ফিন ওহী বোলতা হ্যায়? মারো উসকো…' সঙ্গে সঙ্গে একজন হাতের টিফিন কেরিয়ারটা ছুঁড়ে দিল ও। যে সিপাহী বলেছিল তার কানের পাশ দিয়ে পেরিয়ে সেটা বাগানের গেটে গিয়ে ঝনঝন করে লাগল। শুধু তাই নয়, ওদের মধ্য থেকে একজন জনতার দিকে ফিরে কর্কশ কিন্তু কাঁপা-কাঁপা স্বরে চিৎকার করে বললে, 'বন্ধুগণ, ফিরে যাবেন না, দাঁড়ান…'

সে থামতে না থামতেই আর একজন আওয়াজ দিয়ে উঠল, 'ইনকিলাব…', আর এতক্ষণকার স্তব্ধতা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যেন, 'জিন্দাবাদ…'। সমুদ্রের যে তরঙ্গ শান্ত হয়ে উঠছিল, ঝাপটা লেগে সেটা আবার ক্ষুব্ধ, উত্তাল হয়ে উঠল।

ব্যালকনির ওপরও অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেল। এস-আই কী জিজ্ঞেস করলেন এস-ডি-ও'কে। এস-ডি-ও ঘন ঘন তাকাতে লাগলেন ঘড়ির দিকে, মাইকের সামনে মুখ এনে কি বলতে চাইলেন। করালী কেবল 'চলা যাইয়ে…' কথাটা এই অদ্ভুত গোলমালের মধ্যে শুনতে পেলে। মুহূর্ত পরে মাইকটা ছেড়ে দিলেন তিনি, কেমন অস্থির, হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, এস-আই'কে কী বললেন। তারপর বাহু আর কাঁধে একটা অসহায় ভংগি করে ব্যালকনি থেকে ভেতরে চলে গেলেন তিনি। এস-আই তাঁর কথায় নড করে নিচে নেমে এলেন দ্রুত পায়ে। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পুলিশ লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। উদ্যত পিস্তল ডান হাতে, বাঁ হাতটা ঝোলানো অবস্থায় উদ্দেশ্যহীনভাবে কাঁপতে লাগল, জনতার প্রতি চোখ রেখে ধরা গলায়, কাতরানো স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফাঃ…'

করালী বিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল, কিন্তু ভয়ে নয়! এস-ডি-ও'র সঙ্গে কথাবার্তা থেকে আরম্ভ করে এস-আই'এর এই নিচে নেমে আসা পর্যন্ত সব ওর চোখের সামনেই খুঁটিয়ে দেখতে পেলে ও। 'উনি ভয় পেলেন কেন…' এস-ডি-ও চলে যাবার পর আশ্চর্য হয়ে ভাবলে ও। আর এস-আই…লনের ওপর লাল পাথর ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে যখন ছুটতে ছুটতে আসছিলেন তিনি, তখন করালীর মনে হল তাঁর পা টলমল করছে, কী দুর্বল হয়ে গেছেন তিনি। এস-আই এসে যেখানে দাঁড়ালেন, করালীর থেকে সেটা বেশি দূরে নয়। করালী স্পষ্ট দেখতে পেলে তাঁর কালো মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অমন করছেন কেন উনি। কী রকম অপরিচিত শব্দে চেঁচিয়ে, লাফিয়ে উঠছেন। 'ফাঃ-ফাঃ…' পা দুটো অসম্ভব কাঁপছে, এখনই হয়তো পড়ে যাবেন।

করালী ছিল জনতার প্রথম সারিতে, কিন্তু প্রথম সারি থেকে অনেকটা পেছনে তখনও ইসমাইলের কাছাকাছি ছিল সুখন। মুহুর্মুহু রাইফেলের আওয়াজে এবং জনতার বিভ্রান্ত গোলমালে কিছু বুঝবার উপায় ছিল না। কোনো কিছু দেখাও তখন সম্ভব নয়। বাইরে পায়ের নিচে মাটি সরে যাওয়ার মতো তখন চারদিক থেকে সব কিছুই সরে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে। সামনে একটা কিছু হচ্ছে এটাই ভাবছিল সুখন আর সেটা কি দেখবার জন্য এগোচ্ছিল ও। ওর বাঁ হাতের কনুইয়ের নিচে থেকে রক্ত ঝরেঝরে পড়ছিল, আর ডান দিকের তলপেটের কাছে জামা ভিজে গিয়েছিল রক্তে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আর একটা জগতে চলে গিয়েছিল ও। ভাবছিল, ওর ভাই বাহাদুর এতদিনে

হয়তো বোম্বের কাজে লেগে গেছে। নিজের ছোট্ট গ্রামটির কথা মনে পড়ল ওর। বাহাদুর যখন ছোট ছিল, তখন গ্রামের সেই কুয়োতলাতে পালিয়ে আসত প্রায়ই। সুখন এসে ভাইটাকে কাঁধে করে নিয়ে ফিরে যেত। খুব দুরন্ত ছিল বাহাদুর, কিন্তু এখন সে কথা মনে করে হাসতে থাকে ও। ক্লান্ত মুখের ওপর হাসিটা কেমন নেতিয়ে পড়া কিন্তু অর্থপূর্ণ মনে হয়। ও ভাবলে, দু'এক বছরের মধ্যে বাহাদুরের সাদী করিয়ে দেবে। ওর নিজের সাদী হয় নি, কিন্তু ওর কতকগুলো টাকা আছে জমানো, সেগুলো দিয়ে—কিন্তু কত টাকা আছে যেন? ঠিক মনে করতে পারল না ও। সহসা সামনে একজনকে পড়ে যেতে দেখে তাকে তুলবার জন্য এগিয়ে গেল ও। সেখান পর্যন্ত পৌঁছে যখন পড়ে যাওয়া মানুষটাকে তুলবার জন্য ও ঝুঁকে পড়ল, তখন ও নিজেই পড়ে গেল, আর উঠতে পারল না।

কিন্তু উঠতে পারছে না কেন?···বাহাদুর যে রকম ছোটাছুটি করছে তাতে কুয়োর ভেতর পড়ে যাবে যে! পাকড়ো উসকো, পাকড়ো···আস্তে আস্তে কুয়োতলাটা ঝাপসা হয়ে এল ওর চোখের সামনে।

ওখান থেকে একটু দূরে হাড়-ওঠা, বিরাট চেহারার একজন মজুর এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল হতভম্ব হয়ে। চারপাশে ওর কী হচ্ছে তার ঈষৎ চেতনা যখন ওর হল, তখন চাবুক খাওয়া পশুর মতো ককিয়ে উঠে পেছন ফিরে মারলে লাফ। তাতে একটা ঘটনা ঘটল। ওর সামনেই একজন চিৎ হয়ে পড়েছিল, ও তার জানু মাড়িয়ে দিলে। কিন্তু পেছন থেকে আর একজন ওকে বজ্র গর্জনে তিরস্কার করলে। 'আরে, এ বুরবক্, রাস্কেল, তুম কেয়া কিয়া? সেখ সাহাবকে উপ্‌পর প্যার দিয়া! হা-হা-হা···' বুক ভেঙে আর্তনাদ বেরিয়ে এল মজুরটির, ঝুঁকে পড়ে ও ইসমাইলকে তুললে। আরও দু'জন এসে সাহায্য করলে ওকে, তারপর ব্যাপার বুঝতে পেরে আরও কয়েকজন থমকে গেল। ততক্ষণে সেখ সাহেবকে তুলে নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে ফিরে এগোচ্ছে ওরা। কয়েক জোড়া হাতের ওপর ইসমাইলের হাল্কা দেহ নেতিয়ে পড়েছে। মাথার লম্বা, ঘন চুলের বোঝা লটকানো, চোখ দুটি নিমীলিত, তাঁর ভারী ফ্রেমের চশমা কোথায় ছিটকে পড়েছে। ডান হাতে ধরা অবস্থায় পোর্টফোলিও ব্যাগটা তখনও ঝুলছে। একজন সেটা নিজের হাতে নিলে। কিন্তু যে মজুরটি ওঁকে প্রথম দেখেছিল, সে এখন ওঁর দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে উঠল। 'এ কেয়া কিয়া, রামজী! কলজেমেঁ গোলি লাগা! হা-হা···'

যেখানে সুখন পড়ে গিয়েছিল অন্যকে তুলতে গিয়ে, সেখানে তখন আর এক ব্যাপার চলছে। ওদের দু'জনকে পড়তে দেখে আরও কয়েকজন এগিয়ে গিয়েছিল ওদের আনবার জন্যে। এক সঙ্গে জড়ো হলে এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার দিক থেকে সুবিধা হয় বেশি। পর পর আরও দু'জন পড়ে একটা স্তূপ হয়ে উঠল। যেমন করে এসেছিল লোকজন, তেমনি করে কখন সরে গিয়েছে। কেবল একজন শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল, যদি কেউ তাকে সাহায্য করতে আসে। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও ও যখন দেখলে আর কেউ ওকে সাহায্য করতে এল না, আর একা ওর পক্ষে এই স্তূপে হাত দেওয়াও সম্ভব নয়, তখন সে আস্তে আস্তে চলে গেল মাঠের ওপর দিয়ে।

। সপ্তম পর্ব সম্পূর্ণ।

পর্ব ৮

অধ্যায় ১

১৯৫৩ সালের ১৫ই জুনের বিকেলে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের ওপর দিয়ে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল একটা ঘি-রঙের ক্যাডিলাক কনভার্টিবল্। খুব হাল্কা স্বচ্ছন্দ এর চলন। কেবল নাতি-কর্কশ হর্ণের শব্দে অসতর্ক পথচারীকে চমকে সরে দাঁড়াতে হয়। গাড়িটা ততক্ষণে বাতাসে একটা গম্ভীর আওয়াজের ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে কোথায় ছিটকে গিয়েছে।

এই গাড়ির পেছনের সীটে কুশনের ওপর দোল খেতে খেতে 'সানডে ইকনমিস্টের' পাতা ওলটাচ্ছিলেন জুনাপুর আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট সেরিডান এ্যাণ্ড কোং'এর অন্যতম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার ধীরানন্দ মুখার্জী। নিটোল, লম্বা-হানো মুখ, চোখ-মুখ-কপাল সবই ভাসা-ভাসা, কপালের ওপর বিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুলের দু'একটা ছোট কুণ্ডলী। খুবই মৃদু আর আত্মতৃপ্ত, কেবল চিবুকেই দৃঢ়তা আর ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। ডান হাতে কফির কাপ, একটু আগে ফ্ল্যাস্ক থেকে ঢেলে নিয়েছেন। স্যার ধীরানন্দ কফি খেতে খুব ভালবাসেন, কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় পুত্রবধূ কমলা দেবী (যিনি মিঃ টমসন-আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেছিলেন) একটা বড় ফ্ল্যাস্কে ভরে কফি তৈরী করে বেতের সাজিতে দিয়ে দিয়েছেন। কুমার শুভানন্দ তখন স্কুলের ছাত্র তিনি বিপত্নীক হয়েছেন, তারপর যেদিন থেকে এই মমতাময়ী পার্ক স্ট্রীটের 'মুনশাইন ভিলা'-তে এসে উঠলেন, সেদিন থেকেই তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুর নির্ভর হয়ে উঠেছেন। এই সময় সংগে আসবার জন্য খুব ধরেছিলেন কমলা দেবী, কিন্তু স্যার ধীরানন্দ বলেছেন, 'মা যাতে মায়ের মতোই যেতে পারেন তার জন্যেই তো পথ করতে এগিয়ে যাচ্ছি আমি।'

স্যার ধীরানন্দ সানডে ইকনমিস্টের পাতা থেকে মুখ তুললেন। কাপটায় শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন সাজির মধ্যে ফ্ল্যাস্কটার পাশে। তারপর তাকালেন বাইরে কিন্তু রাস্তার দু'পাশে বিছানো উন্মুক্ত প্রকৃতির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল না। জুনাপুরে ছুটে যাচ্ছেন তিনি—এতদিনে যাবার প্রয়োজন হয়েছে! বাহাত্তরটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক এই সেরিডান এ্যাণ্ড কোম্পানী। কলকাতায় থেকেই সব ক'টিকে দেখা-শোনা করেন, এ নিয়ে তাঁর একটা গর্বও

আছে। আর এই রকম কোনও উপলক্ষে বাইরে যেতে হলে—সে ব্যতিক্রম তাঁর কাছে ভালই লাগে, উষ্ণতার সঞ্চার করে। কিন্তু এবারে উদ্বেগের পরিমাণ তাঁর এত বেশি যে উষ্ণতা অনুভব করতে পারছেনই না। মাঝে মাঝে তাঁর চোখের সামনে থেকে সব কিছু সরে যাচ্ছে, তাঁর চৈতন্য একটা সুতো-কাটা ঢেলার মতো তলিয়ে যাচ্ছে অতলের গভীরে। তখন একটা অস্থিরতা তাঁর সমস্ত শরীর-টাকে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়, তাঁর ভাসা-ভাসা চোখের ওপর ভুরুতেও টান পড়ে, ঘেমে উঠতে থাকেন। এটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো—ভেঙেও ভাঙতে চায় না। অথচ এখনই যদি তিনি জাল থেকে বেরোতে না পারেন, তাহলে এতদিন যে শক্তি নিয়ে তিনি নাড়া-চাড়া করছেন, সেটাই তাঁকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

একটা রেল ক্রশিং পার হয়ে গাড়িটা মোড় নিলে। স্যার ধীরানন্দ চকিত হয়ে আবার সানডে ইকনমিস্টের পাতার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। মে মাসের শেষ দুই সপ্তাহ, আর জুনের প্রথম সপ্তাহ—এই তিন সংখ্যার তিনটে আর্টিক্‌ল্ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করছেন। তাঁর পার্সন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট শ্রীঅনিমেষ সেনগুপ্ত এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এই তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। ভালই লিখেছেন।

হঠাৎ একটা গোঙানির সংগে সংগে স্যার ধীরানন্দের গাড়িটার গতি শ্লথ হয়ে এল। তারপর ঢেউএর ওপর মোচার খোলার মতো মুহূর্তের জন্য থরথর করে কেঁপে গাড়িটা থেমে গেল। ঝাঁকুনি খেয়ে সামনের সীটের মাথাটা ধরে ফেলে স্যার ধীরানন্দ চাপা কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন, 'কেয়া হুয়া?'

তাঁর ড্রাইভার বদ্‌রীনাথ বুড়ো লোক, শাদা লম্বা লম্বা চুল, উস্কো-খুস্কো, দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। গাল কুঁচকে গিয়েছে, তার পাঞ্জাবি আর ধুতিও ধোপ-দুরস্ত নয়—কিন্তু তার শিথিল বার্ধক্য দেহেই কেবল, ওর কর্মক্ষমতাকে স্পর্শ করে নি। যে বছর স্যার ধীরানন্দ সেরিডানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে পারলেন, সেই বছরই, তার কয়েকদিন আগে ও চাকরীতে ঢুকেছে। স্যার মুখার্জীর কর্ম-জীবনের সংগে একরকম জড়িয়ে গিয়েছে ও। গাড়িটা থেমে যাবার সংগে সংগে ও ঝুঁকে পড়েছিল স্টিয়ারিংএর ওপর। স্যার মুখার্জীর বিরক্তি ওকে বিচলিত করতে পারল না। ও কেবল কুতকুতে দৃষ্টিতে একবার স্যার মুখার্জীর দিকে তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। যেন ও বলে গেল, 'আউর ক্যা? কল বিগড়া গিয়া...'

স্যার মুখার্জী হাতের পত্রিকাখানা যেন ছুঁড়ে মারলেন সাজিটার ভেতরে। পেছনে হেলান দিয়ে, ছু'হাত আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রেখে গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর যেন ভাবলেন, পত্রিকাটা অমনি করে ছুঁড়ে ফেলা উচিত হয় নি। একটু পরেই সানডে ইকনমিস্টের তিনখানা সংখ্যা হাতে নিয়েই নেমে এলেন গাড়ি থেকে। কর্তব্যহীন, শিথিল অবস্থা, পাদানির কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন বিব্রত হয়ে।

একটু পরে বদ্‌রীনাথ এসে সামনে দাঁড়াল। বললে, 'গাড়ি ঠিক হোনেকা বহুৎ দের হোগা জী···বহুৎ কমসে এক ঘণ্টা লাগেগা···'। ওর নিস্পৃহ ভংগীর আড়ালে মৃদু কৌতুক উঁকি মারছিল কি না কে জানে। বদ্‌রীনাথ জানে তাড়াতাড়ি জুনাপুর পৌঁছাবার জন্য স্যার মুখার্জীর উদ্বেগ কতখানি। কিন্তু লোভী ছেলেকে লোভের মাথাতেই খাবার দেখিয়ে আটকে রাখার মতো করে খবরটা শোনাল ও। বহু দিনের পুরোণ আর খাঁটি ভৃত্য যারা তারা এমনি ধরণের একটা স্নেহের আর সেবার প্রভুত্ব অর্জন করে, যার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্যার ধীরানন্দ গোমরা মুখে ঘড়ির দিকে তাকালেন, পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট। তারপর কিছু না বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ওর দিক থেকে।

জায়গাটা কলকাতা আর জুনাপুরের মাঝামাঝি। একেবারে ফাঁকা, ছু'দিকে ছড়ানো মাঠ, সে মাঠের শেষ দিকে গ্রাম অস্পষ্ট দেখা যায়। শুকনো মাঠ, এই তো ছু' একবার মাত্র বৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত গ্রীষ্মকাল ধরে যে রুক্ষতা জমে উঠেছে তা তখনো যায় নি। কিন্তু এ হচ্ছে বাংলারই কৃষি-অঞ্চল, আর কয়েকদিন পরেই সোনা ফলানোর জন্যে এই রুক্ষতা স্নেহরসে বিগলিত হয়ে উঠবে। স্যার ধীরানন্দ ফাঁকা মাঠটার দিকে একবার তাকিয়ে কি যেন ভাববার চেষ্টা করলেন, তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা বটগাছের তলায়। দীর্ঘ শরীর, পেছনে রাখা ছু'হাতের মধ্যে পত্রিকাগুলো দুমড়ানো অবস্থায় রয়েছে, বোধ হয় নিজের অজান্তেই সেগুলোতে মোচড় দিচ্ছিলেন।

বদ্‌রীনাথ গাড়িটার সীট থেকে একটা কুশন তুলে এনে বটগাছটার নিচে ঘাসের ওপর পেতে দিলে। স্যার মুখার্জী জিজ্ঞাসু, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন বদ্‌রীনাথের দিকে। কিন্তু হলে কি হবে, এছাড়া উপায় ছিল না, ধপ্‌ করে বসে পড়লেন আর অগত্যা আবার দুমড়ানো কাগজগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

কিন্তু গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের ওপর মাঝপথে এই কল বিগড়ানো যতই অবাঞ্ছিত

মনে হোক স্যার ধীরানন্দের কাছে, পরিণামে এটাই তাঁর বর্তমানের কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিলে। সানডে ইকনমিস্টে মিঃ সেনগুপ্তের আর্টিকল্ তিনটে তিনি কলকাতায় চোখ বুলিয়েছেন, রাস্তায় আবার নাড়াচাড়া করেছেন গাড়িতে বসে, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে, রচনা তিনটের অর্থ ঠিকমতো স্পষ্ট হচ্ছে না তাঁর কাছে। বাইরের দিক থেকে মিঃ সেনগুপ্তের বক্তব্য খুবই সামান্য, আর্টিকল্গুলোর শিরোনাম দেখলেই তা বোঝা যায়। 'ঈষ্ট—এ নিউ ফ্রেণ্ড,' 'দি ট্রুথ এ্যাবাউট্ সাউথ্-ঈষ্ট এশিয়া,' আর 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড্ সাউথ ঈষ্ট্ এশিয়া।' লেখক এ-গুলোর মধ্যে একটা কথাই বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, সময় এসেছে যখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথা সমগ্র এশিয়ার বুকের ওপর থেকে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান অবশ্যম্ভাবী, এবং ভারতবর্ষকেই সেই মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব নিতে হবে। আর এই স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অংগই হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। কোনও অঞ্চলের অর্থনীতিক দিকটা কেবল নেতির দিক থেকে দেখবার বিষয় নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশের অর্থনীতিক চাহিদাও বেশি—সেটা মেটাবে কে? ভারতবর্ষকেই এগিয়ে এসে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। অনেকেই কথাটা শুনে মুখ ফেরাবেন, হাসি গোপন করার জন্য। কিন্তু সামর্থ্য অসামর্থ্যের কথা নয়, ইচ্ছাটাই হচ্ছে বড় কথা। এখানে সেই আয়রন-উইল চাই, যা না হলে সমস্যার জটিলতার সামনে কেবল হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শ্রী সেনগুপ্ত এক জায়গায় প্রশ্ন করেছেন, 'উইল ইণ্ডিয়া থ্রব্ ইন হার হার্ট ওনলি অর থ্রব্ উইথ লাইফ এ্যাণ্ড গো এ্যাহেড?'

স্যার মুখার্জী পত্রিকাগুলোর পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। নিজের পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্টের রচনার ওপর এমনি অস্বাভাবিক শ্রদ্ধা অন্য সময় হলে তাঁকে লজ্জা দিত। কিন্তু তিনি ভোলেন নি যে এই অনিমেষই তাঁর জিস্কোর শেয়ার ভাগ্যের একটা পরিবর্তন এনেছেন। কোনও ছাত্র যেমন আত্যন্তিক মনোযোগ আর আয়াসে কোনও কঠিন পাঠ্যাংশের অর্থোদ্ধার করবার চেষ্টা করে, বাস্তবিক পক্ষে তিনিও তাই করছিলেন। আর ক্রমাগতই বিমর্ষ হয়ে উঠছিলেন তিনি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই,—যেমন করে অন্ধকার, পথহারা রাত্রিতে বিদ্যুৎ-চমক হয়, ঠিক তেমনি করে চকিতে একটা সূত্র যেন পেয়ে গেলেন তিনি। আর সূত্রটা কেবল সেই অবস্থায় রইল না, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে ক্রমে পরিপূর্ণরূপে তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'স্প্লেন্ডিড!' স্যার মুখার্জী মুখ তুলে ছোট ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে উঠলেন, 'আমি ঠিক ভেবেছিলাম এর কোনও ইণ্ডিকেশন আছে! মিঃ সেনগুপ্ত ডেমাগগ নন যে কেবল দেশপ্রেমের বুলি আউড়ে আর্টিক্‌ল্‌ লিখবেন। আশ্চর্য! আই এ্যাম্‌ প্রাউড অব হিম···'

স্যার মুখার্জীর দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল! যেদিক থেকে এসেছেন, তাকালেন সেই দিকে। কালো পিচের রাস্তাটা এঁকে বেঁকে চলে এসেছে—দুধারে বনস্পতির সারি, লম্বা, ঝাঁকড়া, কোনটার তলায় পাতা ঝরে পড়েছে—কোনটা একেবারে রিক্ত, কোনটা বা একেবারে পত্রপল্লবে ঢাকা, নিটোল সবুজ মূর্তি। এদিকে পথটার বাঁক নেই—যতদূর চোখ যায় কেবলই বিছিয়ে রয়েছে। আর কয়েক মাইল পরেই বাঙলার এই রূপ থাকবে না, রুক্ষ পাথুরে মাটি, তা ক্রমাগত কঠিন হতে থাকবে। এই পথেরই একপাশে—আর কিছুদূরে জুনাপুর আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল ওআর্ক্‌স্‌।

বদ্‌রীনাথ ঠুং ঠাং করে শব্দ করছে। সামনের এঞ্জিনের ঢাকাটা খুলে ফেলেছে ও। ওর পা'দুটো কেবল দেখা যায়, মাথাটা অদৃশ্য হয়েছে ওধারে। ওকে পাশ কাটিয়ে ট্রাক, গরুর গাড়ি, প্যাসেঞ্জার-বাস মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী দৃষ্টি, আর চিৎকার ছুঁড়ে দিতে গিয়ে স্যার মুখার্জীর দিকে দৃষ্টি পড়তে থমকে যাচ্ছে।

মাঠের ওপর এরই মধ্যে লাঙল পড়েছে—একটু আগে পর্যন্ত লাঙল ঘাড়ে চাষীরা আসছিল, এখন সকলেই কর্মরত।

স্যার মুখার্জীর বটগাছটা থেকে একটু দূরে একটা বুড়ো চাষী গরুর লেজ মুড়ে মুড়ে লাঙল চালাচ্ছে। তা পেরিয়ে সমস্ত মাঠ: অপরাহ্নের শেষ আলোর তীক্ষ্ণতা কমে নি তখনও, কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য চোখে পীড়া দেয় না।

'বাবুজী, গাড়ি ঠিক হুয়া···' বদরীনাথ সামনে এসে দাঁড়াল। ওর হাতের তেল-কালি তখনও সে বহু-ব্যবহৃত একটা তোয়ালেতে করে মুছে মুছে তুলবার চেষ্টা করছে।

স্যার মুখার্জী চোখ ফিরিয়ে তাকালেন ওর দিকে। তাঁর ভাসা-ভাসা চোখে স্নিগ্ধতা ঝরে ঝরে পড়ছে। বদরীনাথের কথা শুনে উঠে দাঁড়ালেন। যেন কৌতুক করে বদরীনাথের ঘাড়ের ওপরকার পাঞ্জাবির কোণটা ধরে টেনে আনলেন কাছে। বাঁ-হাত বাড়িয়ে সামনের চাষীটার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বদরী, এবার তো ওরা ধানের বীজ বুনবে। বৃষ্টি যদি এখন নাও হয়, তাহলেও নিশ্চয় অনেকগুলো চারা বেরোবে?'

বদরী অলক্ষিতে একবার কুতকুতে দৃষ্টিতে তাকাল স্যার মুখার্জীর দিকে। কিন্তু ততক্ষণে সম্মতিতে ওর ঘাড় নত হয়ে এসেছে, 'জী, হাঁ…'।

অধ্যায় ২

স্যার ধীরানন্দের গাড়ি যখন চাঁতার মোড়ে পাক খেয়ে জুনাপুরে ঢুকল, তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পেরিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে চাঁতার মোড়টা যেন গমগম করতে থাকে। মজদুর, পথচারী, জুনাপুর-আসানসোল বাসের প্যাসেঞ্জার, চা-পান বিড়ি সিগারেট, ফেরিওয়ালাদের হাঁক সব মিলে জায়গাটার চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। এখন খাঁ-খাঁ করছে। দুটো খেঁকি কুকুর জড়াজড়ি করে পড়ে ছিল রাস্তার মাঝখানে। ধুলোর সংগে মিশে গিয়েছে এমনি, হেড লাইটের আলো পড়ে ওগুলোকে চিনবার উপায় ছিল না। তারপর গাড়িটা কাছে এসে একেবারে ওগুলোর ঘাড়ে পড়তেই কেঁউ-কেঁউ করে পালাল। স্যার মুখার্জী হঠাৎ চমকে উঠে তাকালেন, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না।

কারখানার বাউণ্ডারী দেওয়ালের পাশ দিয়ে এই রাস্তাটা কিছুদূর গিয়ে ডান দিকে বেঁকেছে—তারপর মিশেছে গিয়ে স্টেশনের কাছে ক্লাব রোডের সংগে। কিন্তু রাস্তাটার সংগে পাশের আর সব কিছু যেন মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে—সব কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ভাব। অন্ধকারের জন্যে নয়, কেন না প্রথম সন্ধ্যাতেই অন্ধকার এখনো গাঢ় হয় নি। বরঞ্চ মনে হয়, অসহ্য গরম, আর একটু আগে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হওয়াতে সমস্ত আবহাওয়াটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। রাস্তার ওপর লাইট-পোস্টের থেকে যথারীতি আলো পড়েছে, কিন্তু হঠাৎ মনে হয়, আলোর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব কিছুই অস্পষ্ট কিংবা যা দেখা যাচ্ছে, স্পষ্ট করে বোঝা যায় না জিনিসটা কি। বাউণ্ডারী দেয়ালটার পাশে জলের নালাটা থেকে মনে হয় দুটো শুয়োর উঠে এল। কারখানা চালু থাকার সময় নালাটা দিয়ে কলকল করে জল ছুটতে থাকত, এখন যেন শুকিয়ে যাওয়া জিবের মতো আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

স্যার ধীরানন্দ ভাবছিলেন। তিনি যদি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জুনাপুর ওআর্ক্‌সে লক আউট ঘোষণা না করতেন, তাহলে শ্রমিকরা প্রস্তুত হয়ে উঠছিল, তারাই ধর্মঘট করে বসত। কিন্তু সেটাও আবার বড় কথা নয়, শ্রমিকরা যদি

আগেই ধর্মঘট করার সুযোগ পেত, তাহলে কারখানাটাই ওদের আয়ত্তে চলে যেত। কথাটা মনে আসা মাত্রই স্যার মুখার্জীর ডান পাটা থর থর করে কেঁপে উঠল। একটা স্টীল কারখানা ওদের হাতে চলে যাবার অর্থ কী তা তো তাঁর অজানা নয়।

'দে কুড্ মেক এ্যাণ্ড আন্‌মেক এনিথিং দে লাইকড্, দ্যাটস্ ইট···' উচ্চারণ করলেন স্যার মুখার্জী।

গাড়িটা স্টেশন পেরিয়ে ক্লাব রোডে এসে পড়ল। পিচ-ঢালা কালো রাস্তা, দু'পাশের ঝাঁকড়া গাছগুলো ডালপালা জড়াজড়ি করে যেন মাথা নিচু করে রয়েছে। লাইট পোস্টের আলোগুলো অতন্দ্র রক্তচক্ষুর মতো স্থির। ওদিকে তবু দু'একজনকে দেখা যাচ্ছিল রাস্তায়, এদিকে একটা প্রাণী পর্যন্ত নেই। মনে হয় কবে জুনাপুর ছেড়ে চলে গেছে সবাই। সুপিরিয়র ক্লাবের পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখ ফেরালেন স্যার মুখার্জী। উৎসব-মুখর সুপিরিয়র ক্লাবের উল্লাসের ঢেউ পৌঁছোত অনেক দূর পর্যন্ত। সেই ক্লাবের গেট খোলা হয় নি। ইট কাঠ পাথরের প্রাসাদটা আধো অন্ধকারে ঢাকা প্রেতপুরীর মতো—সুইমিং পুলের ওপর এর চেহারা ডবল হয়ে পড়েছে। ক্লাবটার নির্জীব শৈত্য যেন বাকি রাস্তাটার ওপর অসম্ভব ভারের মতো চেপে বসেছে।

তবু এরই মধ্যে স্যার মুখার্জী বুক শক্ত করে রয়েছেন। অন্ধকারে তাঁর মুখ ভাল করে দেখা যায় না, কিন্তু প্রেতপুরীর যাদুকরের মতো একটা জ্বালা-দেওয়া আত্মবিশ্বাস তাঁর চোখে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছেন তিনি—এর প্রয়োজনও হয়তো ছিল। এর তলায় পিষে মরতেন হয়তো, কিন্তু এর ওপর নিজের প্রাসাদ কি করে গড়ে তুলতে হয় তার চাবিকাঠি পেয়ে গেছেন তিনি। এখন সেটা ব্যবহার করতে পারলেই হল।

জুনাপুর হোটেলের পোর্টিকোর নিচে তাঁর গাড়ি এসে যখন থামল তখন বারান্দার ওপর পেছনে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি—এই নাট্যের সূত্রধার, লেবার এ্যাণ্ড ওয়েল-ফেয়ার অফিসার শ্রী অমরেশ ব্যানার্জী। একমাত্র তিনিই অপেক্ষা করছিলেন স্যার ধীরানন্দের জন্য। এমন কি হোটেলের ওয়েটাররা একটু আগে পর্যন্ত জানত না যে ডিরেক্টার সাহেব জুনাপুরে আসবেন। তার কারণও ছিল—এটা স্যার ধীরানন্দের আনুষ্ঠানিক পরিদর্শন নয়। জুনাপুর যাত্রা করার আগে পর্যন্ত তিনি জানতেন না এ যাত্রার ফল কি। পরিস্থিতিটা তিনি নিজে একবার দেখে যেতে চান এমনি একটা ভাবই তাঁর ছিল। তারপর

পথের মধ্যে ব্রেকডাউন হল,—হ্যাঁ, এই ব্রেকডাউনের ভেতর দিয়েই তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন, পাবেনও। জুনাপুরের যে প্রেত-বিভীষিকা এইমাত্র তিনি পেছনে ফেলে এলেন তাঁর মনের ভেতর তা অস্পষ্ট হয়ে এল।

গাড়িটা পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়ানো মাত্র শ্রী ব্যানার্জী তরতর করে নেমে এলেন। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিলেন তিনি। তারপর সামনে হাতের ওপর হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। সনম্র, গর্বিত কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, দেরি হয়ে গেল যে, রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় নি তো?' তাঁর হাসি হাসি মুখের ভাবটা যেন এই: 'এইবার নিজের চোখে দেখে যান, স্যার, ঠিক জিনিসটাই করতে পেরেছি কি না।'

স্যার মুখার্জী গাড়ি থেকে নেমে এক মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হাসতে হাসতে হাতের সাজিটা শুদ্ধ জড়িয়ে ধরলেন শ্রী ব্যানার্জীকে, 'হ্যালো, অমরেশ, ভাল আছো?'

শ্রী ব্যানার্জী এই পুরস্কারের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। স্যার ধীরানন্দের আলিংগনের মধ্যে বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি। কিছু একটা বলতে গেলেন, কিন্তু কেবল দু'একটা অস্ফুট 'স্যার,' 'আমি' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু খুব টান করে বাঁধা তার যেমন পটাং করে ছিঁড়ে যায়, তেমনি করে তাঁর আবেগের মাঝখানটায় হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যেন। স্যার ধীরানন্দ বলছেন, 'তুমি অদ্ভুত কীর্তি অর্জন করেছো—তুমি ছাড়া এটা আর কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তুমি যদি আমার আত্মীয় না হতে, তাহলে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তোমাকে অভিনন্দন জানাতাম। তবু···' এই সময় শ্রী ব্যানার্জীকে তিনি আর এক দফা চাপ দিলেন বুকের ওপর। কিন্তু বেয়ারাদের সামনে সংযত করলেন নিজেকে, শ্রী ব্যানার্জীকে ছেড়ে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'তবু এ হচ্ছে অতি তুচ্ছ। যা করতে হবে তোমাকে-আমাকে এরপর, তার তুলনায় যা করা হয়েছে তা হচ্ছে একটা ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট্ ডট্, ইয়েস। শোন আমার কথা, ডোণ্ট্ লুক লাইক ছাট্···আমি মোটেই তোমার কীর্তিকে ছোট করছি না, ওটা না হলে যা করতে হবে তা কখনই সম্ভব হত না···'

শ্রী ব্যানার্জী অন্ততো জানতেন, কী করে আত্মস্থ হতে হয়। এর মধ্যেই তাঁর মুখের ভাব শক্ত হয়ে উঠেছিল। মৃদু হেসে বললেন, 'সব কিছুর জন্যে সব সময়ই আমাকে প্রস্তুত থাকতে হয়, স্যার···'

স্যার ধীরানন্দ সিঁড়িতে উঠছিলেন। শ্রী ব্যানার্জীর ঠাণ্ডা স্বর এবং তার

কারণ বুঝলেন। কিন্তু তবু বললেন, 'তোমার সংগে আমার একরাশ কথা আছে, আজ সমস্ত রাত্রি বলে শেষ করতে পারব না। কিরে পিয়ারী, ভাল আছিস··· আমার রুম ঠিক করেছিস, না কি···'। বুড়ো খানসামা পিয়ারীচরণ এতক্ষণ ছোট ছেলেদের উড়ন্ত প্রজাপতি ধরার মতো করে দু'হাত বাড়িয়ে ঘুরছিল, ওঁর হাতের সাজিটা নেবার জন্যে। সেই সাজিটা এখন তার হাতে এল। নত হয়ে সেলাম করে সে বললে, 'জী, আপনার রুম ঠিক আছে। দিদিমণি এসেছেন শুদ্ধ, তিনি এখনও গুছাইছেন সব···'

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে পড়লেন স্যার মুখার্জী, 'দিদিমণি···কে?' শ্রী ব্যানার্জী বললেন, 'সুমিত্রা এসেছে। আপনার ফোন পেয়ে ও আগেই চলে এসেছে এখানে।'

'ওঃ, তাই না কি। ছেলে না আসতেই মা এসে হাজির! পিয়ারী, তুই সাজিটা নিয়ে আমার রুমে যা। অমরেশ···' স্যার ধীরানন্দ সিঁড়ির মাথার থেকে সরে গিয়ে দেয়ালের ধারের দিকে দাঁড়ালেন। ঠিক মাথার ওপরকার আলোটার থেকে পোকাগুলো উড়ে এসে বিরক্ত করছিল। বললেন, 'এস-আর-মিটারকে একবার তোমায় কন্‌ট্যাক্ট্ করতে হ'চ্ছে। আজই আমি ওর সংগে কথা বলে নিতে চাই।'

'আমি এখনই ওঁকে কল দিচ্ছি···'

সম্মতিতে ঘাড় নত হয়ে এল স্যার মুখার্জীর, কিন্তু হঠাৎ উনি ভিন্ন স্বরে বললেন, 'দেখ, আমি ভাবছি কি, আজকাল যদি আমরা অনেক 'ইজ্‌মে'র সংগে 'অফিসিয়ালিজ্‌ম'টাও ভুলতে পারি তাহলে অনেক কাজ দেবে না কি? ওহো, তুমি বোধ হয় ভাবছ আমি কি বলতে চাই? ঠিক তাই। আরে, আমিও এখন সব কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না, পরিষ্কার করে আমিও এখনও বুঝি নি। কিন্তু তোমাকে আমার বোঝাতেই হবে···তা না হলে···আচ্ছা, অমরেশ, অনিমেষের চিঠিপত্র পাও না তুমি?'

শ্রী ব্যানার্জী বললেন, 'সুমিত্রার কাছে মাঝে মাঝে চিঠি আসে, তার কাছ থেকে সমস্ত খবর পাই···'

'ছাট্‌স্ অলরাইট। তোমার সংগে আবার দেখা হচ্ছে···'

যতক্ষণ বারান্দা দিয়ে স্যার ধীরানন্দ তাঁর রুমের দিকে এগোতে লাগলেন, দেখা গেল ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রী ব্যানার্জী। একটা বিচিত্র হাসি কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর মুখের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই প্যাণ্টের পকেট থেকে পাইপ বের করে মুখে পুরলেন। একটু পরেই তাঁর গাড়িটা পোর্টিকো থেকে হুস করে বেরিয়ে গেল। এই কীর্তিমান লোকটি একটু আগেও বিজয়ী বীরের

মর্যাদায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, জুনাপুর হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই তাঁর নিজের প্রভুই অন্তত দুটি জায়গায় তাঁকে বিদ্ধ করলেন। বুঝলেন, স্যার মুখার্জী টমসনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চান। আর বুঝলেন, অনিমেষই এখন স্যার মুখার্জীর সব হয়ে উঠেছেন। শ্রী ব্যানার্জীর সেখানে কোনো প্রয়োজন নেই।

অধ্যায় ৩

স্যার ধীরানন্দ ঘরে ঢুকেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'সুমিত্রা, মা, নিজে হাতে এসব করতে গেলে কেন? পিয়ারী কি দোষ করলে···হ্যাজ হী ডান সামথিং ফুলিশ?' ঘরটায় ঢুকেই বাঁ-দিকে স্টীল-ফ্রেমের বেড্‌স্ট্যাণ্ড, সুমিত্রা চাদর পেতে বালিশটা ঠিক করে দিয়ে শেষ করলেন। এদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বললেন, 'তা নয়তো কি! আমার জ্যেঠুমণির ঘর সাজাতে ও আসবে কেন, সেইজন্যে ওকেই তাড়িয়ে দিয়েছি। পিয়ারী দেখ্‌তো, গরম জল নিয়ে আয়···'

সুমিত্রার যেন একটু পরিবর্তন হয়েছে। বোধ হয় একটু মোটা হয়েছেন, নয়তো কোনও একটা খুশির জন্যে ওঁকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত, হাসি দিয়ে একটা বেদনা নিঃশব্দে ঢেকে রেখেছেন তিনি। স্যার মুখার্জীর পক্ষে এ খুশির মানে বুঝবার উপায় ছিল না। ইংলণ্ড থেকে পড়াশুনা সেরে ফিরে আসার পর সুমিত্রা যেন ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। কোন সময়েই সাজ-পোষাকের জাঁক-জমক ছিল না। এখনও অবশ্য রঙ-চঙ বলতে যা বোঝায় তা পরেন নি। হালকা বাদামী রঙের ভয়েল, তাতে পাড় নেই। নার্সদের মতো আঁটো-সাটো করে পরেছেন। বাড়তি আঁচলটা কোমরে বেড় দেওয়া। মনে হয়, কাজ করবার জন্যেই তৈরী হয়েছেন, তাঁর মনোভাবের সংগে এটা ভারি মিলেছে। আগেকার মতোই বাঁ-হাতের মণিবন্ধে ঘড়ি, ডান-হাতে একখানা চুড়ি, কিন্তু আজ গলায় একটা হার দিয়েছেন, সরু মটরমালা, সাবেক আমলের। তাঁর খুশি মুখের নিচে চোখে পড়ে।

স্যার মুখার্জীর ভাসা-ভাসা চোখ ঝিকিয়ে উঠল। পথশ্রমের ক্লান্তি যেন ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেলেন। সামনের সোফাটার উপর বসে পড়ে বললেন,

'আমি ভাবছি এই বিরাট পৃথিবীতে মায়েরা যদি না থাকতেন, তাহলে কি হ'ত। ওখানে 'মুনশাইন' ভিলা'তে পেয়েছি আমার কমলা মাকে, আর এখানে রয়েছ তুমি…'

সুমিত্রার হাসি-মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বোধ হয়, কিন্তু উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না—না, আপনি বসবেন না, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, যান। তারপর ধীরে সুস্থে কথা হবে।'

'আমি উঠছি, উইথ প্রোটেস্ট, অফ কোর্স…'

ডানদিকের দেয়ালের দূরতর কোণে বাথরুমের দরজা—সেদিকে এগোতে এগোতে স্যার মুখার্জী বললেন, 'জানো, আজকাল আমরা যতই বড় বড় জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাই না কেন, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই : হোম, সুইট হোম… ঘরের মধ্যে কাউকে না পেলে ঠিক মতো পাওয়াই হয় না।'

সুমিত্রা চকিতে মুখ তুলে তাকালেন। স্যার মুখার্জীর এই উৎসাহের আবেগ তাঁর কাছে খট্ করে লাগল। কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। স্যার মুখার্জী দরজার হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

ঘরটি খুব বড় নয়, কিন্তু ওরই মধ্যে ছিমছাম করে সাজানো শেষ হ'ল। আসবাবপত্র সংক্ষিপ্ত, প্রায় অধিকাংশই স্টীলের তৈরী। বিছানার পাশে ওদিকের কোণায় একটা বুক কেস, সামনে টেবিল আর একটা চেয়ার। ছোটখাটো স্টুডিওর মতো হয়েছে। মেঝের মাঝখান থেকে ডান দিকের দেয়ালের কাছাকাছি পর্যন্ত চক্রাকারে সোফা সাজানো, মাঝখানে গোলাকার একটা টেবিল। সুমিত্রা ফ্লাওয়ার ভাসে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা রাখলেন।

এরপর ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। স্যার মুখার্জী আর সুমিত্রা টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসেছেন। স্যার মুখার্জী পোষাক বদলে ফেলেছেন এর মধ্যে, হাল্কা পাজামা আর হাফ্ শার্ট চড়িয়ে নিয়েছেন। বসেছেন হেলান দিয়ে, দুই হাতের তেলো জড়াজড়ি করে মাথার পেছনে রাখা। পিয়ারীচরণ টেবিলের ওপর থেকে প্লেট কাপ সরিয়ে নিয়ে গেল।

স্যার মুখার্জী বললেন, 'আমি যে খুব কফি খাই, সেটাও তুমি মনে করে রেখেছ !'

সুমিত্রা দুই হাঁটুর ওপর দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে পড়েছিলেন। নখ খুঁটরোতে খুঁটরোতে বললেন, 'আজ আর আপনি কথা বলবেন না…আপনি বরঞ্চ শুনুন। আমি জুনাপুরের কথাই বলছি। ফায়ারিংএর পর থেকে এরা

ভীষণ প্যানিকি হয়ে উঠেছে। আজ বারো দিন হয়ে গেল এরা এখনো রাস্তায় বেরোয় না। আমার হাসি পায়, জানেন জ্যেঠুমণি, এরা সব সময়েই ভাবছে লেবাররা ছুরি উঁচিয়ে রয়েছে, রাস্তায় বেরোলেই বুকে বসিয়ে দেবে…'

সুমিত্রা একটুখানি চুপ করে রইলেন। যেন তাঁর মনের মধ্যেই একটা দ্বিধার ভাব এসেছে। তারপর ম্লান হেসে বললেন, 'এরা কত দুর্বল না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দুঃখ হবে কি, হাসিই পায়। হপ্তায় দু তিনবার সিনেমা হাউসে না গেলে এদের রাত্রে ঘুম হত না, আর এই বারো দিন সিনেমা হাউসটাই বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।'

স্যার মুখার্জী মাথার ওপর থেকে হাত দুটো নামিয়ে এনে বুকের ওপর জড়াজড়ি করে রাখলেন। বললেন, 'এটা কেন হয়েছে জানো, অন্যের প্রতি ভয় আর অবিশ্বাস আমাদের এমনি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে কিছুতেই অন্যকে বুঝতে পারি না। এখনকার জগতে এ দুটো যতখানি ক্ষতি করেছে, তোমার এ্যাটম আর হাইড্রোজেন বম্‌ও ততখানি করতে পারে নি।'

সুমিত্রা থমকে গেলেন। যেন স্যার মুখার্জীকে কথাটা শেষ করতে দেবার জন্যেই বললেন, 'আপনি ভয় আর অবিশ্বাস বলে কি বোঝাতে চান?'

'কেন, তুমি দেশগুলোর দিকেই তাকিয়ে দেখ না, একে অন্যের বিরুদ্ধে কেবল তাল ঠুকেই চলেছে। অথচ এরা যদি নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখে, তাহলে বুঝবে যে এতেই তাদের কতখানি সর্বনাশ হচ্ছে। জুনাপুরের ঘটনাটাকেও আলাদা করে দেখবার প্রয়োজন নেই। এখানে আমরা অনেকে মিলেই একটা জিনিস গড়ে তুলেছি, এই স্টীল কারখানা, কিন্তু আজ আমরা নিজেরাই মিলতে পারছি না। অথচ…'

স্যার মুখার্জী এর পর আগ্রহে মন্থর হয়ে এলেন, 'অথচ আমরা সবাই যদি মিলতে পারি তাহলেই দেখতে পাব, আমাদের সামনে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে, যেটা করণীয় আছে, তার তুলনায় আমাদের নিজেদের মত-বিরোধ কিছু নয়।' কথাগুলো বলতে স্যার মুখার্জীর ভালই লাগছিল, কেননা এর মধ্যে আশ্চর্য একটা নূতনত্ব রয়েছে। উনি আজ যখন কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলেন, তখন কল্পনাও করতে পারতেন না এসব কথা তিনি বলবেন। মিঃ সেনগুপ্তের প্রবন্ধগুলি তাঁর সমস্যার সমাধানই শুধু করে নি, তাঁর হৃদয়কেও মুক্তি দিয়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নেতৃত্বের একটা স্বপ্ন কেমন করে তাঁর মধ্যে একটা আবেগের সঞ্চার করছিল।

সুমিত্রা স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্যার মুখার্জী কোন্ দিক থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছোচ্ছেন, উজ্জ্বল সম্ভাবনা বলতে কি বোঝাতে চান তাও পরিষ্কার হল না তাঁর কাছে। কিন্তু ফায়ারিংএর পর থেকে তিনি নিজে যে চিন্তা করেছেন,—আর কাজও করছেন—সেইটের থেকেই এই যুক্তির সমর্থন পেলেন। বললেন, 'তাহ'লে সবার আগে তো আমাদের মজদুরদের পাশেই যাওয়া উচিত। তারাই তো আজ ওআর্স্ট-সাফারার...'

'ওঃ, নিশ্চয়ই। আমার নিজের এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নেই। আমরা যা-কিছু করতে যাই না কেন, লেবার হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সহায়। যে-কোন জিনিসকে তারা ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে...আর আমাদের কেবল জানা উচিত হাউ টু ডীল উইথ দেম। তাদেরকে বুঝতে শেখা আমাদের কর্তব্য।'

সুমিত্রা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি এই খবরটা কি ভাবে নেবেন জানি না, কিন্তু আমরা দু'একজন...আপনি শংকরী মুখার্জীকে হয়তো চেনেন না, মনোতোষ বাবুর মেয়ে...আমরা লেবারদের যথাসাধ্য সার্ভিস দেবার চেষ্টা করছি। জুনাপুর হাসপাতালে এমনিতে যথেষ্ট নার্স নেই, অথচ ফায়ারিং-এর পর পঁচাশি জনকে হাসপাতালে দিয়ে গেল। তাদের সবাইকে অবশ্য নয়, উনচল্লিশ জনকে বেড দিতে হয়েছিল, আজকে অবশ্য একুশে নেমে এসেছে...'

সুমিত্রা চোখ নিচু করে কথা বলছিলেন। তাঁর শাড়িটা যেখানে ডান পায়ের ওপর দিয়ে কার্পেটের ওপর পড়েছিল, সেদিকেই দৃষ্টি ছিল তাঁর। হঠাৎ চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাতে হল তাঁকে। স্যার মুখার্জী দুহাত ছুঁড়ে চাপা আবেগের সংগে বলে উঠলেন, 'হুররে, আই কনগ্রাচুলেট ইউ, মাই চাইল্ড্...'

তারপর যেন নিজের আবেগ চাপতে চাপতে বললেন, 'তুমি যা আরম্ভ করেছ তার জন্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কেবল আহত মজদুর কেন, যারা নিহত তাদের পেছনে তাদের পরিবারও পড়ে রয়েছে। ফায়ারিং-এ মৃত্যুই হয়েছে চোদ্দ জনের। আমাদের এখন দেখা দরকার তাদের জন্যে আমরা কি করতে পারি। যে কোন রিজনেবল সাম তোমার হাতে তুলে দিতে আমার আনন্দই হবে। আমি এটা জানতাম না, বাট্ ইউ প্লীজ্ মী ভেরি মাচ, রীয়েলি...'

সুমিত্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওঁর দিকে। সংশয়ের একটা কালো ছায়া তাঁর মনের মধ্যে ভেসে উঠল, কিন্তু কিছুতেই এই মৃদুস্বভাবা মেয়েটি বলতে পারলেন না, শ্রমিকদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পর এই বদান্যতা কতখানি

কুৎসিত দেখায়। বললেন, 'জ্যেঠুমণি, আমি যদি ভুল করি আমাকে মাপ করবেন। আর কারখানার পলিসি নিয়ে আমি খুব গভীরেও যেতে চাইনে, আমার ক্ষমতাও নেই...কিন্তু দেখুন, মিঃ টমসন ছ'মাস আগে লেবারদের জন্যে একটা ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম নিতে চেয়েছিলেন। আমি যতদূর জানি, সেই প্রোগ্রাম বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল!'

পথ চলতে চলতে হঠাৎ উদ্যত ফণার সামনে পড়লে মানুষ যেমন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, স্যার মুখার্জীর অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়ে উঠল। প্রথমটা তিনি তো-তো করতে লাগলেন, কথা আটকে গেল। কিন্তু মুহূর্তে তীব্র আকর্ষণে রাশ টেনে সংহত করলেন নিজেকে। যদি এই স্নেহশীলার কাছে তিনি অসতর্ক অবস্থায় না থাকতেন, তাহলে তাঁকে হয়তো এমনি অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হত না। সুমিত্রা আবার চোখ নিচু করেছিলেন, তা না হলে দেখতে পেতেন, এতক্ষণকার জ্যেঠুমণির কাছে আর তিনি বসে নেই। তাঁর সামনে বসে আছেন সেরিডান এ্যাণ্ড কোম্পানীর অন্যতম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, যিনি বাহাত্তরটি বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তাঁর নরম ভাসা-ভাসা চোখও কখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেই কঠিন উত্তপ্ত দৃষ্টির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

স্যার মুখার্জী পরিষ্কার ভারিক্কি গলায় বললেন, 'এটা খুব সোজা। সব জিনিস সব সময় করা যায় না, তারও একটা সময়-অসময় আছে। এখন আমরা লেবারদের জন্যে একটা ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম ইচ্ছে করলে নিতে পারি। তুমি হয়তো শুনলে আশ্চর্য হবে, আমরা যা করতে চাই তার জন্যে জুনাপুরে যে ঘটনা ঘটে গেল তার প্রয়োজন ছিল।' কথাগুলো যেন সুমিত্রাকে বললেন না তিনি, যেন কোন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন।

সুমিত্রা চমকে উঠলেন কিন্তু তাঁর বলার কিছু ছিল না। দলগত কোন সংঘাত তাঁকে কেবল পীড়িতই করেছে, আকৃষ্ট করতে পারে নি। এমন কি সেটা তাঁর জীবনে একটা কঠিন সমস্যাও হয়ে ওঠে নি। তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পালা অন্যত্র মিটে গিয়েছিল। অন্ততো, মিটিয়ে দিয়ে এসেছেন বলেই তিনি বিশ্বাস করেছেন। তা না হলে এমনি করুণায় তিনি এদের মাঝখানে নেমে আসতে পারতেন না। চুপ করে রইলেন তিনি।

স্যার মুখার্জী এই কল্যাণীয়া নম্র মেয়েটির মুখের ভাবটা উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন। যেটা কখনো কখনো খুব অস্পষ্ট ভাবে মনে হয়েছে সেটাই এখন

স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। অমরেশের একমাত্র কন্যা ও, কিন্তু তার সংগে এর কত তফাৎ। কত নরম আর লক্ষ্মী মেয়েটি। এই মুহূর্তে, এতক্ষণ পরে তাঁর মনে হ'ল, কোনও গভীর বেদনা হয়তো ওই মেয়েটি নিজের মধ্যে বহন করছে। যে কথা তিনি বলছেন, সে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না ওর কাছে, কিন্তু না বলেও তো তাঁর উপায় ছিল না।

কতক্ষণ এইভাবে কাটল। একসময় সুমিত্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জ্যেঠুমণি, আমি এখন যাই। বাবা বোধহয় আবার আসবেন। তা ছাড়া আপনার এখন একটু বিশ্রামের দরকার।'

সুমিত্রা দরজার কাছ পর্যন্ত চলে এসেছিলেন, এমন সময় স্যার মুখার্জী ওঁকে থামালেন। অন্য প্রসংগ এনে শেষকালে আবহাওয়াটাকে একটু হালকা করে দিতে চাইলেন তিনি। হেসে বললেন, 'অমরেশের কাছে শুনলাম, অনিমেষ তোমার কাছে প্রায় চিঠিপত্র লেখে। কেমন আছে সে, তার নিজের খবর কিছু লেখে ?'

এমনি হয় মাঝে মাঝে, কিছুতেই এড়ানো যায় না—ব্যথার জায়গাটায় ঠিক ঘা এসে লাগে। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। সুমিত্রার দেহে যেন একটা কাঁপুনির ঢেউ খেলে গেল। চোখের ভেতরটায় চারপাশ থেকে জ্বালা করে উঠল, জলে ভরে এল আস্তে আস্তে। কিন্তু আর অপেক্ষা করাও চলে না। বললেন, 'বলছি। কিন্তু একটা জিনিস কেমন ভুল হয়ে গেছে দেখুন···' হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ্‌টা অফ করে দিলেন সুমিত্রা, মুহূর্তে ঘরটা অন্ধকার হয়ে উঠল। কিন্তু এও মুহূর্তের জন্যে, পরেই সবুজ আলোটা জ্বলে উঠে ঘরটাকে স্নিগ্ধ আলো-আঁধারিতে ভরে দিলে। সুমিত্রা ফিরে বললেন, 'এ না হলে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হ'ত। এরপর দরকার হলে জ্বালিয়ে নেবেন। আপনি তো অনিমেষবাবুর ব্যক্তিগত খবর জানতে চাইছিলেন···কিন্তু সেসব কিছুই তিনি লেখেন না।'

'তাই নাকি। কী তাহলে লেখে সে ?' স্যার মুখার্জীর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল।

সুমিত্রা বুঝলেন কথা এড়াতে গেলে কথা বাড়াতে হবে। তাই বললেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা · সেখানকার মানুষ, দৃশ্য, বৈশিষ্ট্য এইসবের বর্ণনা দেন।'

'ইজ ইট্‌···' লুব্ধ ছেলের মতো বলে উঠলেন স্যার মুখার্জী। সেই প্রবন্ধ

তিনটের কথা মনে হল তাঁর—এখানেও সেই দক্ষিণ-পূর্ব [illegible]য়া! বললেন, হাসতে হাসতে, 'ওর হচ্ছে ওই দোষ, ও যা লেখে তার [illegible] থেকে ওর মনের কথাটা বুঝে নিতে হয়। এমনি পাওয়া যায় না।'

'ওঃ...' কেমন নীরস কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে চলে গে[illegible] সুমিত্রা।

সেই অবস্থায় অর্থহীনভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন স্যার মুখার্জী। ঘরটার আলো-আঁধারির মতো তাঁর চিন্তার মধ্যেও একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠছিল। বুঝলেন, একটা সুর কেটে গেছে। কিন্তু, কিন্তু তা যদি গিয়ে থাকে, তাহলেও তার জন্যে অন্য পথ ছিল না।

ঢুকবার দরজার ঠিক বিপরীত দিকে একটা দরজা এতক্ষণ বন্ধ ছিল। আস্তে আস্তে ওটা খুলে ছোট্ট ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। চোখ তুলে তাকালেন সামনে, কিন্তু এ কি! কতবার এই ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়েছেন তিনি। কারখানার আলোয় সমস্ত জুনাপুরটা উৎসবের মতো জল-জল করত। জুনাপুরের চারপাশে বিশ মাইল দূর পর্যন্ত এ আলো দেখা যেত। এখন সেই আলো নিবে গিয়েছে। সমস্ত জুনাপুর যেন একটা কালো মুখোশ পরে রয়েছে। কেবল ব্লাস্ট্ ফার্ণেসটাকে নিবে যেতে দেওয়া হয় নি—গ্যাস জালিয়ে ওটাকে 'জীবন্ত' অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেটুকু আলো আভার মতো ছিটকে পড়েছে, তাতে অন্ধকারটাকেই যেন আরো জমাট করে দিয়েছে। যেন একটা অন্ধ আক্রোশের মতো, বের হবার পথ না পেয়ে গুম খেয়ে পড়েছে। এই কারখানার পাশ দিয়েই মৃত জুনাপুর পেরিয়ে এসেছেন তিনি। অতর্কিতে স্যার মুখার্জীর বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল।

অধ্যায় ৪

সুমিত্রা ব্যানার্জী তাঁর শোবার ঘরে জানালার রেলিঙে মাথা হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ঘর অন্ধকার, বাইরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সামনে বাগানের মধ্যে গাছ আর ফুলের ঝাড়গুলো অস্পষ্ট, কেবল বাতাসে নাড়া খাচ্ছে। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে গায়ে। জুনাপুরের সারা-দিনকার তীব্র জলুনির পর এই হাওয়া সুধা বর্ষণ কর[illegible] পারত, কিন্তু তাঁর সে রকম অবস্থা নয়। সুমিত্রা

বাঁ-দিকের রেলিঙে একবার মাথা রাখেন, তারপর আবার ডান দিকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে অবসন্নের মতো পড়ে থাকেন। তবু তাঁর চোখে ঘুম নেই। একটু আগেই তিনি ঘড়ি দেখেছেন, একটা বেজে দশ মিনিট। 'থানার ঘড়িতে এর পর দেড়টার ঘণ্টা পড়বে, তারপর দুটোর। আর আমাকে বোধহয় পর পর ঘণ্টা গুণে যেতেই হ'বে···' ভাবলেন সুমিত্রা।

বাতাসের সঙ্গে মৃদু আর ভিজে-ভিজে রজনীগন্ধার গন্ধ নাকে এসে লাগে, মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়। মুহূর্তের জন্য উত্তপ্ত স্নায়ুগুলো স্নিগ্ধ হয়ে এলিয়ে পড়ে, তার পরেই ধুঁইয়ে পুড়তে থাকে শুকনো খড়ের মতো। 'উঃ, মাগো, কি কষ্ট!' সুমিত্রা কপালটা আরো জোরে চেপে ধরেন রেলিঙের ওপর। 'আর কি আশ্চর্য! এই জন্যে···জ্যেঠুমণি না হয় একবার নামটাই করেছিলেন···কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার নিজেকে আমি এতটুকু জানি না, আমার ওপর আমার নিজের কোন জোর নেই!'

কিন্তু এই কথা মনে আসার সংগে সংগে ভেতর থেকে প্রচণ্ড বেগে না-না করে উঠলেন সুমিত্রা। রেলিঙ থেকে মাথা তুলে নিয়ে স্ফুরিত হয়ে উঠলেন। চোখ দুটো ঝক্-ঝক্ করে উঠল তাঁর। 'না, তা কখ্খনোই হতে পারে না। আমার উইক্‌নেস আমি জানি—কিন্তু তার ওপর দাঁড়িয়ে ওরা হয়কে নয়, নয়কে হয় করবে, তা কখনো হতে পারে না। অনিমেষ কি চেয়েছিল আমি জানি। দুঃখ এই, যে স্পর্ধাকে আমি পা দিয়ে মাড়াতে পারতাম, তাকে আমি বাড়তে দিয়েছিলাম!'

সুমিত্রা জানালা থেকে সরে এসে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়ালেন। আয়নাটার একটা অতি অস্পষ্ট তারল্য অন্ধকারের মধ্যে ঝিকিয়ে উঠল মাত্র, কোন ছায়া পড়ল না। সুমিত্রা চোখ দুটো বিস্ফারিত করে আয়নাটার দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন, যেন এরই মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ মনে মনে হেসে উঠলেন তিনি, যেন একটা কৌতুকে তাঁর মুখখানা উষ্ণ হয়ে উঠল। আয়নাটার গায়ে টেবিলের ওপর একতাড়া চিঠি বের করে রেখেছেন তিনি। তাড়াটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, যেন যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রিয় হতে পারত সেটা নিয়ে ছেলেখেলা করছেন।

'জ্যেঠুমণি চিঠিগুলোর কথা বলছিলেন। খুব খুশি···কিন্তু, আচ্ছা, আমি কেন পারি না, জ্যেঠুমণি যে চোখে দেখছেন সেই চোখে দেখতে?···পারি না, তার কারণ হয়তো ওর সেই চিঠি, ওর 'শুভবিবাহে'র নিমন্ত্রণ!' অনিমেষের

শুভবিবাহ—কোন্ এক বেলারানীর সঙ্গে কন্যার পিতার মধ্যমস্থ বাসভবনে যা সুসম্পন্ন হয়েছে। তারপর ও দেশভ্রমণে চলে গেল। 'ছিঃ, এটা যদি স্বীকার করেই নিই তাহলে ওর আঘাতটাকেও তো স্বীকার করে নেওয়া হল। না, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না···তা হতেই পারে না···'

শেষকালের কথাগুলো উচ্চারণ করে ফেললেন তিনি। তারপর সেই কথা-গুলোরই জোর যেন তাঁকে বিছানায় টেনে নিয়ে এল। হেড্‌ ফ্যানটার সুইচ অফ করে দিলেন, বাইরে বৃষ্টির জোরটা বেড়েছে। তা ছাড়া পাখার একটানা শব্দ মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

অনেকক্ষণের জলুনির পর একটা স্নিগ্ধ শৈথিল্য দেহ-মনের ওপর যেন বিছিয়ে পড়ে। সুমিত্রা বুকের ওপর দুটি হাত রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকেন। বাঁ-দিকটায় মশারিটা ভাল করে দাবা হয় নি, কনুইয়ের নিচে টান হয়ে রয়েছে। মশারিটা অনুভব করা যায়, একটা ঘনিষ্ঠ আবরণের মতো, এমনি একটা আবরণের কতখানি প্রয়োজন তাঁর। বাইরে বৃষ্টির শব্দটা ভারী হয়ে এসেছে, শ্রান্ত মস্তিষ্কের ভেতর ঘুমপাড়ানির মতো ঝরে ঝরে পড়ে।

তখন সেই শ্রান্ত, নিশ্চল মনের ওপর জ্যেঠুমণির—স্যার ধীরানন্দের হাসি মুখখানা ভেসে ওঠে। সারা সন্ধেবেলাটা খুশি হয়ে কথা বলেছেন তিনি—সেটা যে কতবড় খুশি তখন সুমিত্রা বুঝতে পারেন নি। জ্যেঠুমণির ভাসা-ভাসা চোখের ওপর যেন শান্ত আনন্দ ঝক ঝক করে। এমনি না হলে তো স্নেহ করা যায় না। জ্যেঠুমণি বলেছেন, 'ওর হচ্ছে ওই দোষ···ও যা লেখে তার মধ্যে থেকে ওর মনের কথাটা বুঝে নিতে হয়। ওতো একটা ছোট্ট দুরন্ত ছেলের মতো···তা ছাড়া অভিমান ওর কম নয়। দুরন্তপনা করবে, আর কিছু বলতে যাও, তখন গোমরা মুখে রাগের আগুন ছুটবে, তবু কাউকে একটা কথা বলবে না··হাঃ-হাঃ-হাঃ···'

তড়াক করে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল সুমিত্রার।

আর ক্রমাগত উত্তেজনার মধ্যে থেকে মানুষের যা হয়, একটা জিনিসই চকিতে আর এক জিনিসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। জ্যেঠুমণির হাসিটা তখনও কানে বাজছিল। কিন্তু এতক্ষণ জ্যেঠুমণির যে হাসিটা স্নেহ-কৌতুক বলে মনে হচ্ছিল, সেটাই তখন অট্টহাস্যের মতো ঠা-ঠা করে উঠল মাথার ভেতর। মুহূর্তে সমস্ত জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে। বুঝলেন, এই রাত্রিটার শেষ এতেই নয়, এমন রাত্রি অনেকবারই আসবে। যে জিনিসটাকে ভেবেছিলেন শেষ হয়ে

গেছে বলে, তা না হ'লে সেটা আবার এমনি করে ফিরে আসবে কেন। তা না হলে, জ্যেঠুমণি ওর নাম করা মাত্র, তাঁর চোখ জলে ভরে আসবে কেন। বরঞ্চ সেটার আরম্ভ এখনই হয়েছে।

সুমিত্রা ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। সুইচটা টিপে আলো জ্বালিয়ে তেমনি সহজভাবে এসে বসলেন ড্রেসিং টেবিলটার সামনের চেয়ারে। প্রচণ্ড দুঃখ যখন লড়াই করে দূর করা যায় না, চেষ্টা করে ভুলে থাকা যায় না, তখন মানুষ—যদি সে মানুষের তেমনি প্রচণ্ড অভিমান থাকে,—মানুষ তখন সেটার মুখের দিকে এমনি হাসিমুখে তাকাতে পারে। সুমিত্রা আয়নার দিকে তাকালেন। ছোট্ট কপালটার ওপর কয়েক গুচ্ছ চুল এসে পড়েছে। লম্বা পাতলা মুখখানা রাত জাগার জন্যে থমথমে আর ভারিক্কি মনে হচ্ছে। চোখ দুটো ভিজে ভিজে কিন্তু শিশিরের মতো জ্বল-জ্বল করছে। তারপর ওখান থেকে সরে এলেন তিনি। যে বেদনা বুকের ভেতর কেটে কেটে বসে, সুমিত্রা যেন তাকেই জোরে বুকের ওপর চেপে ধরলেন। টেবিলের ওপরকার চিঠির তাড়াটা হাতে নিয়ে ফিতে খুলতে লাগলেন।

অধ্যায় ৫

চিঠিগুলোর আবহাওয়া এর থেকে কত অন্য রকমের। এখানকার পারিপার্শ্বিকের সংগে তার কোন মিল নেই। জুনাপুরে সেদিনকার সেই ঘটনা ঘটে গেল। তারপর সমস্ত এলাকাটা বোবা হয়ে গেছে! এ যেন গভীর, অন্ধকার রাত্রিতে দুঃস্বপ্নের একটা আর্ত চিৎকার, তারপর সব চুপচাপ, অন্ধকারকে তা আরও জমাট করে দিয়েছে। মুখ চেপে ধরে রেখেছে যেন। আর এই চিঠিগুলোতে—একটা আনন্দের হিল্লোল এসে যেন চোখ মুখ ভরে দেয়। কিন্তু এরও প্রকৃতি যেন কি রকম। এই তো সারাদিনকার অসহ্য গরমের পর বৃষ্টি হচ্ছে—হাওয়া লেগে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। দুঃখের শেষ হলে মানুষ যে আনন্দ পায়, এ আনন্দ তো সে রকম না। কোন কিছু ভালো লাগলে যে আনন্দ হয়—দেশ ভ্রমণ করে মানুষ দেখার আনন্দ পেয়ে থাকে—এ তো তা-ও নয়। অনিমেষ যা দেখে উল্লসিত হয়েছেন, তা যেন গৌণ হয়ে গেছে। এ যেন হালকা বসন্তের—রঙীন যৌবনের আবহাওয়া। এ ক্রমাগত উড়ছে, আলোর নিচে প্রজাপতির মতো

পাখা পতপত করে উড়ে বেড়াচ্ছে। এ ফুলের বনে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, তারপর আপনা-আপনি হেসে কুটিকুটি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এ উড়ে চলেছে, উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এ আদর করে জড়িয়ে ধরছে, তারপর আবার ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে।

সুমিত্রা চিঠির পাতাগুলো শেষ করছেন আর মনে হচ্ছে, ঠিক এমনটি এর আগে তাঁর মনে হয় নি। এগুলো যেন নতুন করেই পড়া হচ্ছে তাঁর। এর সুরটা ধরিধরি করেও ধরতে পারেন নি। হঠাৎ তাঁর মনে হল, জ্যেঠুমণিকেও তো আজ ঐ একই ভাবে দেখেছেন। ওঁর মত রাশভারি মানুষ, স্বল্পভাষী—কিন্তু আজ সন্ধেবেলায় কি না করেছেন তিনি। স্যার ধীরানন্দের উচ্ছলতা, আর এই চিঠিগুলোর হাসিমুখ—এ তো একই সুরে বাঁধা। একজনকে দিয়ে আর একজনকে বোঝা যায়। আশ্চর্য।

সুমিত্রার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। কিছু একটা অভাবনীয়কে এখনই যেন দেখতে পাবেন, ঝুঁকে পড়ে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস হয়ে উঠলেন তিনি। অনিমেষ লিখছেন সিংগাপুর থেকে :

'আপনাকে রেঙ্গুন থেকে এর আগে দুটো পত্র দিয়েছিলাম—নিশ্চয়ই পেয়েছেন। রেঙ্গুন থেকে তারপর জলপথেই এসেছি এখানে। জলপথে আসতে এত ভাল লেগেছে! সমুদ্র আগাগোড়া বেশ শান্ত ছিল। নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ, উজ্জ্বল রোদ ঝিকঝিক করছে। তার মাঝে মাঝে বৃষ্টি, তখনও রোদ আছে আর হীরের মতো বৃষ্টির কণা পড়ছে সমুদ্রের বুকে। আমি দেখছি, আর আশ্চর্য, মাঝে মাঝে সেই দেখাটাই ভুলে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে—সে কত হাজার বছর আগে আমার পূর্বপুরুষেরা এমনি করে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে এই সমুদ্রের ওপর দিয়ে গিয়েছেন—আমি যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে! আমি কি তাঁদের সাথে ছিলাম, তাঁদের কোন ক্ষুদ্র পোতের একটা দাঁড়ি, কিংবা কোন পরিচালক হয়ে। কত জন্ম কেটে গিয়েছে—কেন এখন আমি তা মনে করতে পারি না! আমার এই বেদনা কে বুঝবে।

'পথে কতবার মনে হয়েছে, আপনার কাছে লিখি। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে তখনই লিখে ফেলি নি। তাহলে এখানে এসে যা দেখেছি—আমার বুক যে অনুভূতিতে ভরে উঠেছে, তার পরিচয় তো আপনাকে দিতে পারতাম না। আমার পূর্বপুরুষের সমুদ্রযাত্রার কথা ভেবে আমি তখন আশ্চর্য হয়েছি, কিন্তু সে যাত্রার পরিণত ফলটিকে তো তখনও দেখি নি। তাঁরা এই নগরীর নাম

দিয়েছিলেন সিংহপুরম্‌, যার বিকৃত সিংগাপুর উচ্চারণটাতেই আমরা অভ্যস্ত। সুবর্ণদ্বীপ, কাম্বোজ, চম্পা, যেসবের এখনকার নাম ইন্দোচীন, মালয়, যব, বলী, সুমাত্রা, বোর্ণিও—এইসব, এরই দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে আমি যেন দুই মহাভূমির চরণস্পর্শ করতে পারি। আমি খুব সামান্য ব্যক্তিই—কিন্তু আমার সত্য-অনুভব তো গোপন করতে পারব না—কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সময় এসেছে, যখন এই দুই মহাভূমির কাছে এসে বিশ্বকে মাথা নত করতে হবে। আর দু'দিন পরে এখান থেকেই আমি হংকং যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন. মিস ব্যানার্জী' আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, একটাকে না ছেড়ে আর একটাতে যাওয়া যায় না?'...

সুমিত্রার আঙুলের ওপর সুদৃশ্য চিঠির কাগজটা কেঁপে উঠল, বুক টিপটিপ করতে লাগল তাঁর। আগ্রহে শক্ত হয়ে উঠলেন তিনি, এখানেই ওর মনের কথা লুকিয়ে নেই তো? কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি শিথিল হয়ে এলেন। অনিমেষ লিখেছেন: 'লোভী ছেলের মতো আমার কোনটাই ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমার পূর্বপুরুষেরা এখানে যা রেখে গিয়েছেন, তা চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকি। আমার আমাকেই যেন আর একজনের মধ্য দিয়ে পাওয়া। এখানকার ভাষা শুনে ভারতবর্ষকে মনে পড়ে, এর শিল্প আর সাহিত্যকীর্তি তো ভারতেরই পরিমণ্ডলে গড়া। রামায়ণ-মহাভারত এদেশেরও পুরাণ। এখানকার চিত্রকলা ভারতবর্ষের রীতি আর বিষয়বস্তু দুই-ই গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের মতোই এখানকার মন্দিরের উৎকীরণ-চিত্র রামায়ণ মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির আখ্যায়িকা অবলম্বন করে আঁকা। কোন্‌টির নাম করব। যবদ্বীপের বড়ভুধর এবং কাম্বোডিয়ার আংকোর ভাটের মন্দির ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন—এতো সমস্ত জগতেরই শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রীবিজয় তো একসময় সংস্কৃত-চর্চার কেন্দ্র ছিল...'

পড়া বন্ধ রেখে সুমিত্রা মুখ তুলে তাকালেন। আয়নার দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, খুঁজে পেয়েছ তুমি, যা খুঁজছিলে চিঠির ভেতর?' তারপর উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন, 'না, না, তা কেন হবে। খুঁজেই পাবে এমন তো কোন কথা ছিল না। চিঠি পড়ো, থেমো না, ...কেন না, তুমি যা খুঁজছ তা যদি নাও পাও, তা হলেও এর আর এক মূল্য আছে সেটা কেন দেবে না? জ্যেঠুমণি যেটা পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন, সেটা তো তোমার সামনেই পড়ে রয়েছে। তবু কেন, তবু...'

এর পর হংকং থেকে লিখছেন অমিয়েশ :

'আজ কয়েকদিন ধরে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছি শহরের ভেতরে, আর বাইরে সমুদ্রের ওপর। দেখে দেখে আশ মিটছে না। কাল বিকেলেই গিয়েছিলুম সমুদ্রে। স্টীমার আছে ছোট ছোট, কিন্তু আমি একটা জেলে-ডিঙিই ভাড়া করে নিলুম। ছোট্ট ডিঙি, স্টীমার আর জাহাজের তোলা ঢেউএর ওপর ক্রমাগত মোচার খোলার মতো উঠছে পড়ছে। মনে হয় এইবার ডুবেই গেল, কিন্তু আমি তো বাংলা দেশের ছেলে। আমার ডিঙির যে 'তন্‌কা'—মাঝি, সে বুড়ো হয়েছে, দাঁড় হাতে করে যখন বসে ঝিমোতে থাকে তখন মনে হয় বুড়ো আফিমখোরটার আর বেশি বাকী নেই কিন্তু যখন সে ডিঙি চালায় তখন তাকে মনে হয় শাল কাঠের মতো শক্ত। ডিঙিতে যখনই ছলাৎ করে জল ওঠে তখনই বুড়ো দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে আমাকে অভয় দিতে থাকে। আর আমি ওর দিকে তাকিয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকি। কিছুক্ষণ পরেই ও বুঝতে পারে যে আমি ভয় পাই নি।

'এই 'তন্‌কা'রা বেশ জাত, সব সময়েই জলের উপর ভেসে রয়েছে। দিন-রাত্রে সব সময় জলের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, কিন্তু জলের সঙ্গে এদের এমন সহজ মিতালি যে আশ্চর্য হতে হয়। এদের দিকে তাকালে আমাদের দেশের পদ্মার মাঝিদের কথা মনে পড়ে। অবশ্য এখানকার প্রধান বাসিন্দে হ'ল 'পুণ্ডী'রা—তারা খাস ক্যান্টনী। জমিতে চাষ-বাস তাদের হাতে, আর ব্যবসা-বাণিজ্যও তাদের হাতে। এ ছাড়াও আছে পাহাড়ীয়া, এরা তাদেরকে বলে 'হাক্‌কা'। আমাদের দেশের বেদেদের মতো, এদের পাশাপাশি থেকেও রয়েছে অপাংক্তেয় হয়ে। অথচ কি কর্মিষ্ঠ, সহিষ্ণু আর সুঠাম মানুষ এরা। কঠিন পাহাড়কে এরা ফলপ্রসূ করে তুলছে।

'যাক, যে কথা বলছিলাম—স্টীমারে করে না গিয়ে আমি যে ডিঙি ভাড়া করেছিলাম তার কারণ আছে। স্টীমারে করে কেবল দূরে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রটাই দেখিয়ে দেয়। আর আমি চাই সমুদ্রে নেমে একটু সরে এসে হংকংটাকেই দেখা। এ যেন মায়ের কাছ থেকে অভিমান করে সরে এসে মায়ের হাসিমুখ দেখবার চেষ্টার মতো দুষ্টুমি বুদ্ধি। আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলাম, তার থেকে বাইরে আসতেই তার সৌন্দর্য পূরোপূরি উদ্ভাসিত হয়েছে। অবশ্য আপনি ভাববেন না…'

শেষ কথাগুলো সুমিত্রার চোখ এড়িয়ে গেল। তার আগেই মুখ তুলেছিলেন

তিনি। মনে মনে বলতে লাগলেন, 'এই তো, যদি একটা অবলম্বন তোমার একান্ত দরকারই তাহলে, এখানে তো তা রয়েছে। নয় কি?' কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে আবিষ্ট হয়ে রইলেন সুমিত্রা। তারপর রুগ্ন, লোভী ছেলের হাত থেকে মা যেমন করে মিষ্টি কেড়ে নেন তেমনি নিজের ওপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। বললেন, 'যে পরাজয় তোমার হয়েছে, তার মধ্যে কোন মোহই আর রেখো না সোজাসুজি তাকে মেনে নাও। অন্তত এই গর্ব তোমার থাক।'

সুমিত্রা চিঠি পড়ছেন: 'অবশ্য আপনি ভাববেন না যে আমি সবুজ ঝিলিমিলি শোভার বর্ণনা দিতে যাচ্ছি। বাঙলার খাস সৌন্দর্য তো তাই। হংকংএর সৌন্দর্য পাহাড়ী, তাও হিমালয়-সুলভ নয়। এর রুক্ষ গাত্রের ওপর নানা রেখায় ঝর্ণা নেমে এসেছে আর থাকে থাকে শহর উঠেছে। এর রুক্ষতা দেখে আমার কি মনে হচ্ছিল জানেন, জুনাপুরের ডিরেক্টার্স বাংলোর ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে যখন চারদিকে তাকিয়ে দেখি, এও ঠিক তেমনি। আমার এত ভাল লাগে। আচ্ছা মিস্ ব্যানার্জী, আপনার কি মনে হয় না, আজকাল নরম শোভা ছেড়ে আমাদের রুক্ষতারই পূজা করা উচিত?'

সবার শেষের চিঠিটা (অবশ্য যেটা তিনি সবার আগেই পেয়েছিলেন অনিমেষ এদেশে থাকতে থাকতেই) আর খুললেন না সুমিত্রা, অনেক যত্নে দুহাতে করে ধরে রইলেন। এটা হচ্ছে অনিমেষের শুভ বিবাহের চিঠি, নিমন্ত্রণ পত্র।

হঠাৎ মুচকে হেসে সুমিত্রা বলে উঠলেন, 'বাঃ, এটা শেষ কালে কেন, এটা তো সবার আগেই থাকা উচিত। জ্যেঠুমণি যে দৃষ্টিতে এ চিঠির বাণ্ডিল দেখবেন, তিনি জানুন আমিও সেই দৃষ্টিতে দেখছি। জ্যেঠুমণির জন্যে আমার অন্তত এই ঠাট্টাটুকু থাক।'—বলে উনি চিঠির তাড়াটা ফিতে দিয়ে বাঁধলেন।

তারপর, মন্ত্রীমশায় যেমন বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে বিদায় দিয়ে চকিতে তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন, সম্পূর্ণ পৃথক আর ঘরোয়া ভঙ্গীতে, তেমনি করে সুমিত্রা আয়নাতে তাকালেন। সেই মুহূর্তে তাঁর আহত অনুভবটা যেন সর্বাপেক্ষা গভীর হয়ে উঠল। অন্ততো নারীর দৃষ্টি এটাকে না লক্ষ্য করে পারল না। অনতিচঞ্চল গভীর দৃষ্টি, ইতিমধ্যে তাঁর ম্লান ঠোঁট দুটি কিছুটা স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু...' সুমিত্রা আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কিন্তু তোমাকে মেনে নিয়েও একথা বলতে ছাড়ব না, সে আমাকে অপমান করেই আমাকে জাগিয়েছে। কথাটা খুব উল্টোপাল্টা লাগছে, না? কিন্তু না-না,

শোনো, শুভ বিবাহের চিঠিটার কথা ভুলো না। ওটা যদি তুমি না পেতে, তাহলে অমন করে জেগে উঠতে কি তুমি।...তোমাকে ভালবেসে তো কেউ জাগাতে পারে নি, প্রফেসর অমিয় রায়কে মনে আছে তোমা ? অক্সফোর্ড যাও নি তখনও তুমি। তারপর ওখানে শোভন, সে বিবাহই করবে না বলেছে তোমাকে ছাড়া। আর অনিমেষের থেকে কি চেয়েছিলে ? ও হয়ত দামোদরের পথের সেই ঘটনার পর একদিন বিয়ের প্রস্তাব করত। তুমিও তাই আশা করেছিলে, কিন্তু সত্যি করে বলো তো তাতে রাজি হতে তুমি ?... বলো না, স্বীকার করো। সে তোমাকে মাড়িয়ে দিয়েই তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছে...ভালবেসে কেউ তোমাকে জাগাতে পারত না। একে নিয়ে তুমি কি করবে ?'

অধ্যায় ৬

খুব জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। সুমিত্রা ড্রেসিং টেবিলের ওপরই কখন ঝুঁকে পড়েছিলেন। দুটো হাত ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখেছেন, ক্লান্তিতে হাত দুটির ওপর ডান দিকের গালটা রেখেছিলেন, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহটা শিউরে উঠল, আপনা আপনিই পেছন দিকে মাথাটা টানা হয়ে হাতের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হল, তবুও ঘুম ভাঙল না। কিন্তু দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। জানালা খোলাই ছিল, সকাল বেলাকার উজ্জ্বল রোদ এসে চোখে পড়ল। চোখ ধাঁধিয়ে কিছু দেখতে পেলেন না, বুঝবার মতোও অবস্থা ছিল না তাঁর।

'এই দেখুন, আমি ভেবেছি অনিদ্রা রোগে আমাকেই ধরেছে, তা নয়... আমারও সঙ্গী হওয়ার মতো লোক আছে তাহলে...' বলতে বলতে হাসিমুখে ঢুকল শংকরী মুখার্জী। দরজা খোলাই ছিল—কড়া নাড়তে নাড়তে বুঝতে পেরেই ভেতরে চলে এসেছে। দমকা হাওয়ার মতো ঢুকল কথা ছিটোতে ছিটোতে, 'কিন্তু আপনার অবস্থা এ কি, আমাকে চমকে দিয়েছেন। এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রয়েছেন ? গালে চুড়ির দাগ বসে গেছে !'

চেয়ারের হাতল ছেড়ে সুমিত্রা কয়েক পা এগিয়ে এলেন, শংকরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা উঠল তাঁর। মনে হল কাঁধে হাত দিয়ে ধরবেন, কিন্তু হাতটা উঠেই নিচে পড়ে গেল। কিছু বলতে না পেরে কেবল অপ্রস্তুতের মতো হাসলেন একটু।

'খুব চটলেন আমার ওপর তো···ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বলে! কিন্তু জানেন তো, রাতের ঘুম সকালে সারতে নেই, ভীষণ মাথা ধরে তাহলে।'

'আমাকে আপনি মিনিট দশেকের জন্যে মাপ করুন, আমি খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেব।'

'আমি তাড়া দিচ্ছি বলে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না, এখনো যথেষ্ট সময় আছে। আমি বসলাম এখানে।' সুমিত্রার ড্রেসিং টেবিলটার সামনেই বসে পড়ল শংকরী মুখার্জী।

'না, আজ একটু তাড়াতাড়িই আছে। এখান থেকে একবার জুনাপুর হোটেলে যাব। জেঠুমণি···স্যার মুখার্জী এসেছেন ··জানেন তো!'

'ও, তাই না কি···'

সুমিত্রা শংকরীর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন—মনে হল ওর উদ্যত কৌতূহলের সামনে ভয় পেয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি ভেতর দরজার দিকে চলে গেলেন চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

শংকরী মুখার্জী একলা পড়ল ঘরের মধ্যে। কিন্তু ওর ছিল সেই ধরনের মন, শূন্যতার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। তার ওপর সুমিত্রা যাবার সময় স্যার মুখার্জীর আসবার কথা বলে গিয়েছিলেন। এমনিতেই জুনাপুরের পরিস্থিতির সম্পর্কে একগাদা উত্তপ্ত খবর সব সময়েই ও· মাথার মধ্যে দাপাদাপি করছে, এতে সেগুলো আর একবার নতুন করে নাড়া খেয়ে উঠল।

শংকরী ভোরেই স্নান করে নিয়েছিল। কালো ভিজে চুলগুলি আঁচড়ে পিঠের ওপর ফেলে রেখেছে। মুখের ওপর খুব অল্প একটু প্রসাধন। ঘামে এখনো তা নষ্ট হয়ে যায় নি। উপরন্তু ওর কালো ঈষৎ রুক্ষ মুখের ওপর একটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে। খুব পূর্ণ, সতেজ একটা মনোভাব ওর চোখে ঝিকিয়ে উঠছে বোঝা যায়। শংকরী তাকাচ্ছিল ঘরটার দিকে। জানালা দিয়ে বৃষ্টিতে ধোয়া পরিচ্ছন্ন উষ্ণ রোদ্দুর ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর এসে পড়েছে। আর সেখান থেকে আলো ছিটকে দেওয়ালে, আয়নাতে, আলমারির গায়ে পড়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শংকরী এক একবার মুহূর্তের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে

তাকাচ্ছে। যেন বলছে, 'কেমন, এ সম্পর্কে আমার মনে হচ্ছে সেটা ঠিক কি না।'

'নিশ্চয়ই ঠিক, বাবা যাই বলুন না কেন, আমার কথাটা তাঁকে মেনে নিতে হবেই...' উত্তর পেয়ে শংকরী আবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

'চলুন, জুনাপুর হোটেলে যাওয়া যাক, স্যার মুখার্জীর সঙ্গে আলাপ করে নেবেন...' বলতে বলতে সুমিত্রা ঘরে ঢুকলেন।

ওঁর পোষাক দেখে চমকে উঠল শংকরী, কলকল করে বলে উঠল, 'কি ব্যাপার মিস ব্যানার্জী...এই চিঠির তাড়াটার সঙ্গে কোনও কানেকশন আছে না কি। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, রঙীন খাম...আমার ভারী লোভ হচ্ছিল খুলে দেখতে...' শংকরীর চোখ পিট পিট করতে লাগল।

'স্বচ্ছন্দে দেখতে পারেন,...' সুমিত্রা যাবার জন্যে তাড়া দিচ্ছিলেন, কিন্তু সরে এসে একটা মোড়া টেনে নিয়ে কাছাকাছি বসলেন। মুচকে হেসে বললেন, 'পোষাকের কথা বলছেন? এও আপনার ওই লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রঙিন খাম...ভেতরে কিছু নেই...' বলে নিজেই পোষাকের ওপর সকৌতুক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

ঘন উজ্জ্বল কমলা রঙের সিল্ক চড়িয়ে এসেছিলেন সুমিত্রা, এরই মধ্যে চুলগুলো একটু ফাঁপিয়ে আঁচড়ে একটা এলো খোঁপা দিয়ে আসতে পেরেছেন। আরো কিছু করতে পারলে খুসী হ'তেন, কিন্তু এদিকে আবার সময় ছিল না।

শংকরী হাসছিল, 'কিন্তু সে কথা থাক...রাত্রের অনিদ্রা কেন রোমান্স যখন নয়, তখন জুনাপুরের সিচুয়েশন নিশ্চয়ই।'

সুমিত্রাকে মনে হল একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন, বলতে লাগলেন,—'ঠিক তো। ভাবছি...জুনাপুর ছেড়ে চলে যাব, আর থাকা যায় না...' বলতে বলতে সেই হাল্‌কা উদাসীন হাসিটা ওঁর শ্রান্ত মুখের ওপর ভাসতে লাগল, যা দেখবার মতো দৃষ্টি ছিল না শংকরীর।

'থাকা যায় না মানে? জুনাপুরে, আমার কি মনে হয় জানেন...ঠিক এখনই থাকবার সময়। যেখানে পথ বন্ধ, সেখানে পথ করে নেওয়াই তো আসল কাজ। বাবাকেও আমি সেই কথাই বলছিলাম। কাল আপনার কাছ থেকে ফিরে বাবাকে পেলাম...কলকাতা থেকে ফিরেছেন। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন উনি। কর্তৃপক্ষ এখনই এ্যাকশন কমিটিকে স্বীকার করে নিতে রাজি

হচ্ছেন না। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? একদিন এটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে···সে দিনটাই যাতে আসে আমাদের জোর করে চালিয়ে যেতে হবে। প্রাণ পর্যন্ত পণ করে। আমরা মরে যাই যাব···তাতে কি হয়েছে? ওয়ান্ মাস্ট ডাই সামটাইম···কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সে কথা সত্যি। কিন্তু সবচেয়ে ওনাকে কি কষ্ট দিচ্ছে জানেন···ট্রেড ইউনিয়ন্‌সের বিশ্বসংস্থা জুনাপুরের এই ঘটনার পর একটা বড় রকমের সাহায্য পাঠিয়েছেন শ্রমিকদের জন্যে। এতে কি হবে জানেন? ডিক্টেটরশিপ চায় এমন একটা শক্তির জোর বাড়তে পারে জুনাপুরে। কিন্তু আমি বাবাকে বলেছি···তোমার সেই জোর এখনও আছে, যাতে করে তুমি ওদের মাথা ভেঙে দিতে পারবে। কাল রাত্রেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছি···আমি নিজে গিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর ফিরে অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট করেছি।'

শংকরী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকাল সুমিত্রার দিকে, যেন ওর চোখ বলতে লাগল, 'বলুন, ঠিক করেছি কি না।'

সুমিত্রার কাছে এসব কথার কোন অর্থ নেই। তবুও বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানেন, কোম্পানীর পলিসি বোধ হয় আর একটা বদলের মুখোমুখি হয়েছে। স্যার মুখার্জী এখন এ্যাকশন কমিটি নাও চাইতে পারেন।'

যেন বুঝতে পারছে না এমনি করে শংকরী তাকাল সুমিত্রার দিকে। তারপর টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা মুঠির ঘা মেরে বলে উঠল, 'অসম্ভব, তা কখনো হতেই পারে না।'

সুমিত্রা উঠলেন, টেবিলের ওপর থেকে চিঠির তাড়াটা নিয়ে পুরলেন দেরাজের মধ্যে। বললেন, 'যাক গে ওসব···আমরা উঠি···আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি। আমি ভাবছি···আপনি আমাকে যে নার্সিংএর কাজ দিয়েছেন সেটাই ভাল। এর জন্য আপনি আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন···আমি একটা পথ পেয়ে গেছি।' সুমিত্রার চোখ ছলছল করে উঠল।

'মিস্ ব্যানার্জী, সবই ঠিক, কিন্তু আপনার এই পরাজয়মূলক মনোভাব আমার ভাল লাগছে না। কেননা···'

কিন্তু ও আর ব্যাখ্যা করতে পারল না, নিজের অসহিষ্ণুতায় হঠাৎ যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। কেবল বললে, 'না, না, আপনি ওসব বলবেন কেন।'

লনের ওপর দিয়ে দুটি বন্ধুতে হেঁটে বাংলোর গেটটার দিকে এগোচ্ছিলেন।

কিন্তু দু'জনের মধ্যে তফাৎ কতখানি। একজন দেহে পোষাকে উজ্জ্বল, কিন্তু ক্লান্তিতে কেমন শিথিল, মাটির দিকে চোখ রেখে হাঁটছেন। আর একজনের মোটা খদ্দরের সামান্য পোষাক, কিন্তু চোখ মুখ উদ্দীপ্ত, খানিকটা অসহিষ্ণু।

সুমিত্রা চোখ তুলে পাশে তাকালেন। গত রাত্রির বৃষ্টিতে গাছপালাগুলি সতেজ হয়ে উঠেছে। রোদ পড়ে যেমনি উজ্জ্বল হয়েছে, তেমনি সুখের গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে যেন। সুমিত্রা একটা নিঃশ্বাস চেপে বললেন আস্তে আস্তে, 'জানেন শংকরী দেবী, মানুষ যদি নিজেকে একেবারে বিসর্জন দিতে না পারে, তাহলে কখনোই অন্যের সেবা করতে পারে না।'

শংকরী ফিরে তাকিয়ে এই প্রথম লক্ষ্য করলে, ওর সঙ্গিনীর মুখখানা শুকনো। বুঝলে, এ মেয়েটি অনেক দূরে রয়েছে ওর থেকে। কিন্তু সেটার অর্থ ওর বুঝবার কথা নয়। ফাঁক পূরণ করে দেওয়া তো দূরের কথা।

অধ্যায় ৭

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জুনাপুর হোটেলে স্যার মুখার্জীর সঙ্গে শ্রী এস. আর মিটারের সাক্ষাৎকার হল। 'আপনাকে আমি আর মিঃ মিটার বলে ডাকব না, আপনাকে ডাকব আমি সরোজ রঞ্জন···রাদার্ সরোজ বলে। আর আমরা কথা বলছি··একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টার, আর একজন জিস্কোর কর্মচারী হিসেবে নয়,···আমরা দু'জনেই জিস্কোর কল্যাণকামী, সেই হিসেবে। নট এ্যাজ এমপ্লয়ার এ্যাণ্ড হিজ এম্প্লয়ী, বাট···' স্যার মুখার্জী কথা বলছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পড়ার টেবিলটায় প্লেটের উপর রাখা বেলফুলগুলো সাজিয়ে একটা আকৃতি দেবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর এই স্নেহপ্রচেষ্টা যেন তাঁর কথার ভেতর-কার অর্থটাকে জোর দেওয়ার জন্যেই। মুখে বলছেন ঘরোয়া·· সম্পর্কের কথা, আর তাঁর আঙুলের স্পর্শে স্নেহ ঝরে পড়ছে।

'স্যার, জিস্কোর যদি একজন উপযুক্ত কর্মচারী হতে পারি, তার বাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই। কিন্তু আপনি যা বলছেন সেকথা শুনলে আমাদের বুক ভরে ওঠে।'

'ওয়েল, হ্যাট্স্ রাইট, হ্যাটস্ রাইট…' স্যার মুখার্জী সামনে ঝুঁকে পড়লেন, আর তাঁর আয়ত চোখ দুটিতে খুশি ঝিকিয়ে উঠল। 'একজিকিউটিভ দক্ষতা সবার আগে সবার চাই। এ যদি না হল তাহলে আমরা কেবল দাঁড়াতেও পারলাম না, আমাদের মেরুদণ্ডই নেই তাহলে। কিন্তু কখনো কখনো ওটা ছাড়াও আরো কিছু ভাবা দরকার, সামথিং ইমাজিনেটিভ। ঠিক এখনই তার প্রয়োজন হয়েছে।'

টেবিলের যে কোণটার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন স্যার মুখার্জী, সেই কোণাতেই ওধার থেকে মুখোমুখি বসেছিলেন এস. আর। এস. আর ক্বচিৎ শেল্ফের বইগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন, আর অধিকাংশ সময়েই তাকিয়ে রয়েছেন স্যার মুখার্জীর মুখের দিকে। ছাত্রের মতো, তেমনি সরল আর সাবহিত তাঁর ভঙ্গী। তবু ওরই মধ্যে একটুখানি হাসি যেন উঁকি মারছিল তাঁর চোখে। ঔদ্ধত্যের নয়, তা যেন সবিনয়ে বলছে, 'ঠিক তাই…এই জিনিসটার জন্যেই তো অপেক্ষা করেছিলাম। মিঃ টমসনের এতদিনকার প্রচেষ্টা এই দিনটার জন্যেই উৎসুক হয়ে ছিল!' সেই মুহূর্তে এস. আর'এর নিজেকে সত্যিই আর স্যার মুখার্জীর অধীনস্থ কর্মচারী বলে মনে হচ্ছিল না, ভাবলেন, তিনিও আর এক শক্তির প্রতিনিধি। তাঁদের দু'জনের কোনও পার্থক্যই নেই।

এঁদের কথোপকথন যখন চলছে, তখন আরও একজন সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রী অমরেশ ব্যানার্জী। টেবিল থেকে দূরে এদিকে দরজার মুখে একটা সোফায় বসেছিলেন তিনি। মাঝখানের টেবিলটা ঘিরে সোফা-চক্র, তার মধ্যে তিনি একেবারে একক। এক সময় ফ্লাওয়ার ভাস থেকে রজনীগন্ধার একটি কলি তুলে নিলেন শ্রী ব্যানার্জী, অসহিষ্ণু আঙুলে চকিতে একটা চাপ দিলেন। কিন্তু আবার সেই মুহূর্তেই এই অসহিষ্ণুতার জন্য লজ্জিত হলেন যেন, থেঁতলানো কলিটাকে সযত্নে ভাসের ওপর রেখে দিলেন।

এই আলোচনায় শ্রী ব্যানার্জীর মতো আগ্রহ বোধ হয় আর কারুরই থাকবার কথা নয়। তাঁর মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় এর প্রত্যেকটি কথাই যেন তিনি আলাদা আলাদা ওজন দিয়ে গ্রহণ করছেন। কিন্তু আরও একটু লক্ষ্য করলে এও বোঝা যাবে, তাঁর সমস্ত আগ্রহ গুলি পাকিয়ে কঠিন হয়ে উঠছে। মুখ চোখ থমথমে. তাঁর ফরসা রঙটা এখন আলোর নিচে লাল টকটকে দেখাচ্ছে। চিবুক ঝুলে পড়েছে, নিটোল শক্ত হাত দু'টো দুই হাঁটুর ওপর রাখা। মাঝে মাঝে বুকের ওপর জড়াজড়ি করে রাখছেন।

গতকাল রাত্রেই এস. আর'এর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন স্যার মুখার্জী আর তার ভার দিয়েছিলেন তাঁরই ওপর। সেই সাক্ষাৎকার আজ সন্ধ্যায় সম্ভব হচ্ছে—স্যার মুখার্জী এই বিলম্বের কৈফিয়ৎ চাইবেন না কখনও, তিনিও দেন নি। কিন্তু তাঁর যা বক্তব্য এই ভাবেই তিনি তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে উঠে দাঁড়াতে হল। ওঁরা কথাবার্তা শেষ করে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়িয়েছেন।

'স্যার, আজকের পরিস্থিতি এমনি দাঁড়িয়েছে, ঘরে বাইরে বোঝাপড়া ছাড়া আমরা এক পাও চলতে পারি না। যত তাড়াতাড়ি আমরা এটা বুঝতে পারি ততই মঙ্গল…' এস. আরকে প্রায় ওপরে তাকিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, স্যার মুখার্জীর মুখের দিকে তাকাবার জন্য। স্যার মুখার্জী তখনই তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে উৎসাহ দিলেন, 'দ্যাটস্ দি পয়েন্ট্, মাই বয়। যখন আমাদের মধ্যে কিছু থাকে না তখনই আমরা খিটখিটে হয়ে উঠি। হাঁড়ি-কলসীর ঠোকাঠুকি হতে থাকে। কিন্তু যখন আমাদের সামনে কাজ থাকে·· সরোজ, 'তুমি' জানো, জিস্কোর সামনে ইমেন্স্ পসিবিলিটিস্ উপস্থিত হয়েছে, ইন্ দিস কান্ট্রি এ্যাণ্ড বিয়ণ্ড ?' মনে হল, এর পরই তিনি অনিমেষের প্রবন্ধগুলোর কথা তুলবেন। কিন্তু তাঁর সুর বদলে গেল। যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যোগ করতে ভুলে গেছেন, এমনিভাবে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি হাঁড়ি-কলসীর কথা বলছিলাম। হাঁড়িও ভাল, কলসীও, কিন্তু…' হঠাৎ বাঁ হাতটাও এস. আর,এর কাঁধে এনে ফেললেন উনি। দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের দিকে একটু টেনে নিলেন তাঁকে। তারপর তাঁর সাবহিত মুখের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন—'কিন্তু যার যা স্থান তাকে তা দিতেই হবে। কলসীর পজিসন কলসী পাবেই, তাকে সেটা না দেওয়াই ভুল। আর, এক যুগের কলসী সব যুগেই আর কলসী থাকে না।. পরিবর্তনশীল জগতে এই পরিবর্তনও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, ইয়েস।'

সত্যোপলব্ধির প্রক্রিয়াটি ভারী অদ্ভুত। কখনো কখনো দিনের পর দিন মাথা খুঁড়েও এর সাক্ষাৎ মেলে না, কখনও এর আভাসটুকু মেলে। কিন্তু কখনও চকিতে সামনের পর্দাটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সত্যের সমগ্রতা উদ্ভাসিত হয়ে তখন মানুষকে বিহ্বল করে ফেলে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

স্যার মুখার্জীর থেকে ঝাঁকুনি খেয়ে এস. আর যেন হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁর সাবহিত মুখের ওপর চোখ দু'টো মিটমিট করতে লাগল, ঠোঁট দু'টো ঈষৎ

ফাঁক হয়ে কাঁপতে লাগল। মনে হল ঢোক গিলতে চাইলেন কিন্তু তাও সম্ভব হল না।

একটা পরিবর্তিত আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে এটা এস. আর জানতেন। নতুন সামঞ্জস্যের জন্যে কঠিন সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু সামঞ্জস্য যে ঠিক এই ভাবেই হবে তা বুঝতে পারেন নি। চকিতে একই সঙ্গে অনেক কথাই মনে হল তাঁর—জিঙ্কোর মালিকানা, দেশী-বিদেশী কর্তৃত্ব, ভারতবর্ষে এবং তার বাইরে এর অনন্ত সম্ভাবনা···তা ছাড়াও···সর্বোপরি আগের যুগে যারা ছিল হাঁড়ি তারাই আজ কলসী হয়ে উঠেছে, সুতরাং কলসীকে নেমে আসতে হবেই নিচে। আশ্চর্য, এ স্বীকার করে নিতেই হবে।

'কিন্তু···' এস. আর যখন এটার সম্বন্ধে একটু ভাববার মতো অবস্থায় এলেন, তখন সর্বাগ্রে তাঁর মনে হল, 'আমি না হয় এই ব্যালান্সের কথা ভাবতে পারি নি, কিন্তু মিঃ টমসন কি এটা জানতেন, যিনি অসুস্থতার রাত্রে মায়ের মতো জেগে আছেন? হয়তো জানতেন, হয়তো জানতেন···'

এক সময় আবেগ-বিকৃত স্বরে এস. আর বললেন, 'আমি এখন আসি। এটা স্বীকার করতে আমার অসুবিধা নেই, আমি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে এই সন্ধ্যা অনেক বেশী ইনস্ট্রাক্টিভ্। আমি মনে করি মিঃ টমসনের পক্ষে এটাতে খুব বড় লাভ হবে।'

স্যার মুখার্জী স্নেহভরে ওঁর কাঁধে হাত রেখে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

ভালো মেকানিক যেমন আসল জায়গায় হাত দেবার আগে আনুষঙ্গিক খুচরো অংশগুলোতে হাত লাগান—এখানে একটা স্ক্রু, ওখানে একটা নাট-বলটু ঠিক করে দেন—তেমনি করে এগোচ্ছিলেন স্যার মুখার্জী। ফিরে এসে শ্রী ব্যানার্জীর কাছে বসলেন তিনি।

বললেন, 'অমরেশ, আমি তোমাকে বুঝতে পারি। আর একথা বলবারই বা প্রয়োজন কি? যদি না পারতাম তাহলে তোমাকে বেছে নিয়ে এতদিন আমি নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছি··তোমাকেও অপমান করেছি।'

'স্যার, আমি এইটুকু বলতে চাই যে আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে চেষ্টা করব, এবং বুঝতে পারবও।'

স্যার মুখার্জী হাসতে লাগলেন ছেলে মানুষের মতো। যেন তিনি একজন করিৎকর্মা কৌশলী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন না, কালকের সন্ধ্যার মতো কল্যাণীয়া সুমিত্রার সঙ্গে কৌতুক করছেন।

'না-না, তোমার থেকে আমি এখন কিছুই শুনতে চাই না। আরো কয়েক দিন পরেই, আমি শুনতে না চাইলেও তুমিই নিজে আমাকে শোনাবে। সে লোভটা ছাড়ব কেন বল। আরে শোন, কাল তোমাকে যখন এস. আর'এর কাছে পাঠালাম···আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে পাঠিয়েছি···ওপরের চোখে দেখলে এটা তোমার ওপর চূড়ান্ত ইনজাস্টিস্, কিন্তু একদিন এটা দিয়েই আমি তোমার কাছে প্রমাণ করে দেব, আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম এ্যাজ্ এ নীউ লীডার ইন এ নীউ ফিল্ড···'

স্যার মুখার্জী চোখ ফিরিয়ে নিয়েই শ্রী ব্যানার্জীর অস্বস্তি বুঝতে পারলেন। কিন্তু তাঁর থামবার উপায় ছিল না। খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু আরো স্পষ্ট করে বলে গেলেন, 'আই মাস্ট্ টেল ইউ দিস্ নাউ অর নেভার। আমাদের সব চেয়ে যা ভয়ের জিনিস তা হচ্ছে পার্টনারশিপ নয়, ডিক্টেটরশিপ। জুনাপুরে সেই আশংকা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ওয়েল, ডোণ্ট্ লুক লাইক দ্যাট্। আমি জানি আমাকে তুমি ভালবাস বলে তোমার অভিমান কম নয়। তুমি বলবে যে-কোন শক্তিকে তোমার ঐ বক্সিং-করা মুষ্টি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। আমি সন্দেহ করছি না। কিন্তু কে জানে সেটা গুঁড়ো হবে, না কি লাফিয়ে উঠবে।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন স্যার মুখার্জী, মুহূর্তের জন্যে থেমে নিজেকে সংযত করলেন। তারপর, কথাগুলো নিয়ে যেন নাড়াচাড়া করছেন, এমনিভাবে বললেন, 'ওদের পার্টি লেবারদের বলতে পারে, তাদের সমস্ত সুখের ব্যবস্থা করে দেবে, আমরাও কেন বলতে পারি না, আমরাই করে দেব। আমাদের কারখানা হবে একটা ওয়েলফেয়ার ওআর্ক্স্। আমরা ওদের বলতে পারব না কেন যে, আমরাই করে দেব, তোমরা যা চাও। হ্যাঁ···, উই মে এ্যাজ ওয়েল টেক আপ দি ওয়েলফেয়ার ওআর্ক সাজেস্টেড বাই মিঃ টমসন। আর··· আর, তোমাকে দেখতে চাই নতুন ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে···'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর, ওঁরা বিদায় নিলেন।

অধ্যায় ৮

এর মাসাধিক কাল আগেকার কথা। শিবলাল কারখানার স্টাফ গেটের দারোয়ান বক্‌সি সিংয়ের কোআর্টারে ঢুকে ওদের বিছানায় বসবা মাত্র বক্‌সি ওকে-বাঁতাস করতে আরম্ভ করলে এবং বক্‌সির স্ত্রী রুক্‌মিনী তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে দিলে।

জল খেতে খেতে গেলাসের মুড়ির ওপর দিয়ে চোখ তুলে তাকাল শিবলাল। জল দিয়ে একটু ডান দিকে সরে দাঁড়িয়েছে রুক্‌মিনী। মেয়েটির বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশের মতো হবে। দেহে স্বাস্থ্য যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে, ওর দিকে তাকালে সবার আগে সেটাই চোখে পড়ে। ওর হাসি মুখের মধ্যে কোনো কুণ্ঠা নেই। ওর মাথার কাপড় খোলা, মুখে একটা সহজ, ঘরোয়া ভাব।

শিবলাল ক্ষণিকের জন্য ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে থেকে পারল না। এই মেয়েটির জন্যই বক্‌সির নাম হয়েছে বোরখা সিং। রুক্‌মিনী বক্‌সির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, ওর সম্বন্ধে বক্‌সির খুঁত-খুঁতুনির কমতি নেই। তার কোয়ার্টারের সব দিককার জানালা আর দরজা সব সময় আগাগোড়া রঙীন পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখত। এটা বক্‌সির মতো লোকের পক্ষে নবাবীআনা বটে, কিন্তু ওর চেনা-শোনা লোকদের এটা চোখে পড়ল না। একদিন ওর সাঙাৎ গোছের এক আদমী সবার সামনে ওকে বলে বসল, 'হাঁ, বক্‌সি, তুমার বহুকে বোরখা দিয়ে রাখ, তা নয় তুমার ঘরখানাকে বোরখা দিয়েছ। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেক, হেঁ…'। লম্বা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বেকুবের মতো হাসছিল বক্‌সি, বলছিল, 'আচ্ছা বোলা হ্যায়, ভাইয়া, আচ্ছা বোলা হ্যায়…'। কিন্তু সেদিন থেকে ওর নাম রয়ে গেল, 'বোরখা সিং'।

শিবলালের এতক্ষণকার অসাড় ভাবটা মুহূর্তের জন্য কেটে যাবার মতো হ'ল। হাতের গেলাসটা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল ও। ওর ভেতরকার একটা তীক্ষ্ণ স্বর যেন বলে উঠল, 'নহী', কভী নহী'। এ কখনও বোরখা সিংয়ের খুপসুরৎ বহু নয়। মানুষ এত ভুল ধারণা করে, অদ্ভুত…'

'হামারা বড়া নসীব, শিববাবু। লেকিন আপলোগোঁকা মাফিক ইহাঁ কুছ মিলেগা নহী'...' মনে হল বক্‌সি যতবার মুখ খুলবে ততবারই এই কথা বলবে। একটু আগে শিবলালের ভেতরটা যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা আবার যেন নেতিয়ে পড়ল। বক্‌সির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলে সে। রুক্‌মিনীর সঙ্গে ওর কি তফাৎ। বয়েসের জন্যে, ওর সম্ভ্রমপূর্ণ ভাবের জন্যও বটে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল ও। পাখার বাতাস দিচ্ছে আর সেই বাতাসে ওর নিজের দাড়িটা নড়ছে একটু-একটু। ওর চোখ ছুটো কোঁচকানো, মুখে সেই কুণ্ঠিত ভাব, যেন পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে।

শিবলাল মাথা তুলে কিছু বলবে বলে মনে করল, কিন্তু তার আগেই বেরিয়ে গেল বক্‌সি। খুব জরুরী কোনো কিছু মনে পড়ে গেছে এমনি করে বললে, 'হাঁ...আরে, কেয়া মুস্কিল...হাম্‌কো আভী বাহারমেঁ যানা পড়েগা। এ ছোটী, সুনো, বাবুকে পাস রহো, হাম আভী আতা হ্যায়।'

শিবলালের একবারের জন্যেও মনে হল না, বক্‌সির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির কিংবা শ্রমিক আন্দোলনের কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হল। ও ভাবলে, বক্‌সি এই যে ওকে আশ্রয় দিচ্ছে, সেটা ওর একটা চাল। সামাজিক ব্যাপারে ও একটা ব্যঙ্গ-কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠেছে আর তারই পাল্টা চাল হিসেবে ও এই রকম একটা কাজ করে বসেছে! কিন্তু তবুও, একে মেনে নেওয়া ছাড়া তার উপায় নেই।

বক্‌সি বেরোল আর তার সঙ্গে রুক্‌মিনীও বাইরে চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত নিঃঝুম, কোনও রকম সাড়া শব্দ নাই।

শিবলাল হাত ছুটো আবার বিছানার ওপর রেখে দিয়েছিল, মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকানো। কিছুক্ষণ এমনি করে বসে থাকবার পর, ওর নিজের চিন্তাটা ভোঁতা হয়ে এল। হুমড়ি খেয়ে বিছানার ওপর পড়ল ও, ক্লান্তিতে ওর দেহ-মন ভেঙে পড়ছিল।

কিন্তু তার পরের দিন সকালে যখন ওর ঘুম ভাঙল, এখন ওর সমস্ত শরীর অদ্ভুত হাল্কা হয়ে গিয়েছে। চোখ মেলতেই সামনে পড়ল জানালার পর্দাটা। একটা তীক্ষ্ণ কৌতুক চকিতে ঝলসে উঠতে চাইল, চিরকালের মতো—কিন্তু পর-মুহূর্তেই তা নেতিয়ে পড়ল। একটা স্নিগ্ধ আরাম অনুভব করল শিবলাল। পর্দার একদিকে তেরছা হয়ে সকাল বেলাকার আলো এসে পড়েছে। তারপর

পর্দার ঐ অল্প একটু ফাঁক দিয়ে আলোর একটা রেখা জানালার দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর একটু পরেই এই রোদ কড়া চাবুক মারতে থাকবে, কিন্তু কোন হিংস্র জন্তুর শিশুটির মতো এ আলো এখনও মৃদু, ভারি সুন্দর। শিবলালের চোখ দুটি ঝিকঝিক করে উঠল। ওর চোখে ঘুমের জড়তা এখনো সবটুকু কাটে নি, চোখ দু'টি একটুখানি কুঞ্চিত হয়ে রয়েছে। আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হ'ল আজকে ওর কোন কাজ নেই। আজকে কারখানায় যেতে হবে না। এ্যাকশন কমিটির কাজও করতে হবে না ওকে। ও ভাবলে, 'ছাড়া পেয়ে গেছি·· এখন তো আমি মুক্ত!' আর একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর দু'চোখ বন্ধ হয়ে এল, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ পড়ে রইল ও।

বিছানার থেকে উঠে মেঝের ওপর দাঁড়াল সে। হাতের তেলো দুটো জড়াজড়ি করে মাথার ওপর দিয়ে এনে কাঁধের ওপর টান দিয়ে হাই তুললে। বুঝতে পারল না ঘরের বাইরে যাবে, না কি একটু দাঁড়াবে। তারপর দু'এক পা করে জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল। আঃ, হঠাৎ ঝিরে-ঝিরে একটা বাতাস এসে ওর চোখে মুখে লাগল, পর্দাটার দুই প্রান্তের ফাঁক দিয়ে আসছে। এতক্ষণ যে পর্দাটা নড়ে, নড়ে উঠছিল সেটার দিকে খেয়াল করে নি শিবুলাল। কিন্তু সে কথা নয়, এই মৃদু বাতাসটা যেন তার দেহে সুধা ঢেলে দিলে। তার শুকনো মুখখানার মধ্যে তখনও যে টানটান ভাব ছিল, সেটা শিথিল হয়ে পড়ল, তারপর স্ফুরিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ ওর কি হল, হাত বাড়িয়ে জানালার পর্দাটা খানিকটা সরিয়ে দিতে চাইলে ও। কোণাগুলো বাঁধা ছিল, সরাতে পারল না ও, তবু খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু তখুনি আবার হাতটা সরিয়ে নিতে হল ওকে। এ আবরণ তো সে সরিয়ে ফেলতে পারে না। এই পর্দা নিয়ে এর আগে সেও তো কৌতুক করেছে, কিন্তু সেই পর্দাই এখন তার আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত, বিচিত্র। এখন তার সেই কৌতুক-বোধটা নিয়েই ওর মন ভরে উঠেছে। যেন হেসে পেছনের দিকে তাকানো যায়, ভালো মন্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

ফিরবে বলে মনে করছে, এমন সময় এ শিফ্‌টের জন্য কারখানার ভোঁ বেজে উঠল। অভ্যস্ত শিবলাল চকিত হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু আশ্চর্য, তার পরেই ওর মনে হল, ওই শব্দ যেন কত আগে শুনেছে ও। অপরিচিত তা নয়,

কিন্তু কতকাল আগে চেনা হয়েছিল এখন যেন তা ঠিক মনে পড়ছে না। পর্দার যেটুকু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্য দিয়েই দেখতে পেলে ও, গেট দিয়ে কর্মচারীরা কারখানায় ঢুকতে আরম্ভ করেছে, আর রাত্রির ডিউটি সেরে অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাইকেলে করে একজন আর একজনকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের অজ্ঞাতেই দৌড় চালাচ্ছে। বিপরীতমুখী কারও সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গ উঠছে কিন্তু তার জন্যে থামতে পারছে না। পাশাপাশি দু'জনে মিলে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে—কথা টেনে টেনেও শেষ করতে পারছে না। একটা 'কার' হুস করে ভেতরে ঢুকল। এ যেন কেমন করে হয়ে চলছে। শিবলাল ঝুঁকে পড়ে পর্দার ফাঁকে ওর বাঁ হাতটা রাখলে। আঙুলগুলো চোখের সামনে বিছিয়ে রয়েছে, আর তা পেরিয়ে কর্মচারীদের যাতায়াতও চোখে পড়ছে ওর। মনে হচ্ছে, ওরা ঠিক যেন অন্য জগতের মানুষ, ওদের সঙ্গে ওর কোনও মিল নেই। শিবলাল ভাবলে, 'এই কাল পর্যন্ত আমিও কারখানার ভিতর এমনি করে গেছি…'

বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হল। তারপরেই রুক্‌মিনী ঘরে ঢুকে বললে, 'আরে, তুম্ ক্যা করতে হো, চা পী লেও…'।

শিবলাল বললে, 'আমি তো এই উঠলাম, এখনই যাচ্ছি কুয়োতলায়…' বলে ও দাঁড়িয়ে রইল।

শিবলাল যেদিকে মাথা করে শুয়েছিল, সেইদিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে তোলা একজোড়া কাপ-ডিস পাড়লে রুক্‌মিনী। তারপর শিবলালের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'তুম্ উহাঁপর ক্যা দেখ রহতে থে? কারখানেকে আদমি যাতে হ্যায় আতে হ্যায়, তুম্ উনকো দেখা নেই?'

'আমি ভাবছিলাম জানালার পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখি ভাল করে। তক্ষুণি আবার ছেড়ে দিলাম…আমি আবার পর্দার জানানা হয়ে গেছি কি না!' শিবলাল মুচকে হাসতে গেল, কিন্তু তার আগেই চমকে থেমে যেতে হ'ল ওকে। রুক্‌মিনী হাসিতে ফেটে পড়েছে। ও ডান হাতে কাপ ডিসটা সজোরে চেপে ধরেছে, আর বাঁ হাতে করে মুখে কাপড় চাপা দিয়েছে—ঢাকবার জন্যে নয়, হাসি সামলাবার জন্যে! এক সময় ও খানিকটা সামলে বলতে গেল, 'ছাঃ-ছাঃ-তুম্ আচ্ছা বোলা…তুম্-ছাঃ…' কিন্তু আবার ভেঙে পড়ল।

একটু বাধা পেয়ে, পরক্ষণেই আবার শিবলালের মুখ হাসিতে ভরে উঠল। এই স্বচ্ছন্দ আর বলিষ্ঠ মেয়েটাকে ভারি অদ্ভুত মনে হল তার।

একটু পরে বিছানায় বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল ও। হাত মুখ ধুয়ে রুক্মিনীর কালকের দেওয়া লুংগিটা পরে বসে ছিল ও। তোয়ালেটা ঘাড় আর কাঁধের চারদিকে জড়িয়ে ফেলে রেখেছে। খুব পরিচ্ছন্ন আর হাল্কা মনে হচ্ছে নিজেকে। আর মনে হচ্ছে যেন সে ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু এ ক্লান্তিতে তাকে কষ্ট দিচ্ছে না, সমস্ত শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে এলিয়ে পড়তে চাইছে।

শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল শিবলাল। বিছানার ওপর একটু পিছিয়ে গিয়ে দেওয়ালটায় ঠেশ দিলে। একটু আগে থেকে যে চিন্তাটা ওর মনের মধ্যে জট পাকিয়ে উঠছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাবলে, 'যদি হঠাৎ করন্তে এখানে এসে না পড়তাম, তাহলে তো এ অভিজ্ঞতা আমার হত না।...কিন্তু মেয়েটি এমনি করে হাসে কেন?' অদ্ভুত, এটাই সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে তার কাছে। ওর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, হয়তো সেই জন্যই ওর কুণ্ঠা নেই। রুক্মিনী যখন হাসে, তখন যেন গমগম করতে থাকে। চমকে উঠে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া উপায় থাকে না।

কিন্তু এ চিন্তাও শিবলালকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। যেমন করে মানুষ চোরাবালির ওপর দাঁড়াতে গিয়ে তলিয়ে যেতে থাকে, ও তেমনি রুক্মিনীর সমস্যা চিন্তা করতে গিয়েই সেটার থেকে দ্রুত সরে যেতে লাগল। ঘুমে ওর শরীর ভেঙে এল যেন। চোখের পাতা টান হয়ে আসছে। সকাল বেলাকার মৃদু ঠাণ্ডা আবহাওয়াটা ওর মাথার মধ্যে একটা শান্তির ভার চাপিয়ে দিলে। দেয়ালে ঠেশ দিয়েছিল সে, যেন গড়িয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ল। যেমন করে বাইরের সবকিছু থেকে—তার কারখানা, পরিবার আর এ্যাকশন্ কমিটি থেকে ছিটকে এসেছিল শিবলাল, তেমনি এদের সম্বন্ধে তার হঠাৎ জাগ্রত কৌতূহল থেকেও সরে গেল ও।

তারপর সারাদিন এবং তার পরের কয়েকদিন কেমন করে যে দিন রাত্রি ওর কেটে যেতে লাগল, সে সম্বন্ধে ওর কোন বোধ ছিল না। যতটুকু সময়ের জন্য ও জেগে উঠত, ততটুকু সময়ও তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে থাকত। স্নান করা, খাওয়া, টুকি-টাকি দু'একটা কাজ এগুলো করতেই হোত তাকে। কিন্তু এগুলোও যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে করা। হাল্কা, নরম, কচি পাখির পালকের মতো, গতি আছে কিন্তু ভার নেই। আস্তে আস্তে তার ঘুমনো আর জেগে থাকা এক হয়ে উঠল। চোখের ওপর দিয়ে পরপর ভেসে যাচ্ছে মানুষ, ঘটনা, তারা হাসছে, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে—কখনও একলা, কখনো দল বেঁধে। প্রথম প্রথম খুব

আস্তে আস্তে, তারপর মিছিলের মতো ছুটতে থাকত। তারপর এমনি বনবন করে সেগুলো ছুটতে লাগল যে শিবলাল চিৎকার করে উঠে পড়ত, বিছানার ওপর বসে বুক টিপ টিপ করত ওর। সমস্তটা বুঝতে পেরে তারপর হঠাৎ ও মুচ্‌কে হেসে ফেলত।

খোলা দরজা দিয়ে উঠোনটা দেখা যায়। বেলা বেড়েছে, রোদ্দ্‌র পড়ে ঝাঁ-ঝাঁ করছে। আর একটু পরে তাকানো যাবে না ওদিকে। উঠোন পেরিয়ে কুয়োতলা, কুয়ো থেকে বালতিতে করে জল তুলছে রুক্‌মিনী। বেশ বড় গোছের বালতিটা, নারকেল-কাতার কাছিতে বাঁধা। রুক্‌মিনী একটুখানি ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, দুই হাত পর পর দ্রুত বেগে ওপরে নিচে ওঠানামা করছে, এতবড় বালতি তুলতে ওর কোনরকম কষ্ট নেই। কিন্তু শিবলালের মনে হল ও যেন অনেকক্ষণ ধরে জল তুলছে। এত জল ওদের কি কাজে লাগতে পারে কে জানে। হয়তো আজকের দরকারের সমস্ত জলটা তুলে ফেলতে চায় ও এক সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই কি ওর জল তোলা শেষ হবে না? সমস্ত জিনিসটা যেন অসহ্য হয়ে উঠল ওর কাছে। 'কি করতে চায় কি ও, এত জল কি হবে?' তখন রুক্‌মিনী দুহাতে দু'টো ভরা বালতি নিয়ে হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুটে এল। কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে কি হবে। রুক্‌মিনী হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল উঠোনের ওপর। আর পড়ে গিয়ে সে কি হাসি ওর। হাসিটা ঢেউ দিয়ে দিয়ে উঠছে, সব কিছুতে যেন ধাক্কা দিচ্ছে ঠাক-ঠাক করে। আর এদিকে জলটা সব ছিটকে পড়েছে উঠোনের ওপর। জলটা গড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায়। কতকগুলো জিনিস ভাসিয়ে দিল জলের তোড়ে। জলটা গড়িয়ে গড়িয়ে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।

অধ্যায় ৯

এমনি করে কতদিন, কুড়ি দিন, নাকি পঁচিশ দিন কেটে গেল। শিবলালের খেয়াল ছিল না সে দিকে। যে কর্ম-প্রয়াস মানুষকে সময়ের প্রবাহ, বস্তু-জগৎ এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন রাখে, সেটার থেকে শিবলাল, অনেক আগেই সরে এসেছিল। রাত্রিতে বক্‌সিদের তক্তপোষে রোজকার মতো শুয়েছিল শিবলাল, দেওয়ালের দিকে মুখ, হাত-পা ছড়ান লম্বা-লম্বা করে। গরমের জন্য কাঁধের ওপর

আর গলার পাশ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। প্রথম প্রথম বিছানায় পড়লেই ভারি ভারি নিঃশ্বাস পড়ত ওর, ছোট খাট হাপরের মতো। কিন্তু এই ক'দিনেই সেটার পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে নেতিয়ে শুয়ে পড়ে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যায় না।

হঠাৎ একটা চটকা লেগে ঘুম ভেঙে গেল ওর। বুঝলে যে এতক্ষণ ও ঘুমোয় নি। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু মনে করার আগেই রুক্মিনীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে ও। সে বলছিল, 'লেকিন, তুম দেখো, এ বাঙ্গালীবাবু বহুৎ কমজোরী হো গিয়া। খালি শো রহতে হ্যায়…'

'হাঁ, হাঁ, এ বহুৎ খারাবী বাত আছে। লেকিন ছোটী, তুমি ওকে একটু বেশি করে দেখো, কত বড় আদমি আছেন উনি…' বকসি যেন তোষামোদ করছে এমনি করে তার যুবতী বহুকে কথাগুলো বললে।

শিবলালের পাশ ফেরা দরকার ছিল, কিন্তু পারল না। কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল। ওরা তাহলে রোজই এঘরে শোয়, আর সে কোন দিন ব্যাপারটা জানতেই পারে নি? 'ওরা কি রোজই এমনি করে কথা বলে ··আমার কথা বলে ওরা?' কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর নিজের থেকে কিম্বা ওদের কথাবার্তা থেকে পেল না শিবলাল, তন্দ্রায় চোখ দু'টো জড়িয়ে গেল।

ঠিক সেইদিন, বা তার পরের দিন আবার তেমনি করে কথাবার্তা বলতে শুনল ওদের। বক্‌সি বলছে, 'ছোটী, আমি তো কলকত্তা যাচ্ছি, তিন চার দিন দেরী হবে। আমার ভাবনা হচ্ছে কি, এ বাবুর দেখাশুনা কেমন চলবে…'

শিবলাল মুচকে হাসলে, লোকটা আছে বেশ। কারখানার দারোয়ানী করে, টাকা ধার দেয়, তার ওপর মাটির কুঁজো চালানির ব্যবসা করে। তার এক সম্পর্কের শালা ফাগু এই ব্যবসায়ের অংশীদার, আরানসোলে ছোট একটা মুদি দোকান চালায় সে। বক্‌সি এই অঞ্চলের কুমোরদের ভাটি থেকে কুঁজো সংগ্রহ করে এনে দেয়, আর ফাগু কলকাতায় সেগুলো নিয়ে যায়। ফিরবার পথে মশলা নিয়ে ফেরে সে, তাতে দু'দিক থেকে লাভ হয় ওর। এবারে ফাগুর বেমারী হয়েছে বলে বক্‌সিকেই কলকাতা যেতে হচ্ছে।

'জানিস ছোটী, শালা বনমালী…শালাঃ বঙ্গালী যে কত রকম আছে,… তিঁন বরষ আগে আমার থেকে চল্লিশ রুপিয়া লিয়া, লেকিন আজ তক ওআসিল কিয়া নহী,…' শেষের দিকে বক্‌সির স্বভাব-নম্র কণ্ঠস্বর তিক্ততায় ভরে উঠল।

শিবলাল মনে মনে হাসল। কোন বনমালী সম্পর্কে একথা বলছে বক্‌সি, তাতে ওর কোন সন্দেহ রইল না। অনেক দিন আগেকার দেখা বনমালীকে সেই হিড় হিড় করে টেনে আনার দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে উঠল ওর। কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রির আলোছায়ায় বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ প্রেত দেখলে মানুষের যেমন হয়, শিবলালের এই কৌতুকবোধ তেমনি মুহূর্তে ওকে যেন মৃত্যু-চেতনার মধ্যে এনে ফেললে। বক্‌সি বলছিল, 'এই এক বঙ্গালীবাবু আছেন, তামাম মজদুর ভাইদের জন্যে লড়াই চালাচ্ছেন। আর এক বঙ্গালী, শালাঃ বনমালী আপনে ভাইকা বেটীকো সাহেবকে পাশ ভেজ দেতা হ্যায়···হাঁ, সুনো, আউর নোকরী মেঁ উসকে লিয়ে প্রমোশন ভী মিলতা হ্যায়···'একটা তীব্র ক্ষোভ আর আন্তরিক দুঃখ ওর কথাগুলোয় ফুটে উঠল।

'হাঁ? উসকী লড়কীকো ক্যা হোগা···' রুক্‌মিনী আহত কণ্ঠে বললে।

'বহুৎ আপশোষ, ছোটী···ক্যা, ক্যা হুয়া বাবু? শিববাবু, আপ জাগতে হ্যাঁয়?' উদ্বিগ্ন বক্‌সি বালিশের থেকে মাথা তুলে এদিকে তাকালে। ভাবলে, উঠে আলো জ্বালাবে কি না।

শিবলাল বোধ হয় নিজের অজান্তেই আর্তনাদ করে উঠেছিল। কিন্তু বক্‌সির প্রশ্ন ওর বিমূঢ় চেতনাকে একটু স্থির করে তুললে যেন। ও তারপর নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল।

'ও কুছ্‌ নেহীঁ, বাবু ঠিক হ্যায়···' রুক্‌মিনী বললে।

মনে হল বক্‌সি রুক্‌মিনীর এই যুক্তি গ্রহণ করলে। ওরা আবার সেই আলোচনা করতে লাগল যে, শিবলাল খুবই কমজোরী হয়ে গেছে, আর কমজোরী মানুষ ঘুমোতে ঘুমোতে এমনি চিৎকার করে ওঠে। বক্‌সি বললে, এবারে সে কলকাতা থেকে ফিরে এসেই কোনো রকম পোস্টাই খাবারের বন্দোবস্ত করবে।

শিবলাল চুপ করে পড়ে ছিল, হাত-পা নাড়বার মতোও সাহস ছিল না ওর। ওদের কথাবার্তাগুলো ওর মস্তিষ্কে ছুঁচ ফুটোতে লাগল যেন। কিন্তু এরই মধ্যে একটা অদ্ভুত চেতনা ওর মনের মধ্যে কাজ করতে লাগল। ক্ষণিকের জন্যে ওর পেছনে ফেলে-আসা জীবনের সমগ্র রূপটা চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। মনে হল তার মধ্যে আর কখনও ফিরে যেতে পারবে না ও। তার সব কিছু কবে মরে গিয়ে কালো কঠিন হয়ে উঠেছে, সেই কালো, মৃত জগতের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল সে, এখন তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

আর সত্যিই তার মনে হতে লাগল, তার বুকের ভেতর কোথায় বিষের জ্বালায় ডানা ঝটপট করছে, আস্তে আস্তে সব শেষ হয়ে আসবে।

*   *   *   *

মানুষ কি আত্মকাম, না কি, বিশ্বকাম? সে কি স্বার্থপর, ব্যক্তিত্বের বামাচারী সাধক, না কি তার সত্তা পরার্থপর, আত্মোৎক্রামী?

মানুষ স্বভাবতই আত্মকাম। ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রো প্রিয় ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রো প্রিয় ভবতি। নিজের ভালো লাগে বলেই আত্মেতর কিছু ভালো লাগে। যেখানে আত্মেতর কিছু আমাদের রোচে না, সেখানে তা আমাদের ভালো লাগে না। কিন্তু মানুষের আত্মত্বের প্রকাশ ও পুষ্টির প্রক্রিয়াটি ভারী বিচিত্র। এ যা চায় তাতে এর আনন্দ, তাতে এর বিকাশ—আবার এ যা চায় না—তাতে এর দুঃখ কিন্তু তাতেও এর বিকাশ আর পুষ্টি। বরঞ্চ বিরোধের দ্বারাই এর অনুভব নিবিড় হয়ে ওঠে। এ আবার স্থিরও নয়, ক্রমাগতই এ এগিয়ে যেতে থাকে, এক আনন্দ থেকে আর এক আনন্দে, এক বিরোধ থেকে আর এক বিরোধের মধ্যে।

আবার মানুষ স্বভাবত বিশ্বকামও। তার আত্মবোধ আত্যন্তিক হ'য়ে উঠলেই তা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। তার গতিপথের উৎস-মুখের দুর্দমতা আর থাকে না, তখন সে কলধ্বনিতে নৃত্য করে না, বিরোধের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হয় না; তখন সে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মতো মন্থর, স্নেহশীল হ'য়ে ওঠে, আপনাকে সে আপনি পায়, তার আত্মত্ব বিশ্বত্বে সঙ্গত হয়। জীবন দোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে এখন সময় হলো তোমার কাছে আপনারে দিই আনি।' পরমের নিকট আত্মসমর্পণে সে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ হ'য়ে ওঠে।

সমাজবিজ্ঞানী বলছেন, আত্মকামনাই মানুষের স্বভাবজ, বিশ্বকামনা, ভূমার জন্য তৃষ্ণা তার কাছে কৃত্রিম। মানুষ যে তবু পরার্থপর হ'য়ে ওঠে, তার কারণ অতৃপ্ত আত্মকামনা, কামনা কামভোগের দ্বারা শান্ত হয় না বলেই। দায়ে পড়ে সে সাধু সাজে, প্রাণের আবেগে নয়। আত্মকামনাই তার লক্ষ্য, তবু যে সে বলে সঙ্গচ্ছধ্বম্, সে কেবল সমাজরক্ষক প্রতিক্রিয়াশীলদের শিক্ষাগুণে, যে-শিক্ষা নিতে সে বাধ্য হ'য়েছে।

* তা নয়। সে কেবল স্বেচ্ছাচারী নয়, সে সংগতও। যে প্রয়োজনে সে আত্ম-কাম, সেই প্রয়োজনেই সে বিশ্বকাম। এক হ'তে হ'তে সে আর-এক হ'য়ে ওঠে। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সমাজই মানুষকে সংগত ক'রে রাখে, তার

অন্তর-প্রকৃতি নয়, তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, মানুষ তাহলে সমাজ গড়ে তুলল কেন? পশুরা তো করে নি। তার উত্তর এই: সংগত, সংযত মানুষ আপনার অন্তর-প্রেরণাতেই সংঘের সমাজের বন্ধন স্বীকার করেছে। ভোগ আর ত্যাগ দুই-ই তার স্বভাবজ, এক বৃক্ষে নিষণ্ণ দুই পক্ষীর মতো, এই হচ্ছে তার জীবনের ধর্ম, মানুষের ধর্ম। ধৃ···ধৃতি: জীবন-প্রবাহের ধারকই ধর্ম। নদীকূল নদীপ্রবাহের তাই সহায়ক, বিরোধী নয়। অরূপ আপনাকে রূপের মধ্যে দেখছেন; রূপধৃত মানুষ তাই অরূপমুখী। আত্মকাম মানুষ বিশ্বকামও।

এই রাত্রির পরের দিন অনেক বেলায় শিবলালের যখন ঘুম ভাঙল, তখন তার মনে এমনি ধরণের একটা অস্পষ্ট কিন্তু নিশ্চিত পরিবর্তন এসে থাকবে। ঘুম ভাঙতে চোখ না খুলেই শিবলাল বুঝলে, বক্‌সি ভোরবেলা কলকাতা রওনা হয়ে গিয়েছে। চোখ খুলে দেখলে, রুক্‌মিনী স্নান সেরে কাপড় বদলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। রেখা-রেখা শক্ত গড়ন, বেশ বড়ো-সড়ো, মনে হয় পাথর কেটে এ মুখ কেউ গড়েছে। ভিজে চুলগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়। হলদে ফুলের ছিটে দেওয়া লাল রঙের শাড়ি পরেছে ও। স্নান করার পরিশ্রমে ওর বুক ওঠা-নামা করছে, যা-ওর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যটাই ফুটিয়ে তুলেছে।

'ক্যা, তুম্‌হারা বিমারী তো হুয়া নেহীঁ?'

রুক্‌মিনী ডান হাতটা শিবুর কপালের ওপর রাখলে। ঠাণ্ডায় ওর কপালটা জ্বালা জ্বালা করে উঠল যেন। কিন্তু গতরাত্রির দুঃস্বপ্নের পর এইটেই ওর কপালে সুধার টীকা পরিয়ে দিলে যেন। ও মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বললে, 'বহিন, তোমাদের কাগজ-কলম আছে, দিতে পারো আমায়?'

'ও, তুমি লিখা-পড়া করবে?' রুক্‌মিনীর চোখ দু'টি সজল হয়ে এল, এত-গুলি দিনের মধ্যে শিবলাল এই প্রথম কিছু চাইলে তার কাছ থেকে। তাড়াতাড়ি বললে, 'ও, আমি দিচ্ছি তোমাকে। লেকিন, তাড়াতাড়ি উঠে পড় তুমি··· আমি আসছি··' বলে ও চলে গেল। শিবলাল জানে, রান্নাঘরে চায়ের জন্য চলে গেল ও।

শিবলাল হাতমুখ ধুয়ে এসে কাগজ-কলম নিয়ে বসল, তার ভয়, পাছে তার এই অনুভবটুকু দুর্বল মনের মধ্যে হারিয়ে যায়। 'এই যে বক্‌সিকে আমরা 'বোরখা-সিং' বলে ঠাট্টা করি, সেটাই তার সত্য পরিচয়, না কি, এই যে বোরখা দেওয়া একই ঘরে তার বহুর সঙ্গে আমাকে রেখে চলে গেছে, সেই বিশ্বাসটা সত্য?' এই প্রশ্নটাই সমাধানের মতো ফুটে উঠে তার সমস্ত চেতনাকে সৌরভে

ভরে তুললে। মানুষ সংশয় ক'রে, কিন্তু বিশ্বাস তাকে করতেই হবে। মানুষ প্রতারণা করে কেন, এ প্রশ্ন একবার (এ্যাকশন কমিটি গড়ে ওঠার সময়) তাকে অত্যন্ত পীড়িত করে তুলেছিল। এখন তার মনে হ'ল, মানুষ প্রতারণার উর্ধ্বে উঠবে বলেই এই প্রতারণা আছে। পশুর মৃত্যু নাই, কেননা তার মৃত্যুচেতনা নাই; মানুষের তা আছে বলেই সে মৃত্যুর চেয়ে বড়, অমৃতকে পেয়েছে।

শিবলালের নিজের পেছনকার জীবন তো কেবল অতৃপ্তি, কেবল বিদ্রোহ। কারখানায় ছাঁটাই চলছে: সে বলেছে, ছাঁটাই চলবে না; তার বাবা তাকে বলেছেন, আন্দোলন কোর না: সে বলেছে, আন্দোলন করবো, কেননা এটাই ভাল। বাবা বলেছেন, লীলাকে বিবাহ করো: শিবলাল বলেছে মেনকাকে; আবার মেনকাকে জীবনে গ্রহণ করতে গিয়ে সে ছুটেছে লীলার দিকে। আবার যখন মেনকার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে, তখন লীলাকে মুক্তি দিয়েছে নিজের মন থেকে? তাই-ই ভেবেছিল সে, ভেবেছিল মকরসংক্রান্তির মেলার মতো ভুল আর কখনো করবে না, কিন্তু গতরাত্রিতে বক্‌সির মুখে লীলার কথা শুনে মৃত্যু-যন্ত্রণা বোধ করেছিল কেন সে। কেন? না, এখনও তার চিত্ত লীলার নিকট প্রসাদ-প্রত্যাশী, লালায়িত সে।

'না, আমার জীবন কখনোই এমনি নয়, আর একভাবে তাকে দেখা যায়। এই জীবনে আর এক রকম করে বাঁচতে হবে…' এইটে যেন অনুভব করতে লাগল শিবলাল। গতরাত্রিতে পেছনের সমস্ত জীবনটা তার কাছে মনে হচ্ছিল প্রেতপুরীর মতো, যার মধ্যে সব মৃত, কিন্তু আজ শিবলালের মনে হ'ল, সেটা তার অতৃপ্ত, আহতকাম সত্তারই বিকৃত দৃষ্টির ফল। নতুন চোখে দেখতে হবে, নতুন ক'রে বাঁচতে হ'বে—এইটে বারবার করে উচ্চারণ করতে লাগল শিবলাল।

'ও, তুমি বসে আছ, বেশ…' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল রুক্‌মিনী। শিবলাল তার কথামতো ইতিমধ্যে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসেছে। 'নাও, এটা খেয়ে নাও…' রুক্‌মিনী ওর জন্যে চা নয়, বাটিতে ভরে গরম দুধ নিয়ে এসেছিল।

অধ্যায় ১০

জানালার ওপর কনুই রেখে পুষ্প বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। জুনাপুরে ট্রেন পৌঁছোতে এখনো দুটো স্টেশন বাকি। ওর বাচ্চা মণ্টু এখন অনেকটা বড় হয়েছে, এক বছর পেরিয়েছে সেদিন। মণ্টু বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন মায়ের অজান্তে জানালা ধরে উঠে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সামনের বেঞ্চিতে এক বুড়ি তার বোঁচকা-বুঁচকী নিয়ে জবুথবু হ'য়ে বসেছিল, ওর ঘোলাটে চোখে কেবলই এদের দিকে তাকাচ্ছিল। গজগজ ক'রে বলে উঠল, 'বলি ও বাছা, তুমার ছাঁ-টোকে ধরগো ··পড়ি যাবেক যে?'

পুষ্প চমকে উঠে ফিরে তাকাল, ও ছেলেটাকে এমনি করে ধরলে যে ওটা যেন পড়েই যাচ্ছিল। বুড়ি বললে, 'বলি হঁগো, যাইছ কুথা···শ্বশুরঘর যাইছ? সঙ্গে উটো কে···হুই যে লেবেঁ গেল···তুমার দাওর হয়?'

পুষ্পর চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল। যেন ও ভয় পেয়েছে এমনি গলায় বললে, 'না, আমার দেওর নয়। ওর নাম হরিপদ···আমাদের ঘরে থাকে···' বলে ও তেমনি দৃষ্টিতে এক মুহূর্তে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'কিন্তু তুমি যাইছ কুথা, শ্বশুরঘর?'

'না, বাপের ঘর যাচ্ছি।'

বুড়ির ঘোলাটে চোখ দুটো ছোট হয়ে এল হাসিতে, ফোকলা মাড়ি বের করে ও বললে, 'হঁ গো, বাপের ঘর যাইছ ত গালে হাসি কই? মুয়ে পান চিবাইছ নাই ত···গাল বেয়ে পানের রস গড়ি পড়বেক কেমন!'

পুষ্পর চোখের মিটমিটুনি থেমে গিয়েছিল, আহত দৃষ্টিতে বুড়ির ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ও। বুড়ি হাত বাড়িয়ে পুষ্পর হাঁটুতে ঠেলা দিয়ে বললে, 'কথা বুলছ নাই কেনে···কি, বুল শুনি?'

মণ্টু পুষ্পর মাকড়িশুদ্ধ কানটা খামচে ধরেছিল আর সেইটে ধরে আর একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। ওর হাতটা ছাড়িয়ে পুষ্প ওকে কোলে টানতে টানতে বললে, 'বাবার খুব অসুখ, তাই দেখতে যাচ্ছি···' বলে পুষ্প আবার জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

মন্টু কোলের ওপর ঝেঁকে পড়েছিল···মাকড়িটা ছাড়িয়ে নিতে কেঁদে উঠেছিল ও, আবার ওটার জন্যে ঝোঁক ধরলে। বুড়ি ওর তোলা হাঁটু দুটো নামিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে ছেলেটা কোলে নিলে, 'ও-মা, তাই দেখি বিটির মুখ যেমন আমসি হয়ে গেছে। আহা, ভগমান, মা কালী ভাল করে দিক, মা। বাপের ভাল মুখ দেখে ফিরে যাও···' বলে ও ছেলেটাকে নিয়ে পড়ল।

পুষ্প কনুইটা জানালার ওপর রেখে আর একটু ফিরে বসল। হঠাৎ একটা কান্নার আবেগ ওর বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠল, ওর ভয় করতে লাগল, পাছে এই ভর্তি কামরার মধ্যেই ও কেঁদে ফেলে। ওর চিবুকের নিচেটা কাঁপতে লাগল কেবল।

শিবলাল অজ্ঞাতবাসে চলে যাবার পর হরিপদ কিছু স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেছে। শিবলাল চিঠি লিখে রেখেই গিয়েছিল, কিন্তু তার পরের দিনই বাঁকুড়ায় চলে যায় নি হরিপদ, চন্দ্রকান্তর অসুখটা তারপর কিছুদিন ধরে যেন একটু ভালোর দিকে এসেছিল, জ্বালা-যন্ত্রণা বলতে কিছু ছিল না। ডাক্তাররাও বলেছিলেন, ভালোর দিকে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর যেমন করে বাদলা-দিনের শেষে রোদ হেসে উঠেই দুর্যোগকে আরো ঘন করে তুলে সরে যায়, চন্দ্রকান্তর অসুখের অবস্থাটাও তেমনি হয়ে ওঠে।

ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে হরি প্লাটফর্মের ওপর নেমে পড়েছিল। এই রকম দু'একটা স্টেশন ছাড়া ছাড়া ও প্রায়ই নেমে পড়ছে, গম্ভীর হ'য়ে একটু পায়চারি করছে, আবার উঠে এসে বসছে। প্লাটফর্মের ওদিকে ও কেন গিয়েছিল ওই জানে, কিন্তু ও যেভাবে ফিরে আসছে তাতে মনে হয়, যাওয়ার ওর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। মাথাটা একটুখানি সামনের দিকে ঝোঁকানো, মাটির ওপর চোখ রেখে এগোচ্ছে। পুষ্পর কাছাকাছি এসে একবার তার মুখের দিকে তাকালে। যেন ও বলতে চায়, ওর ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়েছে—চন্দ্রকান্তর কঠিন অসুখ, পুষ্পকে বাঁকুড়া থেকে নিয়ে আসা—সে সম্বন্ধে ও খুবই সচেতন। সেই নিয়েই ও চিন্তা করছে।

হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে পুষ্পর পাশে এসে হরিপদ বললে, 'ছোড়দি, তুমি জলটল খাবে ত খেয়ে লাও কেনে···' হরিপদ এখন আর পুষ্পকে 'দিদিমণি' বলে ডাকে না, এবারে প্রথম থেকেই 'ছোড়দি' বলে ডাকছে।

পুষ্প ঘাড় নাড়তেই হরিপদ রেগে উঠল। ও মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললে, 'ফের তুমি থালে ভাবনা করছ কেনে···তুমাকে বারণ করলম নাই?'

ওর চিবুকটা টান হয়ে ঝুলে পড়েছিল। একটা বিরক্ত ভাব দেখিয়ে ও আবার ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালে, কিন্তু হুইসিল দেওয়াতে ও গাড়ির মধ্যে উঠে এসে বসল। পুষ্প ভীত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালে। হরি বড় হয়েছে এখন, জুনাপুরের অনেক খবর ও রাখে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলেই ও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। ওর ভাবটা এই: 'এইটেও আবার জিজ্ঞেস করে নাকি?' পুষ্প ডান দিকে ফিরে দেখলে, বুড়ি মণ্টুকে নিয়ে বকে যাচ্ছে আর মণ্টু বুড়ির মুখের দিকে জুলজুল ক'রে তাকিয়ে আছে। পুষ্প হরির দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললে, 'হরি, বাবার অসুখ···এতটা বাড়াবাড়ির কথা দাদা জানত?'

'জানত নাই? থালে উনি চিঠি দিলেক কি করে?' শিবলাল পুষ্প ও ভগ্নী-পতির নামে চিঠি লিখে ইসমাইলের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই চিঠি নিয়ে হরি বাঁকুড়ায় চলে গিয়েছিল।

'না-না, তা নয়···বাবার এই অবস্থায় দাদা কি করে চলে গেল, তাই বলছি···'

'না গেলে কি হত তুমি জান নাই? তার পরের দিন সকালে পুলিশ এসে 'সাচ' ক'রে উয়াকে লিয়ে যেত···'

পুষ্পর মাথাটা আপনিই খানিকটা পেছনে হেলে পড়ল, চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যেন ও একটা আঘাত এড়াবার চেষ্টা করছে। হরি সেদিকে তাকিয়ে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, বললে, 'ছোড়দি, তুমি বুঝতে লারছ···জুনাপুরে যা অবস্থা হইছে না, কারখানার সব লোক উয়ার মুখের পানে চেয়ে আছে। আমি ত বাজি রেখে বলতে পারি, শিবুদার (এটাও তার নূতন সম্বোধন) মতন লোক বলে সব দিক সামলাইছে···বড়বাবু হলে হিমসিম খেঁয়ে যেত···'

এটা যে সে আগে মনে করত তা নয়, কিন্তু এখন তার এটাই সত্য বলে মনে হ'তে লাগল।

হরি যতক্ষণ কথা বলতে লাগল, ততক্ষণ জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগল ও। কথা শেষ হবার পর খুব একটা বড় নিঃশ্বাস নিলে, কচি পায়রার মতো বুকখানা ফুলিয়ে পুষ্পর দিকে তাকিয়ে রইল ও। পুষ্প এর পরে ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেল না। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে গোপন করলে। ভাবলে, 'হরি যা বলছে সেটাই ঠিক। আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তা

না হলে ওর মত ছোট ছেলে যা বুঝতে পারে আমি সেটা বুঝতে পারি নাই কেনে··' এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে ওর নিজের থেকে অনেক বড় বলে মনে হল। 'তা না হলে দাদার নামে এই কথা আমার মনে হয়?' পুষ্প যে শিবলালের ওপর কথায়-কথায় একটুও সন্দেহ করেছে, সেইটেই ওর ভেতরে একটা কাঁটার মতো বিঁধে রইল।

কখন মাঝখানের স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছে, যাত্রীরা ওঠা-নামা করেছে, পুষ্পর খেয়াল ছিল না। জুনাপুর স্টেশন ইয়ার্ডে ঢুকবার জন্য গাড়ির গতি শিথিল হয়েছিল—হরি জানালা দিয়ে চট করে মুখ বের করে দেখে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আ গিয়া···জুনাপুর আ গিয়া। হাম আভী উৎরেগা···' পুষ্প হঠাৎ চমকে উঠল দেখে ও আবার বললে, 'কি হল ছোড়দি, তুমার?' কিন্তু জবাব শুনবার মতো সময় ছিল না ওর, ও তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র মেঝেতে নামিয়ে মণ্টুকে কোলে তুলে নিলে। দু'একজন ব্যস্ত যাত্রীকে কাটিয়ে এগিয়ে রইল ও। গাড়ি থামবা মাত্র প্লাটফর্মের ওপর নেমে পড়ে 'কুলি, কুলি'···করে ডাকতে লাগল।

হরিপদ লক্ষ্য করল না, ও যখন 'জুনাপুর আ গিয়া' বলে চিৎকার করে উঠেছিল, সেই মুহূর্ত থেকে পুষ্প যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। পুষ্পর কোল খালি ছিল, হাতেও কিছু ছিল না, গাড়ি থেকে নামবার ওর কোন বাধা ছিল না, কিন্তু ওর মনে হ'তে লাগল পা ফেললেই পড়ে যাবে। ওর বুকের ভেতরটা জোরে মুচড়ে ধরেছে। প্লাটফর্মের ওপর নেমে ওর অস্পষ্টভাবে মনে হল যে ওখানে ওই গেটের পাশে দাদা আর বাবা দাঁড়িয়েছিলেন, সে যখন স্বামীর সঙ্গে গেল বার চলে যায়।

হরিপদ কুলিটাকে সামনে করে পুষ্পর পাশে এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়িতে ওর বুক ওঠা-নামা করছিল, সেই অবস্থাতেই একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'বড়বাবুর জামাইবাবু কী মানুষ গো···বলে, পাঠাব নাই! তুমি যাই বল, ছোড়দি, তুমার শাউড়ী বরঞ্চ লোক ভাল···বললেক, আহা, বাপের অসুখ, লিয়ে যাও। জামাই বললেক কি, ছেলের অযত্ন হবেক। কেনে···এই রিস্‌কা, এই রিস্‌কাআলা···'

পুষ্পকে রিক্‌সায় তুলে দিয়ে মণ্টুকে ওর হাতে দিলে। একবার পুষ্পর মুখের দিকে তাকাল হরি, একবার দ্বিধা করলে, তারপর ওর পাশেই উঠে বসল। ছেলেটাকে আবার কোলে টেনে নিয়ে, বললে, 'দাও, আমাকে দাও···হঁ রে তুর

আবার ইখেনে যত্ন হবেক্ নাই ! কেনেরে, ই তুর মামাবাড়ি লয় ? আমরা নাই ইখেনে···হঁ ?'

পুষ্প প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ওর চিবুক থরথর করে কাঁপতে লাগল, গলার ভেতর একটা দলা ঠেলে উঠে এল যেন—ও পারল না, একটা বোবা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। হরির আদর করা ঝাপটা খেয়ে থেমে গেল, ফিরে দেখলে, পুষ্পর কপালের ওপর রুক্ষ চুলের গাছি এসে পড়েছে, ঠোঁট দুটো কাঁপতে কাঁপতে ফাঁক হয়ে গেছে। চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

হরি বিব্রত হয়ে পড়ল, তারপরেই ফোঁস করে উঠল ও, 'কি,···কি হল তুমার·· ও ছোড়দি···আঃ, থাম কেনে···'

রিক্সাওয়ালা পাদানিতে পা দিয়েছিল, ও কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে ভীতস্বরে বললে, 'ক্যা হুয়া ?'

হরি মহা বিরক্তির সঙ্গে রিক্সাওয়ালাকে ঝামটে উঠল, 'নেহী, কুছ হুয়া নেহী, তুম বাড়ো না, ইস্টিশন রোড বরাবর·· যত সব নিকুচি করেছে···' বলে ও গুম খেয়ে বসে রইল।

রিক্সাওয়ালা একবার বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুষ্পর মুখের দিকে তাকালে, পর মুহূর্তে লাফ দিয়ে সিটের ওপর উঠে বসল ও, খুব জোরে ঠান্‌-ঠান্‌ করে ঘণ্টা বাজিয়ে চালিয়ে দিলে।

রিক্সাওয়ালার ওপর ধমকটায় কাজ হল পুষ্পর। রিক্সার ছাউনির রড-গুলো বাঁ-হাতে চেপে ধরেছিল পুষ্প, সেই হাতের ওপর মুখ লুকিয়ে নিজেকে শান্ত করলে ও। কিন্তু ওর একবার ইচ্ছা হ'ল, হরিকে ডেকে বলে, রিক্সাওয়ালাকে বাবার অসুখের কথা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু হরিকে বলতে পারল না ও, নিজেরও বলবার মতো অবস্থা ছিল না। গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠেছিল।

অধ্যায় ১১

হরিপদ বাচ্চাটাকে নিয়ে আগে এগোল, আর তার পেছনে একটা বিকল গাড়ির মতো টানা হয়ে চলেছিল পুষ্প। মোটামুটি ওর একটা চেতনাই ছিল যে ওকে চন্দ্রকান্তের কাছে পৌঁছোতে হবে। ওর চোখের সামনে ভাসছিল ওদের শোবার ঘরের ভারী তক্তপোষ, আর এখনই সেখানে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু ওদের বাসার থেকে কয়েক গজ দূরে চত্বরের ওপর ও বাধা পেল। জন পনেরো লোক জমা হয়েছে সামনে, ওদেরকে পেরিয়ে যেতে হবে। পুষ্পর মনের এই অবস্থায় ও বুঝতেই পারল না ওরা কেন এসেছে। পুষ্পর মাথার থেকে কাপড়টা খসে গিয়েছে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, লোকগুলির যত কাছে আসছে ও, ওর চোখ দু'টো ততই বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। ওদের মধ্যে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল, কয়েকজন খাটিয়ার ওপর বসে কথা বলছে, কিন্তু ওরা কি বলবে পুষ্প বুঝতে পারল না। হঠাৎ পেছন থেকে একজন সাইকেল চালিয়ে এল, ওরা সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিলে। এদের চোখে একটা আগ্রহ আর সম্ভ্রম ফুটে উঠল। লোকটি দরজার সামনে নেমে দেয়ালে আস্তে আস্তে সাইকেলটা ঠেশ দিয়ে রাখলে, যেন শব্দ না হয়। ফ্রেমে সাঁটা ব্যাগ থেকে দ্রুত অথচ সাবধানে ও একটা ওষুধের ফাইল বের করলে। ওটা নিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ওষুদটা ভেতরে নিয়ে গেল। লোকটি কি যেন বলে দিলে। চোখ ফিরিয়ে ওদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে যেন একটা কিছুর সমর্থন খুঁজলে, তারপর ওখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

পুষ্প প্রায় থমকে গিয়েছিল এদিকে। কে একজন চাপা গলায় বললে, 'আপনি কি যেতে চান? যান…' বলে ও পথ করে দিলে। আর একজন পুষ্পর মুখের ওপর চোখ রেখে ওর কনুই ধরে টেনে বললে, 'শিববাবুর বোন, আপনি জানেন না?' তখন প্রশ্নকর্তা 'তাই নাকি…' বলে চকিত হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি ফিরে বললে, 'ও, আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে…' ওর চোখে একটা কৃতজ্ঞতা আর স্বস্তি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল।

যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি ওষুধ নিয়ে গেছল, মনে হয় ঢুকবার মুখে পুষ্পকে দেখেছিল সে। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল ও। আধ-ময়লা সাদা থান কাপড় গায়ে ভাল করে ঢেকে জড়িয়েছিল ও, দরজার মুখে থমকে কপালের ওপর ঘোমটাটা একটু টেনে দিলে। তারপর ধীরে ধীরে এদের মধ্য দিয়ে পুষ্পর কাছে এসে দাঁড়াল। ফিস ফিস করে বললে, 'আমাকে চিনতে পারছ ত মা, আমি হরির মা…' ওর চোখ দু'টো ফোলা-ফোলা, মনে হল এই মাত্র কাঁদছিল, চোখ মুছে বেরিয়ে এসেছে। ঢাকা কাপড়ের ভেতর থেকে হাত বের করে পুষ্পর হাত দু'টো ধরল হরির মা। গলাটা পরিষ্কার করে সেই রকম সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে, 'এস মা, কাতর হবেক নাই। এই সময় স্থির থাকতে হয়…ভগমানের নাম লিতে হয়… ।'

পাশের দু'একজন মাথা নাড়লে, যেন বলতে চাইলে, একথা সঙ্গত বটে। ওকে নিয়ে যেতে যেতে হরির মা বললে,—বাঁ হাতের কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের ওপর বুলিয়ে নিলে ও, 'ভয় কি মা, তুমি হলে আপনার লোক, নিজের কন্যে, তুমি…' শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বরটা জড়িয়ে এসেছিল, কি বললে বোঝা গেল না।

হরির মা বুঝতে পারল পুষ্প ওর হাতের ওপর নড়বড় করছে, চৌকাঠে পাছে হোঁচট খায় এই জন্যে দাঁড়িয়ে পায়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে ও, তারপর ভেতরে চলে গেল।

এই ঘটনা এদের মধ্যে একটা আবেগের সঞ্চার করলে। একজন ফোঁস করে চোখের জল সামলালে। একজন কাঁপা গলায় বললে, 'এইটো ভালই হ'ল। উয়ার নিজের মেয়ে এল…তবু একটু জল পাবেক…'। একজন ছোকরার চোখের পাতা কাঁপছিল। ও নিজেকে চাপতে চাপতে বলে ফেললে, 'আঃ, সত্যি…এই সময় যদি শিববাবু আসতেন একবার…ত খুব ভাল হ'ত…'। কথাটা এদের কানে যেন খোঁচা মারলে। চকিতে ওরা বক্তার দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

হরি লীলাকে চিনত না। ও যখন পুষ্পকে আনতে গিয়েছিল, তখনও লীলা এ বাড়িতে এসে পৌঁছোয় নি। মণ্টুকে নিয়ে আগেই ঘরে ঢুকেছিল হরি, লীলাকে দেখে থমকে গেল। লীলা রান্নাঘরের দরজার মুখে কপাটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হরিপদ মণ্টুকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াতে চাইছিল, লীলা সেটা বুঝতে পেরে চৌকাঠ পেরিয়ে এসে একটু সরে দাঁড়াল। হরিপদ তখনও

দাঁড়িয়ে রইল ওখানে, মনে হল ঘরে ঢোকার পথে এখনও ওর বাধা আছে। লীলার দিকে ও তাকাল, চোখের পাতা কুঁচকে ছোট হয়ে গেল ওর। ঘুমন্ত মণ্টুটা ওর ঘাড়ের ওপর থেকে ঝুলে পড়ছিল, ও সেটাকে ঠিক করে দিলে। মনে হল যেন ও কিছু বলবে···কিন্তু পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ও ফিরে দাঁড়াল। মণ্টুকে কাঁধ থেকে নিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'ঐ সোন্দর মেয়েটো কে গা?' পুষ্প সামনে তাকাল, কিন্তু হরির মার আড়াল পড়ছিল, ও কিছু দেখতে পেলে না। হরির মা লীলার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে তেমনি ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'মুয়ে আগুন···'। হরিপদ চকিতে লীলার মুখের দিকে তাকালে, বুঝতে পারল না, ও কথাটা শুনতে পেয়েছে কি না—ওর ডান হাতটা একটুখানি উঠল, যেন মাঝ পথেই কথাটা ও চেপে দিতে চায়। অন্য সময় হলে রাগে ফেটে পড়ত ও, কিন্তু ও কেবল হতভম্ব হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। হরির মা পুষ্পকে বললে, 'এস মা, এস, দাঁড়িয়ে পড়লে কেনে। আগে হাতে মুখে জল দাও···তারপর বড় ঘরে যাবেক। ধুলা পায়ে যেতে নাই···' মণ্টুকে নিয়ে রান্নাঘরের দরজার মুখে গেল ও, ঢুকে যেত কিন্তু লীলার দিকে ফিরে বললে, 'কি গা বাছা, জল গরম করেছ···নাকি, অমনি পুতুলের মত দাঁড়ি আছ, তখন থেকে···'

ওকে পথ করে দেবার জন্যেই সম্ভবত লীলা দেয়ালের দিকে এক পা পিছিয়ে গেল। তার মুখের দিকে চোখ রেখে বললে, 'একবার গরম জল দিয়ে এসেছি, সেঁক হচ্ছে। আবার গরম জল চড়িয়ে দিয়েছি···'

পুষ্প সামনে এগিয়ে এল। ওর অবশ, মূর্ছাহত ভাবটা খানিকটা কেটে গিয়েছিল মনে হয়। কতক্ষণ তাকিয়ে রইল ও লীলার দিকে, তারপর দু'চোখ দিয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়ল। লীলার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললে, 'তুমি···তুমি কবে এসেছ?'

যখন পুষ্প উঠোন দিয়ে আসছিল, লীলা ভীত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন ও সামনে এসে দাঁড়াল, ওকে আগুনের তাপে ঝলসাচ্ছিল যেন কেউ,—ভাবছিল পুষ্প যদি এখনই অবজ্ঞা করে চলে যায়, তাহলেও একটু স্বস্তি পায়। কিন্তু পুষ্পর এই কথা আর চোখের জল দেখে নিজেকে সামলাতে পারল না ও, পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ওর চিবুকের নিচেটা কেঁপে উঠল, কিন্তু ও কাঁদতে সাহস পেলে না। বললে, 'কাল এসেছি।'

করুণায় দু'চোখ ভরে উঠল পুষ্পর। ভিজে, জড়ান গলায় ও বললে, 'এস,

ঘরে এস…' বলে ওকে রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। হরির মা লীলার দিকে একবার তাকালে, তারপর এদিকে ফিরে দেখলে হরি তখনো দাঁড়িয়ে আছে। ও বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'হাঁ করে দেখছিস কি? যা, দেখ, গরম জলের দরকার নাকি…আমি যাচ্ছি থালে…' বলে ছেলে শোয়াবার জন্যে সেও ভেতরে চলে গেল।

অধ্যায় ১২

কিছুক্ষণ পরে ওরা দু'জনেই শোবার ঘরে এসে ঢুকল। পুষ্প মাথার চুল খুলে দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিয়েছিল। সাদা হালকা শাড়িটা ঘাড়ের কাছে খোলা চুলের ওপর দিয়ে বেড় দিয়ে নিয়েছিল ও'। দরজার সামনে বিপরীত দিকে শিবলালের চেয়ারে একজন ছোকরা বসেছিল, পুষ্পকে দেখবামাত্র ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পুষ্পর শান্ত মূর্তি ওর চোখেমুখেও তৎক্ষণাৎ প্রতিফলিত হল। মনে হল, এটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল ওরা।

পুষ্পর খেয়াল ছিল না এদিকে। ওর চোখ দু'টি টানা হয়ে পড়ল তক্তপোষের ওপর। একটা চাদর দিয়ে চন্দ্রকান্তর আধখানা শরীর ঢাকা, ডানদিকে পাশ ফেরানো অবস্থায় ছিল। সাদা ফতুয়াটার গলার দিকে দু'একটা বোতাম খোলা। ওর চওড়া বুক আর কাঁধের অনেকখানি অংশ খোলা দেখা যায়। বুকের ওপর মাংস-পেশী ফুলে উঠেছে।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন কাজ করছিল। রোগীর পায়ের দিকে তক্তপোষের পাশে একটা টুলের ওপর গরম জলের ছোট গামলা, তাতে বোরিক তুলো ডুবিয়ে তোয়ালে দিয়ে নিংড়ে দিচ্ছিল একজন। ওর লম্বা চুলগুলো মাথা নিচু করবার সময় ঝুলে পড়েছিল, ওর মুখখানা দেখা গেল না। দ্বিতীয় জনা মুখের কাছে দাঁড়িয়ে সেঁক দিচ্ছিল চন্দ্রকান্তর চোখে। চ্যাপটানো তুলোটা আঙুলে করে টেনে একটু চওড়া করে আলগা করে নিলে ও যাতে গরমটা চোখের ওপর চড়া হয়ে না লাগে। কিন্তু ওর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছিল, একটা উদ্বেগের চিহ্ন পড়েছিল ওর চোখে। চন্দ্রকান্তের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ওঠা-নামা পরীক্ষা ক'রে দেখছিল ও, যেন সামান্যতম পরিবর্তনও লক্ষ্য করে দেখতে

চায়। একটু আগে গলার মধ্যে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিল, সেটা আস্তে আস্তে কমে এসে এখন মিলিয়ে গেছে।

'বিহারীদা…' মাথার চুলগুলো ঝিনকে পেছনে ছুঁড়ে মুখ তুলে দাঁড়াল ও, একটা তুলোর দলা এগিয়ে দিতে দিতে ডাকলে। বিহারী তুলোটা নিলে কিন্তু ফিরে তাকাল না। তখন ও পুষ্পর দিকে একবার তাকিয়ে আবার বিহারীকে বললে, 'একটু সরে এস, বিহারীদা…' ওর কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রম ফুটে উঠল। বিহারী ঘাড় ফিরিয়ে পুষ্পকে দেখলে…কিন্তু হাতের সেঁকটা শেষ করতে লাগল ও। শেষ করে মাথার দিকে সরে এল। ইঙ্গিতে পুষ্পকে কাছে আসতে বললে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'এখন ডাকবেন না, এই মাত্র মনে হল ঘুমালেন… বেশী সেঁক দেবারও দরকার নেই…দু'একবার দিয়ে ছেড়ে দেবেন।'

পুষ্পর চোখ দু'টো কাতর হয়ে উঠল, এমন ভাবে তাকাল যেন বিহারীর থেকে ও অনুমতি নিলে, তারপর বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বিহারী বললে, 'আগে পুঁটলিটা একটু ফাঁপিয়ে নিন, বেশী গরম দেবেন না…হ্যাঁ, ওইভাবে দিতে থাকুন'। বুক পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল ও। পুষ্পর পিছনে একটু দূরেই লীলা দাঁড়িয়ে ছিল। কি রকম আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মেঝের ঠিক মাঝখানে কেমন খাপছাড়া লাগল ওকে। বিহারী আর একবার তাকাল ওর মুখের দিকে, আর একই কথা মনে হল ওর। তারপর চলে গেল বাইরে, ও খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

প্রথম দু'একবার খুব স্বচ্ছন্দ আর স্বাভাবিক ভাবে সেঁক দিলে পুষ্প। কিন্তু তারপরেই ওর হাতটা শিথিল হয়ে আসতে লাগল। মনে হ'লে, যদি বাবার কষ্ট হয়—আর জেগে ওঠে। এত পরিষ্কার করে এর আগে কখনও চন্দ্রকান্তর মুখের দিকে তাকায় নি পুষ্প, সে সাহসই ওর হত না। মনে হল বাবার মুখখানা যেন বদলে গেছে। চোখের পাতাগুলি একটু একটু ফোলা। কিন্তু আগেকার সেই কঠিন ভাবটা নেই, একটু নরম-নরম, শান্ত দেখাচ্ছে। বাবার সেই উগ্র মেজাজ, যা পুষ্প ভয় করত, সেটা নেই। এটা একটা অন্য জিনিস, খুব নতুন, যেন সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতে পারবে।

পুষ্পর আঙুলগুলো চন্দ্রকান্তর গালের ওপর থেকে সঙ্কুচিত হয়ে এল কিন্তু হাতটা টেনে নিতে পারল না ও। এক মুহূর্ত পরে হাতটা কেঁপে উঠল ওর, আর আঙুলগুলো ভারী হয়ে গালের ওপর চেপে বসল। পুষ্পর চোখ দু'টো

কুঁচকে ছোট হয়ে এল, পরমুহূর্তেই আবার আয়ত বড় হয়ে উঠল। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ রোগীর মাথাটা নড়ে উঠল, মুখখানা খুলে গেল একটুখানি। নাকের নিচে ঠোঁটটা চমকে চমকে উঠতে লাগল। যে গরম জলে তুলো ভিজিয়ে দিচ্ছিল সে চাপা গলায় বলে উঠল, 'কি…কি করছেন…' বলে এক পা এগিয়ে এল ও, কিন্তু কি করবে বুঝতে পারল না।

লীলা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ও এগিয়ে এসে পুষ্পর হাতটা ধরলে, আস্তে আস্তে বললে, 'পুষ্পদি', আপনি ছেড়ে দিন। চলুন…,' বলে ওকে ধরে বাইরে নিয়ে এল ও।

অধ্যায় ১৩

পুষ্প লীলার দু'হাতের মধ্যে ভারী হয়ে পড়ছিল। ওকে আবার রান্নাঘরের মধ্যে আনতে লীলাও হাঁপিয়ে উঠল। এইটুকুর মধ্যে লীলার কয়েকবারই ইচ্ছে হল পুষ্পকে একটা সান্ত্বনার কথা বলবে। কিন্তু ইচ্ছেটা তার গলার মধ্যে কেবলই একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করলে, ও একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না।

মেঝের ওপর বাচ্চাটার পাশে ওকে বসিয়ে দিলে লীলা। নিজেকে একটু ছাড়িয়ে নিতে চাইলে, কিন্তু এইটেই যেন পুষ্পর বাঁধ ভেঙে দিলে। চোখে দু'টো হাত চেপে ধরলে পুষ্প, তারপর হাত-শুদ্ধ মুখখানা লীলার বুকে গুঁজে দিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

লীলার করবার কিছু ছিল না, পুষ্পকে ধরে তার দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে রইল। আস্তে আস্তে ওর চোখে একটা তীক্ষ্ণ, শুকনো দৃষ্টি ফুটে উঠল। পুষ্পকে ধরেই রইল ও, কিন্তু, ওর নিজের দেহটা যেন টানা হয়ে পেছিয়ে আসতে চাইলে। থরথর করে কাঁপছে পুষ্প,—সে কাঁদছে, আর গরম চোখের জল, নিঃশ্বাসের ভাপ এসে লাগছে লীলার বুকে। এমন তো কতোবার হয়েছে, কিন্তু লীলার চোখে যদি এককোঁটা জল আসত! যে পথে এগিয়ে গিয়ে ও মুক্তি পাবে, সেই পথের ধারেই একটা বদ্ধ কুঠরীতে ওকে আটকে রেখেছে যেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেলাটুকু গড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যাবেলা পুষ্প মেঝের ওপর

মাদুর পেতে গড়িয়ে পড়েছিল—ক্লান্ত, নিঃঝুম মনে হল ওকে। এইমাত্র মণ্টু টা ঘুম ভেঙে উঠেছে, ওকে দুধ খরিয়ে দিয়ে হাত দু'টো মাথার দিকে মেলে দিয়েছে। পুষ্প হাত নেড়ে লীলাকে ডাকল। ফুটন্ত দুধের কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে রেখে পুষ্পর কাছে এসে বসল লীলা। পুষ্প একটা হাই তুললে, তার পর বাঁ হাতটা হঠাৎ বাড়িয়ে লীলার হাত ধরে টান দিয়ে বললে, 'একটু শুয়ে পড়, ভাই···', বলে আবার ও হাতটা মাথার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পড়ে রইল।

লীলার কপালে ফুটকি-ফুটকি ঘাম দিয়েছিল। অসহ্য গরমে মাথাটা দপ্ দপ্ করছিল ওর, কিন্তু তবুও শাড়ির আঁচলটা ভাল করে পিঠের ওপর বেড় দিয়ে নিলে। একবার পুষ্পর দিকে, আর একবার মাদুরের যেখানটায় শোবার ইঙ্গিত করেছিল পুষ্প, সেদিকে তাকাল লীলা। তারপর শুয়ে পড়ল।

লীলা এসে মাদুরে বসার সঙ্গে সঙ্গে মণ্টু দুধ ছেড়ে দিয়েছিল। লীলার মুখের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রইল ও। তারপর দুবার পা ছুঁড়ে খুশী হয়ে উঠল। পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে মুখখানা ফাঁক করল ও, তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করল পাখির মতো। ঠোঁট দুটো এমনি বাঁকাতে আর নাড়তে লাগল ও, যেন একটা কিছু দুষ্টুমি করবার জন্যে ফন্দি আঁটছে।

পুষ্প লীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাকীমা ভাল আছেন ভাই?'

'কাকীমা এখানে নাই, বাপের বাড়ি গেছেন···'

'তাই নাকি···কবে গেলেন, কাকা রেখে এলেন বুঝি?'

লীলার জবাব শুনবার জন্য পুষ্পর অপেক্ষা ছিল না। ক্লান্ত অনুনয়ের স্বরে ও বললে, 'তুমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি ভাই, তুমি হঠাৎ এখানে কি করে এলে। তুমি এসে পড়েছ, কী ভাল হয়েছে যে সে তোমাকে কি বলব! আমি এখেনে এসেছি ত আমার হাত-পা কাঁপছে, কি হবে কি করব জ্ঞান নাই। তোমাকে যেই দেখলাম···যেমন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলাম। সত্যি তুমি আসবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি···'

ইতিমধ্যে মণ্টুর প্ল্যান বদলে গিয়েছিল। লীলা শুয়ে পড়তেই মণ্টু মায়ের গা ধরে উঠে দাঁড়াল, একটু ঘুরে লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল ও। ফোকলা মাড়ি বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ল। পায়ের ওপর টলমল করছিল মণ্টু। হঠাৎ হাত দু'টো তুলে এগোতে গিয়ে লীলার মুখের ওপর পড়ে গেল ও। লীলা দু'হাতে করে ধরে ওকে ঠিক করে বসাল। একটুখানি হেসে ওকে একটা কথা বলতে চাইলে লীলা, কিন্তু তার আগেই হাত বাড়িয়ে পুষ্প মণ্টুকে এদিকে

একটু ঘুরিয়ে বললে, 'এই···ও কে রে, কে বল তো? ওমা, জানিস নাই বুঝি···'

লীলার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ধরল যেন কেউ। চকিতে পুষ্পর দিকে তাকাল ও। ওর ভয় করতে লাগল, পাছে কোন একটা সম্পর্কের কথা উচ্চারণ করে ফেলে পুষ্প।

হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ হল। পুষ্প ঘাড় তুলে দেখলে, হরির মা ঘরের ভেতর পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে। হারিকেনের আলো তেরছা হয়ে ওর মুখের ওপর পড়েছে। কিন্তু ওই অস্পষ্ট আলোতেও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল পুষ্প। হরির মা কঠিন দৃষ্টিতে লীলার দিকে চেয়ে আছে। লীলা যে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পুষ্পর কাছে শুয়েছে সেটা ওর চোখে কাঁটা বিঁধতে লাগল যেন।

ঘাড়ের ওপর থেকে থান কাপড়টা তুলে মাথায় দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল হরির মা। মনে হল বাড়ির কর্তার অবস্থা মনে করেই এখন ও নিজেকে সামলে নিলে। শক্ত কথা শোনাতে ছাড়ল না ও, কিন্তু কণ্ঠস্বরে মিষ্টি মাখিয়ে লীলাকে উদ্দেশ করে বললে, 'সন্ধেবেলাই শুয়ে আছ কেন বাছা, উঠে পড়। ঘরে এই অবস্থা···কখন যে কি হবে ভগমান জানে!'

লীলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, ওকে চাবুক মেরে উঠিয়ে দিলে যেন কেউ। পুষ্পর পক্ষে শুয়ে থাকা অসম্ভব হল, কিন্তু ও ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারল না। মণ্টুকে কোলে টেনে নিয়ে একবার লীলার দিকে একবার হরির মার দিকে তাকাতে লাগল।

হরির মা বললে, 'উ ঘরে ছেলে দুটো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একেবারে। যাও না কেনে, একটু দেখ। চা-টা খায় না কি দেখ একবার···'

লীলা পুষ্পর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি একটু বসুন দিদি, আমি আসছি···' বলে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে চৌকাঠ পেরিয়ে এল ও। দরজার পাশে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লীলা হাত বাড়িয়ে দেয়ালটা ধরলে, ওর পা কাঁপছিল। বুঝলে, পুষ্পকে এখনই বলবে হরির মা। পুষ্প আসার পর এই একটুকু সময়ের জন্যেও ওর একটা আশ্রয় ছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে ওর, যেটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ও সেটা যে কোন সময় ভেঙে পড়বে। বোধ হয় সেই সময় এসে পড়েছে।

দেয়াল ছেড়ে দুহাতে মুখখানা চেপে ধরল লীলা। চোখের জল ওর পড়ল

না, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনে ও বললে, 'আমি কি পাপ করেছি যে সবাইয়ের কাছে আমার এই শাস্তি! কেন…।'

ওর বাঁ দিকেই চন্দ্রকান্তর ঘর, কিন্তু তখনই যেতে পারল না, এদিকে ওকে যেন টেনে রাখল। হরির মা পুষ্পকে কি বলবে?

অধ্যায় ১৪

লীলা বেরিয়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পর চোখেমুখে একটা কাতর ভাব ফুটে উঠছে। ও যখন চৌকাঠের ওপর, তখন মনে হল পুষ্পও মাদুর থেকে উঠবে, কিন্তু হরির মা এসে বসে পড়তেই ওর ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। হরির মায়ের তিরস্কার ও মেনে নিতে পারল না, কেন হরির মা অমনি করছে তা সে জানত না। কিন্তু লীলা যে তিরস্কারের যোগ্য নয় এটা বারবার মনে হতে লাগল। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যখন সে হরির মার দিকে তাকাল তখন তার চোখ দুটিতে একটা অনুনয় ফুটে উঠছে, যেন বলতে চাচ্ছে, 'কেন…কেন ওকে অমনি করছ?'

হরির মা বুঝল, পুষ্প কষ্ট পাচ্ছে। তখন তার দিকে তাকিয়ে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল ও। ওর চোখের সেই কঠিন ভাবটা আর ছিল না, গলার স্বরটা ভিজে ভারী হয়ে এল। বললে, 'মা, ভগমানকে ডাক…মনে কষ্ট করবেক নাই। বলে, তুমি কার কে তুমার…সবাই চলে যাবেক এমনি করে। দুদিন আগে নয় দুদিন পিছে …' বলে হরির মা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল।

মণ্টু কোলের ওপর থেকে নেমে পড়বার চেষ্টা করছিল। ওকে তুলে নিয়ে পুষ্প বসাল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। হরির মা বললে, 'ভগমান কাকে রাজা করে, কাকে ভিখারী করে, মা। তাঁর লীলা-খেলা, কে বুঝতে পারে…'

পুষ্পর ডান হাতটা মণ্টুর কপালের ওপর কেঁপে উঠে আবার পড়ে রইল। হরির মা অপেক্ষা করে আছে দেখে ও বললে, 'বাবার অবস্থা কবে থেকে এমন হ'ল, হরির মা?'

'পিথম দিন থেকে এমনি হয়ে রইচে। এত সব হচ্ছে কিন্তু বাবুর জ্ঞান

ফিরল নাই···ওই যেমন সব সময় ঘুমাইছে···' বলে ও কপালের ওপর হাত ঠেকাল, এই রকম অদ্ভুত আর রহস্য-জনক ব্যাধি সে এর আগে আর দেখে নি। বললে, 'যেদিন বড় খোকা চলে গেল, সেদিন আমি যেমন চারদিক অন্ধকার দেখলম। আমি কি জানতম উ চলে যাবেক···থালে সামনে যেয়ে বলতম, তুমি এক পা যাও দিকি থালে আমি আপ্তঘাতী (আত্মঘাতী) হয়ে মরব। জান, তারপর আমি গলায় কাপড় দিয়ে মা কালীকে গড় করলম···বললম, যদি আমি সতের ঘরের বিটি হই ত, আমি ঠিক রুগীকে দেখতে পারব। আহা, অমন পুণ্যাত্ত (পুণ্যাত্মা) লোক···' বলতে বলতে শ্রদ্ধায় আর শোকে ওর গলা জড়িয়ে এল।

'হরির মা, সত্যি, তুমি আর হরি না থাকলে আমাদের যে কি হত! আমাদের ত আর কেউ ছিল নাই···'

হরির মা যেন তার ঘোর থেকে জেগে উঠল। ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, মা, ঐটো বলতে লারব। এক প্রহর না যেতে ছেলেরা সব চলে এল। ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ওষুধ লি' আসা, পথ্যি আনা···সব যেমন চক্ষের নিমিষে হইছে। সব যেমন ভগমান নিজে করে দিচ্ছে। মাগো, সব ঐ বড় খোকার জন্যে। কেউ বলে শিবুদাদা, কেউ বলে শিবুবাবু···তুমি নিজের চক্ষে দেখেছ। তুমার মাকে গড় করি···ভাগ্যিমানি গত্তে বেটা ধরেছিল বটে···' বলে ও আবার কপালে হাত ঠেকাল।

পুষ্পর গলার কাছে কান্না ঠেলে এল, কিন্তু শিবলাল সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস হল না ওর। বললে, 'লীলা কবে এল, হরির মা। কে নিয়ে গেল ওকে?'

'ঐটো আমাকে শুধাও নাই, উকথা আমি বলতে লারব। উ কেনে এল··· কেনে, আমাদের কি লোক ছিল নাই, নাকি রুগী আমরা দেখতে জানি নাই?' বলে ও চুপ করে গেল, কিন্তু ভেতরে ঠিক ততখানি অস্থির হয়ে উঠল। বোঝা গেল, কয়েকবারই কথাটা বলবে বলে ভেবেছে ও, কিন্তু পিছিয়ে গিয়েছে। এবারে যখন এই সুযোগটা এসেছে, তখন যে কোন রকম করে বলে ফেলতেই চায়। ও বললে, 'দেখ মা, আমরা সামান্য মানুষ, বড় কথা আমাদের মুখে সাজে নাই। তবে বিপদের সময় এসে পড়েছি···ভগমান আমার মাথায় বোঝা দিয়েছে···তাই। তা নাহলে তুমি আর বড় খোকা ত ছেলে-মানুষ···' ওর থান কাপড়টা বাঁ হাত ঢেকে ঝুলে পড়েছিল, ভাঁজ করে

গুটিয়ে এনে কাঁধের ওপর ফেললে ও। নতুন দায়িত্ব-বোধে ওর চোখমুখ ঝকঝক করে উঠছিল।

পুষ্প হরির মার এই উত্তেজনার মুখে থতমত খেয়ে গেল। লীলাকে নিয়ে কোন একটা কথা আছে এটা সে বুঝতে পারলে। সেটা লীলার বিরুদ্ধেই যাবে, আর কোথায় যেন ওদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে তা জড়িত, এটাও বুঝতে পারলে। কিন্তু লীলার কিছু খারাপ শুনবে এই আশংকায় ওর বুক দুরদুর করতে লাগল। চকিতে হরির মাকে থামিয়ে দেবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা হল ওর, কিন্তু সেই সম্ভাবনাতেই ও কাতর হয়ে উঠল। এক রকম নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও বললে, 'হরির মা, কি হইছে ?'

'যদি তুমার কি আমার কথা হত মা, থালে আমি কিছু বলতম নাই। বড় খোকা যেথেনেই গেছে, ভগমান তাকে ভাল রাখুক···দু'দিন পরে সে আমার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবেক। সে আমার সরল ছেলে সরল বুঝে···ভগমান কত্তাকে এখন কি সে রকম রেখেছে যে সব দিক দেখবে। শিবু বাপ আমার ছেলে-মানুষ, তাকে ভুলাতে কতক্ষণ ! তাই তুমাকে বলছি···'

হরির মা পুষ্পর ভীত চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে নিজেই আড়ষ্ট হয়ে উঠল। ওর গলা শুকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু ওর থামবার উপায় ছিল না। লীলার সম্বন্ধে ওর কথাটা বলে ফেললে ও। শেষ কালে বললে, 'কার ভাল কার মন্দ বুঝি নাই, মা। লোকে সবাই ভাল···ভগমান কার কখন কি মতি দেয় কে জানে। কিন্তু এর সঙ্গে তুমাদের কথা আছে, তাই বলছি···'

কথা শেষ হল না, পুষ্প আঁতকে উঠল, 'বল কি হরির মা···'

মণ্টু কোল থেকে উঠে হরির মার দিকে এগোচ্ছিল, পুষ্প সজোরে ছেলেটাকে টেনে নিলে। হঠাৎ এই টানটা ও সহ্য করতে পারল না, ডুকরে কেঁদে উঠল। পুষ্প ওকে চুপ করানোর জন্যে আদর করতে গেল কিন্তু দু'হাত দিয়ে ওকে কেবলই চেপে ধরতে লাগল। কতকক্ষণ পরে ও যখন একটু শান্ত হতে পারল, তখন ওর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। অনেকগুলো কথা মনে এল ওর, কিন্তু ও কেবল বললে, 'হরির মা, বনমালী কাকা এই কাজ করতে পারলে ?'

এক দৃষ্টিতে হরির মা পুষ্পর দিকে তাকিয়ে ছিল, সে কথার কোন জবাব দিল না ও। যেন বলতে চাইলে, 'আমার যা বলবার আমি ত বলেছি, আর কি ?' পুষ্প কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করেই সংকুচিত হয়ে উঠল, মণ্টুকে বুকে চাপতে

চাপতে জড়িয়ে জড়িয়ে ও বললে, 'মেয়ে মানুষের আবার এমনি ভাগ্যি হয়। ওর মতন অভাগী আর কে আছে…' বলে ও কাঁদতে লাগল।

অধ্যায় ১৫

এর পরের দিন বিকেলে হরির মা কলসীতে জল ভরে বাড়ির দিকে ফিরবার উপক্রম করছিল। কাঁখে কলসী তুলবার আগেই কাপড়-চোপড় ভাল করে সামলে নিলে ও, এতগুলি লোকের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে। তারপর ডান হাতে আর একটা বালতি ঝুলিয়ে পা বাড়াল ও। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। সামনেই যারা ছড়িয়ে এলোমেলো হয়ে ছিল, তারা একজোটে দরজার মুখে গিয়ে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে। সকলের পক্ষে দরজার ভেতরে দেখাও সম্ভব ছিল না। পেছনের লোকগুলি পায়ের পাতার ওপর উঁচু হয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তাতেও কোন সুবিধে হয়েছে বলে মনে হল না। আরও পেছনে ছাড়া-ছাড়া হয়ে লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখতে চায় না বলে নয়, দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব বলেই ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। থেকে থেকে জিজ্ঞেস করছে সামনের লোককে— ভেতরে কি দেখছে।

'হ্যাঁ, গা, কি হইছে, কি করছ অমনি করে…' হরির মা যাকে কথাটা বললে, সে চমকে ফিরে তাকাল। এইটুকু এসেই হরির মার হাত পা কেঁপে উঠেছিল, মাথার থেকে কাপড়টা খসে গিয়েছিল ওর। ও যখন কথাটা বলতে পারলে, তখন ওর গলাটা এমনি ককিয়ে উঠল যে, ও নিজেই চমকে উঠল।

লোকটির হরির মার কথার দিকে কোন খেয়াল ছিল না, তাকে পেয়ে ওর যেন একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি করে প্রায় একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ মাসি, ভিতরের কি খবর…চন্দবাবু কেমন আছে…'

এই অবস্থাতেও হরির মা একটু বিরক্ত হয়, বলে, 'তুমার ই কি রকম কথা বাছা। আমি জল আনতে গেলম…কোথাও কিছু নাই। তারপর ফিরে এসে দেখি তুমরা সব কি করছ…আমাকে তুমরা বলবে, না, আমাকেই জিগাসছ!'

আরও জনা দু' তিন ফিরে দাঁড়াল। একজন ওকে বললে, 'সে কি মাসি, তুমার বাবুর ঘরে বড় সাহেবের সেক্রেটারী এল, তুমি জান নাই...' বিস্ময় আর সম্ভ্রমে ও গদ্‌গদ হয়ে উঠতে চাইলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু, চন্দ্রবাবুর কি সেই অবস্থা আছে, উনি কি কিছু জানতে পারবেন! হা!'

হরির মা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, সাহেবের সেক্রেটারীর কথা শুনে ওর খুব একটা বড় আর ভয়ের কিছু মনে হল। কিন্তু শেষ লোকটির দীর্ঘশ্বাস শুনেই একদলা কান্না পাকিয়ে উঠল ওর গলার মধ্যে—চন্দ্রকান্তর হঠাৎ কোন কিছু খারাপের সঙ্গে এই আসাটা গুলিয়ে উঠল। ও কাতরে বলে উঠল, 'বলি শুনছ, ভাল মানষের বাছারা, আমাকে একটু জায়গা দাও না...আমি যাই।'

এরা সামনের সামনের লোককে তাড়াতাড়ি সরে যেতে বলতে লাগল। চেষ্টা করেও সরতে সরতে একটা সরু পথের বেশি করতে পারল না। হরির মা পাশাপাশি বেঁকে ছোঁয়া বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে আর ওদের কলসীর ধাক্কা দিতে দিতে ভেতরে ঢুকে গেল।

সি-এম-ও'কে নিয়ে জেনের‍্যাল ম্যানেজার মিঃ টমসনের পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট শ্রী এস. আর প্রায় মিনিট দশেক হল ঢুকেছেন কোয়ার্টারের মধ্যে। মুমূর্ষু চন্দ্রকান্তকে দেখবার জন্য মিঃ টমসন ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনাটা এত অসাধারণ যে এরা একটা অদ্ভুত আগ্রহে যেন এতক্ষণ টানা হয়ে জমাট হয়ে গিয়েছিল। তারপর হরির মা ভেতরে যেতেই এদের মধ্যে একটু ঢিলেঢালা ভাব এল।

একজন নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'উনি ভেতরে কি করছেন...কেনে এসেছেন কে জানে!'

এমন সময় বিহারী ভেতর থেকে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। একসঙ্গে ফিসফিস করে কতকগুলো প্রশ্ন ওর দিকে ছুঁড়ে মারলে। কিন্তু বিহারী নিজেই কেমন উত্তেজিত আর বিহ্বল হয়ে উঠেছিল, এদের কোন কথাও ভাল ক'রে বুঝতে পারলে না। ও নিজের মনেই বলে উঠল, 'ইট্ ইজ এ গ্রেট অনার ইন্‌ডীড!...'

একজন লম্বা, বুড়ো গোছের লোক এগিয়ে এল, ঢিলে পাঞ্জাবির হাতার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য ডান-হাত তুলে ও বললে, 'তা হবেক নাই? চন্দরদা তুমার চারটিখানি লোক নয়...' বলে ও নিজের কথাটার প্রমাণ দেবার জন্যেই যেন বললে, 'আমি এই তুমাদের মতন ছিলম...তখন থেকে দেখে আসছি। আমি বলতম, লোকটাকে

কেউ চিনলেক নাই, একদিন চিনতে পারবেক। ভগমান মুখ তুলে চেয়েছে, আমার মুখ রেখেছে…' বলে লোকটি ওপরের দিকে চোখ তুলে দু'হাত কপালে ঠেকালে।

এরপর লোকটি নিজে কিম্বা আর কেউ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। একটু পরে একজন বিহারীকে উদ্দেশ করে বললে, 'উনি কেমন আছেন… হঠাৎ জেনারেল ম্যানেজারের পি. এ. এলেন ?'

বিহারী বললে, 'বুঝতে পারছি না…উনি ত একই রকম রয়েছেন…চন্দ্রবাবু…' তারপর নিজেকে শোধরাবার মত করে তাড়াতাড়ি বললে, 'কিন্তু যা এড়ান যাবে না, তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। মনে হয়, এই ভাবে বেশী সময় চলবে না…' শেষের দিকে ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন হঠাৎ চরম সত্যকে ও মুখোমুখি দেখতে পেয়েছে।

'ভগমান ওনাকে ক্ষমতা দিয়েছে। তা না হলে এতক্ষণ যুঝতে পারে, এমন কোথাও শুনি নাই আমি…'

ওর কথাটা মাঝপথেই থেমে গেল। ভেতরে দরজার মুখে জুনাপুর হাসপাতালের সব চেয়ে বড় ডাক্তার সি-এম-ও এসে দাঁড়ালেন। উনি এস-আর-এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এস-আর ধীর পায়ে হেঁটে এসে সি-এম-ও'র প্রায় কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। মৃদুস্বরে কি জিজ্ঞেস করলেন শোনা গেল না। মনে হল চন্দ্রকান্তর অবস্থা সম্বন্ধেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সি-এম-ও একটু ইতস্তত করলেন, তারপর স্থির দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন তেমনি করে। বিহারী একটু দূরে থেকেও প্রায় টানা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সি-এম-ও কথা বলবার পর ও কেমন কুঁচকে সরে এল। ঘাড়টা ফিরিয়ে নিল ও।

সি-এম-ও তাঁর খাকি ইউনিফর্মটা একটুখানি টেনেটুনে ঠিক করে নিলেন। 'ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট…' একথা বলবার একটা স্বস্তি যেন অনুভব করলেন তিনি। তারপর হাত বাড়িয়ে এস-আর-এর জন্যে পথ করে দিচ্ছেন এমনি ভংগিতে দরজার থেকে নেমে এলেন।

এরা কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলে। এস-আর মাথা নিচু করে প্রতি নমস্কার করলেন। চশমা খুলে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন, মনে হল চশমা না কি, চোখ মুছবেন, কিন্তু কিছুই না করে পুনরায় সেটা পকেটে ভরতে ভরতে এগিয়ে গেলেন। রুমালটা ভরতে দেরী হতে লাগল।

এরা যন্ত্রের মতো আধখানা ফিরে তাকিয়ে রইল সেদিকে। একটা ভারী জলো ভাব এদের চেপে ধরেছিল, কিন্তু চোখের জল ফেলবার ক্ষমতা এদের ছিল না।

অধ্যায় ১৬

এর একদিন পরে জুনাপুরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটল। আর তারও দুদিন পরে শিবলাল তার অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে বাবার রোগশয্যার পাশে চলে এল।

জুনাপুরে এই ঘটনাটি নিকষ কালো সমুদ্রের ওপর অত্যুজ্জ্বল রক্তাভ আগুনের মতো পুড়তে লাগল কেবলই। এর অপরিচিত আলোতে সব কিছু ওলোট পালোট দেখায়। মানুষ পরম সত্যের সামনে পৌঁছোলে যেমন এতক্ষণ সে যেটা নিয়ে প্রাণপণ করছিল সেটা গৌণ হয়ে যায়, সেটার ওপর মমত্ব থাকে না—এও তেমনি। শিবলাল তার অজ্ঞাতবাস থেকে রেহাই পাবার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে এমনি করে প্রকাশ্যভাবে চলে আসবে তা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে নি। বকসি সিং বেরিয়ে গিয়েছিল, রুক্‌মিনী তখন রান্নাঘরে। শিবলাল একবার ভাবলে, ওর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, কিন্তু দেরী করবার মতো অবস্থা ছিল না ওর। চৌকী থেকে উঠে এই ক'দিনের পরিচিত ঘরখানার দিকে তাকাল ও একবার, তারপর চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দায়, বারান্দা থেকে উঠোনে এসে পড়ল। একবার মনে হল রুক্‌মিনীকে রান্নাঘর থেকে একবার ডাকে, ডেকে বলে, 'বহিন্, হাম যাতা হ্যায়···' কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওর মনে হল, হয়তো এতে তার যাওয়াতে একটা বাধা পড়বে। কয়েক পা এগিয়ে সদর দরজার কাছে এগিয়ে এল ও, পুনরায় ওর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চৌকাঠের কোণায় রোগা হাতটায় ভর দিয়ে ও থমকে দাঁড়াল একবার, তারপর বাইরে এসে পড়ল।

শিবলাল যখন ওদের কোয়ার্টারের সামনেকার চত্বরে এসে পৌঁছল, তখন সেখানে একজন লোকও উপস্থিত ছিল না। ও বুঝতে পারল না, মাত্র তিন দিন আগে পর্যন্তও এখানে কম করে দশ পনেরো জন লোক সর্বদাই অপেক্ষা করত। দরজাটা ভেজানো ছিল—শিবলাল দরজাটা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের উঠোনটা একেবারে খালি, কেবল মাঝখানে একটা টুল উল্টে পড়ে আছে। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি জিনিস ধাক্কা দেবার মতো ওকে প্রায় অবশ করে দিলে। ঘরের ভেতর থেকে একটানা একটা কি শব্দ ভেসে এল।

জড়ানো, অস্পষ্ট—এটা কি ও বুঝতে পারল না, কিন্তু ওর বুকের ভেতর একটা ঠাণ্ডা হিমের মতো ছিটিয়ে দিলে। আর একটা তীব্র গন্ধ ওর নাকে ভক করে এসে লাগল। এ গন্ধ ওষুধের না, কি রোগীর দেহ থেকে বেরোয়, না কি সব মিলিয়ে এমনি তীক্ষ্ণতা পায় বোঝা যায় না। কিন্তু এটা শিবলালকে যেন খানিকটে চেতিয়ে তুললে। এ গন্ধ তার অপরিচিত নয়, এর মধ্যে থেকেই চলে গিয়েছিল সে।

উঠোনের ওপর দু'একটা পা ফেলেছিল শিবলাল, সেই মুহূর্তে হঠাৎ শোবার ঘরের আধখোলা দরজা দিয়ে পুষ্প বেরিয়ে এল। ও বোধ হয় বাইরে একটুখানি আসতে চেয়েছিল, কিন্তু সামনে ভূত দেখলে যেমন হয় তেমনি করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ওর ডান হাত আর দেহের মধ্যে একটুখানি নড়ে উঠল, মনে হল ও সামনে এগোতে চায়, কিন্তু ওর সমস্ত শরীর যেন অনড় হয়ে গিয়েছে। শিবলালও থমকে দাঁড়িয়েছিল। পুষ্পর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল, পুষ্প এতক্ষণ যেন আগুনের ঝাপটার মধ্যে ঝলসে 'উঠছিল, একটু নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য বাইরে ছুটে এসেছে। কিন্তু বাইরে এসে জ্বালাটা কমলো তো না-ই, সেটা জমাট, স্থির হয়ে উঠল।

কিন্তু এই অনুভব শিবলালকে কোন সাহায্য করল না। পুষ্পকে একটা কথাও বলতে পারল না ও, বরঞ্চ ওর মনে হতে লাগল, এখনই পুষ্পর দিক থেকে কিছু একটা ঘটবে। পুষ্পর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, ঘাড়ের ওপর থেকে চুলের গোছাটা বুকের ওপর এসে পড়ল। ওর স্থির থমথমে মুখের ওপর থরথর করে উঠল। শিবলালের মনে হল, পুষ্প এখনই এসে ওর কাছে লুটিয়ে পড়বে। পুষ্প টলতে টলতে দু'পা এগিয়েও এল, কিন্তু মুখে কাপড় চাপা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল ও। এইটেই যেন শিবলালকে টেনে নিয়ে এল বারান্দার ওপর। ও রান্নাঘরে ঢুকবে না কি সোজা শোবার ঘরে যাবে বোঝা গেল না। এমন সময় বিহারী বেরিয়ে এল। একটা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র সেঁক দেওয়া তুলোর পুঁটুলিশুদ্ধ জল নিয়ে এসেছিল ও। বিহারী শিবলালকে দেখে মনে হল না যে অবাক হয়েছে। বরঞ্চ পাত্রটা নিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে এগোতে এগোতে খুব ঘরোয়া ভাবে বললে, 'শিবুদা, এই সময় আপনি এলেন…' ওর কণ্ঠস্বরটা ভিজে ভিজে, শিবলালের মনে হল ও মুখ ফিরিয়ে চোখের জল গোপন করলে। উঠোনের পাশে নালায় জলটা ফেললে বিহারী, তারপর তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

সেই একটানা গোঙানিটা একেবারে কাছে শোনা যেতে লাগল। কিন্তু এখন শিবলালের কাছে সেটা অর্থহীন একটা শব্দের মতো লাগল। পুষ্প আর বিহারীর সঙ্গে যেন ওর দেখা হয় নি, কিংবা দেখা হলেও যে তার কোনও উদ্দেশ্য আছে তা মনে হল না। একটু আগে যে কোথাও অস্বাভাবিক কিছু ছিল তা মনে হল না ওর। এই মুহূর্তে ওর সমস্ত যন্ত্রণা, আবেগ আর অনুভব অদ্ভুত শান্ত হয়ে উঠল। মনে হল, যেখানে যেটা থাকা দরকার সেইখানেই তা রয়েছে। ভাল হোক মন্দ হোক, সবেরই একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য আছে—কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। বাঁদিকে দরজার আড়ালে পুষ্প হয়তো মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়েছে, তার বুকের ভেতরটা চিরে চিরে যাচ্ছে। শক্ত যুবক বিহারী ঘরের ভেতর গিয়ে হয়তো চোখের জল ফেলছে। বাবা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, অন্যভাবে থাকা ত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এতদিন পরে এই যে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়…না, ঠিক জায়গাটিতেই এসে সে দাঁড়িয়েছে।

হরির মা বাইরে বেরিয়ে এল। দরজার মুখেই মাথার কাপড়টা সামনের দিকে আর একটু টেনে দিলে ও। কাছে এসে শিবলালের মাথার ওপর হাত বুলানোর মতো করে স্পর্শ করলে। শিবুর হাতটা ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে রইল ও। ওর ঠোঁট কাঁপছিল, কিন্তু ওর চোখ দুটিতে আশ্চর্য একটা সহজ আর নরম ভাব ছিল, যে ঘটনা এখনই ঘটবে তার জন্যে সান্ত্বনায় ভরে উঠেছিল যেন। বললে, 'বাবা, ভয় নাই, ঘরে এস। ভগমানের নাম লাও, বাবা, ই সময় ভগমানের নাম লিতে হয়…'

শিবলালের চোখ দুটি কুঞ্চিত, মৃদু একটা ঔজ্জ্বল্য চিকচিক করছিল ওর দৃষ্টিতে। কি জন্যে হরির মা একথা বলছে তা চিন্তা করে দেখবার মতো উদ্যম ছিল না শিবলালের। কিন্তু কথাগুলো তার কাছে একটা নূতন অর্থ বয়ে আনল। যেন একটা রশ্মি তার বুকের ভেতর হঠাৎ ফুটে উঠে স্নিগ্ধ আলোতে ভরে তুলল। হরির মা বলছে, 'বাবা, সব ভগমানের লীলে তুমি জানবে। তা না হলে ভগমান কেনে ই সময় তুমাকে ইখেনে পাঠিয়ে দিবে। বাবা, ই দিকে এস…।'

শিবলাল ঘরের মধ্যে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভেতরটায় আবছা অন্ধকার, যেন সেটা চকিতে শিবলালের চেতনার ওপর ছায়া ফেলে গেল। যেন একটা অচেনা পরিবেশের মধ্যে সে এসে পড়েছে। হরির মা ওকে আর একটু সামনে টেনে নিয়ে বিছানার পাশে ছেড়ে দিলে। বললে, 'ভগমানের নাম লাও, বাবা,

দেখ ইদিকে…' শেষের দিকে হরির মার কণ্ঠস্বরের শান্ত ভাবটা যেন ব্যাহত হল। কপালের ওপর থেকে কাপড়টা টানা হয়ে পেছনে সরে গেল। আঁচলের খুঁটটা ও একবার চোখের ওপর তুললে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নামিয়ে রেখে শান্ত হ'বার চেষ্টা করলে।

বিছানার দিকে তাকিয়ে শিবলালের প্রথম একটা অদ্ভুত ধারনা হল যে বাবা সমস্ত বিছানাটা যেন ঢেকে পড়ে রয়েছেন। ওঁর দেহ বড় এটা শিবলালের কত পরিচিত কথা, কিন্তু ঠিক এমনি করে অনুভবের মধ্যে সেটা পায় নি কখনও। খিলানের মতো বাঁকা ছাতি, পরিপুষ্ট কাঁধের ওপর মাথাটা বালিশের ওপর হেলানো। একই সময়ে শিবলালের মনে হতে লাগল, এ সবই তার চেনা, কিন্তু এখন ঠিক এমনি করে তাকিয়ে দেখবার কারণ আছে, এটাও সে অস্বীকার করতে পারল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে পুষ্প আবার ঘরের মধ্যে ঢুকল, চন্দ্রকান্তর মাথার দিকে তক্তপোষের পাশে দাঁড়াল ও। পুষ্প নিজেকে চেষ্টা করে অনেকখানি সংযত করতে পেরেছিল, কিন্তু ও যখন পাশের তোয়ালে দিয়ে চন্দ্রকান্তর কপালটা মুছে দিলে তখন ওর হাত কাঁপছিল। শিবলাল পুষ্পর হাতের দিকে তাকিয়ে বাবার মুখখানা ভালো করে দেখতে পেলে। দেখেই চমকে উঠল ও, এই যেন প্রথম মুখখানা চোখে পড়ল ওর। ঠোঁট দু'টো একটুখানি ফাঁক হয়ে রয়েছে, জিবটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গোঙানির মতো শব্দ যেটা আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, সেটার সম্বন্ধে এই মুহূর্তে আর একবার সচেতন হল। শিবলালের কিন্তু মনে হল বাবার এই মুখের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ গলার কাছে অতি দ্রুত একটা কাঁপুনি হচ্ছিল চন্দ্রকান্তর। যেন অনেকগুলো কথা ওখানে আটকে গিয়েছে, আর সেগুলো গলে গিয়ে একটানা অস্পষ্ট শব্দ বেরোচ্ছে।

হরির মা ঝিনুকে ভর্তি করে জল এনে শিবলালের হাতে দিলে। কি করতে হবে সে সম্বন্ধে এদের মধ্যে ও-ই একমাত্র সচেতন ছিল। কণ্ঠস্বরে যেমনি স্নেহ তেমনি সম্ভ্রম মিশিয়ে বললে, 'বাবার মুখে জল দাও…মুখের পাশ দিয়ে দাও…' শিবলাল যন্ত্রের মতো ওর হাত থেকে ঝিনুকটা নিলে, মুখের পাশ দিয়ে যখন ও জলটা ঢালতে লাগল তখন হরির মার হাত দু'টো প্রায় জড়ো হয়ে এসেছে। খুব নিচু আর রুদ্ধ কণ্ঠে ও 'হরি-হরি' উচ্চারণ করতে লাগল।

রোগীর মুখের ভেতর সমস্ত জলটা গেল না, কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু জল পাওয়ার পর রোগীর মুখের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, ডান দিকের গালের

ওপর দু'একবার মুচড়ে উঠল। আধ-বোজা চোখের পাতাটা ওপরের দিকে ঠেলা হয়ে উঠে দৃষ্টিটা পূরো হয়ে উঠল। চোখ দু'টো ঘোলাটে, কিন্তু শিবলালের মাথাটা যেখানে রয়েছে, শূন্যে সেদিকে দেখবার চেষ্টা করছে যেন। হরির মা আস্তে আস্তে বললে, 'বাবা, একটু কাছে যাও···কত্তা আশীর্বাদ করবেক···'।

চন্দ্রকান্তর ডান হাতটা একটুখানি ছিটকান হয়ে তক্তপোষের ধারের দিকে পড়েছিল। হাতটা নড়তে লাগল, যেন ভেতর থেকে টান পড়ার একটা প্রেরণা এসেছে, কিন্তু নাড়বার ক্ষমতা নেই। শিবলাল হাতটা আস্তে আস্তে তুলে ধরতেই তার দেহের দিকে খানিকটা টানা হয়ে পড়ল, কিন্তু শিবলালের হাতের মধ্যেই রইল। শিবলাল অনুভব করলে যেন মোটামোটা আঙুল গুলো তার হাতখানা ধরবার চেষ্টা করছে কিন্তু ধরতে পারছে না।

হরির মা—হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল। পরক্ষণেই হাতের তেলোতে একটু মাটি জল দিয়ে গুলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। শিবলালকে বললে, 'বাবা তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্ত, তুমি সব। ই হরির মাটি, তুলসী তলা ঠিঙে লি'এলম···কপালে দিয়ে দাও। আর দিয়ে তুমি এখন বাইরে যাও, তুমার এখানে থাকার দরকার নাই।'

শিবলাল বাবার কপালে মাটির ফোঁটা দিয়ে দিলে। ওর হাত কাঁপল না। মনে মনে বাবার কাছে বিদায় নেবার মতো করে এই ফোঁটা সে দিলে। তার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।

পুষ্পও এসেছিল পেছনে পেছনে। দরজা পেরিয়েই ও বলে উঠল, 'দাদা, এ কি হচ্ছে···'। পূরোপূরি শিবলালের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল ও। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শুনে শিবলাল চকিত হল, ফিরে বুঝতে পারলে, এক গাদা কথা—এই সামান্য কথাটার চারিদিকে ভিড় করে রয়েছে, যা পুষ্প কখনো উচ্চারণ করতে পারবে না। এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ও। কিন্তু এইমাত্র যা করে এসেছে ও তারপর ওর আর কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। ও শান্তভাবে বললে, 'এ হবেই—এ ছাড়া আর কি হবে বোন। এ আমি জানতাম।'

অধ্যায় ১৭

এটাই ঠিক, এরই জন্যে এতদিন ধরে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল শিবলাল। এটা যদি আজ তার বুক ভেঙে দিতে দিতে বেরিয়ে আসতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তারও প্রয়োজন ছিল।

বারান্দার ওপর দাঁড়িয়েছিল শিবলাল। ওর মাথাটা অল্প ঝুঁকে পড়েছে, সামনেই মেঝের ওপর কি দেখছে যেন। আশ্চর্য এই যে, এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ওর কোন কষ্ট হচ্ছে না। বরঞ্চ সত্যকে মেনে নিতে পারলে মানুষের যেমন একটা শান্ত অনুভব হতে থাকে, ওরও সেই রকম হচ্ছিল।

বিহারী চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল। শিবলালকে পেরিয়ে গিয়ে বারান্দার ধারের দিকে রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালে। হাতের তেলো দু'টো কপালের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে চুলগুলো টেনে দিলে। তারপর ডান পা মুড়ে দেয়ালে ভর দিলে। যেন ওর যা করার ছিল, তা এইমাত্র শেষ করে দিয়ে এসেছে।

একটা হাই তুলে শিবলালকে উদ্দেশ করে বিহারী বললে, 'আপনি চলে যাবার পর মাঝখানের কয়েক দিন ছাড়া সব সময় আনকনশাস হয়ে ছিলেন, কাল সকাল থেকে এই রকম যন্ত্রণাটা বেড়েছে। নাউ এভরি থিং হ্যাজ এণ্ডেড্... আমাদের আর করার কিছু নাই।...' বিহারীর চোখের পাতা দুটো টানা হয়ে নেমে পড়ছিল, জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'সি-এম-ও এই দিন চারেকের ভেতর তিন বার এসেছিলেন—আজ সকালেও এসেছিলেন একবার, হাসপাতালে যাবার আগে। বাট নাথিং ইজ ফ্রুটফুল, ছাটস্ অল...'

রান্নাঘরের দরজাটা প্রায় ভেজান ছিল। কপাটটা খুলে লীলা বাইরে তাকিয়ে পুষ্পকে উদ্দেশ করে বললে, 'দিদি, আপনি একবার ভেতরে আসুন...'

এরা দুজনেই ফিরে তাকাল। বিহারী কি কথা বলতে যাচ্ছিল, সেটা ছেড়ে দিয়ে চোখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু শিবলালের পক্ষে এ আঘাতটা আকস্মিকেরও বেশী হয়ে দাঁড়াল।

পুষ্প এক পা এগিয়ে এল। বললে, 'লীলা এই ক'দিন এখানে রয়েছে।

ও না এলে আমি যে কি করতম, জানি নাই···' বলতে বলতেই ওর চোখ ভিজে এল। শিবলালের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সে তেমনি শূন্য দৃষ্টিতে লীলার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল পুষ্প। লীলা আগেই চলে এসেছিল, সে বললে, 'দুধ গরম হয়েছে, বিহারীদাকে দিন···'

পুষ্প উনানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেলাসে দুধ ভরতে লাগল। ওর হাত কাঁপতে লাগল, দুধটা ঠিকমতো ঢালতে পারছে কিনা ও বুঝতে পারল না। শিবলালের বিবর্ণ, শূন্য দৃষ্টিটা এখনো ফুটে রয়েছে ওর সামনে। পুষ্পর নিজের সামনেটাও তেমনি ফাঁকা মনে হল। কিন্তু ওর মনে হল, 'দাদা লীলাকে একটা কথা কি বলবে না? না, কথা ওকে বলতেই হবে···তা না হলে কি হবে···?' পুষ্প দাঁড়িয়ে উঠে লীলার দিকে একবার তাকালে, তারপর গেলাস নিয়ে বেরিয়ে এল। বিহারীর হাতে গেলাসটা দিয়ে বললে, 'বিহারীদা, আপনি সারা রাত জেগে আছেন, এখন একটু শুয়ে পড়ুন, আমরা ত আছি···'

বিহারী দেয়াল থেকে পাটা নামিয়ে দুধের গেলাসটা হাতে নিলে। গরম দুধের ভাপটা মুখের কাছে একটুখানি ধরে রাখলে ও, যেন নিজেকে একটু উত্তপ্ত করে নিতে চায়। তারপর একটা চুমুক দিয়ে বললে, 'শিবুদা, এই কদিন আগে পারসোন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টু জি. এম. এসেছিলেন—আপনি শুনবেন পরে সে কথা। এটা একটা বড় অনার, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাই মনে করি··· কাকাবাবুর সেই ভিজিট মনে পড়ে? একবার দেখাতেই জি-এম ওনাকে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, এটা হচ্ছে ফ্যামিলি অনার··· আপনি তাঁর বিরুদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু আমি শুনেছি, হী ওয়াজ নো লেস ইম্‌প্রেস্‌ড্‌ বাই ইয়োরসেল্‌ফ্‌···দ্যাটস্‌ ইট···'

বিহারী ধীরে ধীরে কয়েকটা চুমুক দিলে। তারপর মুখ তুলে বলে উঠল, 'কিন্তু শিবুদা, আপনার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম না। আপনার নামে তো ওয়ারেণ্ট আছে এখনো···'

পুষ্প একবার বিহারীর দিকে, একবার শিবলালের দিকে তাকাচ্ছিল। ও বলে উঠল, 'দাদা, হ্যাঁ, তোমার কিছু ভয় নাই ত? বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে···'

আবার সেই কণ্ঠস্বর, শিবলালের অবসন্ন চেতনাকে যেন চেতিয়ে তুললে। ও বিহারীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'বিপদ আছে কিনা জানি না। কিন্তু

আমি থাকতে এসেছি এখানে। যা হয় মেনে নেবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

শিবলাল কথা শেষ করতে পারল না, মাঝখানেই থেমে গেল।

একটু আগে পর্যন্ত ওর যে আত্মবিশ্বাস আর জোর ছিল, সেটা যেন আর ছিল না। সেখান থেকে টেনে এনে ওকে ছুঁড়ে দিয়েছিল যেন কেউ। ও কেবলই মনে মনে বলছিল, 'এর কি অর্থ আছে, কেন এমনি হয়, আর কেন এমনি হয়েছে?' লীলার মুখখানা শুকনো। কিন্তু শুকনো কেমন হতে পারে···বাবার ঘরে যে মৃত্যুর ছায়া দেখে এসেছে শিবলাল, সেটা লীলার মুখে কেমন করে এল? ভীষণ! কেমন করে এটা সম্ভব? মনে মনে বলে উঠল ও, 'তবে কি আমি ভুল দেখছি! লীলা হয়ত অসুস্থ। না কি, আমরা সবাই এমনি মৃত্যুর মুখের মধ্যে রয়েছি···আমরা আমাদের চিনতে পারি না, আমাদের তেমন করে বুঝতে পারি না···সেটাই ঠিক—'। ও আস্তে আস্তে পুষ্পকে জিজ্ঞেস করলে, 'লীলার কি অসুখ করেছে?'

প্রায় একই সঙ্গে বিহারী পূর্ব কথার সূত্র ধরে বলতে আরম্ভ করেছিল, 'জুনাপুরে এই ঘটনাটা যে ঘটল··· এতগুলো লোক মরল সেটা কিছু নয়? শিবুদা আপনি অনেক ভাল বুঝবেন, আমার মনে হয় একটা ওলোট পালোট কিছু ঘটবে। কিন্তু,···ওকি,···পুষ্প··· তুমি···'

পুষ্পর দু চোখ দিয়ে গড়িয়ে জল পড়ছিল। ও ফিসফিস করে কি বলবার চেষ্টা করল, পারল না তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকে গেল। বিহারী গেলাসটা দেওয়ালের পাশে নামিয়ে রেখে শিবলালকে কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে ফিরে তাকাতে হল ওদের।

হরির মা বিহ্বল হয়ে বারান্দার ওপর ছুটে এসেছিল। ওর মাথার গায়ের কাপড়, স্খলিত হয়ে পড়েছে—চোখ দুটো বিস্ফারিত। উত্তেজিত ভীত কণ্ঠে ও চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ গা, তুমরা এস···আমি একলা, ভিতরে কি হয়েছে সব···'

এরা পর পর সবাই ছুটে গেল। চন্দ্রকান্ত আর ছিল না।

ঘাড়টা সেই একই দিকে কাত হয়ে রয়েছে। জিব আর দেখা যাচ্ছিল না, ঠোঁট দুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যেন এইমাত্র কি কথা বলেছে। চোখ দু'টো শান্ত, নিমীলিত, কপালের ওপর মাটির ফোঁটাটা শুকিয়ে সাদা হয়ে উঠেছে।

অধ্যায় ১৮

অপি সাউ বাজার করে ফিরছিল। ডান হাতে ঝোলানো কালি-ঝুল মাখা রেশন ব্যাগটার দিকে চকিতে একবার করে তাকিয়ে নিচ্ছে আর জোরে পা চালাচ্ছে। আজ সারাদিন রান্না-বান্নার পাট ছিল না, কাম্বু লছমীকান্তর ঘরে আটকে পড়েছে। তার বহু সরসতিয়া অসুস্থ, প্রসবের সময় উপস্থিত হয়েছে বলে বলছে ওরা। ব্যাগটার একটা কোণা দিয়ে এক ঝাড় শাকশুদ্ধ কুমড়ো ডগা ঝুলে পড়েছে। গুমোট সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অপির মনে হয়, শাকগুলো খুব শুকনো, কালো কালো। মনে হওয়া মাত্র দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিড়-বিড় করে উঠল অপি, 'যাঃ-শালা, ঠকি' দিয়েছে রে···' বিরক্তির সঙ্গে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে ও।

পুরাণা হাটের এই রাস্তাটায় লোক-চলাচল একেবারে নেই। নির্জন, পরিত্যক্ত, খাঁ-খাঁ করছে। দূরে দূরে এক একটা লাইট-পোস্ট, তার থেকে ছড়িয়ে-পড়া নিস্তেজ, অপরিচ্ছন্ন একটুখানি আলোর চারদিকে অন্ধকার ঘাপটি মেরে রয়েছে। বাকি জায়গায় তেমনি ঘোলাটে, তরল অন্ধকার, তাতে সব কিছু দেখা যায়, দেখা যায়ও না। বিকেল থেকে আবহাওয়াটা এমনি হয়ে রয়েছে। প্রথমটা মেঘ উঠে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তারপরই ধূলোর ঝড় উঠে মেঘটা ঘেঁটে-ঘুঁটে ছিটকে দিয়েছে। কাঁচা রাস্তাটা থেকে এখন ধূলো উড়ছে না, অল্প বৃষ্টিতে স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে, পা দিলে ধূলোর ওপর বসে যেতে থাকে।

বাঁ-দিকে ভোলা মুদির দোকানের সামনে একটা ষাঁড় লেজ নাড়তে নাড়তে বোধ হয় কলা পাতা চিবোচ্ছে। অন্ধকারে ষাঁড়টাকে একটা অতিকায় জানোয়ারের মতো লাগে। বাজারে যাবার সময়ও ভোলা মুদির দোকানটা খোলা ছিল, এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে চলে গিয়েছে। আজকাল খদ্দের নেই, বেচা-কেনা হচ্ছে না। কোম্পানী 'লক-আউট' ঘোষণা করে দিয়েছেন, কারখানা কবে খুলবে কিছু ঠিক নেই। মজদুররা সব দেশে চলে যাচ্ছে, নয় তো পাশা-পাশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। ভোলা মুদির পাশে মনোহারী দোকানটার মালিক শিউরতন পাণ্ডে কয়েকদিন দোকানই খুলছে না। ডান দিকের কলে জল

নিতে এসেছে—না, মেয়েটাকে অপি চেনে বলে মনে হল না। হায়, মাত্র একটা লোক! এই সময় কলে হুড়োহুড়ি লেগে থাকত।

বারান্দায় উঠবে অপি, এমনি সময় লছমীকান্ত তাড়াতাড়ি তার বাসা থেকে বেরিয়ে এল। এ পাড়াটার মধ্যে এতক্ষণে তবু দুটো লোক মুখোমুখি হল। 'এ অপিবাবু…' লম্বা লিকলিকে চেহারার লছমীকান্ত সর্বদা লাজুক কিন্তু এখন ওর কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন, কর্কশ শোনাচ্ছে। অপি থমকে দাঁড়াতেই লছমীকান্ত সামনে এসে পড়ল। ব্যাগটার দিকে চোখ পড়তেই চোখ দুটো চকচক করে উঠল ওর, কী বলতে এসেছিল ভুলে গিয়ে বলে ফেলল, 'অপিবাবু, সওদা লে আয়া…'

'হুঁ, লে আয়া, কেনে…'

থতমত খেয়ে গেল লছমী। সে নিজে কয়েক দিন বাজার করে নি, সেই জন্যেই যে সে প্রশ্ন করেছিল তা নিজেও জানত না। শুধরে নিয়ে বললে, 'দেখিয়ে, অপিবাবু, আজ বারা দিন লক-আউট চলতা হ্যায়…'

অপির দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠতে গেল কিন্তু কিছু না বলেই পা বাড়াল ও। লছমী আবার ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপ সুনা হ্যায় কি কারখানা দো এক দিন বাদ খুলেগা?'

অপির পা আটকে গেল শুধু তাই নয়, ও ফিরে পড়ে আগ্রহের সঙ্গে শুধালে, 'হুঁ, খুলবেক? আপনি ঠিক জানেন?'

'কৌন জানে, ভেইয়া, আদমিয়োঁ বোলতা হ্যায়…'

দু'জনেই চুপ করে গেল। লছমীর মুখখানা কাঁচু-মাচু, অপির তীব্র বিরক্তি যেন এক মুহূর্তে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে এল। কিন্তু অস্থির অপি অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারে না। আস্তে আস্তে বললে, 'আচ্ছা, আপনার বাড়ির 'উনি' কেমন আছেন, ভাল ত?'

'নেহী, অপিবাবু, ভাল নাই…' লছমীকান্ত এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ গদগদ হয়ে উঠল, বললে, 'গোবিন্দ্‌কী মাতাজী বহুৎ মেহেরবানি করছেন, উনি সভী দেখছেন…'

'উনির কি প্রসব-বেদনা…আপ সমঝাতা নেহী, বাচ্চা হোনেকী…'

'হাঁ, ওহী হ্যায়।'

মেনকা দরজার কাছে ইতস্তত করছিল। এক সময় বেরিয়ে এসে অপির হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে গেল।

'ভাল বন্দোবস্ত করেন, লছমী ভাই, এই সব ভাল নয়…' কিন্তু বলতে বলতেই

কথাগুলো আটকে গেল ওর, রাগে তো-তো করতে লাগল। ভাল বন্দোবস্ত করা তো দূরের কথা, সে নিয়ে একটা জল্পনা করাও ওদের পক্ষে সম্ভব নয় এই সময়। হঠাৎ সব কিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো করে বললে, 'যাক গে, শালাঃ, কবে ল্যাঠা চুকবে কে জানে।'

লছমীকান্ত অপির এই উষ্মার কারণটা বুঝতে পারল না। ও যে-কথাটা আদৌ বলবার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল হঠাৎ সেইটে মনে পড়ে গেল ওর। অনুনয়ের স্বরে বললে, 'আপ পইলে অন্দর যাইয়ে। লেকিন আপনি এখন ডেরেমেঁ থাকবেন ত?' তারপর, পাছে অপি আবার রূঢ় হয়ে ওঠে সে জন্যে তাড়াতাড়ি এই অনুরোধের কারণটাও বলতে আরম্ভ করলে। 'অপিবাবু, এখন হামি বাহার যাবে, দো-তীন ঘণ্টা দেরী হোবে, আপ ইধর্ দেখিয়েগা থোড়া...' বলে অপি নিজের বাসার ভেতর দিকটায় একবার দৃষ্টিপাত করলে। 'হামারা যো ছোটা ভাই কা দোস্ত্, ও আজ গাঁওমে চলা যায়গা, আউর দো-তীন আদমী যায়গা, উনকে সাথ হামকো টিশন পর যানা পড়েগা...লেকিন, আপ ইহাঁ দেখিয়ে থোড়া...' কৈফিয়ৎটা দিতে দিতে ওর উদ্বিগ্ন মুখের ওপর স্বতই সেই লাজুক, আত্মতৃপ্ত হাসিটা ভেসে উঠল।

'আপ যাইয়ে, হাম দেখেগা...'

তাড়াতাড়ি করে বলল অপি। অমন উন্নাসিক অপি সাউএর বুকের ভেতরটা মুহূর্তের জন্য দুরদুর করে উঠল। আরও একদল মানুষ চলে গেল জুনাপুর ছেড়ে!

অধ্যায় ১৯

ভেতর দিককার বারান্দায় পড়ে অপির ছোট ছেলেটা ক্রমাগত চিৎকার করছে। ওর বয়স দু' বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু ও যত বড় হচ্ছে ততই খিটখিটে হয়ে উঠছে। গেল মাস খানেকের মধ্যে ওর এই অবস্থাটা চরমে পেঁাছেছে। ওর চেহারাটা কাঠি-কাঠি, রক্তহীন, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে ওকে থামানো শক্ত, ও নিজেও থামতে পারে না।

ছেলেটার পাশেই ব্যাগটা নামিয়ে বসেছিল মেনকা। কিন্তু ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে ও কাঠ হয়ে গেছে। একগাদা কুমড়োশাক দিয়েই ব্যাগটা

ভরানো ছিল, নিচে কয়েকটা মাত্র বেগুন, আধসেরটাক হবে, আর কোণার দিকে কয়েক মুঠো মাত্র চাল পড়ে রয়েছে। দু'জনের পাতে দেওয়া চলবে। ওগুলো তুলে যে ও রান্নাঘরে নিয়ে যাবে সেটুকু শক্তিও ওর ছিল না। ডান হাতে করে বেগুনগুলো বের করেছিল ও, তারপর সেই হাতখানা যেন ওর অবশ হয়ে গেছে। পায়ের পাতার ওপর ডান হাতটা পড়েছিল ওর, হাতের আঙুলগুলো থেকে কনুই পর্যন্ত চিন-চিন করছে।

অপি ঘরের ভেতর কাপড় ছেড়ে গামছাটা কাঁধে ফেলে হাতমুখ ধুতে এল। ছোট ছেলেটার একেবারে পাশেই ওর বাঁ পাটা পড়ে কেঁপে উঠল, যেন পায়ে করে ওটাকে ছুঁড়ে দিতে চায়। অপি খেঁকিয়ে উঠল, 'এই কেঁচোটা এখানে কেন, যা-যা, মর শালা···' তারপর পাশ কাটিয়ে সুড়ুৎ করে উঠোনের ওপর নেমে গেল ও, পাছে ওটাকে ছোঁয়া হয়ে যায়।

মেনকাকে ঘা মেরে তুলে দিল যেন। ও তাড়াতাড়ি উঠে ছেলেটাকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। ছেলেটাকে চাপড়ে, আদর করে ভোলাতে চাইলে ও, কিন্তু ওর কান্না তাতে আরো উছলে উঠল।

'সোনা আমার, ভাই সোনা আমার, এই দেখ···এই যে সোনা···' ছেলেটাকে কাঁধের ওপর ফেলল ও, কিন্তু ওর একটা টানা, আটকে-যাওয়া গোঙানিতে কানের ভেতরটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে। ওটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দু'হাতে ধরে সামনে আনল মেনকা। আর্ত, চাপা স্বরে বলে উঠল, 'আরে···একটু চুপ কর না রে··' যেন অপির থেকে আর নিজের বিরক্তি থেকেও কোনো রকমে ওটাকে আড়াল করতে চায়।

ছেলেটার রোগা শরীরটা টান হয়ে পড়েছে, হাড়-বের-করা বুকটা ধুক ধুক করছে। চোখ দুটো আধখানা বোজা, গলগল করে জল বেরিয়ে সমস্ত মুখখানাকে অপরিচ্ছন্ন, কুৎসিৎ করে তুলেছে। কিন্তু তাও নয়, ওর গলার মধ্যে একটা কর্কশ, টানা-টানা শব্দ হচ্ছে। মনে হয়, এখনই আটকে যাবে।

হঠাৎ থমকে তাকাল ওর দিকে মেনকা। এই ছেলেটা কি ? ওর ভেতরে এমন কি কষ্ট হচ্ছে যে ও কেঁদেই চলেছে। এতক্ষণ ধরে কাঁদে কি করে ও ? এই তো ওর চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই, কিন্তু কাঁদবার বেলায় তো জোরের কিছু কম নেই !

অপি বাইরে থেকে ডাকলে, 'মেনি, এক গেলাস জল দিয়ে যা।'

মেনকার বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঠ হয়ে উঠল, বুঝতে পারল না ছেলেটাকে

ও কোল থেকে নামাবে কি করে। নামালেই যদি ও আটকে যায়? আর ওকে নিয়ে বাবার কাছে যাওয়া—সেটা আরও অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত মেঝের ওপর ওটাকে নামাল মেনকা, কিন্তু…খুশি হতে গিয়ে চাপা চিৎকার দিয়ে উঠল। ছেলেটা মেঝেতে পড়ে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছে, নেতিয়ে পড়েছে। ছেলেটা 'চলে গেল, না কি?' চেপে-বসা বুকটা টিপটিপ করে উঠল মেনকার, তাড়াতাড়ি ছেলেটার বুকে-মুখে হাত দিয়ে দেখতে লাগল। না, ঘুমিয়ে পড়েছে।

বারান্দার নিচে খাটিয়া পেতে বসেছিল অপি। মেনকার ডাকে ফিরে বাঁ-হাতে করে গেলাসটা নিলে ও। মেনকা জিজ্ঞেস করলে, 'চা করে দিব, বাবা?'

'তা পারিবি, দিবি, শুধাবার কি আছে…' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অপি বললে।

বাঁ-হাতে কেরোসিনের ডিবেটা ধরেছিল মেনকা। কপালে, গলায় ঘাম চুইয়ে পড়েছে। কালো, সাদা-মাঠা মাটির মতো মুখখানা ওর, কিন্তু আজকাল ভীষণ ক্লান্ত দেখায় ওকে। পায়ে পায়ে কোনো রকমে ভেতরে গিয়ে ঢুকল মেনকা।

ওর এই ভয়ে ভয়ে চলে যাওয়াটাই অপিকে খেপিয়ে দিলে। এতক্ষণ ধরে এইটেই, এই রেগে ওঠাটাই, এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিল ও। হঠাৎ ওর মনে হল, এই মেয়েটা এমনি করেই ওকে ঠকিয়ে এসেছে। কোনো সময় সে একটা কুকুর-বেড়ালের মতো মনে করে নি বাপকে, আর সে মেয়ের জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে! অসহ্য রাগে গজরাতে লাগল ও, 'ঠকামি, আমার সঙ্গে ঠকামি! অলুক্ষণে, অপয়া মেয়ে, কুচ্ছিৎ, হতচ্ছাড়ী কোথাকার!' যে কথাটা ও অনেক বারই অস্পষ্টভাবে ভেবেছে সেটাই মনের মধ্যে দপ করে উঠল যেন। ওর আর সন্দেহ রইল না যে এই অপয়া মেয়েটার জন্যেই তার বিয়ের সব সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এটাও—যে সম্বন্ধটা সে ঠিক করে এনেছে, সেটাও ভেঙে যাবে।

বিছে কামড়ালে যেমন হয়, তড়াক করে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অপি। কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে ছটফট করতে লাগল ও। পল্টু মণ্ডলের সঙ্গে মেনকার বিয়ের সমস্ত ঠিক হয়েছে, তার জ্যাঠা গোষ্ঠ মণ্ডলের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। আসছে শ্রাবণের প্রথমেই বিয়ে হবে। সেই বিয়েটাই ভেঙে যাবে? মনে মনে ও একবার কাতরে বলে উঠল, 'কেনে, ভেঙে যাবেক কেনে, কি কারণে ভেঙে যাবেক?' কিন্তু একটা অজানা বোবা ভয় ওর ওপর চেপে বসল। স্বপ্নের মধ্যে নিজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনলে আর ফাঁসি কাঠের দিকে নিয়ে যেতে থাকলে মানুষের যা হয় ওরও তাই হল। চোখ দুটো দ্রুত

কাঁপতে লাগল, দূরে কারখানার দিকে আর কাছে চারদিকে অর্থহীনভাবে চোখ বুলোতে লাগল ও। যেমন কিছু দেখতে পেলে না ও, তেমনি কিছু ভাববার ক্ষমতাও ওর রইল না। সমস্ত চেতনা আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

অধ্যায় ২০

অপির বড় ছেলে গোবিন্দ শিষ টানতে টানতে লছমীকান্তর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর চোখেমুখে কৌতুক ঝকঝক করে উঠছে, যেন খুব একটা হাসি-ঠাট্টার জিনিস দেখে এসেছে ও। অপির সামনে পড়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল গোবিন্দ, তারপর পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইলে।

এটাই অপিকে নাড়া দিয়ে সচেতন করে দিলে যেন। পুনরায় খাটিয়াটার ওপর এসে বসল ও। কিন্তু গোবিন্দকে ও যেতে দিলে না। ছেলেটা দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েছে এমনি সময় ওকে ফেরাল। গোবিন্দ পায়ে পায়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই তার ডান হাতটা মোচড় দিয়ে ধরলে। আঁক্:করে চিৎকার দিয়ে উঠল গোবিন্দ, ওর দেহটা ডান দিকে ঝুঁকে পড়ল। ছেলেটার আর্ত চিৎকার অপির পক্ষে টনিকের কাজ করল, বলতে লাগল, 'কিরে শালাঃ ওদের, ঘরে গেছলি কেনে…হুঁ…'

অপির গলাটা চেরা-চেরা ; খনখনে, এমন করে বলছে যেন কথাগুলো কষ্ট করে টেনেটেনে বের করতে হচ্ছে। 'শালাঃ, ছেলে-বিয়ানা দেখতে গেছ্লি ! তোর লজ্জা করল নাই…শালাঃ, মরদ হঁয়েছিস কেনে…মাগিদের দলে যেয়ে ঢুকতে তোর লজ্জা করল নাই ! যাস্ শালাঃ, আমার সামনে থেকে যা…'

গোবিন্দর মুখের ওপর অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে গেল। হাতের-কানের যন্ত্রণায় প্রথমে চিৎকার করে উঠেছিল ও এবং একটা চাপা অবাধ্যতা ওর চোখ দুটোতে কুৎকুৎ করে উঠেছিল কিন্তু অপির এই কুৎসিৎ আক্রমণে লজ্জায় সহসা ও নিস্তেজ এবং বিবর্ণ হয়ে উঠল। চোখ নিচু করে চলে গেল ছেলেটা।

আবার চারদিক নিস্তব্ধ। অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। ডান দিকে বাঁ দিকে রাস্তার ওপর কেউ নেই। লছমীকান্তদের বাসার ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে। একবার কান্থর উচ্চ-কণ্ঠ শোনা গেল, 'বহিন, তুম মাৎ ডর করো…' কেন বললে বোঝা গেল না। কান্থকে সমর্থন করে কেউ যেন

কিছু বললে। আরো কোন স্ত্রীলোক রয়েছে ওখানে। তারপর আবার সব চুপচাপ। সময়টা যেন আর চলছে না, থমকে রয়েছে। কাজই হচ্ছে সময়ের মাপকাঠি, কাজ না থাকলে কিছুই বোঝা যায় না।

কারখানার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো আটকে গেল অপির। সমস্ত কারখানাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কেবল একটা চাপা আগুনের আভাস ছিটকে পড়েছে বাইরে। মনে হয় ওখানে অন্ধকার রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

'কি হচ্ছে কি ওখানে?' অপি হাত ঝিনুকে বাড়িয়ে দিলে কারখানার দিকে, আপন মনেই। কোম্পানী মাত্র কয়েকজন লোককে দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে। কারখানার সমস্ত মিল আর সেকসন বন্ধ, কেবল ফার্নেসগুলো 'হট' রাখা হয়েছে। আর, যে-লোকগুলোকে দিয়ে কোম্পানী কাজ করাচ্ছে, তারা ঢুকছে কি করে কারখানায়? বিন্দু মাত্র লজ্জা থাকলে পা উঠত ওদের? 'দালাল, শালাঃ দালাল সব, বেইমান···' থু-থু করে থুতু ছিটকে উঠে পড়ল অপি, তারপর যেন লোকগুলোর বাতাস গায়ে লাগবে এমনি করে ঘরের ভেতর চলে গেল।

একটু পরেই খেতে দিল মেনকা। ভেতরের বারান্দায় ঝাঁট দিয়ে জল তড়তড়া দিয়ে পিঁড়ি পেতে দিয়েছিল। গোবিন্দ বসেছিল আগে থেকেই। পাশেই বসে পড়ল অপি। ভাতের ওপর গরম ভাপ উঠছে। অপি ভাত দেখেই বুঝতে পারলে কি রকম ক্ষুধাত হয়ে উঠেছিল ও। ঠিক এখনই ওর মনে পড়ল, সারাদিন ওরা কেউ কিছু খায় নি। কিন্তু শুধু তাই নয়, খেতে বসার আগে কতক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। একটু আগেকার অপির সঙ্গে এর যেন কোনো মিল নেই। পরিষ্কার থালায় এই ক'টা গরম ফেণা-ভাত ওর চোখে কী আশ্চর্য হয়ে ঠেকল। ওর মনে হল, ভাতই লক্ষ্মী, দেবতা।

কুমড়ো শাকের ডাঁটা আর বেগুন নুন-সেদ্ধ করে দিয়েছিল মেনকা। অপি খেতে খেতে বললে, 'বেশ রান্না করেছিস রে, মেনি···'। সমস্ত মুখখানা শিথিল, হাল্কা হয়ে এল ওর। চুকচুক করতে লাগল ও, জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল কয়েক বার। দুটো লম্বা ডাঁটা এক সঙ্গে ধরে চুষে তারপর চিবোতে লাগল। ও দুটো আর ফেলতে ইচ্ছে করে না। মেনকা ফেণ গেলে ফেলে নি, মেয়েটার বুদ্ধি আছে। ফেণ শুদ্ধ ভাত বাড়বে। ফেণা-ভাতের সঙ্গে ঝোল মিশিয়ে সুপ-সুপ করতে বেশ লাগে। হাতের আঙুলগুলো চাটতে লাগল অপি।

এক সময় গোবিন্দর দিকে তাকাল ও। ছেলেটা একটা ছেঁড়া গামছা পরে

খেতে বসেছে। হয় ছেলেটা রোগা হয়ে গেছে নয়তো কেমন রোগা-রোগা দেখাচ্ছে ওটাকে। কিন্তু গবার মতো ছেলে অমনি আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে কেন। অপির এখন তেমন অবস্থা নয়, তা না হলে দেখতে পেত ছেলেটা ভাল করে খেতে পারছে না। খিদে নেই তা নয়, অপির সামনে ওর হাত উঠছে না। ছেলেটা এই প্রথম গ্লানি অনুভব করছে।

অপি উৎসাহ দিয়ে বললে, 'হাঁ রে গবা, ভাত খা, খেঁয়ে লে…' তারপর রান্না-ঘরের দিকে ফিরে বললে, 'মেনি, তুইও ভাত লিয়ে আয়, বসে যা আমাদের সঙ্গে। আয়, আমার পাশে ব'স…'

'না, বাবা, তুমি খাও, আমি খাবখন…'

'না-না, আয়, আমাদের সঙ্গে খাবি…'

অপেক্ষা করতে করতে অপির খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললে, 'যাঃ, এলি নাই! থালে তুই আমার পাতে বসে পড়, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। হঁ, বুঝলি…' বলে ও সামনে বসে রইল।

ভেতর থেকে মেনকা ভীত স্বরে বললে, 'বাবা, তুমি উঠে যাও। আমার খিদে নাই। বিকালে আমানি-ভাত খেয়েছি আমি…'

হঠাৎ খেয়াল হ'ল অপির, সব ভাতই খেয়ে ফেলে নি তো? তড়াক করে উঠে হাত না ধুয়েই রান্নাঘরে চলে গেল ও। 'কি রে, ভাত নাই না কি…' ভাতের হাঁড়ির মুখটা খোলাই ছিল, ভেতরে তাকিয়ে দেখলে অতি সামান্য কটি ভাত পড়ে রয়েছে। বললে, 'যাস্ শালাঃ, সব খেয়েঁ লিয়েছি। তুই বলিস নাই কেনে, হঁ?' তারপর অনুতপ্ত, মৃদু কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু যা, তুই আর দেরি করিস নাই, গরম ফেণের সঙ্গে নুন-ঝোল ভাল লাগবেক রে। যা…'

মেনকা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল, অপির দিকে এবার মুখ তুলে তাকাল ও। ভয়ে ওর মুখটা ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু সত্যি কথাটা না বলে ও পারল না। 'মা এখুনি ও ঘর থেকে আসবেক…মা সারাদিন খায় নি ··মা আসুক, তারপর…'

বলতে বলতে থেমে গেল ও, অপির চোখের দিকে তাকাতে পারল না আর। সকড়ি হাতটা কাঁপছে অপির আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তারপর 'আঁক' করে চিৎকার দিয়েই মেনকা ছিটকে পড়ল পাশে। অপি বাঁ পায়ে করে লাথি মেরেছে।

'শালীর ঝি শালী, মায়ের জন্যে দরদ ভাবছিস…আর তুই না খেয়েঁ থাকবি …হঁ…আমার সঙ্গে ঠকামি! তুদের জাতটোকে জানি আমি। কেনে, আমার

দরদ নাই···তুদের জন্তে আমার দরদ নাই, হঁ? আমি সব ভাত খেয়ে লি··· লয়? আয়, উঠে আয়। দয়াবতী, অলুক্ষুণে, আয় বলছি···তা নাগে সব কটাকে কেটে ফেলব তুদের, তারপর ফাঁসিএ যাব···'

গোবিন্দর হাতের ভাত খসে পড়ল। ভেতর দিকে একটু উঁকি মেরেই ছুটে বাইরে পালিয়ে গেল ও।

অধ্যায় ২১

'এ মাহাদেও, সুনো, হাম যো কুছ বোলা হ্যায় ও মাৎ ভুলো। সভী রাজাকো বোলনা পড়েগা···' লছমীকান্তর বয়েস হয়েছে, তার ওপর এখন কমজোরী হয়ে গেছে ও, মাহাদেওর থেকে কেবলই পিছিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে আধ-ছোটা করে তাল রাখবার চেষ্টা করছে।

'হাঁ-হাঁ, হাম সভী বোলেগা···' যেন লছমীর কথাটা মাহাদেও অনেকবার শুনেছে আর অনেকবারই তাকে জবাব দিতে হয়েছে এমনি ভাবে উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল ও।

লছমীকান্ত এ কথায় আশ্বস্ত হল, মাহাদেও যে ওর ভাইকে সব কথা বলবে সে সম্বন্ধেও ওর কোনো অবিশ্বাস ছিল না কিন্তু পরক্ষণেই ও আবার বললে, 'তুমি রাজাকে বলবে যে আসছে জাড় পর্যন্ত গাই দুটো যেন রেখে দেয়। এখন মহাজনকে দিলে খুব কম পয়সা দিবে। আমি তো জাড়-কালে গাঁও যাচ্ছি তখন দেখে-শুনে দিব···'। তারপর এখনকার অবস্থা বলতে আরম্ভ করলে ও। দেশে যতদিন মা বেঁচে ছিল ততদিন কোনো গোলমাল হয় নি। এখন কথা উঠছে কে গরু দেখবে, দুধ হলে কে বিক্রী করতে যাবে। বলতে বলতে হঠাৎ একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে এমনি করে বলে উঠল লছমীকান্ত, 'হাঁ-হাঁ, মহাদেও, তুমি রাজাকে এটা বোলো না, তুমি যদি সমঝিয়ে বোলো তাহলে ও শুনবে। আরে, মা দাদী, আমাদের সব বহু তো দুধ বিক্রী করতে গেছে (সরসতিয়া গ্রামে থাকার সময় যেত)। লেকিন রাজা তার বহুকে দুধ বিক্রীর জন্য যেতে দেবে না। কেঁও, এতে দোষ কি···তুমি একটু সমঝিয়ে বোলো···'

হাত ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ মাহাদেও রাস্তার ওপাশে সরে গেল, আর লছমীকে লাফ দিয়ে সরে আসতে হল এদিকে: আর্মি-পুলিশের একটা লরী স্টেশন

রোড থেকে হঠাৎ নেমে এসেছে। বাঁ-হাতটা তুলে তাড়াতাড়ি চোখের ওপর চেপে ধরল লছমীকান্ত। তারপর যখন সরালে তখন ওর দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল। ধুলোর ঝড় উঠিয়ে লরীটা পেরিয়ে গেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের ওপরও একটা ঘন আবরণ পড়ে, কয়েক হাত সামনের জিনিসও দেখা যায় না। হতভম্ব ভাবটা খানিকটা কাটিয়ে লছমী যখন একটু দেখবার চেষ্টা করতে পারল, তখন মাহাদেও অনেকটা এগিয়ে গেছে। 'এ মাহাদেও…এ-এ…হোই…' একটা হাঁক দিয়েই ও রাস্তা পেরিয়ে ছুটল। বিড়বিড় করতে লাগল, 'আরে, হামভী তো আতা হ্যায়…ইত্না জলদি বড়তা হ্যায় কেঁও?'

মাহাদেওর কাছে লছমী তখনও পৌঁছে নি, হাত বাড়িয়ে ও মাহাদেওর বিছানাটা ছুঁই-ছুঁই করছে, আর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলছে, 'আরে তুম সকেগা নেহী…ইতনে সমান ··দো হাত ভর লিয়া একদম…মুঝে দো না…' বলে ও বিছানাটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারলে। মাহাদেও ঠিক ততখানি জোরে বিছানাটা আটকে রাখলে। বিরক্ত হয়ে বললে, 'এ, কেঁও পীছেসে খিঁচতা হ্যায়? হাম একলী লে সকেগা…হাঁ।'

মুহূর্তে বেকুবের মতো হয়ে গেল লছমী। কিছুক্ষণ একেবারে চুপ করে গিয়ে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেমন করে বাজপাখি শিকারের ওপর ছোঁ মেরে পড়ে, তেমনি করে লছমী ক্ষিপ্র গতিতে বিছানাটা দু'হাতে পাঁজা কোলা করে ধরে পেছনে টান মারলে। মাহাদেও এই টান আর সামলাতে পারল না। বিছানার তলা থেকে ঘাড় বের করে উঁচিয়ে লছমীকান্ত বলতে লাগল, 'হাম লেগা…জরুর লেগা…লেগা নেহী তো কিসীকে লিয়ে আয়া হাম, হঁ?'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, স্টেশন রোডের ওপর দিয়ে একই ভাবে হেঁটে এল ওরা। লছমীকান্ত এমনিতে তাল রাখতে পারছিল না, তার ওপর বিছানাটা নেওয়ার জন্য আরো পিছিয়ে পড়তে লাগল, আর ছুটে ছুটে তাল রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। মাহাদেওর হাত তখনও ভর্তি, বাসন-কোসন নিয়ে ও একটা থলিয়া বেঁধেছিল, সেটাই এখন ডান হাত থেকে নিয়ে বাঁ-দিকের ঘাড়ে তুলেছে। লছমীর দিকে ফিরে মৃদু কৌতুক করে বললে, 'ক্যা, সুবিস্তা হোতা নেহী?'

লছমীকান্তর সেই ক্রোধটা নেতিয়ে পড়েছিল, ক্লান্তভাবে বললে, 'নেহী, নেহী, বহুৎ সুবিস্তা হোতা হ্যায়। লেকিন এক বাত সুনো, রাজাকো বোলো কি এ মুলুকমে বহুৎ গোলমাল আছে, ও যেন না আসে। আসবে তো কিছু লাভ হোবে না। বাঙলা মুলুকমে পইলে চাকরী মিলজুল যেত, এখন সে-সব হোবে না…'

লছমীর কথা শেষ হ'ল না, ওরা ভীষণ চমকে উঠল। এক বিরাটকায় প্রৌঢ় মাহাদেওর থেকেও বেশি বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে জরু আর দলবল নিয়ে স্টেশনের দিকে এগোচ্ছিল। বরসিংবাঁধের দিক থেকে এসেছে ওরা। ঘোড়ের মাথায় হৈ-হৈ করে এসে পড়ল। বিরাটকায় লোকটির দুই হাতই জোড়া, তাই কথায় জোর দেবার জন্যে ও সমস্ত শরীর মাঝে মাঝে ঝাঁকিয়ে তুলছিল। 'এশ্‌শালে কুম্পানী লোক 'লক-আউট' কিয়া। শালে নোকরীকো লাথ মারো।' যেমন করে লাফিয়ে উঠছিল ও, মনে হবে ওর কাঁধের ওপরকার বোঝাটা ঠেলে ফেলে উঠবার জন্য গাঁক-গাঁক করছে।

কে একজন বললে, 'আপলোগ মুলুকসে কব আপস আয়গা?'

'আয়গা?' লোকটি পিছন ফিরে তাকিয়ে ভুরু দুটো মুহূর্তের জন্য তুললে। 'আয়গা তো আয়গা, নহী তো নহী। কৌন কেয়ার করেগা রে ভেইয়া!'

ওর উৎসাহ যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। জুনাপুর ছেড়ে যাবার আনন্দে ডগমগ করছিল ও। কী মূল্য দিয়ে আর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এই মুক্তি সে পাচ্ছে অন্ততো তখনকার মতো বুঝবার ক্ষমতা ছিল না ওর।

লছমীকান্ত ওর দিকে তাকিয়ে তারপর মাহাদেওর দিকে ফিরে তাকালে। সেখান থেকে কি যেন খুঁজে বের করতে চাইলে ও।

অধ্যায় ২২

জুনাপুর স্টেশন প্লাটফর্মের অবস্থা কিন্তু এ রকম নয়। দরজা-জানালা বন্ধ করা ঘরে বাইরে থেকে হঠাৎ ঢুকলে যেমন হয় এর অবস্থাও তেমনি। হাল্কা অন্ধকার দিয়ে সমস্তটা যেন মুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারখানার সেই উজ্জ্বল আলোর সারি আর নেই। কেবল মাঝে মাঝে একটা অস্পষ্ট, গুম-খাওয়া লালচে আলো ছিটকে পড়েছে। ঝড়ের মুখে মেঘের মাথা থেকে যে-রকম আলো বেরোয় তেমনি। এতে অন্ধকার কাটছে তা নয়, অন্ধকার যেন আরও জমাট বেঁধে উঠেছে। কেবল কয়েক হাত দূর পর্যন্ত অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্তু তারপরেই সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে।

প্লাটফর্মের পাশে একটা সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ডান দিকে কারখানার থেকে বেরোতে গিয়ে একটা রেল-এঞ্জিন থমকে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে,

পেছনে মাল-ভর্তি গাড়ি। আর এদিকে প্রবেশমুখী কামরার পর কামরা, যতদূর চোখ যায় নিশ্চল হয়ে রয়েছে। খনিজ লোহা আর চুণা পাথর—ইস্পাত তৈরীর উপকরণ থরে থরে সাজানো। ঠিক এই মুহূর্তে বোঝা যায় না এগুলোর কোনো উদ্দেশ্য কোনো দিন ছিল কি না। একটা অর্থহীনতার প্রতিমূর্তির মতো পড়ে রয়েছে।

প্লাটফর্মের এধার-ওধার তাকালে সহসা একটা আতংকের মতো লাগে। প্লাট-ফর্মের শেষটা চোখে পড়ে না এমনি লম্বা। শক্ত একটা অনড় পদার্থের মতো বিছিয়ে পড়ে রয়েছে। যেন ভেতরে একটা অভিসন্ধি ঘাপটি মেরে রয়েছে, এখনই ফেটে বেরিয়ে পড়বে। এখানে-ওখানে যাত্রীরা জটলা পাকিয়ে বসে আছে, কোথাও বা দাঁড়িয়ে। ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। ওদের কথাগুলোও ফিসফিসানো, শোনার থেকে না শোনার ভাবটাই বেশি। যেন কেউ ধমক দিয়ে এক্ষুণি ওদের থামিয়ে দেবে তার জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে।

কেবল ওভারব্রিজের কাছে একটা বাতি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। তার নিচে যে ক'জন কথা বলছে তাদের দিকে তাকালে তবু বুকের ভেতর সুস্থ মানুষের একটা ভরসা পাওয়া যায়।

'মানিক, ভাই, আমার দিব্যি…যেদিন তুই লক-আউট তুলার কথা শুনবি, সেদিনই চিঠি লিখে দিবি। তোকে আমি যে পোস্ট-কাড্‌টা দি'গেলম, ওতে ঠিকানা লিখা আঁছে, তুই শুধু দু'ছত্তর লিখবি এই যা…'

যে-লোকটিকে চারদিকে ঘিরে ধরেছিল কথা বলছিল, সে-ই। ওর কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে আর বলতে গিয়ে কাতর হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, মাণিকের কাছে চিঠি লেখাটা ভিক্ষে চেয়ে নিচ্ছে ও। মাণিক যত ওকে আশ্বাস দিচ্ছে ততই ওর অনুনয়-বিনয় বেড়ে চলেছে। শেষকালে মাণিক ওকে থামাবার জন্যে বললে, 'কেনে তুই ভয় পাচ্ছিস, পেসাঁদ? আমি এই দিলাসা দিয়ে বলছি, এক মাসের আগে যদি কারখানা খুলে ত শালা আমি বাপের বেটা লয়…' বলেই মাণিক একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলে। যেন এতক্ষণ পরে একটা কথার মত কথা বলেছে আর শ্রোতাদের ওপর তার প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করতে চায় ও। 'বলি, তুই ত এতদিন চাকরী করছিস কুম্পানীতে, এমন জিনিসটা দেখেছিস কুনু দিন? বলি, যেইটো হচ্ছে সেইটো চারটিখানি কথা লয়, ই সহজে মিটবে মনে হয় নাই। দেখ এখন এ্যাকশন কমিটি কি করে…'

'তা লয় গো…যে যাই করুক, কুম্পানী করুক আর একশন কমিটি করুক,

আমাদের কি? মরলে আমরা মরব, বাঁচলে আমরা বাঁচব…'

'প্রসাদ, তুমি নয় জুনাপুরে থেকেই যাও…, একজন বুড়ো-গোছের লোক এতক্ষণ খুব সমজদারী ভঙ্গীতে চিন্তা করছিল, হাতের বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিয়ে সে বললে। 'তুমি বলছ তুমার দেশে গেলে একটা ঠিকা কাজ জুটি' ফেলবেক, যা হোক একটা। কিন্তু থালে এখেনে কর না কেনে। এই ত আমাদের মধ্যে সব বেরিয়ে পড়েছে, কেউ কুলির কাজ করছে, কেউ জন-মুনিষ খাটছে। এই সময় চাষের সময় হে, তুমারও একটো জুটে যাবেক…'

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল কয়েক জন। এক জন বললে, 'হঁ, এই ঠিক বাত। আমাদের ভাত জুটবেক আর তুমার জুটবেক নাই…'

মনে হল, এর পর আর কারো কিছু বলবার নেই, সকলেই চুপ করে গেল। কিন্তু মাণিক বলে উঠল, 'তা হয় না, ও একবার যখন বেরিয়ে এসেছে, তখন ফিরে যাওয়া চলবেক কি করে!'

এবার প্রসাদ বল পেয়ে ডুকরে উঠল 'হঁ-হঁ, দেশের টান, মায়ের আঁতের টানের মতন। একবার যখন স্থযোগ পেয়েছি, ঘুরেই এসি…'

বুড়ো লোকটি এতক্ষণ ওর দিকে পরীক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, এখন হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, 'বটে! তাহলে বাপ অমনি কাঁদুনীপালা গাইছিলে কেনে। দেশ-ঘরের টানে যাচ্ছ, হঁ? কেনে, আমাদের দেশ নাই না কি। হেথাকে থাকবে থাক, দেশকে যাবে যাও, একটা কর কেনে…'

এর জবাব ছিল না প্রসাদের পক্ষে। কিন্তু একথা মেনে নেবার মতোও মনের অবস্থা ছিল না ওর। কেবল আহত জন্তুর মতো দুচোখ মেলে বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল ও। যেন বলতে লাগল, 'উ কথা বলবেন নাই…উ কথা বলবেন ত তাহলে আমি কি করব!'

এর পর কে কি বলত বলা যায় না কিন্তু হঠাৎ স্টেশনটা যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল। ওরা চকিতে ওভারব্রিজটার দিকে তাকালে। ওআচ এণ্ড ওআর্ড বিভাগের দু'জন উর্দি-পরা পুলিশ কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে, মাঝখানে একজন কারখানার কর্মচারী। দূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, সিঁড়ির কাছাকাছি উজ্জ্বল আলোটার কাছে আসতেই এদিক-ওদিক থেকে দু'একজন ফিসফিস করে উঠল, 'পূর্ণবাবু… এই, পূর্ণবাবু…ফোরম্যান্…'। 'এঃ, শালা দালাল…'

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোনো দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে চলে আসছিল। মনে

হ'ল মাথাটা হঠাৎ আরো ঝুঁকে পড়ল ওর। কোনো রকমে ক্লান্ত পা দুটো টেনে টেনে সিঁড়িটা পেরিয়ে স্টেশন রোডের দিকে এগিয়ে গেল।

'উঃ, দিনরাত কাজ করাচ্ছে না কি রে, বাবা। মানুষটো মরে যাবেক যে। আবার পুলিশ দিয়ে ঘর পাঠাইছে!'

'তা লয়? না হলে ফার্নেস্ জালি' রাখবে কি করে। কুম্পানী কারখানার ভিতরেই খেতে দিচ্ছে...'

মাণিক যেন এক পা এগিয়ে গেল সিঁড়িটার দিকে। 'আরে শুন, পূর্ণবাবু এখন শহরে যাবেক, বাসায়...হয় শালার কেউ মরেছে ঘরে, তা লয় ত মাগছেলের অসুখ করেছে। শালা. মুখ দেখাতে লিয়ে যাচ্ছে, এক্ষুণি ফিরি' লিয়ে আসবেক, যদি পালি' যায়, হুঁ...'

'ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা...চাকরী লয় রে, পেটের জন্যে এই নরক ভোগ...' বুড়োটা এতক্ষণ পরে কাতরে উঠল।

অধ্যায় ২৩

মাহাদেওকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল লছমীকান্ত। ওর ইচ্ছে ছিল গাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত মাহাদেওর কাছে থাকবে, আর কথা-বার্তা বলবে। কিন্তু আস্তে আস্তে সরে আসতে হ'ল ওকে। মাহাদেওর পরি-চিত আরও কয়েকজন লোক তাকে দেখতে পেয়ে লছমীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে যেন ঘিরে ধরলে। মনে হয় প্রত্যেক দিনই একবার করে স্টেশনে আসে ওরা, যাকে পায় তাকেই এমনি করে চেপে ধরে। কারও চিঠি নিয়ে যেতে হবে, কারও বাপকে একটা খবর দিতে হবে, আবার ফিরবার সময় কারো বা বড় ছেলেটাকে এখানে আনতে হবে। সে-ই সব চেয়ে বেশি করে ধরেছিল ওকে, 'ভেইয়া, তুম দেখো কি উস্ বাচ্চেকে লিয়ে হাপ-টিকট কর লো... যব তুম ওয়াপস আয়েগা না, হাম জরুর প্যায়সা দে দুংগা...'

'ক্যা, হাম প্যায়সা ক্যায়সে দুংগা, তুম দেও আব্...'

মহা বিব্রত হয়ে পড়ল লোকটি, হঠাৎ ওর মুখটা আঠা দিয়ে কেউ জুড়ে দিয়েছে যেন এমনি করে তো-তো করতে লাগল। 'ভেইয়া, হামারা পাস এক প্যায়সা হ্যায় নেহী, তো তুম উসকো লে আও...'

'বহোৎ আচ্ছা!' মাহাদেওর চোখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ঝক ঝক করে উঠল, 'তুম্‌হারা বাপ নে হামকো পহলে প্যায়সা দে দিয়া। হাম উসকো জরুর লে আয়েগা…'

গাল বাড়িয়ে দিয়ে আদরের বদলে চড়ুটি খেলে যা হয় এর অবস্থা তাই হ'ল। চুপ করে গেল ও। ততক্ষণে ট্রেনের নানা চাপা কথাবার্তা, জল্পনা কানে আসে। লোকটা মুহূর্ত মাত্র বেকুবের মতো হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ভেইয়া, হামকো বিশোয়াস করতে নেহী'?'

ধাক্কা খেয়ে একটু দূরে এসে পড়েছিল লছমীকান্ত। ওর চোখের সামনে কী হচ্ছে প্রথমটা খেয়াল ছিল না ওর, কিন্তু যখন বুঝতে পারলে তখন ওর গাটা রী-রী করে উঠল। মুখ বাঁকিয়ে চাপা গলায় ও বলে উঠল, 'ক্যা, এক হী আদমী মুলুকমেঁ যাতা হ্যায়, তো ইতনা আদমিয়োঁ এ্যায়সা করতা হ্যায় কেঁও…' একটু আগে ও নিজেই যে এটা করছিল তা ওর মনে রইল না।

হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বর শুনে পেছন দিকে ফিরে তাকাল দলটার থেকে কিন্তু ততক্ষণে সেখান থেকে লছমীকান্ত ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। প্লাটফর্মের গেটটা পেরিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল ও। বাঁ-দিকে টিকিট ঘরের সামনে একটা লোক ঝুঁকে পড়ে কি করছে, টিকিট নিচ্ছে না কি খুচরো গুণছে। খুব তাড়াতাড়ি করতে চায় ও, কিন্তু মাঝখানে কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই ব্যাপারটা মেটাতে পারছে না। লছমী এগোতে এগোতে বার দুই ফিরে ওকে একই অবস্থায় দেখতে পেলে।

তখন ঠিক সেই আগেকার মতো অবস্থা। একটু আগে যে উত্তেজনাটা ছিল সেটা দপ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেছে। আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু নিঃসাড় মনে হয়। স্টেশন রোডের ওপর দোকান-পাট বন্ধ। যে দু'একটা দোকান খোলা ছিল, সেগুলোরও ঝাঁপ টানা, এখনই বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তার ওপর অনেকখানি ছাড়া-ছাড়া লাইট পোস্টের মাথায় আলোগুলো টিমটিম করছে। স্টেশন রোডের বাসিন্দারাও হঠাৎ যেন কোথায় চলে গেছে মনে হয়, দরজায় তালা ঝোলানো নয়তো ভেতর থেকে বন্ধ। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মনে হয়, লোকে যেন সন্দেহ করছে আর আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ, পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠল লছমীকান্ত। একটা পান দোকানের ঝাঁপের নিচে থেকে এক ছোকরা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। এত জোরে ছুটে এল ও যে লছমীকান্তর মনে হল ওর ধাক্কাটা সামলাতে পারবে না। কাছে আসতে

চোখ পিটপিট করে লছমীকান্ত বললে, 'ক্যা, গোবিন্দ, তুম্ ইতনা রাতমে'...'

'আরে, আপুনি এতক্ষণ কুথাকে ঘুরে বেড়াইছিলেন, ঘরকে যান না। মাসিমার কি হইচে দেখেন যেয়ে'...' বলেই গোবিন্দ হী-হী করে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল। অপি মেনকাকে মারছে দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছিল ও, কিন্তু রাত্রিতেও টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভয় করছে না।

'ক্যা, সরসতিয়া মর গয়ী তো নেহী'...' লছমীকান্তর পা দুটো অবশ হয়ে গেল, টানতে গিয়েও টানতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত এমনি করে দাঁড়িয়ে রইল ও তারপর সহসা ওকে ধাক্কা মেরে কেউ যেন সামনে ছিটকে দিলে। হাল্কা, অবশ পা দুটো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছে লছমীকান্ত। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট কাতরানি বেরোচ্ছে, ওর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে যেন, 'হাম কেঁও চলা গেয়া... ও তো মর গই নেহী ?' হঠাৎ একটা আতংক সাঁড়াশির মতো ওর গলাটা চেপে ধরেছে। এতক্ষণ ও ভুলেছিল কি করে সেটাই আশ্চর্য। ডান হাত দিয়ে মাথার চুলের গোছাটা চেপে ধরল ও, তারপর টান মারতে লাগল।

'এ্যাই, এ্যায়সা করতা হ্যায় কেঁও রে...'

একটা কাঁপুনি দিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল লছমীকান্ত। বাঁ-দিকে একটু দূরে একটা আর্ম্ড পুলিশ পিকেট থেকে ওকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

'এ্যাই, ইধর আও ...এ আদমী, স্থনতা হ্যায় নেহী ?'

লছমীর ঐ রকম ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে ওদের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। কিন্তু কিছু করার আগেই একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আদমী ভাগতা হ্যায়... এ বুরবক...'

হাবিলদার গোঁফের চুমরানো ডগাটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'এই, পাকড়ো উসকো...'

জনা দুই পুলিশ ধড়াচূড়ো আর অস্ত্র সমেত ছুটতে আরম্ভ করলে। তাতে ঝনাৎ-ঝনাৎ করে শব্দই হতে থাকল বেশী। কিন্তু তাতেও বাধা পড়ল। হঠাৎ স্টেশনের দিক থেকে এসে একটা অতিকায় লরী এদের পেরিয়ে গেল, আর সামনেটা আড়াল করে দিলে। ধুলোর থেকে মুক্ত হয়ে যখন ওরা তাকাতে পারল তখন সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেছে। কাউকে দেখতে পেলে না ওরা।

অধ্যায় ২৪

লছমীকান্ত যখন বুঝতে পারল যে ওরা আর আসছে না তখন থামল। এই অবস্থাতেও একটা মৃদু কৌতুক ওর মনের মধ্যে চিক করে উঠল, 'ছোঃ, ক্যায়সে বেকুফ বানায়া···'। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে লছমীর এইটুকু খেয়াল হয়েছিল, ও যদি এমনি করে রাস্তার ওপর সোজাসুজি ছুটতে থাকে, তাহলে সামনের মোড়ে পুলিশ ওকে ধরে ফেলবে। সুড়ুৎ করে বাঁ-দিকের মাঠে নেমে গেল ও। আশা ছিল, মাঠের মধ্যে নামতে পারবে না ওরা। কিন্তু আরও একটা সুবিধা হয়ে গেল ওর, হঠাৎ পেছনে একটা লরী আসাতে আড়াল হয়ে গেল, ওরা বুঝতেই পারল না লছমী কোথায় মিলিয়ে গেছে।

হাত পা যে ওর ঠকঠক করে কাঁপছিল এতক্ষণ বুঝতে পারে নি। প্রথম ধাক্কা কেটে যেতেই সেটা ও বুঝতে পারল। তখনও স্টেশন রোডের দিকে তাকিয়ে ছিল ও : সিপাহী দুটো বোকার মতো ফিরে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পা, কি রকম থপথপ করে ফেলছে, হাঁটুর কাছটায় বাঁকা। খ্যাক করে আর এক দফা হাসি ঠেলে আসতে চাইল ওর, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে লছমীকান্ত নিজেকে সামলে নিলে। অপি দাঁড়াতে পারছিল না, একটা ছোট্ট ঢিবির মতো জায়গায় বসে পড়ল। তাছাড়া, এখানে এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতেও ওর ভরসা হচ্ছিল না। যদি আলো ফেলে বা এমনিই বুঝতে পারে।

কিন্তু মাঠের বাতাস লেগে যখন ওর দেহটা জুড়িয়ে এল তখন সহসা আর একটা আশঙ্কায় ওর বুকের ভেতরটায় কাঠ হয়ে উঠল। যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেইটের কথাই মনে হল ওর : যদি ওরা ধরে ফেলত ? কিন্তু কী দোষ করেছিল সে। মনে তো তার কোনো গলতি ছিল না, তবে ? একটা বোবা ভয় ওর মনটাকে অসাড় করে দিলে।

কতক্ষণ এমনি করে বসেছিল ও, হঠাৎ ভক্ করে একটা দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগল। তাড়াতাড়ি জায়গাটা থেকে উঠে পড়ল ও, কোথায় কি ভাবে বসে পড়েছিল কে জানে। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কিছু দেখাও যায় না। দাঁড়াতেই পায়ের নিচেটায় কেমন লাগল, নোংরা মাড়িয়ে ফেলেছে বোধ হয়। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করবার মতো অবস্থা নয় ওর। আস্তে আস্তে মাঠটা পেরিয়ে গেল

ইসকা বাপের জোর আছে। শালা···খেতে না পাই মরে যাব, চাকরীর জন্যে জেম্‌স্‌ সাহেবের পা চাট্‌তে যাব নাই।'

এক মুহূর্তে চুপসে গেল লছমীকান্ত। ওর এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না কাকে কি বলছে। যেন মহা অপরাধ হয়ে গেছে এমনি করে বলতে লাগল, 'নহী', নহী', অপিবাবু, জেম্‌স্‌ সাহেবকো পাস হামভী নহী' যায়গা। একসন কমিটি যো বোলেগা ওহী করে গা, হাঁ···' ক্রমশঃ ঝিমিয়ে আসতে লাগল ও।

লছমীকান্ত কী বলছে সেদিকে খেয়াল না করেই চেঁচাতে লাগল অপি, 'কেনে, শালা এতগুলা মজদুর যে মরল তার কি হল? তার একটা রাহা হল নাই, আর···' দূরে চলে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটো ঘুরে উঠল।

অধ্যায় ২৫

এর আরও ঘণ্টা খানেক পরে মেনকার মা কাদু লছমীকান্তর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দা থেকে নামতেই দূরের ল্যাম্প পোস্টের আবছা আলো এসে পড়ল ওর ওপর। সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে গিয়েছে, চুলগুলো পর্যন্ত জবজবে হয়ে উঠেছে। ওর মাথায় কাপড় নেই, বাঁ কান ঢেকে উস্কোখুস্কো চুলের গোছ বাম বাহুর ওপর লটকে পড়েছে। মোটাসোটা মানুষটি পরিশ্রমের জন্য একটুখানি বিস্রস্ত হয়ে উঠেছে।

বাইরে দড়ির খাটিয়াটা খালি, ভেতরেও অপিকে দেখতে পেলে না কাদু। গোবিন্দও নেই। ও মুখ বাঁকিয়ে আপন মনে বলে উঠল, 'বাবা, এত রাত্রে কোন যমালয়ে গেছে সব···', কিন্তু তারপরই ব্যাপারটা ভুলে গেল। কাদু একটা বড় ঝামেলার থেকে একটু সময়ের জন্য বেরিয়ে আসতে পেরেছে বটে, কিন্তু ওর সমস্ত ভঙ্গীর মধ্যে সেই চেতনা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে এখনই ওকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। ভেতরের বারান্দার ওপর বালতিতে জল ভরা ছিল, দুমদাম করতে করতে এসে চোখ-মুখে ঝাপটা দিলে কয়েকবার। রান্না-ঘরে ঢুকে কলসী থেকে ঢেলে ঢক-ঢক করে জল খেলে ঘটি-খানেক। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

মেঝের ওপর মেনকা যেখানটায় পড়েছিল সেখানটায় একবার বসে পড়ল ও।

পাশেই ছোট ছেলেটা কাদার মতো পড়ে রয়েছে। ওর শুকনো পাতলা ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়েছে একটু। কাহুর মনে হল ছেলেটার ভীষণ খিদে পেয়েছে, ওকে উঠিয়ে 'মোনো' দেবে। ওকে ওঠাতে গিয়ে কিন্তু ঠেলা দিলে মেনকাকে, বললে, 'এই মেনি, ভাত-টাত রেখেঁছিস রে···এ্যাঁ, তুর বাপ কিছু এনেছিল ?'

কাহুর ডাকে মেনকা একবার চোখ মেলে তাকাল, হুঁ-হাঁ করে ওর কথার জবাবও দিলে একটা। কাহু হঠাৎ বললে, 'দেখ মেনি, ভাতগুলা দে দিকিনি একটো বাটিতে করে, লছমীর বউটোকে দি গে···' বলে কাহু নিজের উস্কো-খুস্কো চুলগুলোকে পেছনে নিয়ে গিয়ে ঝুঁটি বাঁধতে লাগল। ওর মাথাটা ঝোঁকানো, চিবুকটা টানা হয়ে বুকের কাছে নেমে এসেছে। ও কথা বলছে আর সহানুভূতিতে ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এসেছে। 'মাগিটো আজ ছ'মাস ধরে ভুগছে··· ছাঁ বিয়াবে কি গায়ে এক রত্তি জোর নাই। দুটো ভাত দিগে, পেটে একটু 'দল' পড়লে যদি নামে। আ-মল, মেনি, তুই ঘুমালি না কি···'

কাহু বিরক্ত হয়ে ওকে আর একটা ঠেলা দিয়ে উঠে পড়ল। আঁচল থেকে খুলে একটা দোক্তা-পান মুখে পুরলে, তারপর নিজেই হাঁড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। ভাতের পরিমাণ দেখে ও চমকে উঠল না, এর থেকে বেশি আশাও করতে পারত না ও। কিন্তু ভাতের সঙ্গে ফেণ ঢেলে জাম্বাটিতে করে নিতে নিতে লছমীকান্তর ওপর খেপে উঠল ও। 'মরদ হইছে দেখ না, মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন···মাগিটো সারাদিন খায় নাই। ব্যথা দিয়ে যাচ্ছে, উয়াকে এক মুঠা খেতে দিবার নাই, আর ইদিকে টো-টো করে ঘুরে বেড়াইছে···'

যাবার মুখে এদের দিকে আর একবার কাহুর চোখ পড়ল কিন্তু এদের সম্বন্ধে কোনো রকম চিন্তাই ছিল না ওর মনে। যাবার জন্য পা বাড়িয়েই ওর মনে হল, এতক্ষণ ওর চলে যাওয়াই উচিত ছিল। একটু বসতে গিয়ে ভীষণ দেরি করে ফেলেছে। যখন বাইরের দরজাটা ভেজিয়েছে শেকল দেবার জন্যে, তখন লছমীদের ঘরের ভেতর থেকে একটা গোঙানির মতো শুনতে পেল কাহু। শেকল শুদ্ধ হাতখানা কেঁপে উঠল ওর, এক রকম ছুটে গিয়ে ঢুকল ওদের ঘরে।

ভেতরের বারান্দায় জাম্বাটিটা রাখতে রাখতে কাহু বললে, 'সত্য-মাসি, অবস্থা কি রকম দেখছ বল দিকি···' কিন্তু সরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে উঠল ও। কিছুক্ষণের জন্য ও বুঝতে পারল না, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি উঠে মেয়েটার কাছে যাবে। যখন ওর প্রথম ঘোরটা কাটল, তখন

আপনা-আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল ওর, 'হে মা কালী, কেনে ই পেটের কাঁটা মানুষকে দাও তুমি···' বলে বারান্দার ওপর উঠে গেল ও।

সত্য-মাসি ওকে দেখে খনখনে গলায় চিৎকার করে উঠল, 'তুমি আচ্ছা লোক বাবু। আমার উপরে ঠিলে দিয়ে তুমি বেশ সরে পড়েছ···' বলতে বলতে সত্য (সত্যবতী) লছমীর বহুর একটা চাপ সামলালে। ওর ঘাড় আর কাঁধ ধরে এক রকম ঝুলে পড়েছিল মেয়েটা। সত্য নিজের ঘাড় থেকে তার হাতটা একটু সরিয়ে হাঁপানো গলায় বললে, 'ই মেয়ের জাঁক আমি সইতে পারি, বাবাঃ···' বলে ও একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

কাহু ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তখনও ওর মূঢ় দৃষ্টি আটকে ছিল সরসতিয়ার ওপর। একটা কিছু করা দরকার সেটা বুঝতে পারছিল ও কিন্তু কিছু করতে পারছিল না। হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় সরসতিয়াকে একটা প্রেতিনীর মতো মনে হচ্ছিল। আধ-বসা অবস্থায় সত্য-মাসির বুকের ওপর বেঁকে পড়েছে ও। ওর বাঁ-পায়ের উরুর থেকে গোড়ালিটা পর্যন্ত খোলা, কাপড় সরে গিয়েছে। সমস্ত পাটা ঠিক কাঠির মতো দেখাচ্ছে। পা-টা যেন মানুষের নয়, এক ফোঁটা রক্ত নেই ওতে। কেমন বিবর্ণ, আর সরসতিয়ার স্ফীত উদরের নিচে অত্যন্ত কুৎসিৎ দেখাচ্ছে। সরসতিয়া কাতরে চলেছিল, একটু ক্ষণের জন্যেও থামতে পারছিল না। কিন্তু ওর তলপেটের দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হয় ওর সমস্ত প্রাণশক্তি হাত পা থেকে সরে এসে ওখানটায় জমা হয়ে উঠেছে, আর সরু সুতায় ঝোলানো ভারের মতো প্রচণ্ড জোরে নিচের দিকে টান খেয়ে পড়েছে। হাত-পা গুলো থেকে তলপেটটা যেন আলাদা একটা জিনিস, জোড়াতাড়া দিয়ে এক-সঙ্গে সেঁটে রেখেছে।

'উ কি গো, অমনি হাঁ করে দেখছিস কি? পুয়াতিটোকে ধর একটু, আমাকে ছাড়···' সত্য-মাসি কাহুর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল। ও শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল, কাহুর ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না, সরসতিয়াকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর খনখনে গলার মতোই ওর লিকলিকে শরীর। নোয়ানো, আটকে-যাওয়া বাঁশের ডগা ছেড়ে দিলে যেমন হয় তেমনি খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললে, 'বাবাঃ, ই ঘাম বলে ঘাম। মানুষের দেহে আবার এত জল থাকে! গায়ে কি হাত বসতে চায়, যেমন পাঁক ঠিঙে পাঁকাল মাছ উঠে এল আর কি···'

কাহু বিরক্ত হয়ে ওকে থামালে, 'তুমি থাম দিকি, মাসি, তুমার বকর্ বকর

রামায়ণ আরম্ভ কর নাই…' কাদু সরসতিয়াকে ধরে ওর ভর নেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সত্যিই ও ঘামে এত ভিজে গিয়েছিল যে ওকে ধরবার উপায় ছিল না। বাঁ-হাতে শক্ত করে সরসতিয়ার ডান বাহুর গোড়াটা ধরেছিল ও, বাঁ হাতটা নিজের ঘাড়ে বেড় দিয়ে এনে ওকে নিজের বুকের ওপর নিলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলে, এ ভাবে ব্যাপারটা মিটবে না। ঘাড় নেড়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'না, ই-ত হবেক নাই। মাসি, 'তুমি ঐ শাড়িটো দাও দিকি। না-না, তুমি বরঞ্চ আর একবার ধর একে…আমি ব্যবস্থা করছি…' কিন্তু সত্য মাসি পুনরায় তখনই ওর কাছে আসতে রাজি হল না। কাদু খেপে গিয়ে সরসতিয়াকে শুইয়ে দিয়ে সত্যকে বললে, 'তুমি যদি এত ফুল-গতরী মানুষ, তবে এলে কেনে মাসি। আর একবার ধরলে কি তোমার গতর টসকে যেত?'

সত্য-মাসি খানিকটা স্থির হতে পেরেছিল। ওর গলার স্বর তেমনি 'মা-বাছা,' কিন্তু বাটালি চটিয়ে বললে, 'তা মা কি করব, বল। আমার এই গতর ভাল, কার ফুলা-গতরের দিকে নজর দিব, মা…'

কাদু চোখে আগুন ছিটিয়ে ওর দিকে তাকালে। কিন্তু ওর হাতে তখন জরুরী কাজ, তখনকার মতো চুপ করে গেল ও। তাড়াতাড়ি শাড়িটা পাকিয়ে একটা খুঁট বারান্দার খুঁটিতে বাঁধল ও, আর একটা খুঁট সরসতিয়ার হাতে দিয়ে বললে, 'বহিন, তুমি পা মিলে দাও খুঁটির দিকে, আর এইটো টেনে ধরে থাক…'

'হঁ-হঁ, কর কি, পুয়াতিকে শুয়ি' দিচ্ছ কেনে, পুয়াতিকে বসি' দাও, তলপেটে চাপ পড়ুক কেনে…' সত্যি-মাসির গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। কাদু এই বাধায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল না, কিন্তু অবজ্ঞায় ওর ঠোঁট বেঁকে উঠল। বললে, 'মাসি, দেখ, …যা জান নাই তা বুল নাই। বসে বসে পুয়াতি ব্যথা দিবেক আর তায় ক্ষেতি হবেক নাই…'

সত্য-মাসি ব্যস্ত হয়ে উঠল কিন্তু কেটে-কেটে বললে, 'বল কি মা, এই লিয়ে মাথার চুল পাকালম আমি, আর…'

ও আরও কি বলত কিন্তু এই সময় লছমীকান্ত উঠোনের ওপর এসে এক কাণ্ড করে বসল। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ও কিন্তু সরসতিয়ার ঐ রকম শোয়ানো অবস্থা দেখে হঠাৎ বিহ্বল হয়ে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল। অতি অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ স্বরে ও হু-হু করে কেঁদে উঠল। লছমীর মুখখানা দেখা যাচ্ছিল না। ও এতটা ঝুঁকে পড়েছিল যে ওর কপালটা প্রায়

মাটিতে ঠেকে গিয়েছিল, কেবল ধনুকের মতো বেঁকে পড়া পিঠের ওপর কান্নার বেগটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল।

কান্নু আর সত্য-মাসি দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। লছমীর থেকে এই ব্যবহারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে ওরা তখন প্রস্তুতিকেও ভুলে গেল। একটু পরে লছমীকান্ত যখন গোঙাতে গোঙাতে অসহায়ভাবে মাথা তুললে, তখন সত্য-মাসি নড়ে চড়ে উঠল। ও একবার বারান্দায় সরসতিয়ার দিকে তারপর লছমী-কান্তের দিকে তাকাল। হঠাৎ অজানা একটা ভয়ে ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এক পা এগিয়ে এসে ও রোগা হাতখানা তুলে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বললে, 'কি···বাবা, কি হইছে তুমার, ভয় কি···'

সত্য-মাসির হাতখানা নেমে আসছিল, কিন্তু তার আগেই লছমীকান্ত দু'হাতে সেই হাতখানা জাপটে ধরে হাউ-হাউ করে উঠল। মাটিতে আগের মতো হাঁটু গাড়া ছিল, মনে হল প্রার্থনা করছে। এক দিকে ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে অন্য দিকে কথা বলবার চেষ্টা করছে ও—দু'চারটে শব্দ থরথর করে বেরিয়ে আসছে—'সরসতিয়া···ক্যা হুয়া, হো-হো-হো, সরসতিয়া চলা গিয়া··হো-হো, হাম ক্যা করে···'

একটু আগে, নানা গোলমালে লছমীকান্ত স্ত্রীর অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ এসে পড়াতেই ওর আগেকার ভয়টা ওকে বিহ্বল করে দিল। বলতে লাগল, 'বহুৎ পইলে গোবিন্দ নে হামকো বোলা থা ···হাম কেঁও আয়া নেহী···'

সত্য-মাসি তার হাতটা টেনে নিতে চাচ্ছিল কিন্তু টানা অবস্থায় হাতটা যেখানে ছিল সেখানেই রাখতে দিতে হল তাকে। লছমীকান্তের বক্তব্য সে বুঝতে পেরেছিল। হঠাৎ সরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলতে আরম্ভ করলে, 'আ বাবা, উ কুছ্ হুয়া নেই···কিছু ভয় নাই, উ এমনি শুয়ে আছে। আমি এক্ষুণি উয়াকে বসা করাচ্ছি···'

এই কথাটা যেন চাবকে কান্নুকে সচেতন করে দিলে। ও মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ফিসফিসানো ভঙ্গীতে কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে ও ঝাপটা দিয়ে উঠল, 'সত্য-মাসি, উনিকে বাইরে চলে যেতে বল ত। কি হইছে কি, আমরা ত দেখছি···নয় চলে যাচ্ছি আমরা···'

সত্যর মুখ চূণ হয়ে গেল। লছমীকান্ত থতমত খেয়ে গেছল, সত্য মাসির হাত ছেড়ে দিলে ও। খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে, খানিকটা ভয়ে কান্নুর দিকে তাকালে ও, তারপর এদিকে চোখ রাখতে রাখতে ঘরে গিয়ে ঢুকল কিন্তু চলে গেল না।

অধ্যায় ২৬

মনে হল পাকানো শাড়িটা ধরে ভর দিতে সরসতিয়ার ভালো লাগছিল। কিন্তু একটু পরেই শাড়িটা ছেড়ে দিলে ও, সেটার আর দরকার ছিল না। ওর যন্ত্রণাটা কমে এসেছিল। সত্য-মাসি ওর অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল, 'হাই যাঃ, ব্যথাটো চলে গেল!' তারপর প্রসূতিকে উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে বললে, 'তুই একবার উঠে বস, মা। একটু ব্যথা দে দিকিনি···'

কানু ওর দিকে একবার তাকালে কিন্তু খেপে উঠল না। আস্তে আস্তে বললে, 'সত্য-মাসি, তা হয় না গো, জোর করে ব্যথা দিলে উল্‌টা ফল হবেক। তার চেয়ে নিজের থেকে যা হয়, সেইটো ভাল···'

কানুর একটা নতুন আত্ম-বিশ্বাস এসে গিয়েছিল। ও বুঝতে পারলে, যা করবার তা ওকেই করতে হবে, এদের ওপর ভরসা করার উপায় নেই। ওর চোখে-মুখে একটা সাবহিত, গম্ভীর ভাব ফুটে উঠল। সরসতিয়ার কাঁধের ওপর থেকে শাড়িটা সরিয়ে পাখা করতে করতে ও বললে, 'তুম শো রহো, কুছ ভয় নেই···'

সরসতিয়া একটুখানি ধাতস্থ হয়েছিল, ক্লান্ত, জুলজুলে চোখ মেলে তাকাতে লাগল ও। রোগা, লম্বাটে মুখের ওপর চোখ দুটো বড়-বড় দেখাচ্ছিল ওর। ও যেন বলতে চায়, 'আমার কি হচ্ছে আমি জানি না, এখন তোমরা কি করছ আমি দেখি···' কিন্তু একটু পরেই ওর মুখের দুর্বল, শ্রান্ত-ভাবটাও কেটে গেল। বারান্দার ওপর জাম্বাটির দিকে তাকিয়ে ও বললে, 'আরে, উসীমে কেয়া হ্যায়? ভাত! ভাত কঁাহাসে আয়া···কিসকে লিয়ে··· ও ভাত খায়গা?' বলে ও দুর্বল বাঁ-হাত খানা তুলে লছমীকান্তকে বোঝাতে চাইলে।

'নেই বহিন, তুমার জন্যে ফেণা-ভাত লি'এলম···' বলে জাম্বাটির কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কানু। এতক্ষণ ও ভাতের কথা ভুলেই গিয়েছিল। সরসতিয়ার কিন্তু খেয়াল ছিল না কানু কি বলছে। জাম্বাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল ওর। জিব বের করে ঠোঁটটা চেটে নিয়ে কানুর দিকে তাকাল ও।

কানু হাত ধুয়ে জাম্বাটিটা সরসতিয়ার সামনে নিয়ে এল! ঢাকাটা খুলে

ডাঁটা-সেদ্ধর ছোট বাটিটা নামাতে যাবে এমন সময় সমস্ত ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল। সরসতিয়া হাত বাড়িয়েছিল জাম্বাটির দিকে, কিন্তু হঠাৎ জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমন হয় তেমনি করে হাতটা সরিয়ে নিলে ও। ওর চোখ দুটো কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ ও কিছুই বলতে পারল না তারপর ভীত স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'বহিন, এ ভাত আপ রসুই কিয়া··· আপ সমঝতী নেহী···' শেষের দিকে লজ্জায় আর বিরক্তিতে ওর মুখখানা গুম খেয়ে উঠল।

কতক্ষণ কেউ কিছু কথা বলতে পারল না। তারপর সত্য-মাসি খন-খন করতে করতে হাত নেড়ে বললে, 'রসুই ভাত না খাও না খাবেক। খাআর লোকের ভাবনা নাই। জান কি··· কাছু আমাদের হ'ল পাকা লোক, পেটে আহার দিলে 'দল' পড়ত··· না খাও ত আর কি হবেক···'

খুট করে দরজার কাছে শব্দ হল। ধমক-খাওয়া ছেলের মতো উঁকি মারছিল লছমীকান্ত। সত্য-মাসির দিকে তাকিয়ে কাঁচু-মাচু গলায় বললে, 'মাতাজী, ক্যা হুয়া?' মনে হল কথাটা বলতে পেরেই ওর সাহস বেড়ে গেল, এক পা এগিয়ে এসে কাছুর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিলে। তারপর সরসতিয়াকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'ভাতকে বারেমেঁ ক্যা হুয়া··· উসীমে কুছ গলতি হ্যায় নহীঁ···' এই সংকটমুহূর্তেও একটা নির্দেশ দিতে পারছে, সেইটে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল ও। একটু আগেকার সংকুচিত ভাবটা কেটে গিয়েছিল। সরসতিয়াকে উৎসাহ দিয়ে ও বললে, 'আরে, তুম্‌হারী তো বেমারী হুয়া··· বেমারীর সময় মানুষ দাওয়াই খায়না? ভাত খেলে তোমার বহুৎ ভাল হবে, হাঁ···' জাম্বাটির দিকে হাত বাড়িয়ে ও দেখিয়ে দিলে। হঠাৎ সেদিকে এগোতে এগোতে একটা প্রস্তাব করে ফেললে ও, 'আরে, তোমার এত চিন্তা কেন, আমি থোড়া খাচ্ছি, তাহলে হবে ত?' কিন্তু জাম্বাটির ভেতর দিকটা দেখতে পেতেই ওর চুকচুকে লুব্ধ দৃষ্টিটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। থতমত খেয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় ও বললে, 'ইতনা থোড়া ভাত, তুম খা লেও, হাম বোলতা হ্যায়···'

সরসতিয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। চিৎকার করে বললে, 'তুম বাহার যাও···জলদী যাও। ফিন ইধর আওগে নেহী···'

লছমীকান্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপসে গেল। যখন ও মুখ ফিরিয়ে এদের দিকে তাকালে, তখন ওর চোখে একটা অনুনয়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

যেন বলতে চাচ্ছে, 'দেখিয়ে জী, আমি কি খারাপ বলছিলাম?' কিন্তু এখন সব কিছুই ওকে মেনে নিতে হবে। আস্তে আস্তে চলে গেল ও।

লছমীকান্ত তখনও দরজা পেরোয় নি, সরসতিয়া এত জোরে ঘাড় ফিরিয়ে জাম্বাটির দিকে তাকালে যে মনে হল ওর সব দুর্বলতা কেটে গেছে। শিকারের দিকে তাক করে বিড়ালীরা যেমন করে বসে থাকে, ওর অবস্থাও তেমনি হয়ে উঠল। তারপর হাত বাড়িয়ে জাম্বাটিটা সুড়ুৎ করে টেনে নিলে ও কোলের কাছে। একটুখানি বেঁকে বসল ও, যেন কাদুর থেকে ওটা আড়াল করতে চায়। প্রথম দলাটা ওর মুখে গলে গেল যেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ও মাড়ি নাড়ল না, চেপে রেখে দিলে। আস্তে আস্তে ওর মুখের ওপর একটা পরিতৃপ্ত, নরম ছোপ পড়ল। কুৎকুতে চোখে কাদুর দিকে তাকাতে লাগল আর মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল।

এই সমস্ত সময়টা কাদু বজ্রাহতের মতো বসেছিল। ওর মুখখানা এদের থেকে ফেরানো, ডান হাতের তেলোটা আঁচল শুদ্ধ গালের ওপর চেপে ধরেছে। ওর করবার কিছু ছিল না। এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে যার রেশ এখনও অনেকক্ষণ ধরে ওর সামনেই চলবে। আশ্চর্য, ভাত আনবার কথা তার নিজের মাথায় এল কি করে? সরসতিয়া তার না-চেনা নয়। জুনাপুর আসার পর প্রথম যে মেয়ের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয় সে এই সরসতিয়া—আর সেটা ছোঁয়া-ছুঁয়ি নিয়েই। সেখানে সে উপযাচক হয়ে হেঁসেলের ভাত নিয়ে এল কি করে?

কিন্তু কাদুর এই জ্বালাটাও থাকবার কথা নয়। লছমীকান্ত আর শেষে সরসতিয়ার ব্যাপার দেখে থ বনে গেল ও, বিস্ময়ে। ওর যন্ত্রণাটাও ফিকে হয়ে এল।

একটু পরেই সরসতিয়া 'পানি, পানি' করে চিৎকার করে উঠল।

সত্য-মাসি এতক্ষণ বারান্দার একেবারে এধারে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েছিল। একটু ঢিলে-ঢালা হতেই শেষ রাত্রিটা চেপে বসেছিল বুড়ো মানুষের ওপর। সরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছিল ও, 'আরে বাপু, ওই হল কথা। রাঁধা ভাত খাবেক তায় দোষ কি। খাচ্ছ ভালই হচ্ছে, তা নালে কষ্ট পেত কে, তুমি না আমি? ভাত···বলে মা-লক্ষ্মী···' কয়েকটা করে কথা ও বলছে আর তারপর ফাঁক পড়ছে, ঝিমিয়ে পড়ছিল সত্য। তারপর সরসতিয়ার ডাকে তড়াক করে জেগে উঠল ও। প্রথমটা ওর মনে হল মেয়েটার গলায় ভাত আটকে গেছে। জলের জন্যে ছোটাছুটি করলে ও, কিন্তু কলসীতে

জল ছিল না। উপায় না দেখে কলসাটা এনে লছমীকান্তকে দেবার জন্যে ছুটে গেল ও, 'বাবা, জল দি' এস···পানি, পানি···কি আশ্চর্য, এক ফোঁটা পানি নাই গা ঘরে!'

কান্থুও উঠে পড়েছিল, সরসতিয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল ও। সরসতিয়া ছটফট করে উঠল, 'দিদি, হাম বাহার···উধর জায়গা···' বলে ও হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে মাটিতে হাত রেখে উঠবার চেষ্টা করলে।

মুহূর্তে সব কিছু ভুলে গেল কান্থু। উদ্বিগ্নস্বরে বলে উঠল, কেঁও বাহার 'কেঁও যায়গা? হাতটো ধুয়ে দি···'

সরসতিয়া দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কোনো রকম করে ও বললে, 'পিসাব করনেকো···' উঠোনে নেমে পড়েছিল ও কিন্তু দু'পা গিয়েই বেসামাল হয়ে পড়ল। উঠোনের ওপরই কাপড়-চোপড় নোংরা করে ফেললে।

কলসাটা লছমীকান্তকে দিয়ে এসে সত্য-মাসি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ও নাকে কাপড় দিয়ে বলে উঠল, 'উঃ, কি ময়লার গন্ধ? কিছু বাকি রাখল নাই গা···'

কান্থু কিন্তু ভুল বুঝল না। যাই হোক না কেন, পোয়াতির এই ব্যথাটা নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না সেটা বুঝতে পারলে ও। কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'ও মাসি, এস গো, ধর, ধর পাটো···' বলে ও সরসতিয়ার বগলের মধ্যে হাত দিয়ে ধরলে। হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা ওকে তুলে এনে ফেলল বারান্দার মধ্যে।

সরসতিয়ার প্রাণটাকে সাঁড়াশি দিয়ে কাঁক্ করে চেপে ধরেছিল কেন! এবারের এইটাই একেবারে মোক্ষম, যে কোনো অভিজ্ঞ স্ত্রীলোক এটা দেখলেই বুঝতে পারত। হয় এস্পার নয় ওস্পার একটা কিছু হবেই এ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না। একটা জীবন আর একটা জীবনের সঙ্গে লড়াই করছে, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। এ সংগ্রাম নির্মম, অংকুর যখন বেরিয়ে আসবে তখন বীজ অক্ষত থাকবে কি না কে জানে।

সরসতিয়াকে এনে বারান্দায় ফেলবামাত্র হঠাৎ কলসী খানেক জল ভেঙে গলে পড়ল। ওর কাপড়-চোপড় আর পা দুটো লেপ্‌টে জটাপটি হয়ে পড়ল। তারপর গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কান্থু দেরি করল না, তাড়াতাড়ি ওর শাড়ির বাঁধনটা আলগা করে টেনে নিলে কোমর থেকে। সেই অবস্থাতেও সরসতিয়া শাড়িটা পা দিয়ে জড়িয়ে হাত দিয়ে ঠেলা মারলে কান্থুকে। কিন্তু কান্থু গর্জন

করে উঠল, 'খবরদার…'। ওর চোখ দুটো জ্বলছিল আগুনের মতো। 'সাবধান, মাসি, ধর, সাবধান…'

সরসতিয়ার দিকে তাকানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ওর ছড়ানো দুটো হাত, আর মুড়ে দেওয়া পা দুটো কাঁপছিল পতপত করে। চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। কেবল অসহ্য চাপ তলপেটের কাছে জমা হয়ে ওখানটাকে অসাধারণ, দুর্নিরীক্ষ্য করে দিয়েছে। এ অবস্থাটাও বদলে গেল মুহূর্তে, সরসতিয়ার হাত-পা নিস্পন্দ হয়ে আসতে লাগল।

গাঁক করে উঠল কান্থ। 'মাসি, হঁই…জল, পুয়াতির চোখে জল দে গা…'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। জীবনের সঙ্গে জীবনের নয়, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর দ্বন্দ্ব একটা চরম, অনিশ্চিত অবস্থায় পৌঁছেছিল। তারপর শিশু কেঁদে উঠল।

অধ্যায় ২৭

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছিল। হারিকেনের আলোটা ফ্যাকাশে দেখাতে লাগল। সত্য-মাসি উঠোনের ওপর ইঁট সাজিয়ে ঘুটে জ্বেলে জল গরম চড়িয়েছিল কোনো রকমে। সারারাত্রি ঘুমটাকে অস্বীকার করে সরিয়ে রেখেছিল ও এখন সেটা শোধ তুলতে আরম্ভ করল। জল গরম করতে হবে সেটা মনে ছিল ওর, জল-গরমের প্রক্রিয়াটা সম্বন্ধে মোটামুটি সচেতন ছিল ও, কিন্তু ওর হাত-পা কোথায় পড়তে লাগল তার ওপর ওর আর ক্ষমতা ছিল না। জ্বাল দিতে গিয়ে যে ও হাতে ছ্যাঁকা লগিয়ে বসল না, কেবল সেইটে সম্ভব হ'ল। শেষকালে কড়াইটা দু'হাতে তুলে এনে কান্থর কাছে নামালে, চোখের পাতা ওপর দিকে টেনে তুলে বললে, 'এই লাও তুমার জল গরম। বাবা গো বাবা, সারা রাতটো কাবার হয়ে গেল!'

কান্থ এক গাদা কাজ শেষ করেছিল ইতিমধ্যে। পোয়াতিকে পরিষ্কার শাড়ি পরিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল ও। তার ময়লা কাপড়-চোপড় উঠোনের এক কোণে জমা করে রেখে বারান্দাটা নিকিয়ে ফেলেছিল। এখন গরম জল আর বাচ্চাটাকে নিয়ে পড়ল। সময় মতো গরম জল পেলে সবার আগেই বাচ্চাটাকে ধোয়াতে হ'ত। কান্থর চেতনাও আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবুও বুঝতে পারল, এত অপরিচ্ছন্ন ছেলেতে এর আগে সে হাত দেয় নি। সাদাটে, ছেঁড়-ছেঁড়া একটা

পুরু আবরণ ওটার সমস্ত গায়ে। আর হাত-পায়ের গাঁটে যেন আরও থাসা হয়ে রয়েছে। কয়েক বারই জলে ডোবালে ও। ছেলেটা অসহ্য চিৎকার করতে লাগল। শেষের দিকে মনে হল আটকে যাবে, কিন্তু কাহু ওকে ছাড়ল না। ওটার চেঁচানিগুলো ছুরির ডগার মতো ওর মাথার মধ্যে খোঁচা মারতে লাগল, কিন্তু এইটেই যেন জাগিয়ে রাখলে ওকে। রোখের সঙ্গে বাচ্চাটাকে পাখলাতে লাগল কাহু।

হারিকেনের তেলটা ফুরিয়ে এসেছিল। পলতে পোড়ার গন্ধ এসে লাগল নাকে। হাত বাড়িয়ে দমটা নামিয়ে দিলে কাহু। আলোর আর দরকারও ছিল না, বরঞ্চ ওটা নিবিয়ে দিতেই চারদিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

বাচ্চাটাকে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছবার সময় ওটার কান্না একটু থামল। মনে হল ও আরাম পাচ্ছে। আবছা অন্ধকারে ছেলেটাকে অন্য রকম দেখাতে লাগল। দুহাতে কিছুক্ষণের জন্য ওটাকে ধরে রাখল কাহু। কেমন যেন লাগল ওর। অমন চির-রুগনী মায়ের ছেলেটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

'লাও গো, তুমার ছেল্যা লাও…' সরসতিয়ার আঁচলটা টেনে পেতে তারই ওপর কাহু শুইয়ে দিলে বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটা শান্ত হয়ে এসেছিল, ওটা এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। আর এক খণ্ড কাপড় ভাঁজ করে বাচ্চাটার ওপর ঢাকা দিলে। অজান্তেই ওর কণ্ঠস্বরে একটু আদরের ভাব ফুটে উঠল, 'লাও, তুমার সাত রাজার ধন মানিক লাও…' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ও।

সত্য-মাসি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নি। বাইরে বেরিয়ে এসে কলতলায় হাত-পা ধুতে লাগল ও। বিরক্তিতে ও খেপে উঠেছিল। কুলকুচো করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ফেললে, থু থু করে। ওর খনখনে স্বরটা কি রকম বসা-বসা মনে হতে লাগল, 'তুর ছঁ্যা বিয়াবার লিকুচি করেছে, সমস্ত রাতটো পার করে দিলেক গা! মুয়ে ঝাঁটা! যেমন মাগি তুই! ইয়ার পর তুই আর গা পাড়তে পারবি? আবার বাবুদের ঘরে কাজে 'জইন' দিতে হবেক!…গিন্নীমা লয় ত, খাঁড়া হাতে করে আছে। একটু দেরি হবেক? পয়সা দেয়, মাথা কিনে লিয়েছে…' ক্লান্ত পা দুটো টানতে লাগল ও।

একরকম টলছিল কাহু। আঁট-সাট করে পরা শাড়িটা ঢিলে করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল ও। কোমরে বেড় দেওয়া আঁচলটা খুলে নিয়ে কপাল, মুখ মুছতে লাগল। ওর যে এত ঘাম দিয়েছিল, এতক্ষণে সেটা বুঝতে পারলে।

সমস্ত শরীরটা শুকনো, কিন্তু ঘামে চটচটে হয়ে রয়েছে। বারান্দা থেকে নামতেই খুব মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস ওর গায়ে এসে লাগল। আঃ, সমস্ত শরীরটা জুড়িয়ে গেল যেন। ওর কপালে, তারপর সমস্ত দেহে খুব হিমের মতো বয়ে গেল। খুব এলিয়ে পড়তে চাচ্ছে, টেনে রাখতে পারছে না চোখ দুটো।

শিথিল শাড়িটা দিয়ে প্রায় অনাবৃত দেহটা ঢাকতে ঢাকতে নিজেদের দরজার কাছে এসে পৌঁছাল কানু, বন্ধ কপাটের ওপর কপালটা একবার রাখলে। শেকলটা নাড়তে যাচ্ছে, এমন সময় চমকে কেঁপে উঠল ও। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ঠিক পাশেই একটা কুঁকড়ো সজোরে ডেকে উঠেছে।

শেকল থেকে হাতটা নেমে এল ওর। ও বুঝতে পারল না হঠাৎ কেন এমন ভয় পেল। বুকের কাঁপুনিটা কমে আসছে কিন্তু সমস্ত শরীরটা একটা জ্বালায় ভরে উঠতে লাগল। আস্তে আস্তে সচেতন হয়ে উঠল ও। রাস্তার ওপর চারদিক ফাঁকা হয়ে আসছে, একটু পরেই লোক চলতে আরম্ভ করবে। না কি, একটা লোক ওদিক থেকে আসছে। কিন্তু এরই মধ্যে সকাল হয়ে গেল! আর এতক্ষণ কি করছিল সে?

বারান্দার ওপর এতক্ষণ পরে চোখ পড়ল ওর। অপি হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। লুঙ্গিটা হাঁটুর ওপর অনেকখানি ওঠানো। পাতলা কোমরের কাছে লুঙ্গির বাঁধনটা খুলে এসেছে। ওর ঘাড়টা বাঁ-দিকে কাৎ হয়ে রয়েছে, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে পড়েছে একটুখানি। স্বামীর ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেঁদে উঠল যেন ওর। অপির কি অবস্থা হয়েছে! চিমসানো, বিবর্ণ মুখ, অপরিষ্কার দাঁতের খানিকটা অংশ দেখা যায়। মানুষটা আধ-পেটা খেয়ে, না খেয়ে কাটাচ্ছে।...চোখ ফিরিয়ে নিলে কানু। কিন্তু সে কি করবে। পাশের খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাতেও সাহস পেল না ও, মেনকা বাচ্চাটা নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। সেখানেও যদি এমনি দেখে ও?

কিন্তু কি হবে দেখে। শুকনো, শুকনো... সব শুকনো, ঝুটা সব। গেল-রাত্রির ঘটনাগুলো ওর কাছে ছায়াবাজির মতো মনে হয়। এই সব ভুলে গিয়েছিল সে—ছেলে-মেয়ে আর স্বামীকে ছেড়ে আনন্দ করতে গিয়েছিল! হ্যাঁ, আনন্দ বৈকি—সমস্ত রাতটা কর্তাত্বি করে বেড়িয়েছে সে।...আস্তে আস্তে সরে এসে খাটিয়াটার পাশে নিচে বসতে গিয়ে ওপরেই অপির পায়ের কাছে বসে

পড়ল। দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখল ও, একটা চিনচিনে জ্বালা ওর সমস্ত শরীরে যেন আগুনের মতো ছ্যাঁকা দিতে লাগল।

খাটিয়াটা নড়তেই ঘুম ভেঙে গেল অপির। চোখের পাতা দুটো পতপত করতে করতে খুলে গেল ওর। চোখ দুটো রক্তবর্ণ, বোঝা গেল অনেক রাত্রে শুয়েছে, তখনও পুরো বিশ্রাম হয় নি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তড়াক করে পা দুটো সরিয়ে নিলে অপি। দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আঃ, ঘুমটো ভাঙি দিলি ··ভোরবেলা উঠে এইছিস কেনে। রাঁড়ের মত সোহাগ জানাতে এইছিস ?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কানু স্বামীর দিকে। ওর ক্লান্ত, মমতা-মাখানো চোখে মুহূর্তের জন্য একটা আহত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। তারপর এটা স্বীকার করে নিলে।

। অষ্টম পর্ব সম্পূর্ণ।

পর্ব ৯

অধ্যায় ১

আরানসোল হাডন রোডের 'শান্তি ভিলা'-র চেহারা এখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। সমস্ত বাড়িটা এতদিন খালি পড়ে ছিল, কেবল তিন তলার একটা ঘরে মেয়েকে নিয়ে থাকতেন মনোতোষ মুখার্জী, আর নিচের কুঠরীতে পুরণো চাকর বিষ্টুচরণ। জুন মাস আরম্ভ হবার দুদিন আগে সহসা এই বাড়ি গমগম করে উঠল। শুধু কৈলাসনাথ চ্যাটার্জী স্বয়ং ফিরে এলেন তাই নয়, এমনি যোগা-যোগ হল যে তাঁর পুত্রবধূরা এবং কন্যারা তাদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে এ বাড়িতে উপস্থিত হল। দিনে-রাত্রে এ বাড়িতে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। ফ্রক-পরা ছোট মেয়ে, আর শাড়ি-পরা বেণী-দোলানো কলেজী মেয়েরা বারান্দায় আর ওপরে-নিচে ক্রমাগত ছোটাছুটি করেও ক্লান্ত হল না, এদের শীৎকার, চিৎকার এবং কলধ্বনি এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত এ পাড়ার আবহাওয়ায় মাধুর্য বর্ষণ করতে লাগল। কালো-চশমা পরা স্কুলের এবং কলেজের ছেলেরা প্রকাশ্যে কাঁধে ফ্লাস্ক আর ক্যামেরা ঝুলিয়ে, এবং গোপনে সিগারেটের প্যাকেট প্যাণ্টের পকেটে পুরে যখন তখন হয় মোটর সিক্‌লে, নয়তো গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। বুড়ো, স্বভাব-কৌতুকী বিষ্টুচরণের মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। খুব বাচ্চাদের তদারক করার ভার ছিল তার উপর। কিন্তু সব গুলিকে সে চিনে রাখতেই পারত না, তদারকি তো দূরের কথা। মনিব বাড়ির ছেলে মনে করে সে অন্য বাড়ির ছেলেকে রাস্তা থেকে ধরে এনে আটকে রাখতে লাগল, এবং উল্টো দিকে ট্রাই-সিক্‌ল-চড়া এ বাড়ির ছেলেকে রাস্তায় দূরের দিকে চলে যেতে দেখেও চলে এল সে, অন্য বাড়ির ছেলে মনে করে।

এরই কয়েকদিন পরে, ৩রা জুন জুনাপুরের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হ'ল। এবং যথার্থ সভ্য-পরিবারে এই জাতীয় ঘটনার যে রকম প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক এক্ষেত্রেও তাই হল। সভ্যতা হচ্ছে সেই জিনিস যা সব কিছুর জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকে। সুতরাং আগ্রহের কিছুমাত্র কমতি না দেখিয়েও, সংবাদপত্রের রিপোর্টের মতো এটাকে ওরা গ্রহণ করলে, আর ওদের জীবন পূর্ববৎ চলতে লাগল। স্বাভাবিক একটা এ্যাকসিডেন্ট বা মৃত্যু-সংবাদের মতো মনে হল এটাকে। অবশ্য, এ বাড়ির মালিক কৈলাসনাথের কাছে এটা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করল,

কেন না মনোতোষ ও তিনি বাল্যবন্ধু এবং মনোতোষ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত; কিন্তু তথাপি এটা এমন কিছু নয়, যাতে ওদের ভাবনা-সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে পারে। এক বন্ধু আর এক বন্ধুর জীবিকা-ক্ষেত্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে যেমনি অনাসক্ত-আগ্রহের ভাব দেখায়, কৈলাসনাথও তাই করলেন।

কিন্তু এর কিছুদিন পরে, যে সময়টায় উৎক্ষিপ্ত মনোতোষ মুখার্জী তাঁতের মাকুর মতো কলকাতা জুনাপুর করে চলেছেন অত্যন্ত দ্রুতবেগে, এবং কখনও সাফল্যের আশায় উৎফুল্ল, কখনও বিফলতার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন—সেই সময়, ১৭ই জুনের সন্ধ্যায় এই বাড়িতেই জুনাপুর থেকে জনৈক ব্যক্তি স্যার ধীরানন্দ মুখার্জীর একটা ব্যক্তিগত চিঠি মনোতোষের কাছে নিয়ে এল, আর সেই রাত্রের শেষেই তিনি গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলছিলেন মনোতোষ। কৈলাসনাথ স্থানীয় ডাক্তারদের ওপর ভরসা না করে কলকতায় তাঁদের আর এক বাল্যবন্ধু এবং এখনকার বড় চিকিৎসক ডাঃ সুবিনয় রায় (ননী) কে ডাক দিলেন ট্রাংক টেলিফোনযোগে। সেই দিন বেলা দুটোর সময় সুবিনয় পৌঁছে গেলেন আরানসোলে, এবং তার পরের দিন বিকেল থেকে মনোতোষ খানিকটে সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগলেন।

মনোতোষের অসুখ নিয়ে কৈলাসনাথ যে উদ্বেগ এবং বিহ্বলতা দেখালেন, তা এই পরিবারের কাছে এবং কৈলাসনাথের নিজের কাছেও কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকল। ডাঃ সুবিনয় আসাতে খুবই খুশি হলেন কৈলাসনাথ এবং মনোতোষের একটুখানি সুস্থ হয়ে ওঠা ছাড়াও এইটে—এই তিন বন্ধুর বহু দিন পরে একত্র হওয়াটা তাঁর কাছে একটা অপূর্ব সুখের আমেজ সৃষ্টি করলে। পরিবারের অন্যান্য লোকের কাছে এর অকৃত ব্যাখ্যা দাঁড়াল এই রকম যে, কৈলাসনাথের বয়েস হলেও এতদিন বৃদ্ধ হন নি, এখন বৃদ্ধ হতে আরম্ভ করেছেন। নিজের অজান্তে কৈলাসনাথেরও মনে এটা কাজ করছিল কিন্তু রোগীর চাটনি মুখে দেওয়ার মতো অজান্তেই এটা ছাড়তে পারছিলেন না। সুবিনয়কে তিনি কয়েকদিন থেকে যেতে বললেন এবং সুবিনয়ও সে অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

সবই ঠিক চলছিল, কিন্তু ২০শে জুন সকাল বেলাকার চায়ের মজলিসে এঁরা হঠাৎ একটা জটিল অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে এসে পড়লেন। এটার জন্য এঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না, আর যখন এটা এসে পড়ল, তখন মুহূর্তের জন্য সকলেই বিমূঢ় হয়ে উঠলেন। কিন্তু কারুরই করবার কিছু ছিল না।

একটা জরুরী কনট্রাক্টের জন্য কৈলাসনাথের বাইরে যাবার প্রয়োজন ছিল।

কোট প্যান্ট এঁটে তৈরী হয়েই চায়ের টেবিলে বসেছিলেন উনি। চা খাওয়া শেষ হলেই বেরিয়ে যাবেন। এখন জানালার কাছে দাঁড়িয়েছেন, বাঁ পাটা গরাদের পাশে তুলে দিয়ে, সামনের বাগানটার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে একটা থম্‌থমে ক্রুদ্ধ ভাব—দেখলেই বোঝা যায় কথাবার্তা বন্ধ করে নিজেকে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। তাঁর জরুরী কনট্রাক্টের কথা ভুলে গেছেন। তাঁর চওড়া বুকখানা শক্ত হয়ে উঠেছে, কোটের একটা প্রান্ত পাকানো মুঠিতে টেনে ধরেছেন—মনে হয় সেই স্কুলের দিনগুলোর মত এখনই ননীটাকে আর ঐ এক রত্তি মেয়ে শংকরীকে দু'হাতে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবেন। তাঁর কথায় ওরাও বাধা দিতে সাহস করেছে!

শংকরীও বসে নি। মেঝের মাঝখানে চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল। চোখের দৃষ্টি চেয়ারের খোলের দিকে, কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। একটা তিক্ততা ও বেদনা ওর চোখে মুখে কঠিন হয়ে রয়েছে। কালো, পাতলা মুখের ওপর ফ্যাকাশে ভাব লেপটে রয়েছে।

কেবল ডাঃ সুবিনয় এঁদের মধ্যে কতকটা আত্মস্থ রয়েছেন। চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমুক দিচ্ছেন আস্তে আস্তে। তাঁর আধা-উদাসীন আধা-সকৌতুক দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছেন মাঝে মাঝে এটা ওটার ওপর। এমন যে একটা আবহাওয়া হঠাৎ এসে পড়েছে, এটার ঘাড়ে একটা থাপ্পড় মেরে মনে মনে যেন বলছেন, 'কি হে, কি ব্যাপার···তুমি তাহলে এই···তা ভালই তো, দেখাই যাক না কতদূরে নিয়ে যেতে পারো তুমি আমাদের···'

অথচ আধ ঘণ্টা আগে যখন এঁরা ঢুকলেন, পরিবেশটা এর থেকে কত পৃথক ছিল। কৈলাসনাথ ও শংকরী আগেই এসে বসেছিলেন। স্মার্ট কাজের মানুষ কৈলাসনাথ, ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন আর তাড়াতাড়ি টোস্ট মুখে পুরছেন। শংকরী বললে, 'আপনি একটু আস্তে খান, অত তাড়াতাড়ি করবেন না, আমি চা ঢেলে দিচ্ছি···আমি বলছি, আপনার দেরী হবে না···' সেই একই লঘু পর্দায় সুর টেনে যেন বললে, 'এই দেখুন না আমাকে। আমাকেও এক্ষুণি বেরিয়ে গিয়ে আসানসোল জেলে দেখা করতে হবে সমীর বাবুর সঙ্গে···এ্যাকশন কমিটির সেক্রেটারী···কই, আমি তো তাড়াতাড়ি করছি না।'

নতুন একটা টোস্টে কামড় দিলেন কৈলাসনাথ, গালের ওপর ভাঁজ আর চোখে খুশি ফুটে উঠল তাঁর, ঈষৎ গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, না, তুমি কেন··· থাক, বৌমা আসছেন···' তারপর বিব্রত হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখ দিকি,

রুণি (কৈলাসনাথের পৌত্রী) ভোরবেলা উঠেই আবার মনোতোষের ঘরে গিয়ে বসেছে···এই দাদুকে একটু চা দেবার সময়ও নেই তার। কিন্তু মনু একটু ভাল আছে মনে হয়। আমার সঙ্গে কথা বলল··'

'হ্যাঁ, ভাল আছেন···আপনারা কিন্তু ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন···' শংকরী মৃদু হেসে বললে।

ঠিক সেই সময় ডাঃ সুবিনয় এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। সকাল বেলা-কার জোরালো হাওয়া এসে তাঁকে পিঠের ওপর জড়িয়ে ধরলে। তাঁর ফাঁপা চুলগুলো লম্বা, শুক্‌নো মুখের ওপর এসে পড়ল। ডাঃ সুবিনয় যেন আদর করে চুলের গোছা দু'একটা সরালেন মুখের ওপর থেকে : 'না, কৈলাসদা, থেকে গিয়ে ভালই করেছি। আমার পক্ষে এই থেকে যাওয়াটা হ্যাজ টার্ন্‌ড্‌ ইটসেল্‌ফ ইনটু এ থেরাপি!'

'ওয়েল, হোয়াট নেক্‌স্ট?' কৈলাসনাথের ঝকঝকে চোখ দুটোতে কৃত্রিম অবিশ্বাস ফুটে উঠল।

'দেখ, আজ ভোর বেলা···তখনও রাত আছে, আমার ঘুম ভেঙে গেল···খুব ছেলেবেলায় শেষ রাত্রে এমনি করে ঘুম ভেঙে গেলে খুব খুশি-খুশি লাগত, মায়ের পাশে বিছানায় পড়ে হুটোপুটি করতুম। মনে হ'ত তক্ষুণি বেরিয়ে যাই···আজ তাই মনে হচ্ছিল···'

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল শংকরী, 'ওঃ, তাই বুঝি আপনি দেরি করে এলেন?' বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলে কৈলাসনাথের দিকে। কৈলাসনাথ ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার, মনে হল একটু দ্রুত হয়ে উঠলেন, তারপর বললেন, 'আর, আমার কি মনে হয় জানিস? বেলা তিনটে না বাজতে বাজতে ছটফট করতুম···আমার এদিকে কোন বাধা নেই, কেবল তোরা তো সাড়ে চারটের আগে বেরোবি না···কতদিন তোদের বাড়ির দিকে বেরিয়ে গিয়ে মাঝপথ থেকে আবার ফিরে এসেছি। কিন্তু ওসব যাক এখন···আমি একটু আসছি, পজিটিভ্‌লি সাড়ে ন'টার মধ্যে ফিরব, তারপর সারাদিন আছে···'

বললেন বটে, কিন্তু উঠলেন না, বোধ হয় শেষ মিনিটটা পর্যন্ত ভোগে লাগাতে চান। বললেন, 'দেখ ননী, আমার কি মনে হয় জানিস··মনে হয় কেন, আমি ঠিক করেছি আমরা সবাই রিটায়ার করব—লেট থ্রি অফ আস রিটায়ার টুগেদার, যদি আগেকার মত থাকতে পারি শেষ কটা দিন···'

ডাঃ সুবিনয় এসে বসেছিলেন, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বললেন, 'তাই নাকি, বুড়ো বয়সে আবার ফন্দি আঁটা হচ্ছে?'

'তোর তো বছর দেড়েক বাকি পেনসনের···আর আমার কি, আমি তো যে কোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারি। আমি কারো অধীন নই, ওদেরকে আমি মানুষ করে দিয়েছি···' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন কৈলাসনাথ, 'ওদের' বলে নিজের ছেলেমেয়েদের কথাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। 'কিন্তু মনোতোষের আর রাজনীতি করা চলবে না। হী হ্যাজ্ ডান এনাফ অব দ্যাট্···। আমি কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম মনুকে বলব। পলিটিক্স এখন ওর ঘাড়ে চেপে বসেছে ভূত হয়ে, ওকে আমি ছিনিয়ে আনব···' কৈলাসনাথ ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকালেন। বলতে বলতে তাঁর চোখ-মুখের ভাব স্থির হয়ে উঠল। হয়তো এটা নিয়ে তিনি সংকল্প করে ফেলেছেন।

মনে হ'ল মুহূর্তের জন্য ডাঃ সুবিনয় চমৎকৃত হলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই ওটা করবে না, কারণ তাহলে মনু উইল বি স্পয়েল্ট্। তার কাজ তাকে করতে দাও···কারণ আমাদের মতো সে তো টাকা রোজগার করার জন্যে কাজ করে না···'

শংকরীও মুখ তুলে তাকিয়েছিল, কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'ঠিক কথাই তো···বাবাকে কাজ থেকে সরিয়ে আনা যায় না।'

একটা চট্‌কা লেগে কৈলাসনাথের তন্দ্রা ভেঙে গেল যেন। ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে অতি পরিষ্কার। মনোতোষকে কাজ থেকে সরিয়ে আনলে তুমি মনে করছ ওর বিশ্রাম হবে, সুস্থ হয়ে উঠবে···মোটেই তা নয়।'

কৈলাসনাথের আহত চোখের ওপর থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নিলেন সুবিনয়। বললেন, 'তোমরা মনে করছ ওর অসুখটা দেহের, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কি জানো···ওর কাজের জায়গা থেকেই ও কোন ভীষণ শক পেয়েছে, যার ফলে ওর এই রকম একটা ওলোট-পালোট হয়েছে··· তোমরাই তো বলতে পারো, ওর মুভ্‌মেণ্টের শেষ খবরটা কি। সেখান থেকে কিছু কি হয়েছে?' বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার কৈলাসনাথের, আর একবার শংকরীর মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমি তো জানি মনুর কন্‌সেণ্ট্রেশন কত বেশি···আমার মনে হয়, সামথিং হ্যাজ্ শেক্‌ন্ দ্যাট বেসিস···' উনি যখন কথা বলছিলেন তখন শংকরীর চোখ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল, মনে হল ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত

হয়ে উঠেছে। এই ক'দিন যে সমস্যাটা তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, এই সকালে ভুলে গিয়েছিল সেটা। এখন সেটা প্রকাণ্ড ঢেউ হয়ে এসে যেন তাকে ধাক্কা মারলে। নিজেকে সংযত করতে করতে বললে, 'ডাক্তার-কাকু, আপনি ঠিক বলেছেন। পরশু দিনের আগের রাত্রে স্যার ধীরানন্দের কাছ থেকে ওনার নামে একটা পার্সন্যাল চিঠি এসেছে। সেই চিঠি পাবার পর থেকে এই হয়েছে। এটা শুধু বাবার ব্যাপার নয়...' ওর গলা ধরে আসছিল, 'আমি অবাক হচ্ছি, আমি এখনো কেন কোলাপ্স্ করি নি...' বলতে বলতে নিজেকে চাপতে চাপতে ফুঁপিয়ে উঠল শংকরী। এক মুহূর্তে এতদিনে তার ভেতরকার নারী নিজেকে প্রকাশ করে ফেললে। সেই মুহূর্তে তার মনে না পড়ে পারল না. এই ক'দিন আগেও সুমিত্রা ব্যানার্জীর সঙ্গে কত আশা আর আগ্রহ নিয়ে স্যার মুখার্জীর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। যাঁকে ওরা একান্ত আত্মীয় বলে মনে করেছিল, তিনিই ওদের প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছেন!

এঁরা দুজনেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন—ডাঃ সুবিনয় শুকনো মুখে তাকালেন ওর দিকে। কৈলাসনাথের নিজের চিন্তা থেকে ঘাড় ধরে টেনে আর এক দিকে চোখ ফিরিয়ে দিল যেন কেউ। বললেন, 'কেন... তাই নাকি... হ্যাঁ, সে দিন সন্ধ্যাবেলায় একজন জুনাপুর থেকে এসেছিল বটে। কি ছিল চিঠিতে? স্ট্রেঞ্জ্... আই ডিড্ নট কানেক্ট্ দ্যাট উইথ দিস্ ইল্‌নেস... বাট হাউ কুড আই?... চিঠিতে কি ছিল? তুমি বস না... দাঁড়িয়ে কেন...'

'দিস ইজ সিম্পলি এ্যান আউট্রেজ্, চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বাবার ওপর। এটাকে অমানুষিক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না আমি...'

'চিঠিতে কি ছিল, বললে তুমি?' অস্থির, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কৈলাসনাথ তাকালেন শংকরীর দিকে।

'ডাক্তার-কাকু, আপনারা এই মুভমেণ্টের কতদূর জানেন আমি জানি না। স্যার মুখার্জী বাবাকে লিখেছেন, এ্যাকশন কমিটি গুটিয়ে দিতে হবে, এর আর প্রয়োজন নেই। মানে, তাঁর আর প্রয়োজন নেই!'

'সে কি! তারপর...'

'বলছেন, এখন জুনাপুর ওআর্কার্স ইউনিয়নকেই পুনর্গঠিত করতে হবে। জেমস্ মাধবন যেমন প্রেসিডেণ্ট আছেন তেমনি থাকবেন। বাবা ইউ-নিয়নের সেক্রেটারী হতে পারেন। অবশ্য তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, সব ক্ষমতাই বাবার হাতে থাকবে, ইউনিয়ন তাঁর হাতেই থাকবে, কেবল জেম্সের মুখ-রক্ষার

জন্য তাঁর নমিন্যাল লিডারশিপ থাকবে।…ডাক্তারকাকু, কিছু অপমান হয়তো জীবনে পেয়েছি, কিন্তু এর মতো লজ্জা আর কখনো পাই নি। এখন আমার কথা বলতে, মুখ দেখাতেও ইচ্ছা করে না! এও সম্ভব!…' ও আর একবার নিজেকে হারিয়ে ফেলবার উপক্রম করলে।

অধ্যায় ২

নিস্তব্ধ, ভারী ভাবটা কাটিয়ে প্রথম কথা বললেন কৈলাসনাথ।

'দিস ইজ চীটিং ডাউনরাইট এ্যাণ্ড নাথিং এল্‌স্‌। পলিটিক্‌স্‌ এত ন্যাস্টি হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। মনোতোষ অনেক দিন থেকেই রাজনীতি করছে, তার সঙ্গে আমি রাজনীতি করি নি কিন্তু মোটামুটি তার খবর রেখেছি। এখন তো সে আমার চোখের ওপরেই রয়েছে, জুনাপুর মুভমেণ্টের নাড়ি-নক্ষত্র জানি আমি। স্যার মুখার্জীর সব কথা মনু আমায় বলেছে…নো, দিস্‌ কুড্‌ নট ইভন্‌ বী এ্যাপ্রীহেণ্ডেড্‌!'

'আমি তো তোমাদের মতো খুঁটিনাটি খবর সব জানতাম না। কিন্তু যতখানি মনে হচ্ছে স্যার মুখার্জীর এই প্রস্তাবটা একটা পরিহাস না হয়ে যায় না।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিলেন ডাঃ স্থবিনয়, আস্তে আস্তে তাঁর চোখ দুটো তীক্ষ্ণ কৌতুকে ভরে উঠছিল। 'কিন্তু ঠাট্টাটা একটু কড়া করে ফেলেছেন স্যার মুখার্জী। এখন দেখা যাক, মনু কি রকম পাল্টা ডোজ দিতে পারে!'

হঠাৎ এঁরা দুজনেই চমকে উঠলেন। কৈলাসনাথ দাঁড়িয়ে উঠে প্রকাণ্ড জোরে টেবিলের ওপর ঘুসি মেরেছেন, 'নো, ছাট মাস্ট নট বী। মনুকে আমি আর অপমানিত হ'তে দেব না। আমি চাই, ওকে কোন হেল্‌থ-রিসর্টে পাঠিয়ে দেব। এই ঘটনা আমি জানতাম না, কিন্তু আমি আগে থেকেই যেটা মনে করেছি সেটা আরও ভাল করে বুঝতে পারছি, যেখানে মনুর মতো লোককে চেনে না, সেখানে ওনার থাকাই ভাল।' বলে উনি চেয়ার ছেড়ে সরে জানালার কাছে দাঁড়ালেন। ওঁর ভারি চওড়া মুখখানায় রক্ত থেবে উঠেছিল। মনে হল সরে এসে এঁদের থেকে নিজের বিচলিত ভাবটা গোপন করতে চান।

চায়ের কেতলিটা টেনে নিলেন ডাঃ স্থবিনয়, উনি আর একবার চা ঢালতে আরম্ভ করলেন। মনে হল এরপর উনি আর কথা বাড়াবেন না। কিন্তু ওঁর

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু মনুকে তুমি রাজনীতি থেকে টেনে আনো তাহলে তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে না। এই অসুখের মূলটা কি তুমি ভুলে যাচ্ছ···কিন্তু সেটাই ভুলে গেলে চলবে না। আমি বলব, রাজনীতিতে থাকাই এখন ওর সব চেয়ে বেশি দরকার।

কৈলাসনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। নাটকীয় ভঙ্গীতে একটুখানি নত হয়ে বললেন, 'উইথ এভ্‌রি রেস্‌পেক্‌ট ফর ইয়োর মেডিক্যাল সায়েন্স, আই ডোণ্ট এগ্‌রি উইথ্‌ ইউ···'

'ওয়েল, ছাট্‌স অল্‌ রাইট···' বলে সুবিনয় চায়ের কাপটা তুলে ধরলেন মুখের কাছে।

ওঁর এই নীরব বিদ্রোহ কৈলাসনাথকে খেপিয়ে দিলে। কথা বলতে গিয়ে তো-তো করতে লাগলেন তিনি। তিনি বুঝলেন, তাঁর এই অতিরিক্ত জিদ কোথায় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। উল্টো দিকে তাঁর সামনে একটা চিত্র ভেসে উঠছিল, তাঁদের তিন বন্ধুর শৈশবের, এবং সেটাকে আর একবার গড়ে তুলতে চাইছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে। সেখানে তাঁদের তিন জন ছাড়া আর কিছু থাকবে না। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই আর একটা ধাক্কা এল শংকরীর কাছ থেকে। শংকরী এতক্ষণে সামলে উঠতে পেরেছিল। ওঁর রাগের অর্থটা বুঝতে পারে নি ও। আগেকার কথার সূত্র ধরে বললে, 'কিন্তু জ্যাঠামশাই, আপনি তো নিজেই বললেন ওরা বাবাকে অপমান করেছে। সেখানে আরও বেশি করেই থাকা উচিত নয় কি?'

'কেন, আরও অপমান পাবার জন্যে?'

'না, অপমান কাটিয়ে তার ওপর বড়ো হয়ে উঠবার জন্যে। আপনি বুঝতে পারছেন না, স্যার মুখার্জী ছাড়াও শ্রমিকরা আছে জুনাপুরে।'

কৈলাসনাথ হঠাৎ খুব নরম গলায় বলে বসলেন, 'শংকরী, তুমি আমায় শেখাতে চাও?'

এর অর্থটা শংকরীর কাছে সেই মুহূর্তে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে নিজের ওপর হাত ছিল না শংকরীরও। অন্য সময় হলে এরপর চুপ করে যেত ও, কিন্তু একথার উত্তরে বললে, 'না-না, এ কি কথা বলছেন আপনি, আমাকে অপরাধী করছেন। আপনার স্নেহ আমি বুঝতে পারি, আপনার মনও দেখতে পারি আমি···কিন্তু বাবাকে যদি মুভ্‌মেণ্ট থেকে ফেরাতে চান আপনি, সেটা

বাবার পরাজয় বলেই আমি মনে করব, আর যেমন করে পারি এটা বাধা দিতে চেষ্টা করব আমি···'

'কেমন করে? সত্যাগ্রহ করবে আমার বিরুদ্ধে?'

'হ্যাঁ, যদি দরকার হয় তাই করব···' বলে ও হাঁপাতে লাগল।

কিন্তু সেটা খেয়াল করার মতো অবস্থা কৈলাসনাথের ছিল না। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তা করবে বৈকি—অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ মেয়ে। বড়দের কথা শোনবার মতোও তোমাদের শিক্ষা হয় নি এখনো। সত্যাগ্রহ শিখেছ তোমরা কেবল গুরুজনদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার জন্যে। কেন, এতদিন মনুর সঙ্গে রয়েছ, কই, এই রাজনীতির শিক্ষা কাজে লাগাতে পার নি? এমনি যে একটা অপমান হল ওর, তার হাত থেকে বাঁচাতে পার নি বাবাকে? আর তারই মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছ ওকে। ও, নো···বাট হাউ স্ট্রেঞ্জ ইজ অল দিস্, হাউ স্ট্রেঞ্জ!'

অধ্যায় ৩

আরানসোল জেলের বিশ্রাম-কক্ষে চওড়া, ভারী হাতল-পায়াওয়ালা পুরণো আমলের একটা চেয়ারে ঠেশ দিয়ে সমীর সেনের জন্য অপেক্ষা করছিল শংকরী মুখার্জী। সামনে ভারী কুলুপ বন্ধ লোহার গরাদ দেওয়া গেট। তারপরেই খুব বড় একটা উঠোন। পুরণো আমলের ভারী আস্ত পাথর কেটে, মসৃণ করে বসানো হয়েছে। উঠোন পেরিয়ে একটা ব্যারাকের খানিকটা নজরে পড়ে। ব্যারাকের দেওয়ালটাও আস্ত পাথর কেটে সাজিয়ে তৈরী। এই পাথরগুলোর এক সময় একটা রঙ ছিল নিশ্চয়ই, তারপর এখন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

মনে হয়, অতবড় চেয়ারটার মধ্যে বসে শংকরীর অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। একটা আড়ষ্ট ভাব নিয়ে চেয়ারটার খোলের মধ্যে হেলান দিয়ে পড়েছিল, ছোট মেয়েরা প্রথম চেয়ারে বসলে যেমন হয়। কিন্তু পর মুহূর্তে আবার সামনে ঝুঁকে পড়লে ও, এই হাতলে কনুই রেখে। চেয়ার ছেড়ে একবার উঠবে বলে মনে হল, কিন্তু কি ভেবে আবার আগেকার মত পেছনে হেলান দিয়ে পড়ল। শংকরীর অস্বস্তিটা তার নিজের জন্য নয়। এই কিছুক্ষণ আগে, কৈলাসনাথের সঙ্গে অশোভন মতদ্বৈধ আর সংঘর্ষের যে···যন্ত্রণা ওকে বিদ্ধ করছিল, তাও গৌণ হয়ে গেল।

ওর মনে হচ্ছিল, সমীর যে কোন মুহূর্তে আসবে এবং তার জন্যেই ও খানিকটা অস্থির হয়ে পড়েছিল। সমীর এর আগে একবারও জেল খাটে নি। এই ঘটনাটা তার ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছে কে জানে। ছাড়া, হঠাৎ এই মুহূর্তে এটাও ওর মনে হল, সমীরকে ও প্রথম কি বলবে... যদি কারাবাসের কথা দিয়ে আরম্ভ করা যায় তা হলে কেমন হয়। কিন্তু এটা নিয়ে যদি তার মনের মধ্যে ক্ষোভ থাকে, তা হলে সেটা না বলাই ভাল হবে। না কি, তার বাড়ির কথা, তাঁর স্ত্রী মীনাক্ষীর কথা বলবে? কিন্তু হয়তো ... আরও খারাপ হতে পারে।

দূরে, ব্যারাকের পাশে ধুতি স্যাণ্ডেল পরা দুটো পা এগিয়ে আসছিল। ঠিক তারই সামনে দিয়ে একটা গিরগিটি তরতর করে বাঁ দিকে ছুটে চলে গেল। এই পাথরের উঠোন পেরিয়ে ওধারে কি কোন সব্জীর বাগান আছে?

'হোই জ্ঞান সিং, ইধর···জলদি চাবি লে আও···' ভেতরের দিকে কোন জায়গায় ভারী বুটের শব্দ আর ব্যস্ততা দেখা গেল। মনে হল আদেশকারী এখনই সামনে এসে পড়বেন—কিন্তু কি আদেশকারী আর কি জ্ঞান সিং, কারুরই দেখা পাওয়া গেল না।

এগিয়ে আসা পা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল শংকরী। বলতে যাচ্ছিল, 'আপনার হাঁটা দেখলেই লোকে বলবে আপনি চিন্তাশীল লোক···', বলেও ফেলেছিল খানিকটা, কিন্তু সমীর সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল। কথাগুলো আটকে গেল শংকরীর, ভীত কণ্ঠে বললে, 'একি, একি চেহারা হয়েছে আপনার, কোন অসুখ-বিসুখ করে নি তো?' বলে চেয়ার ছেড়ে দু'পা এগিয়ে গেল।

মৃদু স্বরে সমীর বললে, 'এই যে আপনি এসেছেন, মনোতোষবাবু আসেন নি?'

'তিনি খুবই অসুস্থ··· কিন্তু সে খবর তো আপনার জানার কথা নয়···' মাঝ-খানে শংকরী থেমে গেল। সমীর এত অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে যে মনোতোষ বাবুর অসুস্থতার সংবাদে তার মনের ওপর কোন দাগ তো পড়লই না, খবরটা ঠিকভাবে শুনলও না। কেবল শংকরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। বললে, 'তাই নাকি?'

ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসছিল। একটু ক্ষণের মধ্যে জেলর সাহেব সামনে দেখা দিলেন। মাঝারি চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক, মুখে কোঁচকানো বিরক্তি

আর খবরদারী গাম্ভীর্যের ভাব। কপাল থেকে বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে ঘাম মুছে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই উল্লুক, জলদি করো না···জমাদার কাঁহা গিয়া?'

জ্ঞান সিং স্বাভাবিকভাবেই পা ফেলে আসছিল, ধমক খেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে লোহার গরাদ-দেওয়া দরজাটা খুলে দিলে। জেলর সাহেব তখনও গুমরে উঠেছিলেন, 'তুম্হারা ইয়াদ নেহী কি এ সমীরবাবুকা ইন্টারভিউ থা। এ ক্রিমিন্যালকা ইন্টারভিউ নেহী···যাও, জমাদারকো পাকড়ো, ইঁহাপর উস্‌কো ভেজ দেও।' বলেই উনি একবার সমীর ও আর একবার শংকরীর দিকে তাকালেন আড়চোখে। তাঁর কথাটা ওঁদের মনের ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে সেইটে যেন যাচাই করে নিতে চান।

জেলর সাহেব শংকরীর পাশ থেকে একটা চেয়ার সমীরবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে আর একটা চেয়ারে বসলেন। এঁদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'আরে বলেন কেন, মশায়। চব্বিশ ঘণ্টা এদের নিয়ে আছি। এদের না আছে বুদ্ধি, না জানে ম্যানার। আর মাঝখান থেকে যত দোষ আমাদের। আপনারা এসেছেন এখন এখানে, নিজের চোখে সব দেখে যান।···চব্বিশ বছর এই লাইনে আছি মশায়, আমরা তো স্পেণ্ট্ আপ্, কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা বদলাবার নয়। এসে যেমনটি দেখেছি, ঠিক তেমনটি আছে। সমীর বাবু, আপনাদের মতো লোকের মাঝে মাঝে জেলে আসা এইজন্যে ভাল, জানেন! আপনারা নিজে সব দেখে যান···যদি কিছু হয় তো আপনাদের দ্বারাই হবে।' বলে উনি পকেট থেকে একটা নোটবুক ও অন্য পকেট থেকে সিগারেটের কৌটো বের করলেন।

জেলর সাহেবের এসব কথায় কান দেবার মত অবস্থা এদের কারুরই ছিল না। শংকরী মুখার্জী তখনও অবাক হয়ে সমীর সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আস্তে আস্তে তার চোখ দু'টি বেদনার্ত হয়ে উঠছিল। সমীর সেন জেলের ভেতরে এসেছে ক'দিনই বা হবে, কিন্তু এই কটা দিনের মধ্যে মানুষের যে এতখানি পরিবর্তন হ'তে পারে, না দেখলে তা বোঝা যেত না। সমীর সেনের সমস্ত মুখখানা কালি পড়ে যেন ঝলসে গিয়েছে। ওর খাড়া নাক আর চওড়া কপাল যেগুলো ওর সৌন্দর্য ছিল, সেগুলো সমস্ত মুখখানা থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। ওর চোখের দৃষ্টি কেমন ফ্যাকাশে, অস্থির।

'সমীরবাবু, জেলে থাকায় আপনার পক্ষে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, না? এখানে আপনি তিষ্ঠোতে পারছেন না···'

এতক্ষণে যেন প্রথম শংকরীর কথা শুনতে পেলে এমনিভাবে সমীর বললে, 'কই, না। জেলে থাকায় আমার পক্ষে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?'

কথাটায় সায় দিচ্ছে এমনি করে ঘাড় দুলিয়ে শংকরী বললে, 'ঠিক তাই। আমিও ভেবে পাচ্ছিলাম না, কোনও আদর্শবাদী রাজনীতিকের কারাবাস কেন কষ্টের হবে ? কিন্তু কি হয়েছে আপনার ? বাবা আশংকা করছিলেন…'

সমীর চেয়ারটায় এতক্ষণ ঠিকভাবে বসল, শংকরীর কথাগুলো যেন তাকে ভেতর থেকে টেনে বের করল, ফ্যাকাশে চোখ দু'টো ঝিকিয়ে উঠল, 'মনোতোষ বাবু কি বলছিলেন, কি করছেন তিনি ?'

শংকরী কণ্ঠস্বরটাকে একটু লঘু করবার চেষ্টা করলে, 'যা বলছিলেন তা ঠিকই দেখছি। আপনারা তো বেশি ইমোশনাল, তাছাড়া এটা আপনার ফার্স্ট ইমপ্রিজনমেন্ট। আপনারা হয়তো এটা সহ্য করতে পারবেন না…কিন্তু তাই বলে আপনি আবার ভাববেন না…তিনি এটা…'

সমীর তেমনি সোজাসুজি শংকরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু ওর ঠোঁট দুটো তরতর করে কাঁপতে লাগল। বললে, 'ঠিক তাই, আমার সহ্য হচ্ছে না …আই হেট দিস্ ইম্প্রিজনমেন্ট্। কিন্তু আপনারা এটা কিভাবে ধরবেন তা ঠিক জানি না…থাকা খাওয়ার দিক দিয়ে নয়, এরা সেদিকে খুব ভাল-ভাবেই রেখেছেন। কিন্তু আমরা জেলে বসে থাকব এই জন্যে তো লেবার মুভমেন্ট করতে নামি নি। আমার মনে হয় উই কুড্ বেটার এ্যাভয়েড্ দিস্ ইম্প্রিজনমেন্ট…'

কোন্ কথাবার্তা কোথায় নিয়ে যাবে শংকরী কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু আগেকার হাসিটা বজায় রেখে বললে, 'কিন্তু অনেক জিনিসেই তো আমাদের হাত নেই, সমীরবাবু…' শংকরীর অজানা ছিল না, মনোতোষের কোন্ পরি-কল্পনায় এবং শ্রীব্যানার্জীর সমর্থনে কী ভাবে সমীরদের কারারুদ্ধ হতে হয়েছে।

'না, আমি বিশ্বাস করি না…' ওর নিজের মনে যে চিন্তাটা কাজ করছিল, সেটার ওপরই জোর দিয়ে বললে সমীর। 'দিস্ ইজ এ মিস্টি্ টু মি…আমাদের কোন কারাবাসের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ও কি, হোয়াই ডু ইউ ফীল আন-ইজি, আমাদের মতের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু আমি এটাই চিন্তা করছি এখন…'

'না, আপনি বলুন, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না…' শংকরীর কথাগুলো জড়িয়ে গেল।

'এখনও আমাদের ওপর কোন চার্জশীট দেওয়া হয় নি কেন? যদি আমাদের জন্যে কোন চার্জ না থাকে···বাই দি বাই, মনোতোষবাবু এখনও বাইরে আছেন, আপনি বলতে পারেন, তিনি এটার সম্বন্ধে কিছু জানেন নাকি? আপনার কি মনে হয়?'

'আপনি কি বাবাকে সন্দেহ করছেন? এই এ্যারেস্ট নিয়ে তাঁর কি করার আছে?' শংকরীর ঠোঁট কাঁপছিল। সেদিকে তাকিয়ে সমীর যেন থমকে গেল। একদিকে তার বিশ্বাস, আর অন্য দিকে অন্যায়কে সোজাসুজি দেখবার অক্ষমতা ওকে মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় করে তুলল। নিজেকেই যেন ঠাণ্ডা করছে এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'না, আমি কারও আন্তরিকতায় 'সন্দেহ' করি না। কিন্তু হঠাৎ আপনি 'সন্দেহ' কথাটা বললেন কেন···রাদার, দিস্ মে বী সাস্‌পেক্টেড্। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলব বুঝতে পারছি না···আমি নিজেই এখনও নিশ্চিত নই। তবুও আমার মনে হচ্ছে আমরা হয়তো ঠিক করি নি। মানে, মনোতোষবাবু ঠিক করেছেন কিনা আমি তা বলতে চাই না। কিন্তু আমি নিজে ঠিক করি নি···কোথায় কোন জায়গায় আমার দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল আমি তা হতে পারি নি···' বলতে বলতে সমীর চুপ করে গেল। আস্তে আস্তে তার চোখে সেই শূন্য ফ্যাকাশে ভাবটা ফিরে এল আবার। কিন্তু এই অবস্থাতেও বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ও, 'মনোতোষবাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন। আজকে আপনার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারলাম না। কিন্তু আমার সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছেন, তাতে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।' বলে ও হাত জোড় করলে।

শংকরীও উঠে দাঁড়িয়েছিল। সমীর বিদায় নেবার কথা বলাতে খুব একটা স্বস্তি পেল বলে মনে হল। যে বিপদটা এক-পা এক-পা করে ঠিক একেবারে সামনে এসে পড়েছিল, সেটা এইমাত্র কেটে গিয়েছে যেন। 'কিন্তু এসব হচ্ছে কি? সকালে কৈলাসজেঠুর সঙ্গে, এখন সমীরবাবুর সঙ্গে···দুনিয়া কি বদলে যাচ্ছে, নাকি আমরা···আমি, মাথা ঠিক রাখতে পারছি না, অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছি?' মনে মনে বলে উঠল শংকরী। প্রকাশ্যে বললে, 'সমীরবাবু, আজকে আমার দিনটাই অপয়া দেখছি। সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার মনে হচ্ছে কি জানেন, কেনই বা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তার কোন দরকার ছিল কি না। যাক্‌গে, আসি এখন। যদি পার্মিশন পাই তো আবার দেখা করব. কয়েক দিনের

মধ্যে। নমস্কার···' বলে সমীরের দিকে না তাকিয়েই চলে গেল শংকরী।

কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় আবার ডাক পড়ল, 'দেখুন, আমায় মাপ করবেন···আমি ওনার কথা বলছি, মিসেস সেনের কথা। আপনি যান আজকাল আমাদের কোয়ার্টারে?'

শংকরী ফিরে এল, 'না, কয়েক দিন হ'ল যেতে পারি নি··কিন্তু কেন বলুন তো?' সমীর চোখ নিচু করলে, 'উনি পরশুদিন এসেছিলেন দেখা করতে। খুব কাতর হয়ে পড়েছেন···আমি ওঁকে নিয়ে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। আর করব কি, আমি তো জেলে বসে রয়েছি। আমার কাছে মিনিট কুড়ি ছিলেন···এক মিনিটও যায় নি, শী অলওয়েজ ওআজ ইন্ টিয়ার্‌স্। আর জানেন তো শী ইজ ইন্ হার এ্যাডভান্সড্ স্টেজ্। আমার মাসিমা অবশ্য এসেছেন···কিন্তু আপনি আজ একবার যাবেন ওখানে? বলবেন দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে···আমি ভাল আছি, বলবেন একথা?'

শংকরী কি বলবে বুঝতে পারল না।

'আপনার একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এটা শুনলে উনি হয়তো একটু সান্ত্বনা পাবেন। যাবেন তো?'

'সমীরবাবু আপনি এমন করে বলছেন কেন। আমার ওপর যে এমন বিশ্বাস করে বলছেন, সেটাই আমার ভীষণ ভাল লাগছে। নিশ্চয়ই যাব···'

'আর বলবেন যে আমি ভাল আছি। একথা বলবেন···' বলে ও চলে গেল।

অধ্যায় ৪

পেছনে কোঁকানো শব্দ করে গরাদে-দেওয়া গেট বন্ধ হ'ল। জেলের সাহেব সমীর সেনের একটু পেছনেই হাঁটছিলেন। একটু পরেই জমাদার বুট মোচাতে মোচাতে এসে স্লিপ দিলে। চোখ বুলিয়েই চিৎকার করে উঠলেন জেলের সাহেব, মুখ থেকে পুড়ে-আসা সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'কেয়া, ফিন্ ইণ্টারভিউ মাঙতা? এ্যায়সা তো জান নিকাল যায়গা, বাপ···'। সমীর সেন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জেলের সাহেব বললেন, 'যান আপনি। আমাদের কাজের কি শেষ আছে, মশায়! স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও মাথা ঘুরে স্যানাটো-

রিয়ামে যেতে হবে!' স্বরটা একটু নামিয়ে এনে আপ্যায়নের ভঙ্গীতে বললেন, 'আপনাদের কষ্ট, মশাই···এ্যাজ স্থন এ্যাজ উই লুক এ্যাট্ ইয়োর ফেস, উই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট···কিন্তু আপনাদের আসাটা আমাদের ভাগ্য, জানেন। চব্বিশটা বছর এই লাইনে কাটিয়ে দিলাম, কি না, শুধু চোর-ডাকাত আর ছ্যাঁচ্চোড় নিয়ে। চাকরীর শেকলে বাঁধা, মশাই, আপনাদের সঙ্গে যে ছুটো কথা বলব তার উপায় নাই। যান এখন আপনি···'

সমীর কিছু বলতে গেল, কিন্তু জেলর সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সমীরবাবু, জানেন তো আমরা কাষ্ঠপুত্তলী হয়ে গেছি। সব সময় আপনাদের অসুবিধা বুঝতে পারি না। এখানে আপনাদের অভাব-অভিযোগগুলো বলবেন একটু···যখন যা হয়···আমাদের দোষ নেবেন না··' বলে কৌটো থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন। তারপর নমস্কার করে চলে গেলেন।

সমীরের চিন্তাক্লিষ্ট চোখ ছুটি ঝিকিয়ে উঠল। বুকের ভেতর একটা আবেগ ঠেলে উঠতে চাইল যেন। একটা অখণ্ড সহানুভূতিতে মনটা সিক্ত হয়ে উঠল। সমীর চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে তারপর চশমার কাচের ওপর রুমালটা ঘসতে ঘসতে এগোতে লাগল।

'হ্যালো, মিঃ স্যান্, আয়েন, এদিকে আয়েন···'

ডাক শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাল সমীর। ছ'নম্বর ব্লকের সামনে ছোট বাগানটার মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃপাবাবু ডাক দিয়েছেন। সমীর তৎক্ষণাৎ ডান হাতখানা ওপরে তুলে জোরে ঝাঁকুনি দিলে, বোঝা গেল না তাতে কি বোঝাতে চাচ্ছে। কিন্তু নিজেকেই নাড়া দিয়ে সচেতন করে তুললে যেন। চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুঝল ও, যে-জিনিসটার মধ্যে ও এতক্ষণ ডুবে ছিল, তার কোনো সমর্থন এই পরিবেশের মধ্যে নেই। কয়েদীদের লম্বা ব্যারাক ছুটো এই মাত্র পেরিয়ে এসেছে ও, একবার সেদিকে ফিরে তাকালে। মুখোমুখি ব্যারাক ছুটো, রাসি সারি ছোট ছোট কুঠরি, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। পরপর দরজাগুলো বন্ধ, সামনের বারান্দায় শুকোতে-দেওয়া পাজামা, প্যাণ্ট বাতাসে তখনও ছুলছে। কয়েদীদের শ্রমের জন্য নিয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে সহসা ওর মনে হল, 'এই কয়েদীরা বড়, না, আমরা বড়? আমরা যারা···'

'আরে, অ মিস্টার স্যান, দাঁড়াইয়া পড়েন ক্যান, আয়েন। অখন ঘরে যাইয়া কাম করবেন কি?' কৃপাবাবু বলতে বলতে একেবারে কাছে এসে পড়েছিলেন। ভারি হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল ওঁকে। রোদ্দুরে মাথার সামনেকার

টাকটা চকচক করছে। কাপড়ে-চোপড়ে বেশ একটা ঘরোয়া, পরিতৃপ্ত ভাব। গায়ে গেঞ্জি, ধুতিটা ফেরতা দিয়ে জড়িয়েছেন কোমরে।

অগত্যা, মৃদু হেসে সমীর বললে, 'কৃপাবাবু, সকাল বেলা কি করছিলেন ?'

'করছিলাম আর কি···ভূতের ব্যাগার। এক বেটার পাল্লায় পড়েছি··· বেটা না বোঝে কাম, না বোঝে কথা। আমাদের ব্লকটার সামনে যে বাগিচা আছে, আরে কয়টা গাছ আছে ওতে, দুইটা পাতাবাহার, দুইটা বেল ফুলের ঝাড়, আর ধরেন একটা চাপা ফুলের চারা উঠছে। আছে ত আছে, নাম মাত্তর···আমি হাত দিলাম তাই, নইলে কোনো ব্যাটা চক্ষু মেলিয়া তাকাইত না। তারপর দেখেন গিয়া···' কৃপাবাবু সমীর সেনকে টানতে টানতে এগোচ্ছিলেন। যেন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করছেন এমনিভাবে নিজের কণ্ঠস্বরে আর সমীরের বাহুতে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'এক বেটা কয়েদীরে রাখা অইচে অই বাগিচাটা দেখবার জন্যে। বেটা মূর্তিমান যমদণ্ড···বললাম, রোজ গাছে জল দাও না ক্যান। কয় কি জানেন, কয়, জল দিব না কেনি, কাল রাত ভর বৃষ্টি হল নি, তাই আজ দিই নাই সকালে। আমি বললাম, কাল নয় বৃষ্টি অইচে, তার আগে ? তখন মুখ নিচু কইরা থাকে, কথা কয় না···'

'তাহলে মেতে থাকবার মতো একটা জিনিস পেয়েছেন, বলুন। জেলের দুঃখ আর নাই ?'

সমীর সেনের কণ্ঠস্বরে যে তিক্ততা ফুটে উঠেছিল, তা বুঝবার অবস্থা কৃপাবাবুর ছিল না। কৃপাবাবু উৎসাহিত হয়ে বলে গেলেন, 'তা যা কইছেন। আমি মাঝে মাঝে ভাবি এই বেটাগুলা যদি না থাকত। এ ব্যাটারে পাতা কাটতি বললে ডাল কাটবে, আর ডাল কাটতি বললে গোড়া। তবু আমি বাগিচাটারে কি করছি দেখবেন আসেন···'

কৃপাবাবুর চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল, গেঞ্জির পাটের নিচে কোমরে গোঁজা রুমালটা বের করে টাকের সামনেটায় আর মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন। রুমালের আড়াল থেকেই বলতে আরম্ভ করলেন, 'আপনার হয় তো পছন্দ অইব না, কিন্তু আর পনেরোটা দিন সবুর করেন, তারপর ওটার চেহারা দেখবেন। আরে মশয়, আমার ঐ 'লটবর' যদি না থাকত, তাইলে···এমন মূর্তিমান বেশে আইসা দাড়ায়···আচ্ছা, মিঃ স্যান, আপনি মনে করেন না যে কয়েদীদের পোষাক এখন বদলান উচিত ? আফটার উই হ্যাভ্ গট ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স্, সেই হাতে বালা, আর ডোরা-কাটা খাটো প্যান্ট এখন আর থাকা উচিত নয়। কারণ,

জেলখানা তো শাস্তির জন্য নয়, ইট্‌স্‌ এ প্লেস্‌ অব্‌ কারেকশন···তাছাড়া, এরা, হুঃ···দে আর নট ক্রিমিন্যাল্‌স্‌ বাট্‌ ফুল্‌স্‌ ওনলি···'

'কৃপাবাবু, নমস্কার, আমি এখন একটু যাই···' ঠিক একেবারে বাগিচার কাছে এসেই হাত ঝিনুকে ছাড়িয়ে নিলে সমীর। এতক্ষণ সমীরের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন কৃপাবাবু। সহসা বিমূঢ় হয়ে উঠলেন তিনি, কি বলবেন না বলবেন ঠিক করতে করতে সমীর ততক্ষণে খানিকটে চলে গিয়েছে। ডান হাতটা শূন্যে তুলে বললেন, 'কিন্তু মিঃ স্যান্‌, বাগিচাটা দেখলেন না···'

'আমায় মাপ করুন, আমি বিকেলে একবার নিশ্চয় আসব।'

কৃপাবাবু রুমালটা মুখের ওপর ঘন ঘন ঘসতে লাগলেন।

সমীর সেনকে বঁড়শির কাঁটাতে বিঁধে দু'দিক থেকে টান দিতে লাগল যেন। এত জোরে সে এই পথটুকু হেঁটে গেল যে মনে হল যেন পালিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল কৃপাবাবুর হাতে, কিন্তু হঠাৎ যেন সজোরে থাপ্পড় খেল পিঠের ওপর। সমীরের দীর্ঘ, ঈষদায়ত দেহখানা যন্ত্রণায় নুয়ে পড়েছিল যেন। আর একটু এগিয়ে ১নং ব্লকের ১১নং ঘরে যেতে পারলেই নিজেকে আপনার মতো করে একটুখানি পেতে পারবে। বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দিয়ে উঠল, এক হলকা গরম নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল সজোরেঃ 'না, কখ্‌খনো না, জেলের ভেতর এসে এদের এই আত্মতৃপ্ত, সুখী জীবন কখনো আমি সহ্য করতে পারব না। হঠাৎ কাজের থেকে এদের পুরো বেতনে পেনসন দেওয়া হয় নি। এখানেও কাজ করবার আছে।··কিন্তু কী, কী-কাজ করতে হবে, আমাকে। এখন আমি কি করব?'

যে রেলিঙটা ধরে ওর ব্লকের দোতলায় উঠছিল ও, সেটা চেপে ধরল সজোরে। একটুখানি ফিরে ডান দিকে তাকাতেই সমস্ত চত্বরটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। বারোটি ব্লক চক্রাকারে সাজানো রয়েছে মাঝখানের গম্বুজটাকে ঘিরে। ওধারের ব্লকগুলোর সামনে মানুষগুলোকে খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে। শংকরী মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময়ও এগুলোর ওপর তাকিয়েছিল একবার। স্নিগ্ধ আর পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল তখন সমস্তটা। এখনই আবার রুক্ষ হয়ে উঠেছে, একটু পরে সমস্তটা অসহ্য হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি করে হাতটা টেনে নিলে সমীর, রেলিঙের সানের গরমে হাতটা জ্বলে যাচ্ছিল।

তিন নম্বর ঘরের সামনে আটকাল ওকে। অধ্যাপক বিনয় চট্টরাজ তাঁর

ঘরের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন বিমর্ষ মুখে। বললেন, 'আপনার চিঠি আছে নিয়ে যান, একটু আগে চিঠি দিয়েছে··'। চট্টরাজ ভেতরে ঢুকলে সমীর একটু এগিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। সমীরের মতো এ ঘরখানাও সিঙ্গ্‌ল্-সীটেড্, কিন্তু অতখানি প্রশস্ত নয়। তবু পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম করে রেখেছেন বিনয়। সমীরের চিঠিখানা খুব যত্ন করে রেখেছিলেন তিনি। বালিশের নিচে থেকে আস্তে আস্তে বের করলেন, যেন বের করতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। এ চিঠিটা তাঁর রাখবার নয় তাই, তবু তাঁর দুচোখে কষ্ট আর মমত্ব ঝিকিয়ে উঠছিল। বললেন, 'এই আপনার চিঠি। আর রতনবাবু আপনার খোঁজ করছিলেন··· রতন ধর···খুব একটা এক্‌সাইটমেন্টের মধ্যে আছেন বলে মনে হল। দেখেন দিকি, ৬নং ঘরে পাবেন বোধ হয়। একটু আগে ঢুকতে দেখেছি ও ঘরে।'

'সমীর তাড়াতাড়ি চিঠির ওপর চোখ বুলোচ্ছিল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন চট্টরাজ, তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উষ্ণ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আচ্ছা, সমীরবাবু, এই লোকগুলোর চামড়া কি গণ্ডারের তৈরী?' যে-বিষয়ে বলতে যাচ্ছেন তিনি সে বিষয়ে কিছু বলবেন না এমনি একটা মনোভাব হয়তো ছিল চট্টরাজের, কিন্তু বলতে হচ্ছে যখন তখন অসহ্য তীব্রতায় ফেটে পড়লেন উনি। 'দিস্ ইজ্ দি ফিফ্‌টিন্‌থ্ ডে আই এ্যাম্ ওয়েটিং ফর এ স্যাংসন্। দীজ্ জেলরস্, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌স্ এ্যাণ্ড ম্যাজিস্ট্রেট্‌স্···দীজ হবুচন্দ্র ভুপস এ্যাণ্ড গবুচন্দ্র মন্ত্রীস্···হ্যাভ দে নট এ ডট অব অথরিটি টু সেণ্ড ইভ্‌ন্ এ রিপ্লাই? একে বললে তার কথা বলে, তাকে বললে আর এক জনের কথা বলে। আমি এদের সঙ্গে আর কথা পর্যন্ত বলি না, এদের রিমাইণ্ডার দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করেছি···'

'আপনি কিসের জন্য স্যাংসন চেয়েছিলেন?'

'ওঃ-হো-হো, ইউ ডু নট নো হ্যাট! আর আমি অন্ততো তিন বার আপনার কাছে একথা বলেছি!' এক মুহূর্ত থামলেন চট্টরাজ। তাঁর বিচলিত মনোভাবটা আর এক দিকে মোড় নিতে নিতে ফিরে এল। আক্ষেপ করে বললেন, 'বই চেয়েছিলাম, গোলা বারুদ নয়। খান পনেরো এথিক্‌স্ আর ফিলজাফির বই, আমার ছোট ভাই আমায় দিয়ে যেত। আর এই রেড-টেপিস্টগুলো ভাবলে, দর্শনের বই দিয়ে এদের একশো বছরের জেলখানাটা আমি উড়িয়ে দেব। কিন্তু সমীরবাবু, এটা কেমন ব্যাপার যে আমি তিন বার আপনাকে যে-কথা বলেছি সে-কথা আপনি মনে করতে পারলেন না?'

'মনে দাগ ধরে নি বলেই মনে করতে পারলাম না। পড়াশুনা করতে চান এমন অধ্যাপককে আমি বুঝি। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে যে অধ্যাপক কারাবরণ করেছেন তিনি কেবল বই পড়ার কথা ভাবছেন আর কিছু নয়, যে-কারণে তিনি এসেছেন সে-কথা…'

আকস্মিক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন চট্টরাজ। কিছুক্ষণের জন্য কেবল তো-তো করতে লাগলেন। কিন্তু পনেরো দিন ধরে যে অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণান্ত সংগ্রাম করছিলেন আর ঘা খাচ্ছিলেন, সমীর তেমন বিরুদ্ধতা নয়, সশরীরে সামনেই উপস্থিত ছিল সে। তাই পরক্ষণেই জড়িয়ে ধরল আঘাতকারীকে। 'সমীরবাবু, আপনাকে আমি সম্মান করি, সুতরাং আপনি এখনো আমায় নন-ভায়লেণ্ট দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি রাজনীতির কথা বলছেন কিন্তু বলতে পারেন কোন রাজনৈতিক কারণে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'

সমীরের বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল: এ প্রশ্ন তো তার নিজেরও। তাদেরকে এমনি করে আটকে রাখার কি কারণ আছে? কিন্তু চট্টরাজের কণ্ঠস্বরে ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না, বলে উঠল, 'তাহলে তাই করুন, আপনার এই এ্যারেস্ট আপনি চ্যালেঞ্জ করুন, তা না করে শুধু বই পড়তে চাইবেন না।'

'ও, ইউ সে দ্যাট্। ইউ সে দ্যাট!' চট্টরাজের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, আঙুলগুলো অনর্থক সামনে নাড়তে লাগলেন। 'মিঃ সেন, ইউ এ্যাণ্ড মীসেল্ফ বিলং টু দি সেম পার্টি। আমি আপনার থেকে পার্টিকে কম ভালবাসি না। কিন্তু আপনার এই মোড়লি অসহ্য। জেনে রাখবেন, একজন এজুকেশনিস্টের কাছে আগে তার স্টাডি, তারপর তার রাজনীতি। যদি স্টাডিতে বাধা পান তিনি, হি কেয়ার্‌স্ এ স্ট্র ফর ইয়োর পলিটিক্‌স্। কেননা, আপনাদের মতো রাজনীতির ব্যবসা তার নয়…' বলে ঘরে ঢুকেই সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলেন বিনয় চট্টরাজ।

অধ্যায় ৫

বারান্দার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সমীর সেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে লাগল। একটু আগে এক রকম পালিয়ে বাচ্ছিল ও, সামনে আর কয়েক পা এগোলেই নিজের ঘরটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারত। কিন্তু আজকার যাত্রা তখনও ওর সম্পূর্ণ হয়নি। শেষটা তখনও বাকি ছিল আর সেটুকুও সেরে যেতে হল ওকে। কৃপাবাবু ওর দলের লোক নন, জুনাপুরের আন্দোলনের জন্যও তিনি আসেন নি। বিনয়বাবু কোন দিন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের মনোভাব যদি ওর পক্ষে পীড়াদায়ক হয় তাহলে হয়তো বলার কিছুই নেই। কিন্তু অন্যদের সম্বন্ধে কি বলা যাবে?

সমীর দু'পা এগিয়েই ৬নং ঘরের দরজা পেল। দরজা ভেজানো ছিল টোকা দিতেই আপনিই ফাঁক হয়ে গেল। ডান হাতটা দরজায় লাগিয়েছে ঠেলে ভেতরে ঢুকবার জন্য, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার মতো হাসির হুল্লোড় এসে তাকে ধাক্কা মারলে। এই ধাক্কায় বাইরে গিয়ে পড়ল না সমীর, ভেতরে এসে দাঁড়াল কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর বুঝবার ক্ষমতা রইল না ভেতরে কী হ'চ্ছে। শুকনো শিমুল ফলের জঙ্গলে চৈত্রের দমকা লাগলে যেমন হয়, ঘরের ভেতরকার অবস্থাটা ঠিক তাই হয়েছিল। বিছানার চাদর, গামছা, বালিশ, বালিশের ঢাকা—যে যা পেয়েছে ওপরে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। একজন একটা টেবিল চাপড়াচ্ছে দুমদাম করে। এক ঝাঁক কানে-তালা-দেওয়া শব্দের মধ্যে বুঝবার উপায় ছিল না কিছু ওর মধ্যে শোনা গেল হাস্যরুদ্ধ কণ্ঠে কে বলছেন, 'ওরে চাইপা রাখেন, ছারবেন না···।' যাঁকে ঘিরে এই কাণ্ড, তিনি ততক্ষণে মেঝের থেকে উঠলেন। চেয়ারে বসে দুই পা চৌকিতে ঠেশ দিয়ে দোল খাচ্ছিলেন তিনি। দোল খেতে খেতে পেছন ফিরে একটা উইট্ করতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। মেঝের থেকে উঠে ঘিরে-ধরা দলটা ফুঁড়ে বেরোতে যেতেই কয়েকজন এদিকে তাকালেন। একজন হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে সমীরবাবু যে, আসুন, আসুন, শান্তবাবুর অবস্থা দেখে যান।'

তাঁর পাশের ব্যক্তিটি ছুটে এলেন সমীরের কাছে। যে অবস্থার মধ্য থেকে ছুটে এলেন তিনি মনে হল তখনও তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। বলে উঠলেন

'এই যে, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? মজা দেখলেন না !' স্পষ্টত, সমীর দেখে নি বলে তাঁর আপশোষ রয়ে গেল।

সমীর চোখ ফিরিয়ে নিলে, তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। পাছে ছোঁয়া হয়ে যায়, না কি, তিনি ওর হাত ধরে ফেলেন, এমনি করে পাশ কাটিয়ে সরে গেল মাঝখানের দিকে।

'বলতে পারেন, রতনবাবু কোথায় ? শুনলাম তিনি এ-ঘরে এসেছেন।'

হয় যাতে গোলমাল ছাপিয়ে ওর কথাটা শুনতে পায় সেই জন্যে জোরেই বলে উঠেছিল সমীর, কিংবা আপনিই ভেতরকার তিক্ত, কর্কশ ভাবটা ঝনঝন করে উঠেছিল, কিংবা যে জন্যেই হোক, হুল্লোড়টা হঠাৎ থেমে গেল। এটা এমনি অতর্কিত যে বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকাবারও ফুরসুৎ পেলেন না। সমীর নিজেও কম চমকিত হয় নি। ও মৃদু কণ্ঠে আবার বললে, 'রতনবাবু কোথায় বলতে পারেন ?'

একই সঙ্গে মুখ খুলে গেল কয়েক জনের। 'আরে, এই ত আপনারে খুঁজে গেলেন তিনি…'। 'এই, এই মাত্তর, আপনার ঘরে গেলেন কি না দেখেন…'।

শেখর মুখার্জী ছিল, এদের মধ্যে খেয়াল করে নি সমীর। ও বেরিয়ে যাবার জন্য ফিরেছিল হঠাৎ শেখর বললে, 'সমীরবাবু, চলে যাচ্ছেন কেন, বসুন একটু। এসেই চলে যাবেন সে কেমন হয়।'

শেখর হাসছিল না, তার খটখটে কণ্ঠস্বর শুনে সমীরের মনে হল শেখর ওকে ঠাট্টা করছে। একই সঙ্গে কয়েকটা উত্তর ছিটকে এল ওর মুখে, কিন্তু কিছু না বলে ছোট্ট একটা নমস্কার করে চলে গেল।

এ ব্যবহার ওর পক্ষে এতই অপ্রত্যাশিত যে একজন বলে উঠলেন, 'এটা আবার কি ? এ নিউ টার্ন ইট সীমস্…'

উত্তরে শেখর তার লম্বাটে মুখে এমনি ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলল যে সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন।

সমীর চলে গেল। তারপর আস্তে আস্তে ওদের হুল্লাড় পূর্বের অবস্থায় থিতিয়ে এল। শেখর মুখার্জী মেঝের ওপর পড়ে দুই কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে রইল। সামনে ছড়ানো তাসগুলোকে গোছা করে তারপর ফিটোতে লাগল। তৎক্ষণাৎ আর একজন এসে শেখরের গর্দানে হেলান দিয়ে পড়লেন। শেখর ওঁর ভারের নিচে কৃত্রিম যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল, 'আঃ, এ্যান্‌সেস্ট্রাল প্রাণটা নিও না,

বাবা, অন্ততো একটা বালিশ পিঠের ওপর দিয়ে নাও…' বলে সামনের থেকে একটা বালিশ টেনে নিয়ে পেছনের দিকে চালিয়ে দিলে।

উনি ভাল করে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'ক্যা শেখরদা, হালচাল কেমন চলতা হ্যায়। ভাল মালুম হোতা নেই……'

'ঠিক তোমার কথার মতো……' শেখর বললে।

ইতিমধ্যে শেখরের সামনে তাসের জন্য গোল হয়ে বসতে আরম্ভ করেছিল, ওঁরা হেসে ফেললে।

'হাঁ, আমার কথায় তো হালচাল বোঝা যাবেই। কিন্তু মেসিংএর কথা বলে বলে যে আমার মুখ ভোঁতা হয়ে গেল তখন তো আমার কথায় কিছু বোঝা যায় না।' বলে উনি আরো একটু ঢলে পড়লেন বিছানার ওপর।

'তার জন্যে আর কাকে দোষ দেবে বলো। এই যদি আমি তোমায় বলি পিঠের ওপর জাঁক দিচ্ছ কেন, তখন তুমি বালিশটা দেখিয়ে বলবে ওটারই দোষ।'

মনে হয় ঠিক জায়গায় হাত পড়েছিল। সামনে থেকে একজন বলে উঠলেন, 'না-না, শেখরবাবু, কথাটা উঠেছে ঠিকই। মণ্টুবাবু যে-রকম মেস চালাচ্ছেন, দু'দিনে আমাশা না ধরে তো আর কি বলেছি। শুধু মশায় কুমড়ো সেদ্ধ, তায় একগাদা লঙ্কার বাটনা। তারপর মাছের 'পিস' দেখেছেন…জেলখানার ভেতরে এসে যদি প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি একবার ধরে…দেখবেন মশায়। এতো আর খোলা আবহাওয়া নয়, এই সব দেয়ালগুলো ব্যাধির নার্সিং বেড…' বলে উনি একবার কোঁচকানো চোখে দেয়ালগুলোর ওপর তাকিয়ে নিলেন।

একজন দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে তাসের ভাগ দেখছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'ইয়েস'। তাঁর চোখের দৃষ্টি তখন তাসের ওপর, বোঝা গেল না কোনটা তিনি সমর্থন করলেন। তারপর দুই পায়ের পাতার ওপর বৈঠক দেবার ভঙ্গীতে বসে বললেন, 'ইয়েস, দেয়ার ইজ্ এ্যানাদার স্টোরি। মেস ম্যানেজারদের কাজ হচ্ছে আমাদের যা দাবী-দাওয়া তিনি তা অথরিটির কাছে জানিয়ে দেবেন। তাঁকে এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, যাতে করে আমরা কি চাই তা নিয়ে প্রশ্ন করবেন। তিনি জানতে চাইছিলেন আমার জুতোর জন্যে স্যাণ্ডেলের বদলে কাবলি চেয়েছি কেন, এ্যাজ্ ইফ হী ইজ গোয়িং টু স্যাংসন ইট……'

'আপনি কি করলেন ?'

'দ্যাট্ ফেলা আই এ্যাম নট হু ইজ্ গোয়িং টু পকেট ইট। বললাম,

মনে হচ্ছে আপনার কিছু ক্ষমতা আছে। দুটোই করে দিন না, ইয়েস।'

'ইজ ইট, হাঃ-হাঃ-হাঃ···' একই সঙ্গে শ্রোতারা এবং বক্তা হেসে উঠলেন। একজন তখনও চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন, 'বেশ করেছ, আচ্ছা ঠুকেছ, বাবা। এর পরের বারে আর মেস ম্যানেজারি নিতে চাইবে না···'

শেখর বললে, 'মেস ম্যানেজারি খুব লোভনীয় মনে করেছেন! নেভারদি-লেস, লেট আস ট্রাই উইথ ভোলাবাবু। ভোলাবাবু, আমার পিঠ থেকে তুমি নাম হে, আমাদের সকলের মাথায় তোমাকে বসিয়ে দেব···'

ভোলাবাবু সুড়ুৎ করে পিছলে এলেন। শেখরের সামনে জোড় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দোহাই শেখরদা, আমি এমনিতে তোমার পিঠ ছাড়ছি, আমার অন্য পদ চাই না।'

একই সঙ্গে কয়েক জন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। যেন ওঁদের সত্যকার কোনো আশা এই মুহূর্তে ধূলিসাৎ হ'তে চলেছে। 'চাই না মানে, চাই না বললে ছাড়ছে কে···'

'তা কখনো হ'তে পারে না, আপনাকে নিতেই হবে, ভোলাবাবু। যদি কন্‌টেস্ট হয়, তাহলে আমরা ক্যাম্পেন চালাব আপনার হয়ে। ভোট ফর···'

'ভোলাবাবু···' উল্লাসে এদের তাস-খেলা ভণ্ডুল হ'বার উপক্রম হ'ল।

শেখর বলছিল, 'তুমি চাও না মানে, চালাকি নাকি, নাকি মামা-বাড়ির আব্দার···' কিন্তু হঠাৎ কথাগুলো কাঁটার মতো যেন আটকে গেল ওর গলায়, দরজার দিকে চোখ পড়াতে। রতন ধর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছে।

শেখরের খেলার জুড়ি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'আঃ, কি করলেন শেখরবাবু, কি দান ফেললেন?' দর্শকরাও 'ইস্—এ্যাঃ', 'চুক-চুক' করে উঠলেন। শেখর লজ্জিত মুখে সাবহিত হয়ে উঠল, সতর্ক হবার চেষ্টা করলে। বললে, 'ছি-ছি, কেলেঙ্কারী করে ফেললাম···' বলে দরজার দিকে আবার তাকাল। ভোলাবাবুরও দৃষ্টি পড়েছিল দরজার দিকে। উনি বলে উঠলেন, 'কি কমরেড, আপনারা কি লুকোচুরি খেলছেন? সমীরবাবু খুঁজছেন আপনাকে, আপনি খুঁজছেন সমীরবাবুকে। একজন যাচ্ছেন, একজন আসছেন?'

শেখর ওদিকে না তাকিয়েই হাসির ভাব আনবার চেষ্টা করে বললে, 'তোমার হল সুরু, আমার হ'ল সারা, তোমায় আমায় মিলে···কিসের ধারা চলছে, কমরেড?'

রতন ঘরে ঢুকে বাঁ-দিকের দেয়ালের পাশে ঘেঁসে এগোচ্ছিল। মনে হল

এঁদের সংঘট্টকে পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকের দেয়ালে জানালার পাশে যেতে চায়। এঁদের কথার কোনো জবাব দিল না ও। কেবল একবার স্থির, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল শেখরের দিকে। এঁরা কেউ লক্ষ্য করলেন না, কিন্তু এ দৃষ্টির অর্থ কেবল শেখরই বুঝলে। রতন চোখ ফিরিয়ে নিলে। শেখর বুঝল, ঘৃণায় রতন তাকাতে পারছে না।

শেখর ভোলাবাবুকে ফিসফিস করে বললে, 'রতনবাবুকে দেখেছেন?'

'দেখছি তো, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না।'

'আমার পক্ষেও তাই। মনে হয় উনি একটা কিছু করবেন…'

'সেটা কী?'

'এখনও বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে সামথিং ভায়লেণ্ট…'

ভোলাবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়। উনি যে-পার্টির লোক, কিছুই আশ্চর্য নয়…' কিন্তু শেখরের কাছ থেকে কোনো জবাব পেলেন না। চকিতে রতনের দিকে তাকালেন উনি। জানালার ওদিকে রতন ঝুঁকে পড়েছে। 'সামথিং ভায়লেণ্ট, সামথিং…' শেখরের কথাগুলো ভোলাবাবুর মনে হতে লাগল।

অধ্যায় ৬

শেখর আগেই চলে গিয়েছিল। যাঁরা তাস পিটোচ্ছিলেন তাঁরা আস্তে আস্তে চলে গেলেন। এ-ঘরে যাঁদের সীট তাঁরাও কখন বেরিয়ে গিয়েছেন দলের সঙ্গে। রতন জানালার একখানা গরাদ চেপে ধরে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। তার চোখের দৃষ্টি জ্বলতে জ্বলতে ফার্নেসের ভেতরকার আগুনের মতো এই মুহূর্তে একটা স্থির জ্বালায় পরিণত হয়েছে। দেখতে দেখতে এক সময় রতনের হাত-খানা কেঁপে উঠল, চওড়া বুকখানা ফুলে উঠল হাপরের মতো। আর ঠিক পর মুহূর্তে যখন বুকখানা খালি হল, তখন হা-হা করে উঠল যেন। এ শব্দে নিজেই চমকে উঠে ও তাড়াতাড়ি ফিরে তাকাল ঘরের ভেতর। 'ও হোঃ, এরা সব চলে গেছে! কিন্তু আমি কি করছি এখানে?' দুই হাত দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরল রতন। দরজার দিকে দু'পা এগোল বেরিয়ে যাবার জন্য কিন্তু কি ভেবে সামনে চৌকিটার পাশে থেমে পড়ল ও। বিছানার চাদরটা দুমড়ানো,

মাঝখানে সিগারেটের আধ-খোলা খালি বাক্স আর টর্চটা পড়ে রয়েছে। সেগুলো সরিয়ে না দিয়েই লম্বা হয়ে বিছানাটার ওপর পড়ল ও মুখটা বালিশে গুঁজে। 'আঃ…' হঠাৎ শ্রান্তিতে সমস্ত শরীরটা ওর এলিয়ে এল।

তখন আস্তে আস্তে ওর মনের মধ্যে ছবিগুলো আবার ভেসে উঠতে লাগল। 'রতনবাবু, পারেন তো পালান, দেরি করবেন না…' ইসমাইলের কথাগুলো এখনো তার কানে বাজছে। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই রতনের সময় লেগেছিল। এ ঘটনা এত অপ্রত্যাশিত যে ভাবতেও অবাক লাগে। ইসমাইল চিৎকার করে এ'কথা বলেই কলকে ফুলের বনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সামনের ডাল-পালাগুলো দুপুর রাত্রির অন্ধকারে আবছা-আবছা নড়ে উঠল মাত্র, ইসমাইল যে পালিয়ে গেলেন, কেবল তখনই তা বোঝা গেল। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেল রতন, তার হাত দুটো ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল পুলিস ভ্যানের খোলা দরজার দিকে। মুহূর্তের জন্য পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে তাকাতে পেরেছিল রতন। ভয়ে আর ক্রোধে বিহ্বল, কুৎসিৎ হয়ে গিয়েছিল লোকটা।…রতনের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল। হাত দুটো বালিশের দু'পাশ থেকে সরিয়ে এনে বুকের নিচে রেখে মুঠির ওপর চেপে ধরল রতন। নিজের বুকটা, নাকি মুঠি দুটো গুঁড়ো করে ফেলতে চায় ও। ও তখন পালায় নি কেন? যে অফিসার ওকে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল, একটা আঘাতে তাকে গুঁড়ো করে ফেলা যেত না? ক'জন ছিল ওরা? আশ্চর্য, একথা তখন ভাবতে পারে নি ও!

কিন্তু ইসমাইল পেরেছিলেন। তাঁর বুঝে নিতে অসুবিধে হয় নি। শুধু তাই নয়, ইসমাইল তার পরের ঘটনাও বুঝতে পেরেছিলেন। তার পরের দিনই যে 'মার্ডার' হবে (এই 'মার্ডার' কথাটা বারবার রতনের মনে আসতে লাগল)—সেটা কেবল একা তিনিই জানতে পেরেছিলেন। জুনাপুরের নওজোয়ান, অগ্রগামী জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইসমাইল! যেখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মহাগৌরব অর্জন করে মানুষ, সেখানটিতে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। মৃত্যু বুক পেতে নিয়েছিলেন।…আঃ, আঃ, প্রচণ্ড জ্বালায় বালিশ থেকে মুখ তুলল রতন। 'আঃ, আমি জানি কেন বুকের ভেতরটা পুড়ে পুড়ে যায়। ইসমাইল শক্তির মালিক ছিলেন…কিন্তু ইসমাইলের পথ আমার পথ নয় (এই-খানে রতনের চিন্তার খাত বদলে গেল, ইসমাইলের নেতৃশক্তির পরকলার ভেতর দিয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে হঠাৎ নিজের পরকলায় ইসমাইলকে দেখতে আরম্ভ করল ও)। ইসমাইল বৃদ্ধ, আপোষের পথ ধরে চলেছিলেন। আমি তাঁর

অতি-সতর্ক অভিভাবকের মতো ভাব মেনে নিতে পারি না। কিন্তু তাঁর পথে যেমন করে চলে যেতে পারতেন তিনি, আমি কেন পারি না তেমন করে আমার পথে এগোতে!'

আস্তে আস্তে রতনের মাথাটা আবার ঝুঁকে এল, বালিশের ওপর মুখখানা থুবড়ে পড়ল ওর। সামনে কালো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার···এই অন্ধকারের অণু-পরমাণু চঞ্চল, অস্থির, যেন তরতর করছে। অন্ধকার, না কি, অত্যন্ত উজ্জ্বল। চোখের ভেতর দপদপ করতে থাকে। মাথার ওপর যেন অসহ্য ভার চাপিয়ে দিয়েছে, ওঠাতে পারছে না ও। খুব চিৎকার করে একটা কিছু বলছে রতন, ভীষণ জোরে বলতে চাচ্ছে। চারদিকে এত গোলমাল, প্রচণ্ড আক্রোশ···তার মধ্যে ওর কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে উঠল। 'চলুন, এইখান দিয়ে চলে যাই···সব কিছু ভেঙে, মাড়িয়ে চলে যাব! সময় কোথা এত ধীরে-সুস্থে চলার। আসুন, এই যে···'। ওর পাশ দিয়ে আর একজন আস্তে আস্তে চলে গেলেন। শ্লথ, মন্থর তাঁর পদক্ষেপ, চলাতে কোনো দ্বিধা নেই। কত শান্ত, যেন অর্ধ-ঘুমন্ত।

রতন চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। ওর বুক টিপ টিপ করতে লাগল···এই দৃশ্য সে দেখতে পারে না। তার বুকের ভেতর যে আগুন অহরহ জ্বলছে তাতে যেন এটা জলের ছিটে দিতে থাকে। এ আগুন তার কাছে অসহ্য, আর এক মুহূর্তও সেটা বহন করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা নিবে যাবে—রতন সেটা ভাবতেও পারে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে এল রতন। জানালার ধারে ওর আগেকার জায়গাটিতে এসে দাঁড়াল। জানালার কার্নিসের শেষ দিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে পলস্তারা ফেটে রয়েছে। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডান হাতের আঙুল বাড়িয়ে একটা ঠেলা মারল রতন। চাপটা ঝুরঝুর করে নিচে পড়ল। নিচে লাল রঙের ভাঙা ইঁটের অংশ বেরিয়ে পড়ল। ওটার দিকে তাকিয়েছিল রতন, কিন্তু এক সময় চোখটা জ্বালা করে উঠল ওর। নাকি, দুপুরের টাট খেয়ে পড়া রোদটা ওখানে জ্বালার সৃষ্টি করেছে।···চোখ তুলতেই সামনে খোলা মাঠ, প্রচণ্ড রোদ্দুরে পিঠ পেতে দিয়ে পুড়ে পুড়ে মরছে। কয়েক গজ দূরে সামনেই একটা ওয়াচ-পোস্ট। গুমটির সিপাহীটা একটু অস্থির হয়ে উঠেছে মনে হয়। বোধ হয় এখন ডিউটি বদল হবে, ওর বদলি আসছে না। এই গুমটি পেরিয়ে আরও কিছু পরেই কাঁটা তারের জালের বেড়া। রোদ্দুরে বিদ্যুতের রেখার মতো টানা-টানা হয়ে রয়েছে। তার ওদিকে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না।

'আরে হোই···ক্যা হুয়া?···কোইকা আনেকা খবর নহী?' সামনের ওয়াচ পোস্টের গুমটির ভেতর থেকে অস্থির সিপাহীটা বেরিয়ে এসেছে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দাড়িতে টান দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও। বাঁ-দিকের ওয়াচ-পোস্ট থেকে জবাব দিল ওর কথার, 'হাঁ, আজকাল ঐসা হোতা হ্যায়···'। রতন মুখখানা সামনে রেলিঙের পায়ে ঠেলে দিয়েছিল। ঘাড়টা বাঁকিয়ে দেখতে চাইলে ও বক্তাকে, কিন্তু ওর গুমটির খানিকটা অংশই দেখা গেল, লোকটাকে দেখা গেল না।

'আরে, রতনবাবু এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখানে···' শান্তবাবু ঘরে ঢুকলেন। কাঁধে ভিজে গামছা, ভিজে চুলে আঙুল বুলোচ্ছেন। উনি খাওয়া সেরেও এসেছেন, সুপুরি চিবোচ্ছেন কটাস-কটাস করে। 'যান এক্ষুণি, কখন সেকেণ্ড বেল পড়ে গেছে···'

'হ্যাঁ, যাই এক্ষুণি···'

যেমনি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি চলে গেল রতন, শান্তবাবু আবাক হয়ে গেলেন। তারপর মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে বালিশের নিচে থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন।

অধ্যায় ৭

'বেয়ারা'—পুরাণো কয়েদী বগলাচরণ সমীর সেনের ঘর পরিষ্কার করার জন্য এসেছিল। ওর বাঁ হাতে মেঝে মুছবার জন্য ন্যাতা আর ডান হাতে জলের বালতি। ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে বালতিটা নামিয়ে রাখলে ও। চারদিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিলে, দেখতে চাইলে সমস্তটা ঠিক আছে কি না। তারপর খুক খুক করে কেশে সমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে ও। বগলাচরণ এমনি করেই বাবুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হঠাৎ মনে হবে লোকটা উদ্ধত, ওর কালো গুলি-পাকানো দেহ আর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তি আর অবিশ্বাস জেগে উঠতে পারে। কিন্তু ওর হাঁড়ি-হাঁড়ি, ভোঁতা গলায় যখন ও বিনীতভাবে কথা বলতে থাকে, তখন সেটাই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ওর সাড়া পেয়ে সমীর জানালার গরাদ থেকে মাথা তুলে ঘুরে দাঁড়াল। খুশি হয়ে বলে উঠল, 'বগলা, দেখ, কী রকম মেঘ উঠেছে। আজও বৃষ্টি হবে।'

বগলাচরণ এটাই চাইছিল, সমীরের কাছ থেকে খুশি মেজাজের স্বীকৃতি পেয়ে নিজের কাজ করতে এগোল ও। আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'বাবু, জানলাটা বন্ধ করে দেন কেনে, ঝড় উঠবেক এক্ষুণি।'

সমীর এগিয়ে এসে ওর বাড়ানো হাতটা ধরে জানালার কাছে নিয়ে গেল। আগ্রহের সঙ্গে বললে, 'দেখ, মেঘ উঠছে কেমন, কালো ধোঁয়ার কেশরের মতো ফুলে উঠছে, কত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে দেখ…'

খেয়ালী ছেলেদের দিকে মা যেমন করে সস্নেহে তাকায়, তেমনি করে সমীরের মুখের দিকে একবার তাকাল বগলাচরণ, তারপর জানালার পাল্লাটা ধরে বন্ধ করে দিতে চাইলে। সমীর ওকে আটকাল, 'না-না, বগলা, এখন বন্ধ কোর না, আমায় আর একটু দেখতে দাও…' শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর অসহায়ের মতো শোনাল।

সমীরের ঘরটা সব চেয়ে গোছালো থাকে, এমন কি ওর বিছানার চাদরটা পর্যন্ত দুমড়ে যায় না। এই নিয়ে বগলাচরণ কয়েকবার অনুযোগও করেছে। আজও ওর করবার কিছু ছিল না, কেবল মেঝের ওপর ন্যাতা ভিজিয়ে ভিজিয়ে ঘসছিল ও। মেঝেটা মোছার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এমনি সময় মুখ তুলে তাকাল বগলা। সমীর দুই গরাদ দুই হাতে চেপে বাইরের দিকে তেমনি করে তাকিয়ে আছে। ওর শুকনো চুলগুলো উড়ছে।

হঠাৎ ওর কি হল বলা মুস্কিল, ন্যাতাটা মেঝের ওপর চেপে ও উঠে দাঁড়াল। ভরাট গলায় ও বলে উঠল, 'বাবু, কি কোচ্চেন, জানলা থেকে সরি' এসে বসুন …' বলে আঙুল বাড়িয়ে ও সামনের বিছানাটা দেখিয়ে দিলে। এটা এমনি আকস্মিক, আর এত জোরে কথাটা বললে ও, যে, সমীর তো বটেই ও নিজেও চমকে গেল। 'বাবু, দেহটাকে কি কোচ্চেন ভেবে দেখবেন…'

সমীর ব্যাপারটা বুঝলে। মৃদু হেসে বললে, 'বগলা, ওসব কথা ছাড়। তার চেয়ে তোমার গল্প শুনি, বল। তোমার মেয়াদ আর কতদিন? আচ্ছা, কবে তুমি 'ফালতু' থেকে 'বেয়ারা' হলে বলো তো?'

'বাবু, উকথা তো অনেকবার শুনেছেন, আর কতবার শুনবেন…' যেন একটা চালাকি ধরে ফেলেছে এমনি ভাব নিয়ে বগলা বললে। 'বাবু, আপুনি যখন জেলে এলেন তখন আপনাকে দেখি নাই? আমি মনে মনে শুধালম, কে এই বাবু। অমন গৌরবর্ণ দেহ…তারপরে সেই দেহ…এখন কালিটি হয়ে গেছে…কেনে, আপনার কি এত কষ্ট, বলেন? জেলে কি আর বাবু নাই

না কি। আমার দোষ লিবেন নাই, বাবু···মুখ্যু মানুষ, ডাকাতি করে জেল খাটছি, তাই···মা'দে সব বুঝতে পারি। এই সিদিন মা ঠাকরেন দেখা করতে এলেন, আমি উদিক পানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। মা কেঁদে অশ্রুপাত হয়ে গেলেন, কেনে সেইটো আপুনি বুঝতে পারেন নাই···'

সমীর ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ওর ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল, জানালার বাইরে তেমনি করে তাকিয়ে রইল ও। এখনও সন্ধ্যা হয় নি, কিন্তু চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঝড়ের মুখে বাইরে তাকানো যায় না। তবু সেদিকেই মুখ করে রইল ও পাছে বগলাচরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায়। এতক্ষণ যে একটা মুগ্ধ ভাব নিয়ে ছিল ও, সেটা যেন চটকা লেগে কেটে গেল। সমস্ত শরীরে জ্বালা জ্বালা করতে লাগল।

কিন্তু একটু পরেই চমকে উঠল সমীর। হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল বগলাও থেমে গেছে কথা বলতে বলতে। সে যে মুখ ফিরিয়ে নিতেই ও থেমে গেছে সেটা বুঝতে পারল ও। ওর সমস্ত জ্বালা আর কষ্টের মধ্যেও আত্মধিক্কারে ও 'ছি-ছি' করে উঠল। 'কেন, বগলার কথায় আমি এমনি করে মুখ ফিরিয়ে নিলাম কেন। সে যা বলছিল, আমাকে ভালোবাসে বলেই তো বলছিল। সে কয়েদী হতে পারে, কিন্তু ভালবাসার অধিকার তো সকলেরই আছে। কিন্তু···' সমীরের এইটেই আশ্চর্য মনে হল যে, বগলার কথাটা শোনা মাত্র ও এমনি তাড়াতাড়ি সরে এসেছিল। দু'জনের মাঝখানে একটা অত্যুচ্চ দেয়াল খাড়া দেখতে পেলে ও, যা শ্রেণীপার্থক্যের বিষময় ফল, বহু দিন ধরে যা গড়ে উঠেছে, এবং যার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো সমীরও দায়ী নয়।···কিন্তু এই দেয়াল তো তার ভেঙে ফেলা চাই। না-না, ভাঙা নয়, সেই দেয়াল অতিক্রম করে এসে বগলার সঙ্গে মেলা চাই। প্রত্যেকেরই ভালবাসার অধিকার আছে। এভ্রিওয়ান মাস্ট্ লাভ এ্যাণ্ড বী লাভেড বাই এভ্রিওয়ান।

সমীর জানালার থেকে সরে এল। বিছানার ওপর বসে বললে, 'বগলা, তুমি শরীরের কথা বলছ, কিন্তু শরীরের কি দোষ বল। এর ওপর কত অত্যাচার করা যায়?' সমীরের কথাগুলি আবেগে কাঁপছিল। এক একটা সময় আসে যখন মানুষের সমস্ত বেদনা মুহূর্তে করুণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। একটু আগেই সমীর যে বগলার থেকে বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তা বুঝবার উপায় রইল না।

বগলা এতক্ষণ ঠায় মেঝের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সমীরের প্রশ্ন শুনে সম্বিৎ

ফিরে পেল যেন ও। চোখ নিচু করে বললে, 'বাবু, আমি ডাকাতি করে জেল খাটছি, কিন্তু সেঁহ ভালবাসা বুঝতে পারি। আপনি আমাকে 'লাই' দিয়েছেন, বাবু ··আপনার কাছে অপরাধ করে ফেললম···'

বগলা মেঝের ওপর বসে পড়ল, ও এখনই ন্যাতা বুলোতে আরম্ভ করবে। সমীর ওর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলে, ও নিজেই যতটা এগিয়ে এসেছিল ততটাই পিছিয়ে গেছে। সেখান থেকে ওকে টেনে বের করবে কি করে?

সমীর কি রকম অস্থির হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি করে ও বলতে গেল, 'বগলা, শোন, তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা···'কিন্তু তার আগেই ঝড়ের একটা ঝাপটা এসে সমস্ত ঘরটা লণ্ডভণ্ড করে দিলে। বিছানার চাদরের ওদিককার খুঁটটা এসে সমীরের দেহের ডান দিক আর মুখখানা জাপটে ধরল। চাদরটা তাড়াতাড়ি মুখ থেকে সরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সমীর। ঘরের মধ্যে একরাশ ধুলো আর শুকনো পাতা এসে পড়েছে। বগলা জানালার কাছে এক লাফে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু গিয়েই থমকে গেল ও। বাঁ-হাত পাল্লার ওপর রেখে জিজ্ঞেস করলে, 'বাবু, জানালাটা বন্ধ করে দিব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দাও, দেরি কোর না···' সমীর চিৎকার করে উঠল।

ঘরের ভেতরটা জবরজং হয়ে উঠেছিল। ব্রাকেট থেকে ধুতি-শার্ট মেঝের ওপর ছিটকে পড়েছিল, টুলের ওপর থেকে ফুল আর জল সমেত ফুলদানিটা মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল। বগলাচরণ তাড়াতাড়ি পড়ল এগুলো নিয়ে, ওকে আর এক দফা পরিশ্রম করতে হ'বে।

সমীর ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখতে লাগল। তারপর ওর চোখ দুটো এক সময় ঝিকিয়ে উঠল। বাঁহাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে ও জিজ্ঞেস করলে নিজেকে, 'কেন বগলাকে আবার পরিশ্রম করতে হচ্ছে? আমি যদি তখনই জানালাটা বন্ধ করে দিতাম! কি···না, মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ফাঁকা কবিত্ব করছিলাম। এ শুধু আমারই খাম-খেয়ালির জন্যে। ছিঃ, এ লজ্জা আমাদের চোখে পড়ে না কেন সব সময়? আমাদের তুচ্ছ আরামের জন্য আমরা ওদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করাই। আর আমরা শিক্ষিত! সংস্কৃতিমান ব্যক্তি। ওপর তলার লোক! আঃ···

'আমি জানি বগলা আমাকে ভালবাসে, কিন্তু সেটা আমি মানতে চাই নি। কেন, না আমার অহঙ্কারের জন্যে। তার ভালবাসার বদলে আমি তাকে দিয়েছি অসম্মান। ঝড়ের থেকে সে আমাকে সাবধান করে জানালা বন্ধ করতে

চেয়েছিল আর তাইতেই আমার সৌন্দর্যবোধ টনটনে হয়ে উঠল। তাকে দিলাম না। ফলে হল কি? এই ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র একাকার হয়ে উঠল! এখন এত অগোছালো আমি সইতে পারব না, কেননা আমি আবার সৌন্দর্য-প্রিয়! সৌখিন! সুতরাং বগলা আবার পরিশ্রম করছে আমার জন্য। ছিঃ!

'কিন্তু এত গ্লানি নিয়েও বগলা কেন ভালবাসে? কেন ভালবাসতে পারে? ওর ভেতরে কই সেই স্বার্থান্ধ মানুষ? হয়ার ডাজ্ দিস ক্লাস-ডিভিসন এগ-জিস্ট? না, তা নেই। কেবল যদি স্বার্থই হত, তাহলে কবে সব ভেঙে চুর-মার হয়ে যেত। পৃথিবীতে তাহলে এত কাজ, এত সেবা কিছুই থাকত না। না, আমি আর চোখ বুজে থাকব না, আমাকে দেখতেই হবে। নো, নো··· অল দীজ্ টমসন্স্ এ্যাণ্ড্ স্থার মুখার্জীস্ মাস্ট কাম এ্যাণ্ড্ সী টু ইট, ইয়েস··· দে মাস্ট্, অর্···আমি জানি না, আমি বুঝতে পারি না তাহলে কি হবে!'

অধ্যায় ৮

বেশ কিছুক্ষণ সময়ের পর ঘর পরিষ্কার করা আর গোছানোর পালা শেষ হল। এতটা সময় লাগবার কথা নয়, কিন্তু বগলা সময় নিয়ে সবটুকু করলে। হঠাৎ মনে হবে, এই রকম একটা নতুন হাঙ্গামা বাড়াতে ও খুশিই হয়েছে। সমীর কিন্তু এতে ভুল করল না। প্রশস্ত বুকের ওপর দু'হাত মুড়ে দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। একটু আগেই যে একটা আলো ওর অন্তরকে আলোকিত করে তুলেছিল সেটার সঙ্গেই যেন বোঝা-পড়া করছিল সমীর। এই চেতনা যেন তার বর্তমান আর ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে। কয়েক-দিন থেকে তার বুকের ভেতর যে প্রচণ্ড পীড়ন চলছিল এই মুহূর্তে তা যেন পরা-জিত হয়েছে। এমন কি একটু আগেই বগলাকে অসম্মান করেছে বলে যে সে কষ্ট পাচ্ছিল তাও আর নেই। কেবল মনে হচ্ছে—ওর চোখের সামনে এই কথাগুলি কেবল ভেসে ভেসে উঠছে: 'আমার জীবনের সব ক্ষত, সব ক্ষতি এইবার পূর্ণ করার সময় এসেছে। এই মুহূর্তে যা আমার কাছে উদ্ভাসিত হল, তা আমার চিরজীবনের সত্য হয়ে দাঁড়াক।' বগলাচরণ কাজ শেষ করে যখন স্বইচ টিপে আলো জ্বেলে বললে, 'বাবু, আমি এখন আসি···' তখন সমীর ওকে

বিছানার ওপর বসতে ইঙ্গিত করে বললে, 'বস, বগলা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বগলাচরণের মুখখানা সাবহিত, কিন্তু ওর অবিশ্বাসী চোখ দুটো সমীরকে একবার নিরস্ত করতে চাইলে। কিন্তু সমীর দমে গেল না। বললে, 'বগলা, তোমরা যারা কয়েদী হয়ে রয়েছ তাদেরকে কতক্ষণ কাজ করতে হয়?'

'আমাদের কি আর কাজের শেষ আছে? কর্তাদের মর্জি···ছ'ঘণ্টা, আট ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা···কাজ হলেই হ'ল।'

'এত কাজ তো তোমরা করছ। এ কাজ তোমাদের কেমন লাগে?'

বগলাচরণ বুঝতে পারল না এ প্রশ্ন কেন করা হচ্ছে। সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর ভেতরটা গলে যেতে চায়, কোনো সতর্কতা, কোনো অবিশ্বাসই জমাট হয়ে উঠতে চায় না। কিন্তু একটু আগেকার অভিজ্ঞতাও ভুলতে পারে না ও। বললে, 'কাজ করতেই আমাদের জন্ম, বাবু, বাইরেও হাড়গোড় ভেঙেছি, জেলের ভিতরেও কাজ করছি। আমাদের ভাল-মন্দ লাগা কি···আমাদের ভাল-মন্দ নাই···'

সমীর ঘাড় নেড়ে বাধা দিয়ে বললে, 'এ কথা তুমি ঠিক বলছ না, বগলা। কাজ করতে তোমার ভাল লাগে তাই তুমি কাজ কর। তুমি অন্যকে ভালবাস বলেই কাজ কর। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস···তুমি যদি আমাকে ভাল না বাসতে, জেলর সাহেবের ভয়ে কখনই এ কাজ করতে না। পৃথিবীতে এত কাজ হচ্ছে··তুমি বলতে চাও মানুষ ভয়ে করছে, নাকি, স্বার্থের জন্যে করছে?'

'বাবু, আপনারা বড় মানুষ, আপনাদের মুখের পানে চাইলে খুশি হয়। আপনাদিকে ভক্তিছেদ্দা করি, তাই ভয় হয় পাছে আপনাদের কাজ অপছন্দ হয়···'

'কখনও না। আমরা বড় বলে তোমরা ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারো না, কেননা, আমরা বড়োই নই। আমরা বড়ো কিসে? দুটো রাজনীতির গরম বুলি কপচাতে শিখেছি বলে? ছি, এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে? অথচ, আশ্চর্য দেখো, এই প্রকাণ্ড মিথ্যাটা আমরা বিশ্বাস করেছি আর তোমাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমাদেরও মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছি···'

'ইসব কথা আপুনি কেন বলছেন জানি নাই। কিন্তু আমরা কয়েদী, সামান্য মানুষ। ইসব কথা শুনলে আমাদের কষ্ট হয়।'

সমীরের চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল, ও হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক

তাই। একথা তোমাদের কষ্ট দেয়, কেননা তোমরা সত্যিই বড়ো। আর অন্তঃসারশূন্য শুকনো মানুষ আমরা, আমাদের যখন তোমরা লম্বা প্রশস্তি কর, তখন নির্বোধের মতো সেটা মেনে নিই। কিন্তু বগলা, একটা জিনিস তুমি ভুল কোর না···তোমাদের বলতে আমি শ্রমজীবী মানুষকেই বুঝি, তার মধ্যে কয়েদীরাও আছে। আজ সকালে আমি 'ফালতু'দের দেখছিলাম, দেখে নিজেকে চিনতে পেরেছি। ওরা এখানে এসে ঘানি টানছে, ফসল ফলাচ্ছে, তাঁত চালাচ্ছে··· এদের শ্রম-নিরত মূর্তি আমি দেখি, আর···যত শোষণই এদের ওপর চলুক, শ্রমের একটা পবিত্র শক্তি আছে, এদের চোখে-মুখে আমি তা দেখেছি। আর আমরা যে এখানে এসেছি, আমরা কি করছি ?'

স্পষ্টত, বগলাচরণ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। নিজেকে আড়াল করবার আবরণটা ওর খসে গিয়েছিল কখন। ওর সেই সাবহিত, কোমল ভাবটা নেই, বরঞ্চ শ্রমজীবী মানুষের যে স্বাভাবিক রুক্ষতা ওর চোখে-মুখে সেটাই ফুটে উঠেছিল। ও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সমীর বললে, 'না বগলা-চরণ, অস্থির হয়ো না, শোন আমার কথা। আমার কাজ আমি এই মুহূর্তেই তোমার সাহচর্যে আরম্ভ করতে চাই। তোমাদেরকে আমি আর অবিশ্বাস করব না, আমার হৃদয়ের সমস্ত কথা তোমাকে বলে আমি পবিত্র হব, শুচি হব।···যাক, যে কথা বলছিলাম, আমরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, আমরা মনে করি তোমাদের শ্রমের ওপর আমাদের অধিকার আছে। আমরা বিজ্ঞানের উন্নতি করছি, কল-কারখানা বানাচ্ছি, তোমাদের মতো হাজার-হাজার মানুষকে জমি থেকে উৎখাত করে এনে কলে পিষে তাদের নিংড়ে নিচ্ছি। হাস্যকর ব্যাপার দেখ, সেই কলেই আবার তোমাদের জন্য আমরা কাজ দিতে পারি না। তাতে তোমরা ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে যদি ডাকাতি কর, তাহলে আমরা জেলখানা বানিয়ে রেখেছি, তাতে তোমাদের কয়েদী করি, তোমাদের ঘানি টানাই।···থামো, তুমি বলবে সে তো মালিক আর সরকার বাহাদুর করে। আপাতত কথাটা তাই বটে কিন্তু আমরা বুদ্ধিজীবীরাও সেই দলের। ওরা যদি বা তোমাদের রুটি বন্ধ করে, আমরা তোমাদের আত্মাকে অপমান করি। তোমাদেরকেই আমরা ভাবি বঞ্চিত, মূর্খ। আর তারপর সখের রাজনীতিক সেজে তোমাদের ভাল করতে এগোই। আশ্চর্য! এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার!'

মনে হল, বগলাচরণের মনের ওপর থেকে পর্দা উঠে গেল একটা। সমীর কি

বললে, সবটুকু বুঝবার মতো অবস্থা ছিল না ওর। কিন্তু ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজেকে প্রকাশ করে ফেললে ও। ওর সেই হাঁড়ি-হাঁড়ি গলায় বললে, এখন সেটা আরও ভারিক্কি আর কাঁপা-কাঁপা মনে হ'ল, 'আপুনি বললেন তাই আপনাকে বললম। ভয় আমরা কাকেও করি নাই, জেলার সাহেব, দারগা বাহাদুর কাকেও কিয়ার করি নাই। যতদিন ই দেহে মাহাপ্রাণী আছে, বাবু, ই ব্যারঞ্জ বশ লয়। কিন্তুক, বাবু, আমরা সাধারণ মুখ্যু মানুষ—আমাদিকে কেউ বিশ্বাস করলেক নাই। আমরা মন্দ বললে বলে, বেটা ছোটলোক, ডাকাত। আর ভাল কথা বললে বলে, বেটা চালাক, ধড়িবাজ, কাজ হাসিল করতে এসেছে। তবে আপুনি যে কইলেন ভালবাসার কথা, ই হাজার কথার এক কথা। বাবু, শুনেন, আপনাদের মুখের দিকে যখন চাই তখন সব ভুলে যাই আমরা। লাথ মেরে তাড়ি' দিলেও মনে করি বাবুরা ঠিক কোচ্চেন, জেলে ঢুকিয়ে ঘানি টানালেও মনে করি ঠিক করছেন। বাবু, আপনারা অন্যায় করতে পারেন ই আমরা মনে করি নাই। মনে হয়, এক বাবু যদি ভুল করেন থালে আর এক বাবু ঠিক করবেন, হঁ।'

বগলাচরণ হাঁপিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না সমীরের। বগলার কথার মাঝখানেই উল্লসিত হয়ে উঠছিল। যেন, যে কথাটা ওর দিক থেকে সত্য ছিল, বগলার থেকে সেটার সমর্থন পেয়ে ওর আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। বগলার কথা শেষ হলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল ও, ততক্ষণে বৃষ্টির ঝাপটা ঘরের মধ্যে এসে পড়তে আরম্ভ করেছে। তারপর পায়চারি করতে করতে বগলার দিকে তাকিয়েই ও বলতে আরম্ভ করলে, 'আর আমাদের অবস্থা দেখ বগলা। আমরা আন্দোলন করে জেলে এসেছি। কিসের জন্য আন্দোলন, না, তোমাদের ভাল করব বলে। আমাদের স্পর্ধা লক্ষ্য কর, যারা নিজেরা শুকনো কলুষিত, তারা অন্যের কল্যাণ করবে! চিত্ত-শুদ্ধি নেই—যে-জন্যে সামান্য জিনিষ নিয়ে আমরা ঝগড়া করি, পান থেকে চূণ খসলে ক্ষেপে যাই আর আদর্শের দোহাই পাড়ি। আর আমরা যাদের নেতা তারা অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা অর্থ দিয়েছে, আমাদের সমস্ত সুবিধে করে দিয়েছে। এমন কি আমাদের যখন বন্দী করে নিয়ে এসেছিল তখন আমাদের কেড়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছে। না, পুলিশ-কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর হিংসা করে নি···দ্য ওআর্স্ট্ ফর্ম্ অব ভায়লেন্স উই হ্যাভ ইনফ্লিক্টেড অন দেম্। আমরাই, তাদের ওপর চরম হিংসা করেছি, তাদের বিশ্বাসকে ভ্রান্তপথে চালিত করেছি।

কেননা যে ত্যাগের মধ্যে কেবল উত্তেজনা আছে, চিত্তের শুদ্ধি নেই সে ত্যাগে কখনই কল্যাণ হতে পারে না। এর থেকে আমাদের সরে দাঁড়াতে হবে, হয়তো আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে কিন্তু তাতে আমি ভয় পাই না। আমি কি করব তার প্রায় কিছুই জানি না কিন্তু পথটা যেন আমি চিনতে পারি। চকিতে তা যেন আমাকে দেখা দেয়। এ পথের প্রথম কাজটা আমি বুঝতে পেরেছি, সেটা হচ্ছে সরল জীবন যাপন করা, দেহ-শ্রমের ওপর নির্ভর করে। আমার নিজের কাজ আমি অন্যকে দিয়ে করাব না, আমি নিজে করব। বগলা, কাল থেকে আমার ঘরদোর আমিই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। তুমি আসতে পারো, কিন্তু তোমাকে কাজে হাত দিতে দেব না…'

'বাবু, আপনি ই কথা কি বলছেন? আমি বুঝতে পারলম নাই। কিন্তুক আমার কি মনে হয় জানেন, আপুনি যা বলছেন তা পারবেন। আপনার অসাধ্য কিছু নাই…'

সমীর মৃদু হেসে ওর সামনে আবার এসে দাঁড়াল। বললে, 'ঠিক তাই। এ কথা যদি আমার বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের বলতাম, তারা বিশ্বাস করত না। করবে কোথা থেকে, প্রাণ থাকলে তো করবে। অথচ তুমি করলে, কারণ তোমরা ভালবাসতে পারো। আমার আবার মনে হচ্ছে আমার কাজ আজই শুরু হয়েছে …তোমাকে যে এমনি করে বলতে পারছি, আমার হৃদয় হাল্কা হয়ে গেছে। হয়তো আমি এই প্রথম বিশ্বাস করতে পারছি। এ যে কী শান্তি, আমার অবস্থায় না পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না। তাই কেবল ব্যক্তিগত জীবনে শুধু নয়, আমার সংগঠনের কাজ কি হ'বে তাও তোমাকে বলতে চাই। এতদিন আমরা শ্রমজীবীদের ওপরই জোর দিতাম সংগঠনের জন্য, কিন্তু এখন জোর দিতে হবে মালিক আর বুদ্ধিজীবীদের ওপর। কেননা, এদেরই জীবন শুষ্ক, কলুষিত… এদেরকেই নেমে এসে ভালবাসতে হবে, তা না হলে পরিত্রাণ নেই এদের। এরা বুঝতে পারছে না…কী মহৎ সর্বনাশ এদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এই সেদিন জুনাপুরে এরা যে 'মাসাকার' করেছে এস-ডি-ও'র বাংলোর সামনে, এতেও কি এদের চোখ খুলবে না?…কিন্তু সে কথা থাক, সে হচ্ছে ভবিষ্যতের কথা। এখনই আমার কর্মসূচী আমার কাছে এসে গেছে, জেলের বাইরে আমার যাওয়া দরকার। এর জন্যে হয়তো আমাকে অনশন করতে হবে…'

কথাটা শুনে বগলাচরণ শিউরে উঠল, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

'ই কি কথা বলছেন, বাবু···না-না, ই কাজ করবেন নাই···আমি নিজের চোখে দেখেছি, কত বাবু এই ইখেনে···আপনকার এই দেহ···'

মাঝপথেই ওকে থামাল সমীর। 'বগলা, আমি নিজেকে অবিশ্বাস করি না, তুমিও আমায় অবিশ্বাস কোর না···' ওর কণ্ঠস্বরে অনুনয় ফুটে উঠল।

অধ্যায় ৯

আগের আগের দিনের মতো এর পরের দিন সন্ধ্যা বেলাতে ঝড়-বৃষ্টি নামল না। রাত ন'টা সাড়ে ন'টার সময় মেঘ করে ঝড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। রাত্রে যে বৃষ্টি হয়, পরের দিন বেলা দশটা হতে না হতেই তার কোনো চিহ্ন থাকে না, তারপর সারা দিন তো আছেই। বিকেলের দিকে অসহ্য গুমোট গুলি পাকিয়ে থাকে। আজকে এত দেরিতে যদিও বা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করল, তবুও তা এদের কারও মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। 'হয় আমাদের বিরুদ্ধে চার্জ-শীট দেওয়া এবং প্রকাশ্য বিচার করা হোক, অথবা মুক্তি দেওয়া হোক'—এই দাবী করে সমীর ব্যক্তিগত অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করেছে এবং অনেকেই তাঁকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছেন।

তখন ডাইনিং হলে এঁরা খেতে বসেছেন। টাওয়ারের পাশেই সবচেয়ে বড় হলটা এঁদের তিনটে ব্লকের জন্য নির্দিষ্ট। সমস্ত হলটায় একটা থমথমে গুমোট ভাব। অন্যান্য দিনের সঙ্গে তুলনায় এর তফাৎটা সহজেই চোখে পড়ে। কেড়ে খাওয়া, পাতে দেওয়া আর পাত থেকে তুলে নেওয়া—গরম রাজনীতির আলোচনা, প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টি নিয়ে নীতিগত তর্ক-বিতর্ক, নেক্স্ট্ মুভ অব দি কংগ্রেস রিলেটিং টু দ প্রবলেম অব্ কাশ্মীর, কোনো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জট, এসব কোনো কিছুই আজকে ছিল না।

আগেকার মতোই অবশ্য এঁরা দলে দলে ভাগ হয়ে আসছিলেন কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় দলগুলি ছোট হয়ে গেছে। সামনে হাতের কাছে যেখানেই জায়গা পাচ্ছেন সেইখানেই বসে পড়ছেন। সম্ভাষণ হচ্ছে কিন্তু কথাবার্তা স্বল্প। তার আগেই তাকাচ্ছেন প্রশ্ন-কর্তার মুখের দিকে, যেন বলতে চান, 'কেমন কি না, এই তাহলে ঠিক তো···এই তাহলে ঠিক?' এবং ঠিক একই প্রশ্ন তাঁর চোখে দেখতে পান।

'ফালতু' গণেশ দরজার মুখে একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসল। টেবিলের ওপর সাজানো গেলাসগুলোতে জগ থেকে জল ঢেলে দিচ্ছিল ও। একটা পাতলা এ্যালুমিনিয়মের গেলাসে জল ঢালতে গিয়ে সেটা উল্টে দিলে। টেবিলের ওপর দিয়ে জলটা চলাৎ করে ছিটকে সামনেই যিনি খেতে বসেছিলেন তাঁর কোলে গিয়ে পড়ল। পাশের থেকে চোখ তুলে তাকালেন কয়েক জন, কিন্তু যেখানে ৬নং ঘরের সেই হুল্লোড়টা আর একবার ঘটতে পারত, সেখানে ওঁরা একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। যাঁর কোলে জল পড়েছিল তিনি উঠে মৃদু হেসে বললেন, 'কি, ঘাবড়াচ্ছ কেন, দাঁড়াও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি···' বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা পেরিয়েই শেখর মুখার্জীর সঙ্গে মুখোমুখি হল। শেখর বললে, 'কি, না খেয়ে চলে আসলেন যে?'

'না, এই কাপড়টা ভিজে গেল। এখুনি আসছি···'

গণেশ তখনও কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ওর কি হল, এগিয়ে এসে শেখরকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমার অপরাধ, বাবু, গেলাস পড়ে গেল···'

'ও, তাই না কি···' শেখর বললে কিন্তু গণেশের কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে ভেতরে চোখ চারাতে লাগল। মনে হল, নিরাশ হয়েছে ও। গর্দান শুদ্ধ মুখখানা ফিরিয়ে ফিস ফিস করে বললে, 'ওহে, শোন, সমীরবাবু এসেছেন?'

গণেশ কথা বলে আরও বেকুব হয়ে গিয়েছিল। ও বুঝতেই পারল না কোনও বাবুই তার কাজ এবং কথায় খেয়াল করছেন না কেন। ও শেখরের পাশে এসে মুখের ঘাম মুছবার জন্যে গামছাটা তুললে কিন্তু না মুছেই বললে, 'না উ বাবু আসেন নাই। রতনবাবু এসেছেন, হুই হোতাকে বসছেন···'

'ও···' বলে পেছনে ফিরল শেখর মুখার্জী। মনে হল, ব্লকে ফিরে যাবে কিন্তু কি মনে করে হলের ভেতর দিকেই এগিয়ে গেল। 'নাঃ, খেয়েই যাই···'

গণেশ আবার জগে জল ভরে হলের মধ্যে ঢুকল। সারিটার শেষে, কোণার দিকে আসতেই যে পরিবেশন করছিল সে তার কাছে সরে এল। কানের কাছে মুখটা সরিয়ে এনে ফিস ফিস করে বললে, 'গণেশ, আজ বাবুদিকে কেমন-কেমন দেখছি···'

'তুমি আদার ব্যাপারী, তুমার জাহাজের খবরে কি দরকার?'

গণেশের হঠাৎ এই রাগের কারণটা আঁচ করতে পারল না ও, কথার মানেও বুঝতে পারল না। বললে, 'ব্যাপার বুঝ···বাবুদের আজ জাঁক নাই, তরকারী

ভাল-মন্দ দিয়ে চিন্তাছে নাই···হুঁ, গণেশ, শুনেছি, বাবুরা নাকি ধর্মঘট করবেন, খাবেন নাই···'

'ত আমাদের উয়ার মধ্যে নাক গলাবার দরকার কি, আমরা যেই ছোট লোক সেই ছোট লোক আছি···'বলে গণেশ তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে জল দিতে আরম্ভ করলে।

এই হলের শেষ প্রান্তে একটা ছোট জটলার মতো বসেছিল। আলো থেকে দূরে একটু আবছায়ার মতো হয়েছে। একটা থামের পাশে বসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে যাচ্ছিল রতন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনও কথা বলল না ও, কোনও দিকে তাকালও না। কিন্তু পাশের থেকে কেউ কেউ লক্ষ্য করছিলেন ওকে। রতন এমনিতে রুক্ষ, চুপচাপ থাকার জন্য খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছে। এখন ওর এক মুখ দাড়ি, বসা-বসা চোখ, মুখখানাকে কঠিন করে তুলেছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ও বোধ হয় মুচকে হাসছে।

'রতনবাবু, খুব খাচ্ছেন দেখছি···' সামনের থেকে বললেন একজন।

'হুম্···আর অল্প বাকি আছে···' বলে রতন বাকিটুকু শেষ করতে আরম্ভ করলে।

'আরে, মশয়, কথা বলেন একটা। কথা বলতে বলতে খান, ভাল হজম হ'বে।'

'কন, কুন, কইয়া যান। কথা কওনের বাধা নাই···' রতন বললে, কথার মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় ভঙ্গী এনে।

'বলি, আবহাওয়াটা কেমন মনে হচ্ছে আপনার, একটু গরম?'

'গরম! কন কি! গরম-ঠাণ্ডা নয়, ভানুমতীর খেল আরম্ভ অইছে, এখন শেষ-রক্ষা অইলে বাচি···' বলে নিজেরই কৌতুকে হা-হা করে হেসে উঠল ও।

'রতনবাবু, না-না, ঠাট্টা নয়। আসুন না, সমীরবাবুর এই প্রস্তাবটা আমরা আলোচনা করি···' বক্তা নিজের লঘু-ভাবটা সংযত করে এনে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলে।

রতনও ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললে, 'আলোচনা করতি চান? বেচারীরে আবার বিপদে ফেলবেন! লাইগা যান, কাম করতি লাইগা যান, পরে চিন্তা করবেন।'

রতনের খাওয়া হয়েছিল, ও ঢকঢক করে একগ্লাস জল শেষ করলে। একটা পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলে উঠে পড়ল।

'আরে, এত তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেল আপনার!'

'হঃ, তা হল। জেলের খাওয়াতে অরুচি ধরে গেছে, এবার আপনাদের কাছে বিদায় নিলাম...'

'তাহলে অনশন করছেন আপনি?'

উত্তরে রতন বাঁ-হাতটা তুলে একটা সেলামের ভঙ্গী করলে। তাতে ও কি বোঝাতে চাইলে বোঝা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে ও সমস্ত হলটা পেরিয়ে চলে গেল। ওর চারদিকে যে এতগুলো লোক আছে এবং তারা কোনও কিছু নিয়ে গভীর আলোচনা করছে, মনে হল না যে সে সম্বন্ধে ও সচেতন বা ওর কোনো আগ্রহ আছে।

যিনি রতনকে অনশন করা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি সেদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'লোকটা উদ্ধত দেখেছেন...' পরে আবার নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য, ওটা ওর চিরকালের স্বভাব, কিন্তু এখন যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।'

'পারহ্যাপ্‌স্ হী ইজ জেলাস অব সমীর সেন। এই প্রস্তাবটা তাঁর কাছ থেকে এসেছে বলেই উনি স্বীকার করতে পারছেন না।'

'আচ্ছা, বলতে পারেন, সমীরবাবু হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলেন কেন। তিনি এ্যাকশন কমিটির সেক্রেটারী হতে পারেন, কিন্তু যতদূর মনে হয়, ওদিক থেকে...মানে, প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কোনো কথা না এলে তিনি কিছু করতেন তা তো মনে হয় না।'

'হাউ ডু ইউ নো ছাট!' বক্তার চোখ মিটমিট করতে লাগল, যাতে বোঝা গেল তিনি এখনই একটা পরিহাস-বর্ষণ করবেন। 'আমি সমীরবাবুর পাশের ঘরে থাকি এবং কিছু কিছু খবর রাখার দাবী করি। দেয়ার অয়্যার টু ইন্টারভিউস...তার মধ্যে কাল সকালে একটা, মনোতোষবাবুর মেয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। তারও দু'দিন আগে মিসেস সেন এসেছিলেন...কোন্ রন্ধ্রে বাঁশি বেজেছে কে জানে...'

'আরে, ঐ তো, যাঁর সম্বন্ধে কথা বলছেন তিনিই এসে পড়েছেন।'

সমীর দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকজনই একসঙ্গে ডাক দিলেন ওকে। কাছেই ছাতা হাতে করে যে 'ফালতু'-টি দাঁড়িয়েছিল, তাকে কি একটা জিজ্ঞেস করল ও, তারপর একটা কোণার দিকে এগিয়ে গেল।

'নাঃ, সমীরবাবু সত্যিই খুব রোগা হয়ে গেছেন...'

এঁরা এতক্ষণ চুপ করে গিয়েছিলেন। সমীরের সমস্ত কথা মেনে নেওয়া না নেওয়া নয়, কিন্তু এঁদের ওপর সমীরের গভীর প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। একজন বললেন, 'বোধ হয় এই প্রিজন্‌-লাইফের ওপর খুব বেশী চিন্তা করছেন, তা না হলে এমনি হবে কেন।'

'একজন শিল্পী মানুষের বিড়ম্বনা আর কি। হী ইজ এসেন্সিয়ালি এ্যান্‌ আর্টিস্ট।'

'রীয়েলি সো…' আর একজন চিন্তা করতে করতে ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলেন।

অধ্যায় ১০

খাওয়া-দাওয়া সেরে ডাইনিং-হল থেকে বেরোবা মাত্র সমীরের কাছে এগিয়ে এল শেখর মুখার্জী। পেছনে এবং পাশে তাকাতে তাকাতে এসে ওর হাত ধরে বললে, 'সমীরবাবু, আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজছিলাম। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে…'

সমীর শেখরের হাতের মধ্যে হাত রেখে কেমন কুঁচকে গিয়েছিল। যে মুহূর্তে শেখর তাকে স্পর্শ করলে সেই মুহূর্তেই সমীরের মনে হতে লাগল, তাকে তার ঠিক জায়গা থেকে সরিয়ে একটা কুচ্ছিৎ আবহাওয়ার মধ্যে এনে ফেলেছে। একবার ওর মনে হ'ল, শেখরের হাত থেকে হাতটা টেনে নেয় কিন্তু একটা অস্পষ্ট, ঠাণ্ডা, সিরসিরে অনুভূতি যেন তার সমস্ত হাতটাকে অবশ করে দিয়েছিল। ও ভীত স্বরে বললে, 'শেখরবাবু, আপনি আমায় কি বলবেন বলুন…'

'কেন আপনি হঠাৎ এই অনশনের প্রস্তাব দিলেন? এর একটা ভীষণ রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে সেটা আপনার না-জানার কথা নয়। আপনি যদি এই অনশন করেন প্রায় সবাই আপনার সঙ্গে যোগ দেবে—আপনার সে-প্রভাব আছে জানি। জুনাপুর-ঘটনার বন্দীরা ছাড়াও অন্য বন্দীরাও ঐ একই দাবি নিয়ে অনশন করবেন আলোচনা করছেন। ইট উইল বী এ গ্রাণ্ড সাকসেস… কিন্তু আপনি নেতা হয়ে এটাকে কোন পথে চালাবেন?' বলে শেখর সমীরের মাথার ওপর থেকে ওর মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল।

সমীরের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। এই বক্তৃতার সমস্তটাই তার প্রশস্তির জন্যে এটা সে বুঝতে পারলে। কিন্তু প্রত্যেকটি কথাই তাকে ছ্যাঁকা দিয়ে পোড়াতে

লাগল। সমীর আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'আপনি কি মনে করেন না, যারা আমাদের নেতা বলে মেনেছে তাদেরকে যখন গুলি করে মারছে তখন তাদের পাশে গিয়ে আমাদের দাঁড়ানো উচিত?'

সমীরের এই নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে শেখর চমকে উঠল, কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে বললে, 'বাই অল মীন্স্, ইয়েস।'

'তাহলে, আমাদের বাইরে যেতে হলে, এ ছাড়া আর কি উপায় বলুন? আপনি তো জানেন, আমাদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ নেই, বিচারে আমাদের আটকে রাখতে পারবে না ওরা।'

'কিন্তু সমীরবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। তার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কিছু করতে পারি না আমরা। মনোতোষবাবুর কাছ থেকে আপনি কি কোনো ইন্টিমেশন পেয়েছেন? আমি তো পাই নি এখনও।'

একগাদা কথা সমীরের মুখে ঠেলাঠেলি করে এল। কিন্তু ও কেবল বললে, 'আপনি আমার ঘরে আসুন, বসে কথা বলব…'

শেখর সমীরের ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়ল। সমীর সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল। কে প্রথম কথা বলবে বোঝা গেল না। শেখর সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। বুঝলে, এতক্ষণ সে যা কিছু করেছে সমীরকে একটুও টেনে আনতে পারে নি, এবং এর পরে যা কিছু কথাই হোক-না কেন, কোনো ফলই হবে না। তবুও এই আশংকা সে বিশ্বাস করল না এবং উপযুক্ত শব্দ খুঁজে বেড়াতে লাগল কথা আরম্ভ করবার জন্যে।

উজ্জ্বল বৈদ্যুত আলো সোজা সমীরের মুখের ওপর এসে পড়েছিল। বাইরের থেকে ঘরের ভেতরকার গরমের মধ্যে এসে দাঁড়াতে ঘামে মুখখানা ভিজে উঠতে চাচ্ছে। চোখ দু'টি উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ। একটুখানি অন্যমনস্ক, মনে হয় বুকের ভেতরটায় সমস্তখানি করুণায় ভরে রয়েছে। তবুও এই মুহূর্তে একটা বেদনার ছাপ পড়েছে ওর মুখে, যেন ও নিজের সঙ্গেই লড়াই করছে ভেতরে ভেতরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমীর শেষ পর্যন্ত বললে, 'শেখরবাবু, কথা আমার খুব সামান্যই। আমি আমার নিজের কথাই বলছি··আমি অবিশ্বাস করেছি,

সন্দেহ পোষণ করছি, কিন্তু এর চেয়ে তো গ্লানি নেই। এ জন্যেও আমাকে অনশন করতে হবে।'

'সন্দেহ! অবিশ্বাস! কেন, কিসের জন্য?'

শেখর উঠতে যাচ্ছিল, তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমীর তাকে নিবৃত্ত করে বললে, 'শেখরবাবু, আপনি এটা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কিন্তু আমাদের এ্যারেস্ট করা আর তারপর জুনাপুর শ্রমিকদের বিপথে নিয়ে যাওয়া এই সব কিছুই আগে থেকে প্ল্যান করে হয়েছে। আর এর মধ্যে আমাদের কারও হাত ছিল না একথা বলতে পারি না।'

শেখরের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল। শুকনো মুখে এবং কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম বিস্ময়ের আমেজ এনে শেখর বলে উঠল, 'সে কি, দিস ইজ এ্যাসটনিশিং, এ্যালারমিং অল দি মোর···আপনি জানেন নাকি, সমীরবাবু?'

'শুধু তাই নয়, তার জের এখনও চলছে। আমরা লেবার অফিসার বা কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছি, মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারের জন্যে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁরা সোজাসুজি মালিক পক্ষের। শ্রমিক আন্দোলনে কি তাঁদের থাকা উচিত?'

শেখর দাঁড়িয়ে পড়ল, ওর অস্থির দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাও কাঁপতে লাগল। ও বললে, 'আশ্চর্য! কিন্তু কার কাছে এ খবর পেলেন আপনি। তার প্রমাণ আছে?'

'শেখরবাবু, সমস্ত জিনিসের প্রমাণ করাটাই কি উচিত, না কি, আপনি তা চাইবেন?'

শেখরের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছল, বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ও। কথা বলা তো দূরের কথা, একটু নড়বার পর্যন্ত ক্ষমতাও রইল না। কিন্তু এটাও বুঝল ও, এই মুহূর্তেই ওর কথা বলা দরকার। যতই দেরি করবে ততই টেনে নামাবে ওকে। এক সময় টেনে টেনে বললে, 'সমীরবাবু, সে কথা নয়···ইয়ে, মানে সব জিনিসের প্রমাণ···প্রমাণ নেই তো প্রমাণ করবেন কি করে···' বলে একটু হাসি টানবার চেষ্টা করল মুখের ওপর আর মুখখানা বিকৃত করে তুলল। 'কিন্তু আমি···আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করি। আপনি বলছেন সুতরাং আমি এটা মেনে নেব। যাক গে, কথাটা হচ্ছে···কিন্তু এখন বোধ হয় আপনি ঠিক 'মুডে' নেই, পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। গুডনাইট···' বলে কুঞ্চিতলাঙ্গুল শৃগাল যেমন করে পালায়, শেখর মুখার্জী তেমনি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সমীরের অবস্থা মর্মান্তিক হয়ে উঠল। অসহ্য ক্রোধ শান্ত করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল ও। আলো নিবিয়ে অন্ধকার ঘরে কাতরাতে লাগল সমীর। আর এই ক্রোধ যতই শান্ত হয়ে আসতে লাগল, গ্লানিতে ক্লিন্ন করে তুলতে লাগল ওকে। এক সময় নির্জীবের মতো বিছানায় পড়ে রইল ও। মাঝে মাঝে মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগল, 'এরও বোধ হয় প্রয়োজন ছিল, এইটাই সত্য। এ লাভার মাস্ট উইন ওভার দি আনচেস্ট, এ লাভার···ইয়েস, দ্যাট ইজ লাভ!'

অধ্যায় ১১

যখন সমীরের ঘুম ভাঙল তখন একটু বেলা হয়ে গেছে। না তাকিয়েই ও সেটা বুঝতে পারলে। পাশ ফিরে শুতে গেল ও, কিন্তু হাত-পাগুলো কেমন তুলোর মতো হাল্কা হয়ে গেছে। উঠতে চায় না, যেন আছে কি নেই। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল ও। ছাদের গায়ে আলো ঠিকরে পড়েছে। কড়ি-বরগার ফাঁকে কিসের অস্পষ্ট রেখা-রেখা দাগ পড়েছে। মনে হয়, বৃষ্টির দাগ লেগেছে, কিন্তু বৃষ্টির জল চুইয়ে কি এমনি পরিচ্ছন্ন দাগ হতে পারে। বোধ হয় মেটে রঙ দিয়ে কেউ চিত্র বিচিত্র করেছে। কোনও বন্দী কি কোনো সময় এমনি রেখা টেনেছেন, কে জানে।

আবার একটা হাল্কা আমেজের মতো এল সমীরের, চোখ দুটো বুজে এল। কিন্তু হঠাৎ খুব সুমিষ্ট আর তীক্ষ্ণ কিচির-মিচির শব্দে চমকে চোখ খুলতে হল ওকে। তড়াক করে বিছানার ওপর উঠে বসল ও। তিন চারটে টুনটুনি পাখি ঢেউ দিয়ে এসে কড়ি-বরগার মধ্যে আঁকড়ে বসল। বসা নয়, ছুঁয়ে দিল মাত্র, তারপর আবার এ-কোণে-ওকোণে দোলাদুলি করে ফিং দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু এই বিরতি মুহূর্তের জন্য মাত্র, তারপর আবার একটা চকিত গতি আর শব্দের ঢেউ এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। ধ্বনি আর গতির জাল বোনা হয়ে উঠতে লাগল।

তখন, যেমন করে এক সুর থেকে আর এক স্মৃতির কথা মনে হয়, তেমনি করে মীনাক্ষীর কথা মনে পড়ল ওর। হাল্কা, অন্যমনস্কভাবে নয়, এমনি করে ওকে অনেক দিন মনে পড়েনি সমীরের। এ যেন একটুখানি ছুঁয়েই সমস্ত

অনুভূতিটাকে টেনে ধরে। সমীরের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। একদিন সকালে একটা বাচ্চা নেউল মীনাক্ষীর রান্নাঘরে ঢুকেছিল। সমীর সেটা তাড়াতে যেতেই ওকে বারণ করেছিল মীনাক্ষী। 'তবে, তবে তুমি কি করবে?' সমীর জিজ্ঞেস করছিল। মীনাক্ষী ওটা ধরতে চাইলে। নেউলটা ছুটে এসে শোবার ঘরে ঢুকল চৌকির নিচে। একটা হাঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিলে। তারপর, মীনাক্ষীকে এঘর-ওঘর ছুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ওটা। মীনাক্ষীকে একটা ছোট মেয়ের মতো তেমন করে আগে আর ছুটতে দেখে নি সমীর। যদি মীনাক্ষী তার আনন্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠত তাহলে কি অমনি করে ছুটতে পারত? এই তো সেদিন মীনাক্ষী এসেছিল কিন্তু···মীনাক্ষী কি আবার দেখা করতে আসবে?

দুই হাতের তেলোর পেছনে চোখ মুছল সমীর। ততক্ষণ পাখির দলটা উধাও হয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে সামনের দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার সামনে দাঁড়াল ও। চিরুণিটা নিয়ে চুলে দিতে গিয়ে আবার রেখে দিলে। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল ওকে—দুই চোখের কোণা দিয়ে দুটো কালো দাগ নেমে এসেছে। আঙুল দিয়ে ঘসতেই খানিকটা দাগ উঠে গেল। আশ্চর্য, তাহলে রাত্রে কি ও কেঁদেছিল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে? আর যদি কেঁদেই ছিল তাহলে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই? না কি, সমস্ত ভুলে গিয়েছে সমীর! এটা কেমন করে সম্ভব হল বুঝতে পারল না ও। না কি, মানুষ এমনি করে তার খুব বেশি কষ্টের কথা ভুলে যায়? তাহলে···তাহলে এই কি মৃত্যু? মৃত্যু! ভাল-মন্দ, কান্না-হাসি, তীক্ষ্ণ আনন্দ আর বেদনা, অতি তীব্র অনুভূতিপূর্ণ মানুষের এই জীবন—মৃত্যু তাহলে তারই অতি সহজ বিস্মৃতি! এমন বিস্মৃতি যে মৃত্যু-যন্ত্রণা—না, জীবন-যন্ত্রণাও তখন মনে থাকে না। এত সহজ—ঠিক পল্লব-প্রান্তের শিশির-বিন্দুর ঝরে পড়ার মতো।

খুব তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে চলে গেল সমীর। ঘণ্টা খানেক পরে যখন ফিরে এল ও, তখন ওর পায়ের গতি মন্থর হয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে ও কাপড়-চোপড় বদলাতে লাগল। এখনও সমস্ত শরীরে, চুলে, গালের ওপর ভিজে ভিজে রয়েছে। চুলের ওপর চিরুণি চালাচ্ছে সমীর আর চোখ বুজে রয়েছে। মাথার মধ্যে খুব স্নিগ্ধ, সুখস্পর্শ আনন্দের ঢেউ যেন ভরে ভরে তুলছে। একটা কোনও সুর মনে পড়তে চাইছে তার···সে সুর ঠিন ঠিন করে বাজছে। কি একটা সুর, এই যেন হাতের কাছে এসে ধরা না দিয়েই চলে যায়। অন্যমনস্কভাবে

বারান্দায় বেরিয়ে গেল সমীর, ভিজে ধুতিটা মেলার জন্য। সেখানে গিয়ে হঠাৎ সেই সুর আর গান মনে পড়ে গেল। তার বোবা আনন্দটা হঠাৎ কথা পেয়ে, রূপ পেয়ে সজীব হয়ে উঠল।

ওপর দিকে মুখ করে উঁচু তারের ওপর ধুতি ছুঁড়ে দিচ্ছিল ও। সেই মুহূর্তে এক রাশ আলো ওর চোখের ওপর এসে পড়ল। স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল আলো, ভিজে-ভিজে, ঈষদুষ্ণ স্নেহ-স্পর্শের মতো···ঠিক, ঠিক তো, এই তো সেই গান: আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও। সমীরের স্পষ্ট মনে পড়ে সেটা ছুটির দিন, কিন্তু কবে কতদিন আগে তা মনে পড়ে না। মীনাক্ষী চা দিয়ে বলেছিল, 'তোমায় আজ একটু বাজিয়ে শোনাই···' কত মৃদুস্বরে হাসতে হাসতে কথা বলে মীনাক্ষী, কিন্তু ওকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি। জানালার পাশে মাদুর পেতে বসে এস্রাজের তারে ছড়ি টানছিল ও। সমীর মাদুরের ওপর বসতে যেতেই ও বললে, 'না গো, এখানে না, তুমি ঐ মাদুরটায় বসো···'। একটু পরেই বোঝা গেল মীনাক্ষী সমীরকে ভুলে গেছে, নিজেকেও।

রেলিঙে দু'হাত দিয়ে সামনের দিকে দেহটা ঝুঁকিয়ে দিল সমীর। ওর সমস্ত দেহের ওপর আলো এসে পড়েছে—চোখ বুজে থাকতে থাকতে চোখ মেলল ও। সামনে জেলখানার ব্লকগুলি গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে। তার ওদিকে অনেকটা ফাঁকা। জেলের সীমা পেরিয়ে নগরের বাড়ি ঘর, বাঁ-দিকে অনেক দূরে একটা উঁচু জায়গার আভাস। কিন্তু তা নয়, এই সব কিছুর ওপর নব সূর্যের আলো পড়েছে এটাই সত্য। কাল সমস্ত রাত্রির বৃষ্টির পর এ আলো ধুয়ে ধুয়ে পবিত্র হয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে ওর বুকের মধ্যে ব্যথা, না কি, সুখের নিবিড় অনুভূতি ঠেলে এল। মীনাক্ষী এই মুহূর্তে কী করছে।···ওর মনে হল, বিশ্বের এ সৌন্দর্য, সে তো আত্মবিস্মৃত নারী সৌন্দর্যের মতো। তা এমনি নিমীলিত-দৃষ্টি, তন্ময়, তা কেবলই মন্ত্রসাধনা করছে: উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো। আলোকের ঝর্ণা-ধারায় ধুইয়ে দাও।···

*   *   *

ঠিক এই সময় জেল কম্পাউণ্ডের সীমা বরাবর কাঁটা তারের বেড়ার ধারে দুজন বন্দী বেড়াচ্ছিলেন, অধ্যাপক বিনয় চট্টরাজ এবং শান্তবাবু। শান্তবাবুর মুখখানা বেশ প্রফুল্ল, স্পষ্টত আসন্ন অনশন সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, সেটার সমস্যা অপেক্ষা আনন্দের দিকটাই তিনি অনুভব করছেন। কিন্তু অধ্যাপক চট্টরাজের ঠিক বিপরীত। ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে, এত বিরক্ত হয়েছেন যে

ভাল করে কথা বলতে পারছেন না। শান্তবাবুর কথায় হুঁ-হাঁ দিচ্ছেন আর বিরক্তি অসহ্য হয়ে উঠলে বিড়বিড় করে বলছেন, 'অল দীজ আর ননসেন্‌স্‌।' তিনি কেবলই ভাবছেন, অন্যত্র তাঁর স্থান রয়েছে এবং সেখানে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন, যা তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক হত। কিন্তু এইভাবে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। অনশনের এই নূতন প্রস্তাব—এতে তাঁর অনেকখানি শক্তি যাবে। অথচ এটা তিনি এড়িয়ে যেতেও পারবেন না।

মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটছিলেন চট্টরাজ। সামনে একটা আধলা ইটের কোণা পড়েছিল, ওটাতে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন। আরও একটু পাশে সরিয়ে দিতে যাচ্ছেন এমন সময় শান্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, দেখেন, দেখেন প্রফেসার, ওটা কি দেখেন তো।'

বলতে বলতে শান্তবাবু জিনিসটার দিকে এগিয়ে গেলেন। চট্টরাজ একবার নাক সিটকে তাকালেন ওদিকে তারপর তিনিও ফিরলেন। শান্তবাবু পায়ের পাতার ওপর বসে হাতে করে তুলে ধরেছিলেন জিনিসটা, 'আরে, দেখেন, তুলোর প্যাড্। কিন্তু তুলোর প্যাড কেন, নিশ্চয়ই কেউ…' বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন শান্তবাবু, অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন চট্টরাজের দিকে।

'সে আবার কি?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন চট্টরাজ কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেও আকৃষ্ট হয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারের বেড়া বরাবর আরও কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো পড়ে আছে। এক মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠল: নিশ্চয়ই কেউ কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়েছেন। হাতের ওপর প্যাডটা তুলে নিলেন চট্টরাজ। ঈর্ষায় তাঁর গাটা রী-রী করে উঠল। বললেন, 'শান্তবাবু, সাম ফর্চুনেট উল্‌ফ হ্যাজ এস্কেপড, এ্যাণ্ড উই আর সো হেল্পলেস্…'

'প্রফেসর, চলুন, সরে যাই। ব্যাপার বড় সুবিধের নয়…'

'কেন?'

'বাবু, ক্যা হুয়া? ও চীজ ক্যা…' একজন জমাদার ওদিকে যাচ্ছিল, ওদের এইভাবে দেখে ছুটে এল কাছে।

শান্তবাবু তাড়াতাড়ি করে বললেন, 'কিছু না, কিছু না…এই কি একটা দেখছিলাম। প্রফেসার, আসুন আজ যাই…'

জমাদার ততক্ষণে চট্টরাজের হাত থেকে প্যাডটা ছিনিয়ে নিয়েছে। ওর চোখ দুটো নাটার মতো ঘুরছে তখন। 'আরে, উহাঁ একঠো পেন হ্যায়?' ও এক লাফে বেড়ার ধারে গিয়ে ফাউণ্টেন পেনটা কুড়িয়ে নিলে। ফাউণ্টেন পেন

আর প্যান্টের টুকরোগুলো শক্ত করে চেপে ধরলে ও, যেন কেউ এক্ষুণি ওর হাত থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নেবে। এঁদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠল ও, 'ইয়ে তো কিসীকা বাবুকা হ্যায়…' বলে ও তৎক্ষণাৎ অফিসের দিকে ছুটে গেল। এঁদের বিমূঢ় ভাবটা কাটতেই প্রথম কথা বললেন চট্টরাজ, 'ননসেন্স……'

শান্তবাবু নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেকে হাল্কা করে বললেন, 'যাক, আবার এক কাণ্ড হল। কিন্তু মিঃ চট্টরাজ, আমরা আর এখানে দাঁড়াব না, চলুন……' বলে চট্টরাজের হাত ধরে নিয়ে এগোলেন।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছেন এমন সময় পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল।

চট্টরাজ শান্তবাবুর হাত ঝিনুকে বললেন, 'হোআট্ ইজ্ দিস?' কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না ওঁরা। চারদিকে কোথাও কিছু নেই, তারপর ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। ভীষণ আক্রোশে ঘণ্টা বেজে চলেছে। এ যেন অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে বলা হচ্ছে, 'বাঘ পড়েছে…' কিন্তু কোথায় পড়েছে, ঠিক দু'হাত সামনেই রয়েছে কিনা বুঝবার উপায় নেই। অথচ তার আতংক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে ততোধিক অন্ধভাবে ছুটছে যে যেখানে আছে সেখান থেকে, দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই।

ওদের অজান্তেই ওদের পায়ের গতি বেড়ে গিয়েছিল। শান্তবাবু বার দুই অস্ফুট দ্রুত স্বরে বললেন, 'আমাদের এক্ষুণি রুমে ফিরে যেতে হবে, এক্ষুণি……'

সামনেই একজন বুড়ো কয়েদী হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ও সব্জী বাগান থেকে কাজ করতে করতে ছুটে এসেছে। 'এঃ শালে…যাও, যাও, মাৎ ঠারো…' একটা খাটো-চুল, রক্তমুখো সিপাহী ছুটে এসে ওকে লাথি মারলে। লাথি মেরে দাঁড়াল না ও, আবার চিৎকার করে দু'হাত দুদিকে মেলে দঙ্গল তাড়াবার মতো করে ছুটে গেল। মুখ দিয়ে অনর্গল থুতু ছিটকে পড়ছে, 'এঃ শালে, ভাগ যাও, ভাগ যাও…'

একজন এসে শান্তবাবুর হাতটা ধরলে। কিছুটা টানবার কিছুটা ঠেলা মারবার ভঙ্গীতে ওঁকে নিয়ে গেল খানিকটা, তারপর ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে ছুটল। অধ্যাপক চট্টরাজ এটা দেখে সামনে হাতটা ওঠালেন, যেন কিছু বলতে চান। হঠাৎ পেছনে ফিরলেন তিনি এবং সেই অবস্থাতেই চিৎকার করে

যন্ত্রবৎ এক পা পিছিয়ে এলেন। একজন জমাদার বেটন উঁচিয়ে তাঁর দিকে লক্ষ্য করে ছুটে এসেছে। দুই হাতের তেলো সামনে ছুঁড়ে আড়াল দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইউ···স্টপ...খবর্দার...। সে কেবল মুহূর্ত মাত্র। বেকুব জমাদারের মুখের ওপর দিয়ে এক ছুটে তাঁর ব্লকের বারান্দায় এসে পৌঁছোলেন। পা দুটো এমনি কাঁপছিল তাঁর যে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকা লাগছিল, চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল। ডান হাতটা কেবলই ওপরে নিচে করছিলেন তিনি। এত জোরে আর কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করছিলেন যে এটা তাঁরই কণ্ঠস্বর তা বোঝা মুস্কিল ছিল। 'সিলি······অল দিস ইজ্ সিলি······ অল দিস ইজ্ সিলি......'

ঘণ্টা তিনেক দক্ষ যজ্ঞের পর সংবাদ পাওয়া গেল, কম্যুনিস্ট পার্টির রতন ধর এবং আর একজন কয়েদী পালিয়েছে। ঐ কয়েদী নিশ্চয়ই ওর অনুচর ছিল।...

প্রায় সমস্ত সময় সমীর তার নিজের ঘরে স্থাণুর মতো বসেছিল। বাইরের এত বিশৃংখলা, গোলমাল, দাপাদাপি তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না। যখন রতনের খবরটা তার কাছে এসে পৌঁছাল, তখন ওর মুখে একটা ক্ষীণ রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। 'হু টোল্ড্ মী দিস্? আমি কি জানতে পেরেছিলাম দিস ভায়লেন্স্ উড্ হ্যাপেন? কে আমাকে বলে দিয়েছিল!'

সমীর এই মুহূর্তে নতুন করে বিশ্বাস ফিরে পেল যে, অনশনের সিদ্ধান্ত তার ঠিক সময়োপযোগীই হয়েছে।

অধ্যায় ১২

জিস্কোর কনিষ্ঠ মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়র শ্রী সুপ্রকাশ সরকার তাঁর বাঞ্ছিত স্বর্গ জুনাপুর সিনিয়র ক্লাবের নৈশ-সম্মিলনীতে উপস্থিত হয়েছেন। জুনাপুরের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর এই তিনদিন হ'ল ক্লাব খুলেছে এবং এটা তাঁরও ক্লাব জীবনের তৃতীয় রজনী।

সুপ্রকাশ ছোকরা মানুষ, এমনিতে আরও ছোট দেখায়। ঠাট্টা করলে এখনও লাল হয়ে উঠতে চান। সামনে বিলিয়ার্ড টেবিলের চারধারে যাঁরা

জড়ো হয়েছেন তাঁরা হুররে করে উঠছেন মাঝে মাঝে, আর উনি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন।

কিন্তু এই তিন দিন ধরে যেটা ওঁর সব চেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে সেটা হল এক জায়গায় একসঙ্গে এতগুলি 'জায়েণ্টের' আমদানি। কারখানায় এঁদের অনেককেই অনেকবার দেখেছেন; কিন্তু ঠিক তাঁরাই যে এমনি করে নিজেদের খুলে ধরতে পারেন, তা না দেখলে কল্পনাই করতে পারতেন না তিনি। তাঁর মনে হল, এঁদের ঠিকমতো বুঝতে হলে এই রকম ক্লাব লাইফের একটা পারস্পেক্টিভ্ দরকার। খুব তাড়াতাড়ি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি, যেন নিজের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ব্যাপারটা একবার মিলিয়ে নিতে চান।

একবার মনে হ'ল, গ্যালারির ওপর একটু বসবেন, যাতে এঁদের একটু ভাল করে দেখতে পারেন। কিন্তু তার উপায় নেই। ওদিকের গ্যালারিতে যদিও দু'একটা সীট খালি আছে, তবু ওটা লেডিজ্ গ্যালারি হয়ে গেছে। মিঃ সান্যাল গল্প করছেন বটে ওখানে, কিন্তু সুপ্রকাশ ওখানে একলা গিয়ে বসতে সাহস পেলেন না। এদিকের গ্যালারিতে একটা মাত্র সীট খালি রয়েছে, কিন্তু তার পাশের সীটটা অধিকার করে রয়েছেন টেকনিক্যাল এ্যাড-ভাইসার ডব্ল্যু স্মিলেট। মিশরীয় স্ট্যাচ্যুর মতো দুই হাঁটুতে দুই হাত রেখে টেবিলের দিকে উঁচু হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন আর মোটা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলছেন, 'ফাইন, ভেরি ফাইন···'। সুপ্রকাশ একটু এগিয়েও গেলেন, কিন্তু তীব্র গন্ধে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল তাঁর। 'না, না, এটা হওয়া উচিত নয়—' মনে মনে বলতে বলতে একটু সরে এলেন তিনি। স্মিলেট তখন পকেট থেকে ছোট্ট একটা তোয়ালে বের করে নাকের ওপর ধরেছেন। সুপ্রকাশের চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল, 'গুড্ গড! ক' গ্যালন টানতে পারেন এঁরা?'

সুপ্রকাশ চুরুট ধরিয়ে চতুষ্কোণ চক্রটার থেকে একটু তফাৎ রেখে পায়চারি করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে একটু ফাঁক দেখে টেবিলের ধারে যাবেন বলে ভাবলেন, কিন্তু চুরুটটা শেষ করতেই চাইলেন আগে। একটা জায়গায় একটুখানি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, যেন ভেবে নিচ্ছিলেন এরপর কি করবেন। কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ একটা তীব্র গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মুখ ফেরালেন তিনি। অস্বস্তি আর সেই সঙ্গে একটা অপমান-বোধ তাঁকে অভিভূত করে তুলল।

চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চোখ ফেরাতে হ'ল তাঁকে। না, তিনি ভুল করেন নি। সেবার অফিসার শ্রী ব্যানার্জী অগ্নি-দৃষ্টি হেনে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখবা মাত্রই বোঝা যায়, দারুণ মদ্যপান করেছেন, তাঁর বড় বড় চোখদুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। ঠিক সোজাসুজি তাকান যায় না। সুপ্রকাশ মনে মনে বলে উঠলেন, 'সিম্প্‌লি রিভোল্টিং...'

এবারেও তাঁর মনে হ'ল, তিনি ভুল করতে পারেন। পরীক্ষা করবার জন্যে বাঁ দিকে ফিরে দেওয়ালের দিকে তাকালেন তিনি। চুরুটের ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইংলণ্ডের এক পল্লী-নিবাসের বৃহদায়তন ফটোগ্রাফ। নিচে লেখা রয়েছে, 'এ ডিলাইটফুল কর্নার অব স্ট্যাণ্টন কস্ট্‌ওঅল্ড্‌'। পরিচ্ছন্ন রাস্তার বাঁকে একটা কুটীর, গুল্ম আর ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা। রাস্তার ওধারে পাহাড়ে জঙ্গল।

সুপ্রকাশ চকিতে আর একবার তাকিয়ে নিলেন। এক ঝলক রক্ত উঠল মাথায়। দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি, 'দিস ইজ আউট্রেজাস, আই মাস্ট গিভ্‌ গ্যাট ম্যান আ বিট অব মাই মাইণ্ড...।' ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপুনি অনুভব করলেন তিনি, আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে পতঙ্গ যেমন করে, লাফিয়ে গিয়ে শ্রী ব্যানার্জীর শার্টের কলারটা ধরতে চাইলেন।

কিন্তু এবারে শ্রী ব্যানার্জীকে একটু অন্যরকম মনে হ'ল। অবশ্য তেমনি উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভংগিতে তাকিয়ে আছেন তিনি, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। এখনই বোধ হয় বিলিয়ার্ড টেবিলে যাবেন, স্টিকটা এমনি করে ধরে আছেন যে একটা প্রতিহিংসা বোধ করছেন। কিন্তু চকিতে সুপ্রকাশের মনে হ'ল শ্রী ব্যানার্জীর নিজের ভেতরেই একটা কিছু অস্বস্তি আছে।

শ্রী ব্যানার্জীর দিকে আবার ফিরে তাকালেন সুপ্রকাশ—এবারে আর চোখ ফিরিয়ে নিলেন না। 'হী ইজ্‌ বার্নিং উইদিন হিমসেল্‌ফ্‌, আই সাপোজ...' ভাবতে ভাবতে শ্রী ব্যানার্জীর দিকে এক পা এগিয়েছিলেন সুপ্রকাশ, এমনি সময় শ্রী ব্যানার্জী এক কাণ্ড করে বসলেন।

'উড্‌ ইউ বী কাইণ্ড্‌ এনাফ...' খুব একটা সাবহিত ভংগীতে অথচ পরিহাস-তরল কণ্ঠে শ্রী ব্যানার্জী ওঁকে সম্বোধন করলেন। পাশের টেবিল থেকে আঙুর তুলে নিয়ে এতক্ষণ একটা আধটা মুখের মধ্যে ছুঁড়ছিলেন তিনি, তারই একটা গুচ্ছ হাত বাড়িয়ে সুপ্রকাশের সামনে তুলে ধরলেন।

একটু আগে এই ঘটনাটা ঘটলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু আহত

হওয়ার চেয়ে সুপ্রকাশ আশ্চর্য হয়েছিলেন বেশি। এতক্ষণে—শ্রী ব্যানার্জীর এই হাসি দেখেই বুঝতে পারলেন, ওঁর সেই অগ্নি-দৃষ্টিটা কেবল তাঁর দিকে ফেরানোই ছিল, শ্রী ব্যানার্জী একটু আগে পর্যন্ত তাঁকে দেখতেই পান নি।

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি পাশ কেটে সরে গেলেন যেন নিজের এই হঠাৎ বিস্ময়টা তিনি শ্রী ব্যানার্জীর থেকে গোপন করতে চান। টেবিলের ওধারে গিয়ে কয়েক জনের পিঠের আড়ালে আত্মগোপন করলেন তিনি। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি গুছিয়ে নিতে পারছিলেন না। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন সুপ্রকাশ, এখনও কপালের রগটা দপদপ করছে, তারপর হঠাৎ ডিগবাজির মতো ক্রোধের বদলে বোবা-মার্কা বিস্ময়···সুপ্রকাশ কোমরের দুদিকে দু'হাত রেখে চুরুট-শুদ্ধ মুখখানা ওপরে তুলে ধরলেন। এখন নিজেরই ওপর কৃপা হতে লাগল তাঁর : 'ক্লাব-লাইফের এত কম জানি আমি। মিঃ ব্যানার্জী নিশ্চয়ই আমাকে বেকুব ভেবেছেন। আই বিহেভ্‌ড্‌ জাস্ট লাইক এ্যান্‌ এ্যাস্‌···'

কিন্তু সুপ্রকাশের একটা অদম্য কৌতূহল জেগে উঠল। শ্রী ব্যানার্জীর মধ্যে যেটা তিনি দেখেছেন সেটা তাঁর চোখের ভুল যদি না হয়···না, সেটা চোখের ভুল নয়···কিন্তু কি এমন যন্ত্রণা ওঁর থাকতে পারে, যার জন্যে ওঁকে এমনি একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যাবে। সুপ্রকাশ নিজেকে আড়াল করে সামনের মহিলাটির কানের পাশ দিয়ে টেবিলের ওধারে তাকালেন। কিন্তু শ্রী ব্যানার্জী কোথায়? গোড়ালির ওপর একটু উঁচু হলেন সুপ্রকাশ।

হঠাৎ একখানা নরম হাত ওঁর কাঁধের ওপর পড়ল, তারপর সেটা ওর ডান বাহুখানা জড়িয়ে ধরল।

'আরে, বৌদি যে···' প্রদীপের পলতেতে অগ্নিসংযোগ হল যেন, ঝকঝকে মুখে সুপ্রকাশ বলে উঠলেন, 'আমাকে কতক্ষণ একলা ফেলে রেখে গিয়েছিলেন বলুন তো'···শেষ দিকে ওঁর কণ্ঠে ছোট ছেলের মত অভিমান ঝরে এল।

'চুপ, চুপ, এখনো আস্তে কথা বলতে শিখলে না···' বলতে বলতে মিসেস সিংহ—ডিস্কোর সিনিয়রমোস্ট মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়রের স্ত্রী (ইনি সুপ্রকাশকে মানুষ করার 'অর্থাৎ ক্লাব-যোগ্য করার ভার নিয়েছিলেন) ওঁকে একটুখানি সরিয়ে নিয়ে এলেন দেয়ালের দিকে। ভুরু দুটো কুঁচকে

একটা তিরস্কারের ভঙ্গী করলেন মিসেস সিন্‌হা। ভ্রূ-কুঞ্চন করলে এককালে তাঁর যে সৌন্দর্য ঝিলিক দিয়ে যেত, তারই খানিকটা আভাস ফুটে উঠল। সুপ্রকাশের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আচ্ছা সু…তুমি জানো, যে মহিলাটির ঘাড়ের আর পিঠের সৌন্দর্য দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে তার বয়েস কত?'

'কই, না তো…' সুপ্রকাশ একেবারে থ বনে গেলেন। 'আমি কোন মহিলার দিকে তাকাই নি পর্যন্ত।'

'ফলসিটি ডাউনরাইট! অবস্থা একেবারে আয়ত্তের বাইরে!…তবু যদি না আমি তোমাকে গোড়ালির ওপর উঁচু হয়ে থাকতে দেখতাম। কিন্তু তুমি একটা স্ক্যাণ্ডাল বাধিয়ে বসবে দেখছি…অমন করে দেখে!'

'ওহো, যে মহিলাটির পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম আমি?' সুপ্রকাশ যেমনি চমকে উঠলেন, তেমনি পুলকিতও হলেন। 'আজ বেশ ভুলের পালা চলছে… কমেডি অব এররস্।' হেসে বললেন, 'ওঁর বয়েস আর কত হ'বে, একুশের বেশি নয়।'

'ওর মেয়ের বয়েস হবে একুশ…'মিসেস সিন্‌হার চোখ মিটমিট করতে লাগল, 'তোমার সঙ্গে ম্যাচ করবে। বলতো চেষ্টা করি…'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়।'

হঠাৎ ছোট্ট মেয়ের মত ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠলেন মিসেস সিন্‌হা। 'দেব গো দেব…তোমার জুড়ি বানিয়ে দেব, কিন্তু এস এখন…'সুপ্রকাশের বাহুটা এবারে এক রকম জাপটে ধরলেন মিসেস সিন্‌হা। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ঘাড় ফিরিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে, লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কর্নেল সেনকে দেখছি না?' বলতে বলতে সুপ্রকাশের বাহুটা ছেড়ে দিলেন মিসেস সিন্‌হা। বললেন, 'সু, তুমি এক মিনিট অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আসছি। কিন্তু তাই বলে দরজার ধারে আবার দাঁড়িয়ে থেকো না। তার চেয়ে ঐখানে গিয়ে দাঁড়াও, আমি ডেকে নেব…'বলে বিলিয়ার্ড-চক্রের দিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ আদরমাখা সুরে ভর্ৎসনা করলেন, 'দেখো সু, আজ তিন দিন হল তুমি ক্লাবে আসছ, কিন্তু ঠিক সেই প্রথম দিনটির মতো আচরণ করছ। তুমি এত টিমিড্‌ কেন? বিলিয়ার্ড টেবিলের গা পর্যন্ত ঘেঁসলে না। কিছুতে তোমার ইণ্টারেস্ট্‌ নেই…'

'এক আপনাকে ছাড়া…' সুপ্রকাশ বললেন।

মিসেস সিন্‌হা চিমটি দিলেন সুপ্রকাশকে, তারপর কুটিল দৃষ্টির বাণ হেনে চলে গেলেন। মণিবন্ধ থেকে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগটা দুলতে লাগল। চিমটি খেয়ে খুশি হয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন সুপ্রকাশ। খেলাটা দেখবার মতো মনের অবস্থা এতক্ষণ পরে পেলেন তিনি। অবশ্য খেলার চেয়ে খেলা নিয়ে হল্লোড় হচ্ছিল বেশি। বিনয় পাকৃড়াশীকে নিয়ে তখন হাসাহাসি চলছিল। বিনয় মাঝারি বয়েসের সৌখিন লোক, পোষাকে-পরিচ্ছদে আর কথাবার্তায় একেবারে পারফেকশনের চূড়ান্ত। বলেন, 'সব কিছুতে একটা 'গ্রেস্' থাকা দরকার, মরবার সময় পর্যন্ত···'। সেই বিনয় স্টিক ধরেছেন, সুগঠিত, শাদা সিল্কে মোড়া শরীরটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। টেবিলের ওপর সামনে মেলে দেওয়া বাঁ-হাত, ওঁর ঝুঁকে পড়া দেহ আর ডান হাতে ধরা স্টিক-বরাবর একটা রেখা হয়েছে। এটা একটা সুন্দর শো হয়েছিল। বলে আঘাত করার চেয়ে কত সুন্দর করে বলে আঘাত করা যায় সেইটে বিনয়ের লক্ষ্য ছিল।

বিনয় আঘাত করতে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন মহিলা বলে উঠলেন, 'মিঃ পাকৃড়াশী, ইফ ইউ অয়্যার্ এ বিট লেস গ্রেসফুল, তাহলে খেলাটা হ'ত ভালো···' দু-একটা হাসি উঠল, অনেকেই সকৌতুকে দেখছিলেন বিনয়কে। বিনয় আঘাত করলেন। উনি নিজেও জানতেন, অন্যেরাও জানতেন···বল লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। হাসির হল্লোড় থামতে না থামতে বিনয় মিষ্টি গলায় বললেন, 'আমার দোষ নেই, কোনও ভদ্রমহিলা আমাকে মনোভ্রষ্ট করে দিয়েছিলেন, মানে আমাকে অন্যমনস্ক করেছিলেন···'

'ইজ ইট্, রীয়েলি ?' সেই ভদ্রমহিলা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আর একজন বললেন, 'আহা, পরাজয়ের মধ্যেও একটা 'গ্রেস্' থাকা চাই তো···'

আর এক লহর হাসি উঠল।

অধ্যায় ১৩

শ্রী ব্যানার্জী সুপ্রকাশকে যে আঙুরের গুচ্ছটা অফার করছিলেন, সুপ্রকাশ চলে যেতে আবার সেটা ট্রের ওপর রেখে দিলেন। ওটার থেকে একটা দানা তুলে নিয়ে ছুঁড়লেন মুখের ভেতর, সেটা চিবুকে ঠোক্কর খেয়ে মেঝেতে পড়ল। শ্রী ব্যানার্জী সুপ্রকাশের চলে যাওয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন নিচে, আর ওঁকে ভুলে গেলেন। আঙুরের দানাটা একটু গড়িয়ে গিয়ে স্থির হয়েছে। আবছা আলোতে দানাটাকে একটা দামী পাথরের মতো দেখাতে লাগল। শ্রী ব্যানার্জী ডান-পাটা সরিয়ে এনে দানাটার ওপর ছোঁয়ালেন। ভাবলেন, দানাটা তাঁর পায়ের ভর নিয়েছে। তারপর চেপে দিলেন। কিন্তু ইস্, কিসের ওপর পা দিয়েছেন তিনি, মনে হল জুতো পেরিয়ে পায়ের তলায় তাঁর আঠার মতো লেগেছে।

বিলিয়ার্ড-চক্রটার দিকে তাকালেন তিনি একবার। তাঁর আরক্ত চোখ দু'টোতে একটা বিরক্তি ফুটে উঠল। তারপর ওখান থেকে সরে গেলেন। ব্র্যাকেটের কাছে গিয়ে স্টিকটা ছুঁড়ে দিলেন, যেন খেলা করছেন ওটাকে নিয়ে। স্টিকটা আটকাল ঠিক খাঁজে গিয়ে। প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢোকালেন। বুকখানা ঈষৎ স্ফীত হয়ে উঠল। চিবুকখানা ঝুলে পড়ল টান হয়ে, যেন বুকখানাকে স্পর্শ করতে চায়।

বেরিয়ে যাবার মুখে গ্যালারিতে ডব্ল্যু. স্মিলেটের দিকে নজর পড়ল তাঁর। তেমনি মিশরীয় স্ট্যাচুর মতো বসে আছেন বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে তাকিয়ে। খুব উঁচু থেকে যেন চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন আর জড়িয়ে জড়িয়ে বলছেন, 'ফাইন, ভেরি ফাইন...'। শ্রী ব্যানার্জীর চিবুকের টানটান ভাবটা শিথিল হয়ে এল, এমন করে তাকালেন যেন স্মিলেটের তারিফ করছেন। লোকটার ওপর ঈষৎ কৃপা করতে ইচ্ছে হল তাঁর—আঙুলের ডগায় ক'রে একটা ঠেলা মারলে—এখনই মুখ থুব্‌ড়ে পড়বে ওটা। শ্রী ব্যানার্জী তাড়াতাড়ি সরে গেলেন, 'ছোঃ, ছোঃ, পাঁড়মাতাল। এরা মদের গন্ধ শুঁকলেই মাতাল হয়ে পড়ে...আর কেমন ভুলে যায় সবকিছু। দ্যাট্‌স্ এনভিয়েব্‌ল্, অব কোর্স্...'

দরজা পেরিয়ে লম্বা ঢাকা বারান্দার মধ্যে এসে পড়েছেন, পেছনে স্ত্রীলোকের পোষাকের খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল। তারপর পেছন থেকে ওঁর হাত চেপে ধরলে। শ্রী ব্যানার্জী ফিরে একটু আশ্চর্য হলেন, 'হেনরিয়েটা, তুমি!'

হেনারিয়েটা আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, পায়ের পাতার ওপর আর একটু উঁচু হয়ে শ্রী ব্যানার্জীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললে, 'ইয়েস্‌, ইট্‌স্‌ মা···এক সময় যে হেনরিয়েটাকে তুমি হেনা বলে ডাকতে!'

যদি ঠিক এই সময় কেউ হেনরিয়েটার দিকে একটু একান্ত হয়ে তাকাতে পারে—যে হেনরিয়েটার ঈষদুন্নত দেহখানা শ্রী ব্যানার্জীর দিকে একটুখানি আনত হয়েছে—অবশ্য যদি সে ওর চোখের দিকে না তাকায় আর কণ্ঠস্বর না শোনে, তাহলে নারীদেহের পূর্ণ সৌন্দর্য সে তার মধ্যে দেখতে পারে। আর যদি সে তার চোখের দিকে তাকায়—যে চোখ নিজের মোহিনী সম্বন্ধে সচেতন আর তা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করে সব সময়—সে তখন আশ্চর্য হ'বে এই ভেবে যে নারীদেহের এই সরল সৌন্দর্য প্রকাশের বেলায় এমনি কৃত্রিম হতে পারে কি করে! সে-ভাবনা সত্ত্বেও সে চোখ ফেরাতে পারবে না তার থেকে, বরঞ্চ এই ভাবনার জন্যে কষ্ট বোধ করবে।

শ্রী ব্যানার্জীর আয়ত চোখ দুটো কুঁচকে গেল, 'ওয়েল, তারপর?'

হেনরিয়েটা একটুখানি সামনে সরে এল, চোখের পাতা ওপর দিকে উঠে দৃষ্টিটা দপ্‌ করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিমীলিত চোখে বললে, 'ইউ হ্যাভ্‌ ফোরসেকন্‌ মী, মাই লোর্ড···'

শ্রী ব্যানার্জীর জলন্ত দৃষ্টি বারান্দার গরাদহীন জানালার দিকে নিক্ষিপ্ত হ'ল—সেখানে জলতে জলতে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন হেনরিয়েটার এই আনত দেহ আর কথার সঙ্গে ওখানকার কোনও সম্পর্ক আছে। তারপরই তাঁর চোখ দুটো কৌতুকে স্নিগ্ধ হয়ে এল, মন্থর, ভরাট কণ্ঠে বললেন 'কুইন অব মাই হার্ট দাউ অয়ার্ট, গু সেম্‌ দাউ আর্ট নাউ···'

মেকি পরিতৃপ্তিতে হেনরিয়েটার অধর স্ফুরিত হ'ল, 'তুমি এত সুন্দর কথা বলতে পার!'

শ্রী ব্যানার্জী আবার সেই জানালার দিকে তেমনি করে তাকালেন, আবার ফিরে বললেন, 'দেবী, আমায় তুমি চাও?'

বিড়ালীর মতো শ্রী ব্যানার্জীর হাতখানা ঝাপটে ধরল হেনারিয়েটা, 'এসো

আমরা যাই এখান থেকে। কিন্তু…' এগোতে গিয়ে আরো অন্তরঙ্গ কণ্ঠে হেনরিয়েটা বললে, 'কিন্তু আমি তোমাকে চাই, একথা বোল না। বলো তুমি আমাকে চাও…'

'হেনরিয়েটা, সত্যি তুমি চার্মিং…' শ্রী ব্যানার্জী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। নিজের ভেতরে একটা আবেগ অনুভব করলেন তিনি, যে আবেগটার স্পষ্ট মূর্তি তিনি দেখতে পান, ডিস্‌ইলিউসনড বাট এ্যান ইমোশন স্টিল…। কথাটা বলেই কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার বললেন, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও, কেবিনে?'

'ড্যাটুল বী টু মাচ ইনোসেণ্ট। চলো আমরা লনে গিয়ে বসি…'

ঘাসের ওপর দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন শ্রী ব্যানার্জী। তাঁর পাশে তাঁর পেছন দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় হেনরিয়েটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। এখানটায় আবছা অন্ধকার, কিন্তু তাতেই শ্রী ব্যানার্জীর মুখখানা কঠিন পাথরের মতো দেখাচ্ছিল। এই অবস্থাতেই বরঞ্চ বোঝা যায় উনি খানিকটা শীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু ওঁর চোখ দুটো তেমনি যেন জলতে জলতে স্থির হয়ে রয়েছে। নিস্তরঙ্গ, আয়নার মতো। কেবল ওপরের দিকে ক্লাব-ঘরের মাথার আলোটার প্রতিবিম্ব জলে পড়েছে। জলের মধ্যে আলোটা একটা ঝাপসা-পড়া আগুনের দলার মতো মনে হতে লাগল, কেউ যেন তাকে চেপটে দিয়েছে। আলোটার ঔজ্জ্বল্য পীড়িত মস্তিষ্কের একটানা দুঃস্বপ্নের মত অস্বস্তিকর মনে হয়।

শ্রী ব্যানার্জী হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'হেনরিয়েটা, এখন তুমি কি করছ?'

হেনরিয়েটা দেখলে নিষ্ঠুর পরিহাসে শ্রী ব্যানার্জীর ঠোঁট বেঁকে উঠেছে। ও সেটা দেখেও দেখলে না। বললে, 'জেনের‍্যাল অফিসের স্টেনো…আমি যা ছিলাম তাই আছি।' শেষের কথাটা কেমন অভিযোগের মতো শোনাল, সেটার অর্থ যেন এই রকম, 'কিন্তু তুমি কত বদলে গেছ…'।

'তারপর?' শ্রী ব্যানার্জীর চোখে তেমনি কৌতুক ঝকঝক করতে লাগল। হেনরিয়েটা একবার নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলে, তারপর বলে উঠল, 'ব্যানার্জী, আমি সুখী নই, দেখো, আমি শিগ্‌গীর এই ক্লাব লাইফ ছেড়ে দেবো।…' তারপর হঠাৎ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করতে করতে বললে, 'আইম্ গোয়িং টু ম্যারি…'

'ইজ্ ইট্! কাকে করুণা করলে। কিন্তু ক্লাবে আসবে না কেন?' শ্রী ব্যানার্জী আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ছিলেন।

'কাকে!' হঠাৎ অতি লঘু আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল হেনরিয়েটা। বাঁ কনুই থেকে গড়িয়ে পড়ল পিঠের ওপর। সমস্ত শরীরে ওর হাসির তরঙ্গ বইতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ আবার তেমনি করে কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠল ও, হাসিটা বন্ধ করে ছোট্ট মেয়েটির মতো শ্রী ব্যানার্জীর দিকে মিট মিট করতে লাগল, যেন এখনই আবার হেসে ফেলবে।

শ্রী ব্যানার্জীর মাথায় ঝিম ধরল, পা-দুটোতে মৃদু কাঁপুনি অনুভব করলেন। হেনরিয়েটার কাঁকালে হাত রেখে হাস্য-মধুর কণ্ঠে বললেন, 'হেনরিয়েটা, দিস কার্ভ অব ইয়োর বডি ইজ্ এক্স্কুইজিট্, সত্যিই তুমি তেমনি আছ। উইল ইউ নেভার গ্রো ওল্ড্, মাই ডিয়ার?'

'দিস ইজ্ হোআট দাউ আর্ট্, মী লোর্ড্...' চকিতে সেই হাতখানা টেনে নিল হেনরিয়েটা, আর ওর মাথাটা আর একটু ঘন হয়ে এল শ্রী ব্যানার্জীর দিকে। গালের ওপর ও-হাতখানা ঘসতে লাগল। তারপর সেখান থেকে নিয়ে গলার নিচে বুকের ওপর চেপে রেখে চোখ বুঁজে রইল।

একটু পরে চমকে উঠে হাতখানা ডান কাঁধের ওপর ছুঁড়ে দিলে ও। বেয়ারা পাথুরে রাস্তার ওপর জুতোর শব্দ করতে করতে এসে সেলাম করলে। শ্রী ব্যানার্জী প্রয়োজনীয় অর্ডার দিলেন।

বেয়ারা চলে যেতেই একরকম তড়াক করে উঠে বসল হেনরিয়েটা। ও তিরস্কারের সুরে বললে, 'তুমি আবার মদের অর্ডার দিলে। দিজ্ ডেজ্ ইউ ড্রিঙ্ক টু মাচ্...' হেনরিয়েটার চোখ দুটো বড়ো হয়ে উঠল। ওর অধর স্ফুরিত, বললে, 'ওরা এই নিয়ে কথা বলবে, এটা আমি সহ্য করতে পারি না। ওরা বলে কি জানো, বুড়ো লোকটা নিজেকে মেরে ফেলছে। উঃ, বুড়ো তুমি! ওরা তাই বলছে...' বলতে বলতে ক্লাব ঘরের দোতলায় সারি সারি কেবিনগুলোর দিকে তাকিয়ে নিলে ও।

'আর সেই খবর পেয়ে তুমি এসেছ আমার মৃত্যু সম্পূর্ণ করতে!' শ্রী ব্যানার্জী কেটে কেটে হাসতে লাগলেন, যেন নিজের জ্বালাটা নিজেই উপভোগ করছেন।

হেনরিয়েটা নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলে। ওর শরীরটা কেঁপে উঠল একবার, তারপর উপুড় হয়ে পড়ল শ্রী ব্যানার্জীর ডান হাতখানা টেনে নিয়ে তারই ওপর, পড়ে পড়ে ফোঁপাতে লাগল কিছুক্ষণ, তারপর

মাথাটা একটু তুলে বললে, 'তুমি ঐ পুলের দিকে তাকিয়ে দেখ। পাঁচ বছর আগে তুমি আমার একটা ছবি তুলেছিলে ডাইভিং প্লাটফর্মের ওপর। স্থির জলে আমার ছায়া পড়েছিল…তুমি সে ছবির নাম দিয়েছিলে, হেনা, ফ্লোটিং ডাব্‌ল্‌। লেট মী লাভ ইউ…তখন তুমিও 'আমায় ভালবাসতে। আমায় অবিশ্বাস কোর না…'

হেনরিয়েটার মনে হ'ল, শ্রী ব্যানার্জীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কিন্তু কিছু না বলে উনি কেবল তাকিয়ে রইলেন। হেনরিয়েটা আস্তে আস্তে উঠে বসল। বললে, 'ব্যানার্জী, তোমার কষ্টটা কি আমায় বলবে?' বলেই আবার ও তাড়াতাড়ি বললে, 'আমায় অবিশ্বাস কোর না। তুমি আগেকার দিনের কথা মনে করে দেখো…তুমি আমাকে অনেকের মধ্যে থেকে জয় করে নিয়েছিলে… আর তাদের মধ্যে খাঁটি ইংরেজও ছিল…'

শ্রী ব্যানার্জীর কথাগুলো কাঁপা-কাঁপা মনে হ'ল, আস্তে আস্তে বললেন, 'ঘ্যাট্‌স্‌ পলিটিক্যাল। সে কথা শুনে তুমি কি করবে। সুন্দরী…' ওই অবস্থাতেও মনে হল কথাটা নিয়ে তিনি খেলা করছেন, বললেন, 'সুন্দরী, সে কথা শুনলে তোমার মাথায় যেসব ফ্যান্সি কল্পনা আছে তা উড়ে যাবে। তার চেয়ে তোমার চোখের, তোমার দেহের প্রশস্তি শোনাই তোমায়…'

বহু অভ্যস্ত ভ্রূভঙ্গী করল হেনরিয়েটা, 'কেন, মেয়েরা কি পলিটিক্‌স্‌ বোঝে না, নাকি, পলিটিক্‌স্‌ তারা ভালবাসতে পারে না?'

শ্রী ব্যানার্জী হাসলেন—আর এই নিস্পৃহ-ব্যঙ্গের হাসি তিনিই হাসতে পারেন—বললেন, 'সো লং এ্যাজ দে ওয়ান্ট্‌ টু উইন্‌ ওভার এ পলিটিক্যাল ম্যান দে ফ্যান্সি দে লাভ……'

'উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি,' ইউ স্ট্রাইক সো হার্ড……' হেনরিয়েটা দেরি করল না, শ্রী ব্যানার্জীর ডান হাতখানা আবার টেনে নিয়ে উন্মত্তের মতো ঠোঁটে গালে চেপে ধরতে লাগল। 'ডোণ্ট হেট্‌ মী, ডোণ্ট…প্লিজ্‌……'

কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত স্বরে শ্রী ব্যানার্জী বললেন, 'হেনা, সরে এসে বসো। আমায় বলো কাকে বিয়ে করছ তুমি……' ওর হাতখানা ধরে টানতে লাগলেন কাছের দিকে।

শ্রী ব্যানার্জীর মুঠোর মধ্যে হেনার হাতখানা কেঁপে উঠল। একটা আহত, স্থির দৃষ্টিতে শ্রী ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়ে ও বললে, 'তুমি একথা

জিজ্ঞেস কোর না।······স্ট্রেঞ্জ! তুমি একথা চিন্তা করছিলে! হি ইজ্ ট্যু স্মল্ এ ম্যান্ ফর ইয়োরসেল্ফ্। তুমি ওকে হিংসে কোর না······'

হেনরিয়েটার হাতে একটা মোচড় লাগল, শ্রী ব্যানার্জী অস্থির হয়ে থামালেন ওকে, 'হেনা, ডোণ্ট টেল্ মী অব্ ছাট্। টেল্ মী·হিজ নেম ওন্‌লি······'

হেনরিয়েটা চোখ নিচু করল। উত্তেজনায় এতক্ষণ ওর সুপুষ্ট বক্ষ ওঠা-নামা করছিল, আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল সেটা। ও মৃদু স্বরে বললে, 'আশ্চর্য, আমার একথা তোমার কাছে কোনদিন বলতে হ'বে তা ভাবি নি। সে ছেলেটি খুব গরীব······আমারই মতো সে ইণ্ডিয়ান পিতার সন্তান। কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে······তুমি অস্থির হয়ো না, আমাকে জিজ্ঞেস করো না আমি তাকে ভালবাসি কি না। তাকে দেখলে আমার বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত অনুভব হ'তে থাকে, আমি কেঁদেছি কখনো কখনো। আমি ভালবাসি না তাকে কিন্তু সে আমাকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হবে না। আমার সব কিছু জানে সে······কিন্তু আমাকে ক্ষমা করো, তার নাম বিয়ের আগে বলব না আমি······'

শ্রী ব্যানার্জীর হাতের মুঠি শিথিল হয়ে এল। হেনরিয়েটার নিচু-করা মুখখানা শান্ত, কঠিন মনে হ'ল তাঁর। একটু আগেই এ মেয়েটি যা করছিল এ তা নয়। নিজেকে চাবুক মারে যেমন করে তেমনি করে চিবিয়ে বললেন শ্রী ব্যানার্জী, 'তুমি একটু আগে আমাকে বলছিলে, ডোণ্ট্ হেট্ মী······ এ্যাণ্ড্ নাউ আই সী ইউ হেট্ মী ফ্রম দি বটম্ অব ইয়োর হার্ট।'

হেনরিয়েটা মুখ তুলল, তরল চোখ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল মুহূর্তের জন্যে, তারপর আবার নেমে এল।

যেমন করে তাপমান যন্ত্রের পারা উঠে, তেমনি করে শ্রী ব্যানার্জীর অস্থিরতা চরমে উঠল। পা দুটো কাঁপতে লাগল ওঁর, তলপেট আর বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরলেন। ফিস ফিস করে বললেন, 'আমার ওপর তুমি একদিনের জন্যে দয়া কর। চল, এখন দামোদর বাঁধে একটু বেড়িয়ে আসি···' হেনরিয়েটার হাতটা মুঠির মধ্যে নিলেন তিনি।

'মী গড!' শ্রী ব্যানার্জীর চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল হেনরিয়েটা। তারপর অস্ফুট স্বরে বললে, 'আই এ্যাম ইয়োর স্লেভ্, আমাকে নিয়ে যা খুশি কর তুমি।'

অধ্যায় ১৪

হেনরিয়েটার সুন্দর চুলগুলি ঘাড়ের পেছনে উড়ছে, কানের পাশ দিয়ে হাওয়া বইছে ঝড়ের মতো। আসনের একটা অংশ ডান হাতে চেপে ধরেছিল হেনরিয়েটা। ও বুঝতে পারছে, ওর সমস্ত দেহটা শক্ত হয়ে উঠছে। পাশের দিকে মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে ও। স্টিয়ারিং-এর ওপর এক রকম শুয়ে পড়েছেন শ্রী ব্যানার্জী। স্থির, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উনি সামনের দিকে। নাকের ডগাটা ঈষৎ স্ফীত, কিন্তু নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। লাইট পোস্টগুলো সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। খুব অল্প সময়ের জন্যে শ্রী ব্যানার্জীর মুখখানা অস্পষ্ট হয়ে যায়, তারপর মুহূর্তে দপ করে ওঠে।

রিভার সাইড রোডের দুপাশের গাছপালা একটা ঘন কালো দেয়ালের মতো মনে হয়। নিরুদ্ধ, বোবার মতো, কিন্তু খুব পেছন থেকে একটা আড়-চোখের দৃষ্টি এই পর্যন্ত এসে পড়েছে। একটা বাঁক ফিরল হুড-খোলা গাড়িটা। হাতের মুঠোর মধ্যে কৌচটা কাঁপছে, পায়ের নিচে গাড়িটা থরথর করছে। শ্রী ব্যানার্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল হেনরিয়েটা। গাড়িটার প্রত্যেকটি অঙ্গ কাঁপছে—একটু এদিক-ওদিক হলেই ছিটকে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কতক্ষণই বা লাগবে—মিনিট তিন চারের পথ। কিন্তু এর প্রতি মুহূর্ত জমাট হয়ে উঠছে। হেনরিয়েটার কেবলই মনে হতে লাগল, একটা কিছু শেষ হতে চলেছে। আজ নিজের মুখে সমস্ত কিছু বলেছে সে ঐ পুরুষটিকে—যাকে সে ভয় করে সব চেয়ে বেশি, আর যে তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে! আশ্চর্য, ইজ্ দিস্ লাভ? বলার সঙ্গে সেটা অবিশ্বাস করল হেনরিয়েটা।......কিন্তু এটা কি তার নিজের মধ্যে আছে, নাকি ঐ পুরুষটির মধ্যে।—স্ট্রেঞ্জ! দিস্ ইজ্ ডেথ, তার মধ্যে উড়ে যাচ্ছে সে। এই মুহূর্তেই হেনরিয়েটা অনুভব করল, মরণই সে চেয়েছিল। সবাই এমনি কঠিন মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে চরম শিহরণ অনুভব করতে চায়। কত কিছুকে ভেঙে চুরমার করে চলে এসেছে কত মানুষ।

গাড়িটা মন্থর হয়ে এল। হঠাৎ চারদিক কালো অন্ধকারে ঘিরে এল। ওরা বাঁধের ওপর চলে এসেছে। হেনরিয়েটা ভাবল, কেন ওর মনে এই সব হচ্ছে। এ ঘটনা তো তার জীবনে নতুন নয়। স্ট্রেঞ্জ!

গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নামলেন শ্রী ব্যানার্জী। মুহূর্তে ঘুরে এসে হেনরিয়েটাকে নামালেন গাড়ি থেকে। ডান হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ওর সুগন্ধ চুলের ওপর মুখ রাখলেন শ্রী ব্যানার্জী। তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'হেনা, আমার লক্ষ্মী, তুমি আমার হৃদয় অনুভব করে দেখো। মনে রেখো, কেমন করে আমাকে পাগল করতে পারো তুমি!'

হেনরিয়েটার ছোট্ট মাথাটা একটু নড়ে উঠল। কিছুক্ষণ অন্ধকারে বোঝাই গেল না ও কি করছে। তারপর কয়েকটা নরম আঙুল এসে শ্রী ব্যানার্জীর গলায় পড়ল। হাতড়ে হাতড়ে গালের ওপর তারপর চিবুকের ওপর এল আঙুলগুলো। শ্রী ব্যানার্জী সব বুঝলেন, আঙুলগুলো ঠোঁটে চাপতে চাপতে বললেন, 'আমাকে সব ভুলিয়ে দাও তুমি। মায়াবিনী, গিভ্ মী ডেথ্…'

হেনরিয়েটার হাতখানা নির্জীবের মতো টানা হয়ে নেমে এল। সেকি, শ্রী ব্যানার্জীও একই কথা বলছেন!

শ্রী ব্যানার্জী এগোচ্ছিলেন, হঠাৎ থামালেন হেনরিয়েটাকে। বাঁ হাতে ওর চিবুক ধরে মাথাটা তুলে বললেন, 'হেনা, দেখতো, ভালো করে, তোমার চারদিকে দেখ….'

অন্ধকারের বুকে দূরে দেয়ালীর মালা জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন। জুনাপুর আসানসোলকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিল্প-বলয়টা আলো জ্বেলে বিনিদ্র হয়ে রয়েছে।

শ্রী ব্যানার্জী বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন, 'আইম্ ডেড্লি উণ্ডেড্। বাট দে হ্যাভ্ উণ্ডেড্ এ লায়ন…এই সমস্ত এলাকাটা দেখ, হেনা। উইদিন টোয়েন্টি ফোর্ আওয়ার্স্ আমি এর প্রাণস্পন্দন থামিয়ে দিতে পারি। দেয়ার উইল বী কম্প্লীট ডার্কনেস্ দেয়ার…'

হঠাৎ পাশের দিকে তাকিয়ে হেনা চমকে উঠল, 'কে…দেখতো কে আসছে।'

অন্ধকারের মধ্যে একটা বা দুটো মূর্তি এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। শ্রী ব্যানার্জী গর্জন করে উঠলেন, 'হুজ্ ভাট্…হুজ্ দ্যাট্…'

নদীগর্ভে শব্দটা গুম্ গুম করে দূরে মিলিয়ে গেল। মনে হল মূর্তি দুটো একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর আবার এগিয়ে আসতে লাগল। শ্রী ব্যানার্জী পেছনে লাফিয়ে ছুটে এলেন। গাড়ীর ড্রয়ার থেকে চকিতে রিভলবার বের করে ছুঁড়লেন পরপর। তারপর কোথাও কিছু নেই।

হেড লাইটের সুইচটা টিপলেন শ্রী ব্যানার্জী। তারপর হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। সামনে একটা বালির ঢিবি কেবল উঁচু হয়ে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি লাইটটা নিবিয়ে রিভলবারটা ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে এলেন শ্রী ব্যানার্জী। হেনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভয় পাও নি তুমি?'

'না, একটুও না…'

'আমি জানতাম। তুমি ভয় পেতে পার না, তুমি যে আমারই…' শ্রী ব্যানার্জী মনে হ'ল কাঁপছেন উত্তেজনায়, 'তুমি আমার লক্ষ্মী। মাই কুইন, ফরগেট ছাট্ ম্যান। যাও কোথা…'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। দুই বাহুর প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে শ্রী ব্যানার্জীর বাহু দুটো একটু শিথিল করল হেনা। অস্ফুট চিৎকার করে মাথাটা মুক্ত করলে। শ্বাস নিয়ে হাঁপাতে লাগল ও। সেই অবস্থায় কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'ইউ ডেভিল, বিঅয়্যার, লেস্‌ট ইউ কিল মী…'। মুহূর্তে পরবর্তী ঢেউ এসে পড়ল।

অধ্যায় ১৫

সুমিত্রা ব্যানার্জী তাঁর শোবার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে ড্রেসিং টেবিলটায় ঠেশ দিয়ে। বুকের ওপর হাত দুটি মোড়া, চোখের দৃষ্টি জানালার বাইরে বাগানের দিকে। তাঁর বন্ধুর স্বামী মিঃ ডি. কে. সেন ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছেন শ্রী ব্যানার্জীর জন্যে, এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন তিনি।

সকালে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছেন তিনি, চুলগুলো আঁচড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন পিঠের ওপর, সাদাসিদে পোষাকের সঙ্গে সেটি তাঁর চেহারায় বেশ একটা সরল আর মর্যাদাপূর্ণ ভাব এনে দিয়েছে। এতক্ষণে চলে যেতেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই যেন আটকে গেছেন, থমকে

দাঁড়িয়েছেন কিছুক্ষণের জন্য। আষাঢ়ের সকাল বেলাটা আশ্চর্য উজ্জ্বল। আলোর ধারা ঝরে ঝরে পড়ছে যেন। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল; গাছের পাতা, জমির ঘাস আর রোদ্দুর সব কিছু ধোয়া ধোয়া, পবিত্র মনে হয়। গাছপালার রঙ সতেজ, সবুজ; বড় বড় পাতার নিচের ছায়াও কেমন স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ। সহসা সুমিত্রার মনে হ'ল, 'যথার্থ সৌন্দর্য এমনি সতেজ, তা এমনি ভালবেসে সবকিছু ভরে দেয়। কিন্তু কিছু ফিরে চায় না…'। ভাবতে ভাবতে নিজের ভেতর দিকে ফিরে তাকালেন সুমিত্রা, সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হ'ল, তাঁরও আর কোনো বেদনা, অপূর্ণতা নেই, তিনিও সব কিছুকে এমনি করে ভরে তুলতে পারবেন।

ড্রেসিং টেবিলটার পাশ থেকে সামনে সরে এলেন সুমিত্রা, সামান্য একটু প্রসাধন করে নিলেন। 'মিঃ ডি-কে'র আসার খবর পেয়ে যে কথাগুলো ইতস্তত ভেবেছিলেন, সেইগুলোই চকিতে মনের মধ্যে পরপর ছুঁয়ে গেল তাঁর। 'মিঃ সেন আমেরিকা থেকে নিশ্চয়ই সাক্সেস্‌ফুল হয়ে ফিরে এসেছেন, রুমি কত খুশি হয়েছে…'। রুমির চিঠি প্রথম দিকে কলকাতা থেকে বেশি-বেশি পেতেন, এখন কিছুদিন হ'ল কোন খবর পান নি। বলাই কেমন আছে? মিঃ সেন কি আবার আমেরিকায় ফিরে যাবেন?

শোবার ঘর থেকে মাঝখানের বারান্দা পেরিয়ে ড্রইংরুমে যাবার মাঝখানে মুচকে হাসলেন সুমিত্রা। 'এ ফ্রেণ্ড্‌ ইজ দি বেস্ট্‌ অব রিলেশনস্‌…এই দুনিয়ায় বন্ধুত্বের মতো কিছু নেই…' মনে মনে উচ্চারণ করলেন উনি। রুমির সঙ্গে ইস্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল তাঁর, কেমন সে দিনগুলো কেটে গেছে! 'সেই আনন্দের দিন আর ফিরবে না…', কিন্তু একথা আনন্দের সঙ্গেই মনে হল তাঁর।

'আপনাকে অনেকক্ষণ একলা বসে থাকতে হল…' ছোট্ট একটি নমস্কার করলেন সুমিত্রা, এত দিন পরে ওঁকে কি অবস্থায় দেখবেন এই ভেবে তাঁর কণ্ঠস্বরটা ঈষৎ কেঁপে গেল।

'একলা, তা একলা বটে…' ওধারের জানালায় সম্ভবত আমগাছগুলোর সারির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ ডি-কে, সুমিত্রার নমস্কার ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'একলা, কিন্তু নিঃসঙ্গ নই। মনের মধ্যে এত চিন্তা ভিড় করে রয়েছে যে তাল রাখতেই পারছি না…'

'না তা নয়…মানে…' সুমিত্রা যে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকছিলেন

তা সহসা কেটে গেল যেন। কেমন করে তাঁর মনে হল, এতক্ষণ মনের মধ্যে যে আবহাওয়া গড়ে তুলছিলেন তিনি, তার সঙ্গে মিঃ সেনের কোন মিল নেই। নিজেকে সামলে নিতে নিতে বললেন, 'মানে, বাবার আজকাল উঠতে একটু দেরি হয়, অনেক রাত্রি করে ফেরেন কি না। ওনার আসতে দেরি হতে পারে…'

'তাতে কি হয়েছে…' জানালা ছেড়ে এগিয়ে এলেন মিঃ ডি-কে, একটা কৌচের সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলেন, সুমিত্রা বসলেই তিনি বসবেন। 'ওনার আসতে যদি এক যুগ দেরি হয় তাহলেও অপেক্ষা করতে আমার ক্লান্তি হবে না, কেন না ওনার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হ'বে…' বলতে বলতে তাঁর গালে খুশির রক্তাভা ফুটে উঠল।

সুমিত্রা একবার ভাবলেন, ওঁর পাশের কৌচটায় গিয়ে বসবেন, কিন্তু কি মনে করে একেবারে এদিকে প্রথম যেটা পেলেন সেটাতেই বসে পড়লেন। অন্যমনস্ক না হলে বুঝতে পারতেন তিনি। কিন্তু মিঃ ডি-কে'র মুখের দিকেই বিস্মিত এবং আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। মিঃ ডি-কে বরাবরই সুপুরুষ, সুন্দর চেহারা, কিন্তু এখন যেন আরও লম্বা-চওড়া হয়েছেন। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। সুমিত্রার কেমন করে মনে হতে লাগল, এই মাত্র তিনি বাগানের মধ্যে যে রৌদ্রোজ্জ্বল সতেজ সৌন্দর্য দেখে এসেছেন তা ওঁর সমস্ত দেহে মনে আঙুরের রসের মতো নিটোল হয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ একটু আগেকার তাঁর সমাধানটা নাড়া খেয়ে উঠল। ভেবেছিলেন, নিজেকে ঐ আত্মবিস্মৃত সৌন্দর্যের মধ্যে বিলীন করে দিতে পারলেই মানুষের সার্থকতা, কিন্তু এখন মনে হল, 'কেন, সেই লাইফ তো নিজের মধ্যে টেনে নেওয়া যায়, মিঃ সেন যা পেরেছেন?' চকিতে স্যার মুখার্জীর কথাও মনে হল তাঁর। এঁরা সকলেই একটা পথ খুঁজে পেয়েছেন, আর তিনি…না, সবেগে মাথা নাড়লেন সুমিত্রা, এ চিন্তা আসতেই দেবেন না মনে। শংকরী তাঁকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেটাই ঠিক।

মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার শরীর কিন্তু আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে, মিঃ সেন…' বলেই কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন, যদি উনি বলে বসেন, 'আপনার শরীর কিন্তু ভালো নেই,' তাহলে কি জবাব দেবেন তিনি।

মিঃ ডি-কে কিন্তু সেদিক দিয়েও গেলেন না, ভরাট হাসি হেসে স্বীকার করে নিলেন, 'এটা কেবল দেশভ্রমণের জন্যে…নতুন দেশে গেলে এত অভিজ্ঞতা

হয় মানুষের, এমন সব সম্ভাবনার মধ্যে এসে পড়তে হয়, তাই···তা না হলে এই ছ'মাস ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছি, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক ছিল না কিছু···'

'হ্যাঁ, তাই মনে হয়। অনিমেষবাবুও এখন সাউথ-ইস্ট এশিয়া ট্যুর করছেন, তাঁর···' মাঝখানে থমকে গেলেন সুমিত্রা, মুহূর্তের জন্য সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল তাঁর। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন শ্রী ব্যানার্জী। পেছনে দুটি হাত নিবদ্ধ, ঠোঁটে পাইপ চেপে ধরা, চটিশুদ্ধ পা ঘসতে ঘসতে ঘরে ঢুকলেন তিনি। এঁরা দুজনেই চমকে ফিরে তাকালেন। মনে হল, শ্রী ব্যানার্জী ভীষণ অন্যমনস্ক···এঁরা যে রয়েছেন সেটা লক্ষ্য করতে পারছেন না যেন। ঢুকেই অবশ্য বলে উঠলেন, 'ওয়েল্ দিলীপ, সব খবর ভালো ত?' তারপর নিজের কথাটা ভুলে গেলেন। সোজা এগিয়ে এসে সুমিত্রার পাশে বসলেন তিনি।

মিঃ সেন দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রী ব্যানার্জী বসার পরও উনি নিজে বসবেন কি দাঁড়াবেন···ইতস্তত করতে করতে বসে পড়লেন। ওঁর দিকে একান্ত দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করে রইলেন সুযোগের জন্য।

শ্রী ব্যানার্জী মুখ থেকে পাইপটা বের করে বাঁ হাতে নিলেন। তারপর তাঁর কৌচের সামনেকার চায়ের টিপয়টা পায়ে করে ঠেলতে লাগলেন। কোঁচ্-কোঁচ্ করে শব্দ হতে লাগল। একটু পরেই হাত বাড়িয়ে আবার টেনে আনলেন ওটাকে।

মিঃ সেন প্রতি মুহূর্তে আশা করেছিলেন, শ্রী ব্যানার্জী তাঁকে এইবার কিছু জিজ্ঞাসা করবেন। একটু পরেই অস্থির হয়ে উঠলেন উনি, বললেন, 'স্যার···'

শ্রী ব্যানার্জী চকিতে মুখ তুলে তাকালেন, মিঃ সেনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট দুটো স্বল্প হাসিতে মুচকে উঠল যেন। কিন্তু এইটে মিঃ সেনকে উৎসাহিত করবে কি, তাঁকে একেবারে ঘাবড়েই দিলে। শ্রী ব্যানার্জীর চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, ওঁর মন অন্ততো তাঁর কথার ওপর নেই। কিন্তু এইটেই তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে উঠল। যে কথাগুলোতে ঠাসা হয়ে এসেছিলেন তিনি, ফাটা বস্তার থেকে যেমন হয় সেগুলো অর্থহীন ভাবে বেরিয়ে আসতে লাগল। সংযত করবার কোন উপায় তাঁর ছিল না।

মিঃ সেন গদ্‌গদ স্বরে বলছিলেন, তাঁর ডান হাতখানা শূন্যে ছুঁড়ছিলেন কথায় জোর দেবার জন্যে, 'স্যার, আপনাকে আমি সব কথা সান ফ্রান্সিসকো

থেকেই জানিয়েছিলাম। আমি বলব, আমার এই···আপনার এই মিশন সাকসেসফুল হয়েছে···কিন্তু একটা শর্ত আছে। এ শর্তটা বেশি নয়, আমি বলব এটা মিনিমাম, খুব স্বাভাবিক···কারণ যারা টাকা দেবে তারা এই রকম একটা সেফগার্ড চাইবেই ···'

সুমিত্রা শ্রী ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়েছিলেন। রাত্রি জাগরণ আর উদ্বেগের ক্লান্তি ওঁর সর্ব শরীরে···কিন্তু ক্লান্তি কখনো-কখনো মানুষের ভেতরের তেজটাকে ফুটিয়েই তোলে। বাবার জোর সুমিত্রা জানতেন কিন্তু এমনি করে জ্বলতে দেখেন নি কখনো ওঁকে। সমস্ত ঘটনার পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে কে জানে। হঠাৎ বেশ জোর দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন তিনি··· একটা অজানা আশঙ্কা তাঁর বুকে চেপে বসল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের অজান্তেই একটা পরিতৃপ্তি বোধ করছিলেন তিনি : নিজেরই ভেতরকার অসহ্য যন্ত্রণা বাবার মধ্যে দেখতে পেলেন তিনি। উনিও তাঁরই মতো ছটফট করছেন, পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এইটে বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হল না তাঁর। পিতা-পুত্রী দু'জনেই এক। তৎক্ষণাৎ কেমন করে তাঁর মনে হল, এটাই, বাবার এই যন্ত্রণাটাই সত্য ; আঁর স্যার মুখার্জী বা মিঃ সেনের মধ্যে তিনি যে সমাধান, যে আনন্দ দেখছেন, সেইটে ধার করা। সেটা তাঁদের নিজস্ব নয়।

মিঃ সেন পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন, তারপর হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি বলতে লাগলেন, 'স্যার, উই ক্যান্ হ্যাভ্ ইমেন্স অব ক্যাপিট্যাল, ওন্‌লি ইফ্···স্যার, এইটে ওরা দেখতে চায় যে লেবার মুভমেণ্টের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ কণ্ট্রোল আছে।' মিঃ সেন ডানহাতটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে নিজেকেই সমর্থন করে বললেন, 'ওয়েল, দিস্ ইজ ডান। আমরা এ গ্যারান্টি ওদের দিতে পারি। আপনি যেখানে আছেন···তাহলে স্যার, স্যার মুখার্জীর কাছে জিনিসটা আপনি রিপ্রেজেণ্ট করুন, যাতে আমি আবার শীগ্রিই রওয়ানা হয়ে যেতে পারি। এই হঠাৎ চলে আসতে আমার ডিরেক্টার আবার খুঁত-খুঁত করছেন···'

'আঁ···' হঠাৎ শ্রী ব্যানার্জী সচেতন হয়ে উঠলেন। যেন কিসের একটা অসহ্য চাপ মাথার ওপর থেকে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন তিনি। সজোরে সেই টিপয়টাকে আবার ঠেলে দিলেন দূরে। বললেন, 'দিলীপ, তুমি আপাতত আমেরিকা যাত্রা স্থগিত রাখতে পার না ?'

এটা এমনি আকস্মিক, আর মিঃ সেন এতদিন, এতক্ষণ ধরে যে চিন্তা

করেছিলেন, এটা স্তার এমনি বিপরীত যে উনি স্পষ্টাস্পষ্টি তো-তো করতে আরম্ভ করলেন, 'স্তার, এটা···হ্যাঁ, আমি তা হলে ওদের সঙ্গে একবার একটা কন্‌ট্যাক্ট···নিশ্চয়ই আমি স্থগিত রাখতে পারি···' বলে উনি বেবাক চুপ করে গেলেন। কেবল তাঁর চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল।

'দিলীপ, তুমি জাননা স্তার মুখার্জী কি কাণ্ড করেছেন···ওয়েল, স্তার মুখার্জীও জানেন না তিনি কি করেছেন। আমার কাজ হবে···' শ্রী ব্যানার্জী ঝুঁকে পড়লেন, হাত বাড়িয়ে ছুঁড়ে দেওয়া টিপয়টা টেনে আনতে আনতে বললেন, 'দিলীপ, এ্যাকশন কমিটির সমস্ত সভ্যকে আমি জেলে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের এই মুহূর্তে ছেড়ে দেওয়া দরকার।'

শ্রী ব্যানার্জী একটু থেমে বললেন, 'একদিন আমিই এ্যাকশন কমিটি গড়েছি। ভেবেছিলাম, ওটা ভেঙে ফেলার প্রয়োজন এবার হয়েছে। কিন্তু ঠিক এখনই আরো ভাল করে ওটা বাঁচানো দরকার। এতদিন শত্রুকে আঘাত করেছি···এখন মিত্রকেও সমঝে দেবার সময় এসেছে। ওয়েল, ক্যাণ্ট্ ইউ হেল্প মী? দেখ, আমি তোমাকে মানুষ করেছি হাতে করে, আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি···'

মিঃ ডি-কে এত ক্রুদ্ধ আর বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর ঝকঝকে চোখে জল এসে পড়ে তাঁর মুখখানাকে কুৎসিত করে তুললে। জড়িতস্বরে বললেন, 'স্তার, আপনি আমাকে যা বলবেন, আমি তো চিরকাল···' কথার মাঝখানেই থেমে যেতে হল ওঁকে। শ্রী ব্যানার্জী হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন, মুহূর্তে তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, 'দিলীপ, আমি তোমাকে মানুষ করেছি— হাঃ-হাঃ···স্তার মুখার্জী একদিন বলছিলেন, আমাকে বেছে নিয়েছিলেন, আমাকে মানুষ করেছিলেন—হাঃ-হাঃ··· ওয়েল, আমি তোমাকে সেভাবে মানুষ করি নি কি বল!'

মিঃ ডি-কে শান্তভাবে বলবার চেষ্টা করলেন, 'আমাকে কি করতে হবে বলুন!'

তাঁর শান্ত ভাবটা শ্রী ব্যানার্জীকে খানিকটা প্রভাবিত করল। শ্রী ব্যানার্জী তাঁর ডান পা-টা টিপয়ের একটা পায়ায় ঘসতে ঘসতে বললেন, 'আমেরিকার ব্যাপারটা তুমি যা করেছ তা ব্রিলিয়াণ্ট্ হয়েছে···ওটা আমাদের হাতেই রইল। কিন্তু এখানে এখন আমাকে সাহায্য করবার কেউ নেই। ওই শেখরটা···ওকে জেলে না পাঠালেই হত···ও কি করছে জানো? ওরা জেলের

ভেতর একটা খাঁটি আন্দোলন করছে, হাংগার স্ট্রাইক করছে ওরা…সেটাতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। আমি খবর পাঠিয়েছি…হ্যাঁ, তুমি প্রেসিডেন্ট মনোতোষবাবুর সঙ্গে দেখা কর…'প্রেসিডেন্ট কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'লোকটার পাকস্থলী খুবঃদুর্বল। স্যার মুখার্জীর প্রস্তাব শুনে লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে…এত বীর্যহীন রাস্ক্যাল্ সব…ওটাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। বুঝেছ…'

মিঃ ডি-কে চোখ নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি…'

শ্রী ব্যানার্জী কটমট করে তাকালেন তাঁর দিকে…এই স্বীকৃতিই যেন তাঁকে অস্থির করে তুলল, মনে মনে বলতে লাগলেন, 'ওনলি লাইফলেস্ টুলস্… 'প্রেসিডেন্ট' মনোতোষ থেকে আরম্ভ করে…আহা, যেমন করাও তেমনি করি। মী গড, দে আর ডিভয়েড্ অব্ এ বিট অব ইমাজিনেশন… এক ফোঁটা চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই…।' বিরক্তিতে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'দ্যাট্‌স্ গুড্, তুমি তাহলে ওর কাছে যাও একবার, পারো তো নিয়ে এসো আমার কাছে…' শ্রী ব্যানার্জী পা দিয়ে টিপয়টা ছুঁড়ে দিলেন।

সমস্ত সময়টা কাঠ হয়ে বসেছিলেন সুমিত্রা। এই আলোচনার জন্য নয়, কেননা কুটনীতির রাজনীতির আলোচনা তিনি এড়িয়ে চলতেই চান। রাজনীতি বললেই তাঁর মনে একটা নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, নীচ, কুৎসিৎ জিনিসের চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি শংকরীর কাছে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তা সত্য হয়েছে, স্যার মুখার্জী এ্যাকশন কমিটি বাতিল করে দিয়েছেন। এই আলোচনার কিছুই শোনেন নি তিনি। কিন্তু শ্রী ব্যানার্জীর সঙ্গে আশ্চর্য নৈকট্য অনুভব করেছিলেন তিনি, বাবার সঙ্গে এত কাছাকাছি অনেকদিন বোধ করেন নি সুমিত্রা। লোকে বলে, বাবার সঙ্গে মেয়ের কোন মিল নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর কাছে তা বানানো, অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল। ওঁর ইচ্ছে করতে লাগল, এখনই উঠে গিয়ে বাবার পায়ে হাত দিয়ে কোনো একটা কথা বলেন। মিঃ সেন না থাকলে তা হয়তো করতেনও।

অধ্যায় ১৬

জুন মাসের শেষ সপ্তাহের এক বিকেলে এ্যাকশন কমিটির অফিসে পুনরায় দুটি মানুষকে দেখা গেল। শিবলাল খাতা-পত্র নাড়াচাড়া করছিল, আর এ ঘরের মালিক করালী বারই মেঝেতে দুই হাতে রগ চেপে ধরে চুপ করে বসে ছিল।

পরপর এত ঘটনা ঘটে গিয়েছে যে তারপরও এ্যাকশন কমিটির অফিস খুলবে কখনও, এটা কেউ ভাবতে পারত না। ৩রা জুনের সেই গুলিবর্ষণ এখনও জুনাপুরের ওপর প্রেতের আতংক বিছিয়ে রেখেছে। ইসমাইলের মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে নৈরাশ্য সঞ্চার করে। মনোতোষবাবু অসুস্থ, তিনি 'শান্তি-ভিলা'তে এখনো শয্যাশায়ী। কোম্পানী ২২শে জুন থেকে লক্‌-আউট প্রত্যাহার করেছেন, কিন্তু কারখানায় যোগ দেবার এক অতি-উদ্ধত, অত্যন্ত অপমানকর শর্ত যোগ করে দিয়েছেন····ইউনিয়নের পাশ দিয়ে যেতে হ'বে। ৩রা জুনের আগে কোম্পানীর সুর যতটুকু নরম হয়েছিল, এটা যেন তারই ঠিক বিপরীত। আশার কথা, এ পর্যন্ত খুব কম শ্রমিকই ইউনিয়নের পাশ নিয়েছে। আরানসোল জেলের বন্দী নেতারা অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছিলেন, ধর্মঘটের প্রথম দিনেই তাঁদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে-সব গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ্যাকশন কমিটির দিক থেকে এতে খুশি হবার কথা, কিন্তু মুক্ত নেতারা কে কোথায় ছিটকে পড়েছেন কেউ বলতে পারে না। রতন ধর আগেই জেল থেকে পালিয়ে ছিল, এখন আইনের দিক থেকে বাধা না থাকলেও আত্মপ্রকাশ করে নি। শোনা যায়, যে গুপ্ত কর্মী-সম্প্রদায় গড়ে তুলছিল ও তাদেরই মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। জুনাপুরের আন্দোলনকে সে এখন শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমীর সেই যে জেল থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকেছে, তারপর একবারও বেরোয় নি। এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্টের কাছে সে বেরিয়েই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। কারণ দেখিয়েছে, এর পর সে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায়। শোনা যায়, তার নিজের পার্টির কাছেও অনুরূপ পত্র পাঠিয়েছে। আর, শেখর মুখার্জীর ব্যাপারও একই রকম। সাড়ে তিন হপ্তার কারাবাসে ওর শরীর খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল, কারও সঙ্গে দেখা হবার আগেই দু' মাসের জন্য সে কোন স্বাস্থ্য নিবাসে চলে গিয়েছে।

শিবলালও এতদিন পর, এই প্রথম এ্যাকশন কমিটির অফিসে এসেছে। ঘরখানার অবস্থা ঠিক জুনাপুরের মতোই। টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজ-পত্র, একটা কোণায় ছেঁড়া মাদুর-সতরঞ্চ, সব কটার ওপর পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। দেয়ালে টাঙানো গান্ধীজির ছবিটা পেরেক থেকে ঝুলে পড়েছে। বৃষ্টির জল ঢুকে ভেতরে একটা কালচে ছোপের মতো হয়েছে। মনে হয়

না যে, শিবলাল কি এই ঘরখানার অবস্থা, কি জুনাপুরের পরিস্থিতি, কোনোটার সম্বন্ধেই সচেতন ছিল। কেমন অপরিচিত একটা কোমলতা ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। বাবার শ্রাদ্ধের পর ওর মুণ্ডিত মস্তক, সাদা পঞ্জাবির ওপর উড়ানি ঢাকা সব মিলে একটা নতুন, ভিন্ন ভাব এনে দিয়েছিল ওর মুখে। রুক্ষ মাটির ওপর যখন প্রথম চারা বেরোয়, তখন যেমন সে তার ভূমিকে ভুলে যায় আর আলোর দিকে লকলক করতে থাকে, মাটির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিছু বলে মনে হয় মাটিতে থাকলেও……শিবলালের অবস্থাও যেন ঠিক তেমনি।

করালীর অবস্থা এর ঠিক বিপরীত। জুনাপুরের বর্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধে সেও সচেতন ছিল না। কিন্তু তারও আগে, জুনাপুর শ্রমিকদের সেই অভিযানটি তখনও তার উপর যেন চেপে বসেছিল। এই এতদিন ধরে সেই ঘটনাই চোখের সামনে দেখেছে ও তারই মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বেঁচেছে। তার পাশে সুখনকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছে সে, তারপর দুর্বল হয়ে পড়ে যেতে দেখেছে। ইসমাইলকে ওরা যখন তুলে নিয়ে যায়, তখন সারাটা পথ তাদের পেছনে পেছনে ছিল ও। সেই দৃশ্য কখনও সে ভুলতে পারবে না।

নিজের দুই হাতের থেকে মাথা তুললে ও, একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, 'হাঃ-হাঃ হা-হা……' যেন এখনও সে দৃশ্য চোখের সামনে দেখছে ও। আর এই রকম নিবিড় যন্ত্রণার মুহূর্তে প্রতিবারই যা মনে হয় ওর একবারেও অনিবার্যভাবে তার মনকে অধিকার করে বসল: সবই মিথ্যা। কেন সে তার ঘরখানা এ্যাকশন কমিটিকে দিয়েছিল, কি উৎসাহ বোধ করেছিল সে, কেনই বা এ্যাকশন কমিটি গড়ে উঠেছিল, মজদুররা কি চেয়েছিল……এসব প্রশ্ন তার মনে ওঠে, আর মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, সব ঝুঁটা, সব মিথ্যা। এমনি বলার সময় কখনও কখনও সেই শোভাযাত্রায় যেমন করে সে আওয়াজ দিচ্ছিল, তেমনি উত্তেজনা বোধ করে।

এখন শিবলালের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য বুকের ভেতরটা দুলে উঠল তার। এই ছোকরাটির ওপর শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস সব সময়েই পোষণ করেছে সে। মনে হল, ওর ঐ রুগ্ন কোমল মুখে একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলে ও, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনের মধ্যে না-না করে উঠল; এই বিশ্বাসটাই ভুল, এইটাই মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। মুখে বললে, 'উ আর কি

দেখবেন, বাবু, পিসিডেণ্ট—সাব কি কিছু রেখেছেন, সব লিয়ে গেছেন·· ···'

শিবলালেরও তাই মনে হল, খাতাপত্র দেখবার দরকার নাই, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। পেছনের চেয়ারে বসে পড়ল ও, ঘাড় থেকে উড়ানিটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলে। মৃদু হেসে বললে, 'করালীবাবু, জুনাপুর মজদুরদের এখন কি করতে হবে জানেন·····' চেয়ারটার পেছনে মাথাটা ঠেশ দিয়ে রাখলে ও, এমন ভাবে যে, যেন নিজের একটা অবলম্বন চাইছে। 'কারখানার মজ্‌দুরদের এখন ধর্মঘট করতে হবে। এ্যাকশন কমিটিকে কাল-পরশুর মধ্যে এই ডাক দিতে হবে······'

বলতে বলতে করালীর ভীত, ঈষৎ অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ও। কিন্তু করালীর এই ভাব ওকে প্রভাবিত করতে পারল না। যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমনি করে তাড়াতাড়ি বললে ও, 'ধর্মঘট করা ছাড়া এখন আর মজদুরদের অন্য পথ নাই। ইসমাইল বেঁচে থাকলে তিনিও এই ডাক দিতেন······'

বাইরের খোলা দরজার পাশে একটা মুখ দেখা গেল। লোকটি এদেরকে এখানে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে আর ভেতরে উঁকি মেরে দেখছে। শিবলাল লক্ষ্য করে করালীকে বললে, 'দেখুন তো, ও কি চায় ···' বলেই কিন্তু নিজেই এগিয়ে গেল। লোকটি যেমনি করে মুখ বাড়িয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল ও পালিয়ে যাবে। কিন্তু শিবলালকে আসতে দেখে পিট পিট করে তাকাতে লাগল ও, হাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'নমস্কার, শিববাবু, ভাল আছেন? আমাকে চিনবেন নাই আপনি, আমি এই পাড়ায় থাকি...আবার কাজকর্ম আরম্ভ করলেন, ভাল···, বলে অর্থহীনভাবে দাঁত বের করে হাসল ও। তারপর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'যাই, এখন আবার পেটের ধান্দায় যেতে হবেক ত···' বলে কী রকম সংকুচিত হয়ে সরে গেল।

আস্তে আস্তে ফিরে এল শিবলাল। অন্যমনস্কভাবে বললে, 'করালীবাবু, এতদিন ধরে কিছু হয় নি। একদম গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে, সব পড়া ভুলে গেছি···'কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ও, তারপর যেন সমস্ত ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলে দিলে এমনি করে হেসে বলে উঠল, 'যাক গে, আরম্ভ যখন করতেই হবে, তখন করা যাক। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আমি

ধর্মঘটের কথা লিখে দিচ্ছি, আপনি মনোতোষবাবুর কাছে যান, তাঁর মতামত নিয়ে আসুন।' বলে ও চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল।

করালী 'বারই আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণ শিবলাল কি করছিল, কি বলছিল কিছুই খেয়াল করে নি ও। ধর্মঘটের কথাটা হঠাৎ ওকে জাগিয়ে দিয়েছিল যেন। ও সোজা এগিয়ে গিয়ে শিবলালের ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেললে, রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগল, 'শিববাবু, আমরা সাধারণ পাঁচপাঁচি মানুষ, আপনাদের উসব এ্যাকশন কমিটি আর ধর্মঘট আমরা বুঝি নাই, আমাদিকে কাজ দিন কেনে। এতগুলা লোক মরল, আর সর্বনাশ ডাকবেন নাই। আমাদিকে কাজ দেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কুলির জাত আমরা একবেলা না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু দু'হাতে কাজ না পেলে পারি নাই। আপনাদের স্লোডাউন আমাদের আধমরা করে রেখেছিল, তার উপর এই লক-আউট। বলতে পারেন, কবে দু-হাতে কাজ পাব···' বলতে বলতে ওর দু'চোখে জল গড়িয়ে পড়ল, শিবলালের হাতখানা নিজের অজান্তেই জোরে জোরে মোচড়াতে লাগল ও।

শিবলাল আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে। কেমন এক রকম করে করালীর দিকে তাকিয়ে রইল ও। মনে হল, এতক্ষণ পরে তার নতুন চেতনার অঙ্কুর তার ভূমি সম্বন্ধে সচেতন হল। 'আমি কি আবার সর্বনাশ ডেকে আনতে যাচ্ছি?' চোখ দুটি নিস্পন্দ হয়ে উঠল ওর। বাবার মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। যখন ইসমাইল গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন তখন সে আরাম করে রুক্মিনী বোনের সেবা গ্রহণ করছে। কেন জুনাপুরের এই হত্যাকাণ্ড হ'ল তা এখন সে জানে, কিন্তু মনোতোষবাবুর তীব্র বিরোধিতা তো সে-ই করেছিল ৬ই মের মীটিংএ, যার জন্যে এইটে হয়েছে। আশ্চর্য, আবার সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে?

কিন্তু এটা কেবল ক্ষণকালের জন্য। যেমন করে ঝড়ের পর আকাশের বক্ষতল নীলিমায় গভীর হয়ে ওঠে, তেমনি শান্ত স্বরে ও বললে, 'করালীবাবু, আপনিও শ্রমিক, আমিও শ্রমিক। আসুন আমরা সেই শপথই নিই যাতে আপনি যা চান তাই সত্য হয়ে ওঠে: মজদুররা দু'হাত ভরে মাথা তুলে কাজ করতে পারে!'

অধ্যায় ১৭

শিবলাল যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। আজকের আবহাওয়াটা অন্যদিনের মতো নয়। প্রথম বর্ষায় এমনটা প্রায় থাকে না। সারাদিন বৃষ্টি হয় নি, গুমোটও নেই। এরই মধ্যে একটা পাতলা আবছা অন্ধকার চারদিকে ছুয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোকজন দোকানপাট কম, অন্য সময় মনে হয় খাঁ-খাঁ করতে থাকে, কিন্তু এখন সেই শান্ত ভাবটাই বেশ মানিয়েছে। বাতাস বইছে না। কিন্তু একটা ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগে যেন হাঁটতে হাঁটতে।

শিবলাল দূরে সত্ত জ্বলে-ওঠা আলোগুলোর দিকে তাকাচ্ছে, আর ওর চোখের দৃষ্টিটাও জ্বলজ্বল করে উঠছে, প্রদীপের নরম আলোর দিকে তাকালে যেমন হয়। শিবলাল অনুভব করতে পারে, তার সমস্ত দেহটা হাল্কা হয়ে গেছে। জোরে নিশ্বাস নিলে ও, বুকের ভেতরটা ভরে উঠল। অস্ফুট স্বরে বললে, সব ঠিক আছে। আমি এতদিন কি ভেবেছি জানি না, কিন্তু এমন করে ভাবি নি নিশ্চয়। আজ আমি সব কিছুর দিকে তাকাতে পারি আর বলতে পারি, 'সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। সবকেই আমি দেখতে পারি, নাড়াচাড়া করতে পারি…' শিবলালের চোখ দুটো সজল হয়ে এল।

দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে পা দিয়েই শিবলাল দেখলে, গলায় আঁচল দিয়ে পুষ্প তুলসীতলায় প্রণাম করছে। হঠাৎ মনে হ'ল তার, অনেকদিন এমনি অবস্থায় পুষ্পকে দেখে নি।

প্রদীপ হাতে নিয়ে পুষ্প বললে, 'দাদা এলে?' যেন এতক্ষণ ওর আসার জন্যই অপেক্ষা করছিল ও। বললে, 'সেই কখন দুপুরবেলা বেরিয়েছ… খালি মাথায় এই অবস্থায় রোদে রোদে যাওয়া কি তোমার ঠিক?' শিবলাল পুষ্পর কথার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না, তার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল ও। নিচের দিক থেকে আলো পড়ে মুখখানা কঠিন দেখাচ্ছিল পুষ্পর, মনে হচ্ছে যে কথাটা ও বলছে তার আড়ালে ওর ভেতরের কথাটা চেপে রেখেছে ও, নিঃশব্দে একটা কষ্ট বহন করছে।

শিবলালের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, ও যেন বলতে চাইলে, 'আজ তাকে

ঠিক মায়ের মতো দেখাচ্ছে। 'পুষ্প···' কিন্তু একটু হেসে ও বললে, 'কি রে, তোর ফিরবার সময় হ'ল না কি, ক'বে যাচ্ছিস্? চিত্ত আরো দু'একদিন থাকবে না?'

পুষ্পর চোখ দুটো ওপরে উঠে ওর মুখের ওপর স্থির হ'ল, 'দাদা, আমি গেলে তুমি বাঁচ, না কি, আমি যাই আর থাকি তোমার কাছে দুই সমান···' শেষকালে নিজেকে সামলাতে পারল না ও, আঁচলটা মুখে চেপে তাড়াতাড়ি চলে গেল। শিবলাল বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুটে বললে, 'এমনিই হয়, এটাই বোধ হয় ঠিক...', যেন পুষ্পর এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের কোনো কারণ দেখতে পেয়েছে ও। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পুষ্পর সামনে একটা অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত হয়েছে। ছোট্ট একটা পতঙ্গের মতো আগুনের চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। আগুনের হলকায় তার ডানা দুটো ঝলসে গিয়েছে। অবসন্ন হয়ে পড়ছে সে, উড়তে পারছে না। ডানা পতপত করতে করতে সকলের কাছেই একবার করে উড়ে যাচ্ছে সে, বলছে, 'হ্যাঁগো, শুন, আমি একটা তুচ্ছ লোক, আমাকে ইয়ার মধ্যে টেন নাই। আমি পারব নাই, আমাকে ছেড়ে দাও···।' তার কথা শুনে সকলেই স্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তাতে তার পাখা আরও ছ'ড়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত তার সম্পত্তির দানপত্র রেখে গিয়েছে। শ্রাদ্ধের পরদিন এটর্নী এসে সেই দানপত্রের মর্ম বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন এদের। এ দানপত্রে খুব বড় একটা স্নেহ-বর্ষণ হয়েছে পুষ্পর ওপর, কার্যত, পুষ্পর জন্যেই এই দানপত্র। চন্দ্রকান্তর ব্যাংকে জমানো হাজার পাঁচেক টাকার চার হাজারই পেয়েছে পুষ্প, বাকি এক হাজার তার বন্ধুকন্যা লীলা পাবে বিয়ের পর যৌতুক হিসেবে। শিবলালও বাদ যায় নি একেবারে। ভাড়াটে বাড়ি দুটো আর ওদের যে আটটা রিক্‌শ খাটে জুনাপুরে, সেগুলো সে পেয়েছে।

একথা পুষ্প যখনই শুনেছে, তখন থেকেই আহত, অর্ধমৃত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। এ টাকা তার পাওনা নয়, এ টাকা নিতে পারবে না সে। এ টাকা নিলে সে বোধ হয় মরেই যাবে। কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, এটা বিশ্বাস করতেই পারছে না। স্বামীকে সে একবার বলেছিল, 'দেখ, আমি পাগল হয়ে যাব···এরা সব কি বলছে! এ টাকা আমাদের নয়, বাবা দাদার উপ্‌রে রাগ করে এই সর্বনাশ

করে গেছে…', কিন্তু তার বেশি আলোচনা এগোয় নি। 'তা একটা কিছু গোলমাল হয়েছে বুঝতে পারছি, কিন্তু তুমিই বা কি করবে, আর আমিই বা কি করব…' চিত্ত তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলে যেন পুষ্পর অসহায় অবস্থাটা সে অনুভব করতে পারছে। কিন্তু পুষ্পর বুঝতে দেরি হয় নি যে চিত্তর টান-হয়ে-যাওয়া মুখ আর কুঁচকে-যাওয়া চোখের নিচে খুশি ঝিকঝিক করছে। পুষ্পর অনেকবারই কষ্ট হয়েছে, তার বুক খালি করে সব কথা চিত্তকে সে বলে, ওর পায়ে ধরে সাধে, কিন্তু ঐ কথার পর আর একবারও সে মুখ খুলতে পারে নি। চিত্ত তার কথা শুনবে না সেজন্যে নয়। তার ভয় করতে থাকে। পাছে চিত্তকে এমন কোন কথা সে বলে ফেলে যাতে চিত্তর কষ্ট হয়।

প্রদীপটা শোবার ঘরের কুলুঙ্গিতে রেখে রান্নাঘরে চলে এল পুষ্প। রুদ্ধ-স্বরে হরির মাকে বললে, 'হরির মা, আমি কি করব বলতে পার, মেয়ে-মানুষের প্রাণ এত কঠিন কেনে?'

হরির মা ভাতের হাঁড়িতে চাল তুলে দিচ্ছিল, ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই হাতের কাজটা শেষ করলে। পুষ্প তাকে কি প্রশ্ন করেছে, সেটা যেন সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, আর এতক্ষণ ধরে সেটাই সে চিন্তা করছিল… এমনি একটা ভাব নিয়ে ঘুরে বলতে আরম্ভ করলে, 'তা করবে কি বাছা, উনি লোকটির মনে যা ছিল, তা করেছে…এখন যারা মরবে তারা মরবে…'

পতঙ্গের পাখায় আর একবার আগুনের ছোঁয়াচ লাগল, কিন্তু নিজের তাপ দিয়ে অপরকে জ্বালা দিতে পারল না ও। পুষ্প কাতর হয়ে বললে, 'হরির মা, যা হয়েছে সে ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি কি করব বল, কেউ আমার কথা শুনছে নাই…'

'শুনবে কি করে বাছা, জামাইবাবুর কথা বুলছ ত, সে এখন ছাড়বেক কেনে …কিন্তু এইটো কি কাজ বল দিকি বাবুর…তেনা স্বগ্‌গে গেছে, আমি কিছু বুলতে লারব, কিন্তু অমন বেটার মুখের দিকে চাইল নাই, বলতে গেলে তারই ত সব…' বলতে বলতে হাত আর মুখের একটা ভংগী করলে, যেন আগে থেকেই সে জানত যে এমনি একটা কিছু ঘটবে, আর তাড়াতাড়ি বললে, 'উ সব বড়লোকের বড় কথা মা, আমরা তার কি বুঝব। এই দেখ না কেনে, আমার হরি, মুখে একটু রা নাই, বাবুর কম করুনিটা করেছে! এখন লয় সবাই তোমরা এসে পড়েছ, পাড়ার পাঁচজন টাট খেয়ে পড়েছিল…তা অমন

শেষকালে সবাই আসে। কিন্তু যখন একটি জনপ্রাণী কেউ ছিল নাই··· দাদাবাবু টো-টো করে বেড়াত, তখন বাবুর দেখাশুনা করত কে···' বলতে বলতে হরির মার গলা ভার হয়ে এল, কাপড়ের খুঁটটা চোখের দিকে তুলে বললে, 'গুমার করব নাই, হরির আমার মন তেমন লয়, তুমার পাঁচ জনের আশীর্বাদে সে বেঁচে থাক। কিন্তু বড়লোকের কথা আলাদা, তারা দেখতে পায় নাই গো···' বলতে বলতে হরির মা চোখে আঁচলটা চেপে ধরলে।

পুষ্পর যেন ঘোর কাটল, হরির মায়ের কথাটা বুঝতে পারল সে। ওদের মা-ছেলের সেবার কথা এতটুকু অস্বীকার করতে পারে না ও, কিন্তু ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। হরির মাকে কোনো একটা সান্ত্বনার কথা বলতে চাইলে ও, কিন্তু কি রকম বেকুবের মতো হয়ে গেল ও। একটু পরেই বললে, 'খোকাটা বোধ হয় ও ঘরে উঠেছে, দেখি আমি···' কিন্তু বাইরে এসে বড় ঘরের দিকে যেতে পারল না, শিবলাল ও ঘরে রয়েছে।

অধ্যায় ১৮

এর ঘণ্টা দুয়েক পরে বড় ঘরেই ঢুকতে হ'ল পুষ্পকে। শিবলাল তখন খেয়ে এসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সামনে একটা বই খোলা রয়েছে ওর, কিন্তু পড়ছে না, পেন্সিল দিয়ে টেবিলের ওপর হিজিবিজি রেখা টানছে। পায়ের শব্দ শুনে মুখে তুলে একটু হাসলে, বললে, 'আয়, তোর খাওয়া হয়েছে? ও, চিত্ত তো আসে নি এখনো···'

পুষ্প দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে তক্তপোষের ধারে দাঁড়িয়েছিল। ওধারে একটা মোটা বালিশের আড়ালে খোকাটা ঘুমোচ্ছে, সেদিকে একবার তাকিয়েই আবার শিবলালের দিকে তাকাল ও। দাদার হাসি মুখ দেখে মুহূর্তের জন্যে ওর ভেতরটা স্বস্তিতে ভরে এল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও।

'কিন্তু তুই আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ব'স, ঐ টুলটা টেনে নিয়ে আয়...' শিবলাল হাত বাড়িয়ে টুলটা দেখালে, কিন্তু ও নিজেই একটু গা তুলে ঝুঁকে পড়ে ওধার থেকে টুলটা নিয়ে এল, 'বস, তুই আমার কাছে এসে ব'স···'

পুষ্প টুলের ওপর বসে, কোলের ওপর হাত দুটো রাখলে। খাড়া হয়ে

বসে এমন করে শিবলালের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইল, মনে হল যেন ও বলতে চায়, 'দেখ, আমার উপর তোমাদের একটু দয়া কর। যে যন্ত্রণার জন্যে আমি দায়ী নই, সেটার মধ্যে আমাকে ঠেলে দিও না…'

শিবলাল মাথার পেছনে দুই হাতের তেলো চেপে দু'দিকে দুই কনুই ছড়িয়ে দিলে, চেয়ারের পেছনে ঠেশ দিতে দিতে বললে, 'দেখ পুষ্প, তখন তোকে দেখে কি মনে হচ্ছিল জানিস…সেই তুই সন্ধ্যা দেখাচ্ছিলি…তখন তোকে বলি বলি করে বলা হয় নাই। অনেক দিন পরে মাকে মনে পড়ল। দেখ…কিন্তু কেমন করে মনে পড়ল জানিস? মা তোর মতো করে সন্ধ্যা দিত…' একটুখানি থামল শিবলাল। ওর ভয় করতে লাগল, যে কথাটা ও বলতে চায় সেটা ঠিক বলতে পারবে কি না, তারপর ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললে, 'সব জিনিসেরই দরকার আছে, পুষ্প। মায়েরও মরার দরকার ছিল জানিস। তা না হলে তোকে ঠিক অমনিভাবে দেখতে পারতাম নাই…'

পুষ্পর চোখের পাতা-দুটো ঈষৎ কেঁপে গেল, কিন্তু ঠিক তেমনি করে বসে রইল ও।

শিবলাল বললে, 'দেখ, আমার মনের মধ্যে অনেকগুলো কথা অনেক দিন ধরে জমে রয়েছে…কাউকে বলতে ইচ্ছে করে, তোকে বলছি শোন। দেখ, একটা দিক আমার একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে…বাবা নাই…'

সহসা অস্থির হয়ে উঠল পুষ্প। কোলে হাত দিয়ে তেমনি করে বসে রইল ও, কিন্তু হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলে, 'তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না, একটা কথা তুমি আমাকে বল। আমি হরির মাকে এখন বলছিলাম…'

শিবলাল এখনও বুঝল না, পুষ্প বুকের মধ্যে কোন আগুন চেপে রেখে এসেছে। কিন্তু তবু সে ওকে থামালে, একটু হেসে বললে, 'আরে আমিই কি বুঝতে পারছি না কি, কিন্তু আমার কথাটা শোন। আচ্ছা, ধর আমাদের এই আন্দোলনের কথাটা…' কিন্তু সহসা থামতে হ'ল ওকে, পুষ্পর সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। কোলের ওপর থেকে হাত দুটো তুলে টেবিলটা ধরে নিজেকে সামলালে ও, হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাদা, তোমরা, আমাকে কি পেয়েছ কি…আমি মেয়ে-মানুষ বলে আমার উপর যা ইচ্ছা তাই করবে। উঃ, ভগবান…আমি কি পশু? পশুর উপরও মানুষ দয়া

করে, কেউ আমার দিকে চেয়ে দেখ না পর্যন্ত…'পুষ্পর ছ'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে লাগল ও। একটু পরে উঠে দাঁড়াল পুষ্প, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরলে একবার, তারপর ধরা গলায় বললে, 'দাদা, বাবা এখন নাই, তোমাকেই বলছি আমি। এ টাকা আমার নয়, আমি উ নিতে পারব নাই। টাকায় হাত দিলে আমাকে নরকে যেতে হবে। তুমি এর বিহিত কর একটা…যদি না কর, তাহলে…তাহলে আমার মনে যা আছে তাই করব…'

শিবলাল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু মুখে কাপড় চেপে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল পুষ্প।

দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল শিবলাল, তারপর থেমে গেল। ওখান থেকে সরে এসে চেয়ারের কাছে কোণায় দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল ও, তারপর সরে গিয়ে ওর মায়ের ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, যেন এর পর কি কর্তব্য সেইটে ছবিটার থেকে জানতে চায়। 'আমি এতক্ষণ আমার দিকটাই দেখছিলাম। আমি ঠিক করে বসে আছি যে বাবার উইলে আমার কিছুই ক্ষতি হয় নাই, আমার কষ্ট নাই, কিন্তু ওর দিকটা তো দেখি নাই।' আর একবার দরজার কাছ থেকে পায়চারি করে এল ও।

পরপর কয়েকটা উপায় মনে এল ওর। প্রথম ভাবলে, ওকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেই ওটা নাকচ করে দিলে: তাতে কিছু ফল হবে না। না কি, চিত্তকে সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি বলবে ও…কিন্তু সে তো আরও নিষ্ফল হবে। তবে কি, টাকাটা ফেরৎ নেবে সে, পুষ্প যা চায়?…অসম্ভব। ঘাড় নাড়তে নাড়তে সরে এসে টেবিলের ওপর ছ'হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল ও, চোখ ছুটো জলজল করে উঠল, যেন টেবিলের ওপর কিছু একটা দেখতে পেয়েছে।

আর সত্যিই কিছুক্ষণ পরে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতেও পেলে ও। ধীরে ধীরে ভেতরটা শান্ত হয়ে এল ওর। এ্যাকশন কমিটির অফিস থেকে ফেরবার সময় যেমনি একটা স্নিগ্ধতা বোধ করছিল, তেমনি ভাবটা ফিরে এল ওর। ওর আপশোষ হতে লাগল, এটা কেন আগেই ভাবতে পারে নি সে। পুষ্পকে এটা তো পেতেই হবে, এই যন্ত্রণা। ও কি বলছিল মনে নাই? মেয়েমানুষ বলে আমার ওপর যা খুশি তাই করবে! এ কথার যন্ত্রণা যে

অনেক···এটা তো এই মাত্র শুরু হল, এই নিজেকে বুঝবার যন্ত্রণা···' টেবিল ছেড়ে বিছানাটার দিকে একটু এগোল শিবলাল, পুষ্পর বাচ্চাটার দিকে চোখ পড়ল ওর। একটু মুচকে হাসল ও, 'এইটে কেন ভাবতে পারি নাই আমি···' ও বিছানার ওপর এসে বসল।

অধ্যায় ১৯

পুষ্প দাদার কাছে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যে ইঙ্গিতটা উচ্চারণ করে এসেছে, আর যেমন করে উচ্চারণ করে এসেছে, ও কোন দিনও তেমনি করবে কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু যে মুহূর্তে কথাগুলো বলতে পেরেছে সে, সেই মুহূর্ত থেকেই যেন পরশমণি ছুঁয়ে এসেছে। ছোট্ট চড়াইয়ের মতো যে দিকেই তাকাচ্ছে ও, সেদিকেই ঢেউ দিয়ে ভেসে যাবার মতো খোলা মাঠ দেখতে পাচ্ছে।

পুষ্প মেঝের ওপর শুয়েছিল, বাচ্চাটাকে নিয়ে···ওকে বুক ছাড়িয়ে উল্টো দিকে ফিরে উপুড় হয়ে শুল ও। বুকের মধ্যে এতক্ষণকার স্বস্তিটা অসহ্য লাগছে। গভীর রাত্রি, তক্তপোষের ওপরে দাদা আর ওর স্বামী ঘুমোচ্ছে···ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ পড়ে রইল পুষ্প, তারপর আবার ফিরে শুতে হ'ল ওকে। কিছুতেই তন্দ্রার মতোও আসছে না ওর। হঠাৎ ওর ভয় করতে লাগল, ও কি পাগল হয়ে গেল না কি।

দূরে কোথায় ঢং ঢং করে দুটোর ঘন্টা পড়ল। এই ঘণ্টার শব্দের সংগে কি ছিল বলা শক্ত, পুষ্প তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। হঠাৎ ওর ইচ্ছে হ'ল ওদেরকে ডেকে ওঠায় আর ওর কথাগুলো ওদেরকে বলে। হাঁটু মুড়ে সেইখানে বসল, আস্তে আস্তে নিজের মনেই বলতে লাগল, 'দেখ, আমার কথা শুন···আমি তোমাদের আর কেউ নই, তোমরাও আমার কেউ নও। তোমরা যদি আমার কথা না শুন, তা'হলে তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকব নাই আমি···আমায় দোষ দিও না, আমি যা হাতের মধ্যে পেয়েছি তা আমার থাক্···' পুষ্পর চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এল। মনে মনে যে কথাগুলো বলছিল ও, সমস্ত মন দিয়ে যেন সেগুলো অনুভব করতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে বসে রইল পুষ্প। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উঠোনের উপর একটা বেড়াল পড়েছিল, ওকে দেখে পালিয়ে গেল না, একটু সরে গিয়ে বসল। দরজা খুলে চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল ও। সামনের চত্বরটার ওপর গোটা দুই খালি খাটিয়া পড়ে রয়েছে। সামনের সারি সারি দরজাগুলো বন্ধ। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। একটি লোকও জেগে নেই। চারদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। চৌকাঠ থেকে এক পা নেমে গেল পুষ্প। চত্বরটার ওপর এসে আকাশের দিকে তাকালে। পরিচ্ছন্ন আকাশ, তারাগুলো নিঃস্পন্দ দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। দুই হাতে চোখ দুটো মুছল পুষ্প, ওর মনে হল কেউ কারো নয়। কেউ স্বামী নয়, কেউ স্ত্রী নয়। বাপ-মা, ভাই-বোন, কেউ কোথাও নেই…সব এমনি শান্ত। মানুষ এত কষ্ট পায় কেন, মানুষ মরলে এত আকুল হয় কেন। কষ্ট মিথ্যা, সুখ মিথ্যা,…এই অন্ধকারের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। মানুষের কোন দিন কোন ভার নাই…এত যন্ত্রণা, মানুষের সঙ্গে মানুষের এত হিংসা…

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পুষ্প, তার আগেই শিবলাল এসে ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'পুষ্প, তুই এখানে, কেন… এ কি, তুই কাঁদছিস?' এ কথার জবাব দেবার মতো অবস্থা পুষ্পর ছিল না, কিন্তু শিবলালেরও উত্তর শোনার প্রয়োজন ছিল না। ওর চোখের জল দেখেই তার উদ্বেগ শান্ত হয়ে এল। একটু অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বললে, 'কেন, একথা আর তোকে জিজ্ঞেস করছি কেন, তোকে কাঁদতেই হবে। কাঁদা ছাড়া তোর উপায় নাই…কিন্তু আমার দিকটা তোকে পরিষ্কার করে বলছি শোন। বাবার উইলের কথাই বলছি…আমি ভাবতাম এতে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই…'

শিবলালের সামনে চোখের জল গোপন করবার চেষ্টা করল না পুষ্প, একবারের জন্য ওর দেহটা কেঁপে উঠল, তারপর কান্নায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওকে। শিবলাল বললে, 'আঃ, পুষ্প, তুই একটু শান্ত হ', আমাকে কথাগুলো বলতে দে…'

পুষ্প চোখের জল মুছলে, জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'দাদা, ঘুমাও নি?'

'ঘুমাই নি ঠিক নয়! কিন্তু এতক্ষণ আমি এই কথাই ভাবছিলাম যেন। আমি ভাবতাম, বাবা আমাকে টাকা দিয়ে যায় নি, তাতে কি হয়েছে? আমার কোন ক্ষতি নাই। স্বীকার করি তোর কাছে, মনে একটুও ক্ষোভ ছিল

না, তা নয়। কিন্তু এইমাত্র আমি কি ভেবে এলাম জানিস···তোকে বলতেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। তারপর তোকে দেখতে না পেয়ে এখানে এসেছি। কি জানিস, আমার এতে এত ভাল তা আমি জানতাম না। দেখ, পুষ্প, তোর মতন যদি কাঁদতে পারতাম আমি···দেখ, বাবার সঙ্গে কোনদিন আমার ঝগড়া হয় নি, বিরোধ হয় নি! আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বাবা বুঝেছিলেন। এমন বাবা ক'জন পায় রে···'

শিবলাল ওর রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে বললে, 'বাবা আমাকে টাকা দেয় নি···টাকায় আমার কি হত বলতে পারিস? বাবা সবচেয়ে ভয় করত আমি টাকা উড়িয়ে দেব। আমি সেইটাকেই মনে করতাম বাহাদুরি···কিন্তু মানুষকে টাকা দিয়ে তার উপকার করা যায় না। মানুষ নিজেই ঘা খেয়ে খেয়ে জাগবে। তুই···তোকে দেখে আমার তাই মনে হয়···তোর এই কান্না তো শুরু হল। আর, বাবা যে ভাড়াটে বাড়ি আমায় দিয়ে গেছে, সেখানে জানিস ফাঁকি নাই। সেখানে যে মানুষ থাকবেক, তারা আমার মুখ চেয়ে থাকবেক নাই, আমিও তাদের উপর দয়া করব নাই···এ শিক্ষা খুব বড় শিক্ষা রে। এই বাড়ি ভাড়ার ব্যাপার···না, পুষ্প, তুই অস্থির হ'সনে, আমি যেমন করে দেখছি, তুই দেখ একবার, তারপর...' থেমে ও চোখ মুছলে। পুষ্পকে থামাতে গিয়ে ওরও চোখের পাতা ভিজে এল।

অধ্যায় ২০

সকাল আটটা নাগাদ চিত্ত ওদের উঠোনে চৌকি পেতে বসে সাবান ঘসে ঘসে স্নান করছিল। একটু আগে বালতি হাতে করে গলায় বুকে তোয়ালে ঢেকে বাইরের কলতলাতেই যাচ্ছিল ও। পুষ্প রান্নাঘরে ছিল, বাচ্চার আর স্বামীর জন্যে খাবার তৈরী করছিল সে। কিন্তু হরির মা দেখতে পেয়ে একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠল। মাথার কাপড়টা টানতে টানতে তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে এল, ওর সামনে এসে ফিস্‌ফিসানো কিন্তু পরিষ্কার স্বরে বললে, 'উ কি গো, তুমি কি বাইরে নাইতে যাবেক? রাখ, তুমি···আমি ক' বালতি জল এনে দিচ্ছি···'

বালতি রাখতে রাখতে চিত্ত বললে, 'তুমি আবার যাবে কেন··· ক' বালতি আর জল আনতে পারবে,···' কিন্তু চিত্ত এটাতে খুশি হল, কেবল একটু হেসে পাশের চৌকিটাতে বসে পড়ল।

বালতিটা তুলে নিয়ে বেরোতে বেরোতে বললে হরির মা, 'বল কি বাপ, জল তুলে তুলে এতটা বয়স কাটালম, আর…' তারপর ওর কথাগুলো আর বোঝা গেল না।

চিত্তর সেই মৃদু হাসিটা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল, এই সামান্য ব্যাপারটার মধ্যেও কোন একটা নিগূঢ় অর্থ খুঁজে পেলে যেন। তেল দেওয়া মাথাটা আর এক দফা ঘসতে লাগল ও।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাশের ড্রামটা প্রায় ভর্তি করে আনল হরির মা। চিত্ত বললে, 'থাক, থাক, আর দরকার নাই…এতেই হবে…'

'না, গো, তুমি সাবান ঘসবেক দেখছি, তুমার জন্যে আর একবার যাই…' হরির মার গলায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়েছিল, মাথার কাপড়টা গড়িয়ে পড়েছিল পেছন দিকে, সেইটে আর একবার টেনে দিলে ও।

চিত্ত মাথায় জল চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'আচ্ছা, হরিকে দেখছি না ত। হরি কোথায়?'

এইটে হরির মাকে থমকে দিলে, কপালের ঘাম আঙুল দিয়ে মুছে হাঁপানো-হাঁপানো গলায় বললে, 'তার কৃথা আর বুল নাই তুমরা, বাবা। সে আপনার ঠিক আছে। তাকে আমি বদ্ধমানে পাঠি' দিছি তার মামার ঘর। সেখেনেই ছিল সে, ঘুরে আসুক কিছুদিন…'

'না, হরির মা, তোমার ছেলেটা ভাল…খুব চালাক…' বলতে বলতেই চিত্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করতে লাগল, 'আমাদের বাড়ি বাঁকুড়ায়, আমি নিজের চোখে দেখেছি…'

হরির মা কি যেন বলতে গেল, কিন্তু রান্নাঘরের দিকে চকিতে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলে। বালতিটা হাতে তুলে নিয়ে কেবল বললে, 'বাবা, সবার যদি তুমার মত চোখ থাকত থালে ঢের হ'ত, পিথিমীতে এত পাপ থাকত নাই। এত কাঁদতেও হত নাই মানুষকে…' বলে ও চলে গেল।

চিত্ত মাথাতে জল ঢালতে লাগল। 'ওঃ…আঃ…' করে তৃপ্তির শব্দ করতে লাগল ও, মনে হ'ল, মাথা আর সমস্ত গা বেয়ে একটা সুখের ধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। সেই অবস্থাতে চোখ বন্ধ করে ও ভাবলে, পুষ্প আর শিবলাল যে এতখানা মুসড়ে পড়েছে তার কোন অর্থ নেই। এইটুকু স্বীকার করা যায় যে, শিবলালের পক্ষে কষ্ট পাবার তবু কারণ আছে। কিন্তু পুষ্প! পুষ্পকে বুঝতে পারে না চিত্ত। 'থাকগে, কেউ যদি বলেই যে সে কষ্ট পাবে

তা হলে তুমি কি করবে বলো?' বলতে বলতে হাসল চিত্ত, খুব একটা খুশি-খুশি বোধ করল সে, একটা নিস্পৃহ আর যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান করতে পেরেছে বলে।

ডান পাটা বাড়িয়ে সাবানমাখা জালি ঘসে নখগুলো পরিষ্কার করতে লাগল চিত্ত, ভাবলে, 'যা হয়েছে তাতে যখন কারো হাত নাই, তখন অনর্থক চিন্তা কেন। এতে কার ক্ষতি হয়···নিজের মাথার! তাছাড়া শিবুদা ত এটা মেনে নিয়েছে। মেনে না নেবার কি আছে, স্ত্রীলোকের কি উত্তরাধিকার নাই? আগেকার দিনকাল ত নাই আজকাল।···এই সম্পত্তি নিয়ে ত ভাই-বোনে শত্রুতা হয়ে যায়, সেটা কি ভাল! তাছাড়া, শিবুদা ত একেবারে পাচ্ছে না তা নয়···আর লীলা মেয়েটির ব্যাপার কি তাহলে, সে টাকা ত শিবুদারই। এ হচ্ছে ঘুরিয়ে নাক দেখানো···শ্বশুর মশায় বেশ চালাক লোক, যাহোক!'

আবার মুচ্‌কে হাসল চিত্ত,তাড়াতাড়ি পরপর মাথায় জল ঢালতে লাগল। শিবুদা পুষ্পর কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, তার এই নিজের চিন্তাধারাটা ঠিক রাখতে পারলেই হল।···

এর একটু পরেই কাপড়-চোপড় চড়িয়ে বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শার্টের হাতাটা কনুই পর্যন্ত গুটোতে গুটোতে ও বললে, 'কই গো, আমি তো বেরোচ্ছি এখন, ছেলের জন্যে কি আনতে হবে বল, আর ছেলের মায়ের জন্যে কি···' বলে মুখ টিপে ভেতরের দিকে তাকালে।

পুষ্প বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর মুখখানা শুকনো, সেইটেতেই বোধ হয় খুব শান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। বাচ্চাটা ওর কোল থেকে ঝাঁপিয়ে চিত্তর দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল, চিত্ত ওর দিকে মুখটা বাড়িয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করতে আরম্ভ করলে। পুষ্প জিজ্ঞেস করলে, 'আমরা কি আজ রাত্রেই যাচ্ছি?'

চিত্ত খোকার হাত থেকে নাকটা ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ ধরে যে চিন্তাটা করে এসেছে ও, সেটা ওলোট-পালোট হতে দিলে না ও। নিস্পৃহভাবে বললে, 'দেখ, সেটা তোমার ইচ্ছে। আমার কোন আপত্তি নাই···আমি ত আগস্ট মাসে ছুটী পাব, জন্মাষ্টমী নয়, মহরমের সময়···তখন এসে নয় নিয়ে যাব···কি গো, চিচ্‌চ্‌চ্‌···'

এবারে খোকন ঝুঁকতে গিয়েই চিত্তর গালের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। চিত্ত লাল মাখানো গালটা ওর দিকে ধরে রেখেই আঁ-আঁ করতে লাগল 'বাব্বাঃ, কি বাপ-খেকো ছেলে রে···' বলতে বলতে ওকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল ও। মাঝে মাঝে চুকচুক করছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বলছে, 'খোকামণি বাজারে যাবে না কি, তাহলে বাজারে তার *তোমার কি বিক্রী করবে···ওদের কী হীরা মানিক আছে না কি···আঁ?* পুষ্পর কোলে ওকে দিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

বাইরের চত্বরটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েছে এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ হল। তাকিয়েই দেখলে একটা ব্যাগ হাতে দ্রুত পায়ে হরির মা আসছে ওর দিকে। একটু দাঁড়াতেই হরির মা কাছে এসে পড়ল। হরির মা খুব মোটা নয়, কিন্তু দ্রুততার জন্যে ওর কাপড়ে ঢাকা দেহটা নড়বড় করছিল। 'জামাইবাবু, বাজারে যাইছ না কি···আমাকেও বাজারে যেতে হবেক··· পাঠাল···'

চিত্ত হাসি মুখে বললে, 'এস···' ও স্পষ্ট বুঝতে পারলে, হরির মা তার অনুগ্রহ পেতে চায়, আর অকাতরে সেটা সে দান করলে। ও মনে মনে এও ভাবতে লাগল, ওর কিছু একটা কি করা যায়?

দু' এক পা হাঁটার পর হরির মা পেছন ফিরে ভাল করে একবার দেখে নিলে, যেন পুষ্প বা আর কেউ থাকতে পারে। তারপর আগেকার কথার সূত্র ধরে বললে, 'তখন কি বলছিলম বাবা জান···বড়লোক ভীষণ স্বার্থপর। তাদের হাজার থাকতে পারে কিন্তু তবু একটা পয়সা কাকেও দিবেক নাই। দিদিমণি লয় নিজের বেটী বুঝলম, ঝি পাবেক জামাই পাবেক, কিন্তু ঐ লীলা মেয়েটাকে কেনে, উয়ার কিসের অভাব? বাবার থেকে ধন পেয়েছে, কাকা দিচ্ছে···তাও বুঝতম মেয়েটার মতিগতি ভাল, তবে হ্যাঁ। যেদিন তুমি মরলে তারপর দিন আর তর সইল নাই চলে গেল আর আমার হরিটো···বড় লোক জান বাবু একটো চোখ নাই···'

চিত্ত ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল, হঠাৎ বললে, 'বড়লোক তুমি কাকে বলছ, দুএক হাজার টাকা জমালেই যদি বড়লোক হয়, থালে···'

হরির মা সম্ভবত এ কথার ইঙ্গিতটা বুঝল না, ওর হঠাৎ মনে হতে লাগল এদের মধ্যে জামাইবাবুটি লোকটি ভাল, এর কাছেই দুটো মনের কথা বলা যায়। ও বললে, 'তারপর ইয়াদের ভাইবোনের ছিরি দেখ···মেয়েটি ধি

বটে বাবা⋯দোহাই বাবা, তুমি রাগ কর নাই। বাপ যদি তোকেই সব দিয়ে গেছে, তবে তোর এত জ্বালা কেন রে বাপু, তোরই ত ভাল⋯তোর স্বামী ছেলে নাই, তোরই তো ভাল ত এও জান, লবাবের বিটির লবাবী চাল। কি⋯না, টাকাকড়ি উসব আমি চাই নাই⋯'

নিজের ইংগিতটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে চিত্তর একটুখানি ভুরু কুঁচকে গেল। বিরক্ত স্বরে হঠাৎ ও বলে উঠল, 'আজকাল দিনকাল ঐ, কারখানার লেবার মজদুররাই সব। দেখনা, দিনকাল এমনি পড়ছে, উয়াদের হাতেই সব কিছু চলে আসবেক। আর নামেই মজদুর, এই স্টীল কারখানায় এক একটা কুলি কত পায় জান? আর আমরা শিক্ষা-লাইনে থেকে কত পাই⋯ তাই ওদের অত গুমর⋯' বলতে বলতে চিত্ত হরির মার বিস্মিত মুখের দিকে তাকালে, বুঝলে এ কথাগুলো ওর বোঝার কথা নয়। বললে, 'তুমি পুষ্পর কথা বলছিলে, হরির মা⋯ ও মেয়ে সে রকম নয়। বাঁকুড়ায় যখন থাকে, তখন⋯তোমাকে বলতে পারি আমি, ও স্বামী শ্বশুর বলে জানে⋯কিন্তু এখানে, সঙ্গদোষে মানুষ নষ্ট হয়⋯' বলে জিব দিয়ে নিজের ঠোঁটটা চাটলে একবার।

কিন্তু চিত্তর মনের এই ক্ষোভটা স্থায়ী হবার কথা নয়, স্টেশন রোডে উঠবার মুখেই ওর সমস্ত মুখটা কৌতুকে ভরে উঠল। কি একটা ভেবে ও বললে, 'পুষ্পকে আমি আজ রাত্রে নিয়েই যাব বলছিলাম, কিন্তু এখন ওকে কি বলে এলাম জান হরির মা, বললাম ওর যেদিন খুশি যাবে⋯বল তুমি!'

হরির মা থতমত খেয়ে হাঁটছিল এতক্ষণ, ভাবছিল, ওর যা বলবার নয়, তাই হয়তো বলে ফেলেছে, কিন্তু এখন বুঝলে খুব বেশি দূর গণ্ডী পেরিয়ে যায় নি। ও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে⋯মাঝখানে বাধা পাওয়াতে ওর অন্তরঙ্গ ভাবটা আরও ঘন হয়ে উঠল যেন, 'তা তুমি ঠিক করেছ, বাবা। থাক না দু'চারদিন⋯মেয়েছেলে, হাজার হোক বাপের বাড়ি, টান থাকবে বই কি। আর উ টাকা, উ সব ত তোমারই রইল⋯দু'দিন সবাই অমন হাত-পা ছুঁড়ে⋯'

স্টেশন রোডের ওপর উঠেই পান আর সিগারেট কিনল চিত্ত। পানের রসে ওর মুখখানা আরও নরম, চোখ দুটি আরও খুশি মনে হ'তে লাগল। একটা সিগারেট ঠোঁটের কোণায় চেপে ধরে প্যাকেটটা পকেটে পুরলে।

ধীরে-সুস্থে ধরিয়ে রিং করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চিত্ত। চারদিকে দৃষ্টি পড়তে লাগল ওর। একটা হাল্কা সবুজ রঙের গাড়ি, প্রায় নিঃশব্দে পেছন থেকে এসে পেরিয়ে গেল ওকে। কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। একটা প্রামে করে দুটি ফুটফুটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে একজন মাদ্রাজী আয়া বাড়ি ফিরছে···বেশ রোদ, দেরি ক'রে ফেলেছে বোধ হয়। ঝিকিয়ে রোদ উঠেছে চারদিকে। একটা শিরিষ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলো চিকচিক করে চুইয়ে পড়ছে। চিত্ত এসব দেখছে, আর ওর মনের মধ্যে খুব বড় একটা ভাব ভেসে উঠছে। ভাবছে, মানুষের কোন কিছুতেই নালিশ করার কিছুই নাই। আমরা অনেক সময় না বুঝে কষ্ট পাই, কিন্তু ক্ষতি হ'লে মুষড়ে পড়ি। কিন্তু সব কিছুকেই সমান দৃষ্টিতে কি দেখা যায় না? অন্ততো দেখা তো উচিত।

বাজারের মুখে চিত্ত ঈষৎ পেছন ফিরে বললে, 'হরির মা, হরিকে একটা কিছু চাকরী জুটিয়ে দাও···বাড়িতে চাকর খাটা কিছু নয়। তুমি যদি না পার, তাহলে আমি চেষ্টা করব, এই কথা দিলাম···'

'হ্যাঁ, বাবা, দিবেক বইকি তুমরা, তুমরা পায়ে ঠাঁই না দিলে হবেক কেনে···' এতক্ষণ হরির মা কেমন নিস্পন্দ হয়েছিল যেন, কেন যে এতক্ষণ ও কথা বলে নি সেইটেই আশ্চর্য। চিত্তর কথায় চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বলে ফেলে ওর মুখের দিকে তাকালে, যেন অপরাধ করে ফেলেছে। একটু গিয়েই বললে, 'যাই, বাবা, বাজারে ঢুকি আমি···'

চিত্ত হাত বাড়িয়ে ওকে বাধা দেবার মতো করে আটকালে। বললে, 'এই কাপড়ের দোকানে একবার এস, হরির মা, এক্ষুণি চলে যাবে তুমি···?' বলে ও এগিয়ে গেল। হরির মার সামনে দিয়ে একটা রিক্‌শ ঠুন্‌ ঠুন্‌ করে বেরিয়ে গেল। চিত্ত দোকানে চাইলে, 'একখানা মিহি সুতার পুরা মাপের থান দেখি···।' কাপড় কেনা শেষ করে ওর হাতে দিয়ে বললে, 'তোমাকে আমি এইট' দিলাম, নাও, তোমার ছেলেকে আমি পরে সন্তুষ্ট করব···'।

সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত হয়ে গেল যে হরির মা কিছুই বুঝতে পারল না। ওর মুখখানা শক্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। মনের মধ্যে পরিষ্কার বুঝতে পারলে ও, এটা সে চায় নি। মনের মধ্যে খট করে উঠল তার, এত কথা তাহলে জামাইবাবুকে বলেছে কেন সে। জামাইবাবু কি ভেবেছে তাহলে?

হরির কথা মনে পড়ল তার, হাতের মধ্যে কাঠ হয়ে গেল। অনেকদিন পরে চিত্তকে বললে, 'বাবু আমরা গরীব মানুষ। তুমরা যদি আমাদিখেয়ে দাঁড়াতে ওর গলা শুকিয়ে উঠল, কথাগুলো আটকে গেল। আড়ষ্টের মতো গম্ভীর বাড়িয়ে থানটা নিলে ও।

অধ্যায় ২১

চিত্ত সেই রাত্রেই বাঁকুড়া চলে গেছে। শিবলালের সঙ্গেও আর পুষ্পর কথাবার্তা হয় না, সে খুব কম সময়ের জন্য বাড়িতে আসে। রাত্রে ও ক্লান্ত থাকে, পুষ্প আর কথা বলে না। তাছাড়া, ওর নিজের আর বলার কীই বা আছে, ওরা যদি কিছু বলত, তাহলে তার কথা আলাদা। কিন্তু ওরা কিছু বলে না, শুধু তাই নয়, ওকে পাশ কাটিয়ে চলে।

পুষ্পকে নিতে এসেও চিত্ত কেন ওকে রেখে চলে গেল সেটা ও বুঝতে পারে। 'পুষ্প কষ্ট পাচ্ছে···বাপের বাড়িতে থাক কিছুদিনে তারপর আপনিই ঠিক হয়ে যাবে···' উনি নিশ্চয়ই এটাই ভেবেছেন। শিবললাও তাকে বলেছে, 'তোকে কাঁদতেই হবে, বোন···।' অবশ্য, শিবলাল কেন সে কথা বলেছে তা পুষ্প বুঝতে পারে, কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল ও। শুধু তাই নয়, আরও একটা কথা প্রথম উপলব্ধি করল, ও স্ত্রীলোক, মেয়েদের দুঃখ পুরুষ বোঝে না, মেয়েদের সব সময়েই অবহেলার মধ্যে কাটাতে হয়। শুধু তাই নয়, আরও একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা বিঁধতে লাগল পুষ্পকে। চিরদিন ওর বুক ভরে রেখেছিল এই ভাবনা যে, সবার কাজ করে, সেবা করে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু এখন ওর মনে হতে লাগল, কারুরই জন্যে কিছু করবার নেই ওর, কেউ ওর কাছ থেকে কিছু চায় না। এইটে তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল।

এক সন্ধ্যায় হরির মা মশলা বাটছে আর পুষ্প তরকারি কুটছে। তোলা হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে বসেছে পুষ্প, হরির মার দিকে না তাকিয়েই তার আগেকার জীবনের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে। হরি তখন পাঁচ মাসের, ওর বাবা মারা যায়। ওদের আর কেউ কোথাও নেই। হরির মার আরও এক ছেলে এক মেয়ে ছিল, বারো তেরো বছর বয়েস হয়েছিল তাদের, তারপর 'মায়ের দয়ায়' পরপর দু'দিনের মধ্যে দু'জনেই

মারা যায়। এসব কথা পুষ্প এর আগে জানত না। ভাবলে, 'আশ্চর্য, আমরা মানুষের কত কম খবর রাখি···'। পুষ্প এই সব কথা শুনছে আর অজান্তেই নিজের সঙ্গে ওর তুলনা করছে। তখন, এই ক'দিন ধরে ও যে চিন্তাটা করছিল আর যা অসহায় ভাবে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, একটা বিপরীতমুখী ধারা এসে সেটাকে ঘোলাটে, স্তিমিত করে দিলে। ও ভাবলে, 'এই ত হরির মা রয়েছে, ওর কেউ নেই, কোনো সম্বল নেই, তবু ও সুখী, সন্তুষ্ট। আর এই আমি···আমাকে সব দিয়েছে, সব কিছু পেয়েছি আমি, তবু আমি সন্তুষ্ট নই কেন! আমার এই জ্বালা কেন···'। মনের মধ্যে খুব একটা কঠিন চেষ্টা করতে লাগল ও: অন্যভাবে সমস্ত জিনিসটা দেখবার জন্য, কিন্তু তবু মনের মধ্যে তেমনি খাঁ-খাঁ করতে লাগল।

হরির মা মশলা বাটা শেষ করে উনুনের কাছে গেল, ফুটন্ত ভাত পরীক্ষা করবার সময় ওর কথায় বাধা পড়ল একবার, তা না হ'লে সমানে নিজের কথা, অন্যের কথা বলতে লাগল ও। এদের ওপর সমস্ত অভিযোগ সত্ত্বেও এদেরকে ভালবেসে ফেলেছিল হরির মা, তাই কয়েকবার চলে যাবার কথা বললেও চলে যায় নি। কথায় কথায় হঠাৎ লীলার প্রসঙ্গে এল ও, এবং বললে, 'মেয়েটো ধন্যি বটে, বাপু। যেদিন কত্তা সগ্গে গেলেন, তারপর দিনই চলে গেল। এতগুলা টাকা পেলি, একটুন কিতজ্ঞ নাই···', তারপর বলতে বলতে তেমনি করে চিত্তর ওকে থান-কাপড় দেবার কথায় চলে এল ও। সগর্বে বলে উঠল, 'আমরা তেমনি লোক লয়, বাপু। নুন খেলে গুণ গাইতে জানি। জামাই ছেলের সুখ্যাত না করে, পারব নাই···'। অর্থাৎ এই দুনিয়ার সঙ্গে ওর জীবনের সম্পর্ক নিরাসক্তির, আঘাত পেলেও যেমনি, খুশি হলেও তেমনি সেই জীবনটিই প্রকাশ পেতে থাকে।

পুষ্প চমকে উঠল, হরির মার এই কথাগুলো যেন তার মনের মধ্যে একটা নতুন পথ খুলে দিলে। ও তাড়াতাড়ি বললে, 'আচ্ছা হরির মা, আমরাও তো ওদের ওখেনে যেতে পারি? এত দিন হয়ে গেল, আমরাও তো তার কোনো খোঁজ নিই নি...'

'সে কি বাছা, তুমি যাবে না কি····'

'তাতে দোষ কি, হরির মা। বাবা ওদের বাড়িতে গেছলেন আমাকে নিয়ে···' তারপর যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমনি করে বললে, 'লীলা একলা মেয়ে-ছেলে, ওর কাকিমাও ঘরে নাই, কাল আমরা যাব চল···'

সেই রাত্রে শুয়ে শুয়ে এই কথাই চিন্তা করছিল পুষ্প। অনেকদিন পরে একটু স্বস্তি পেলে ও। লীলা স্ত্রীলোক, তার পাশে ওকেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার দুঃখে ওই এখন সান্ত্বনা দিতে পারে। যতই রাত্রি গভীর হতে লাগল, ততই মনে হল তার, সে লীলার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, তার সমস্ত দুঃখ নিজের বুকে তুলে নিতে পেরেছে। কয়েকদিন আগে সে ভাবছিল, পুরুষ স্ত্রীলোকের দুঃখ বোঝে না, সে যন্ত্রণাটা ভুলে গেল ও। মনে হ'ল, এই যে একজন স্ত্রীলোক আর এক জনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই।

অধ্যায় ২২

সাত নম্বর ব্যাটারির 'টোপমান' লছমীকান্ত মিশিরের জীবনে একটা বড় আক্ষেপ ছিল, সে সন্তানের মুখ দেখতে পায় নি। পাঁচবার তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে, কখনো অকালে স্রাব হয়ে গেছে, কখনো ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে। কিন্তু ডাক্তার রাইবাবু মেহেরবানি করে এমন দাওয়াই দিয়েছিলেন (অন্ততো লছমীকান্ত এটাকেই কারণ বলে মনে করে) যে এবারে তার স্ত্রী যথাসময়ে শুধু প্রসব করেছে তাই নয়, প্রসূতি আর ছেলেটি দুই-ই ভালো আছে। লছমীকান্তর খুশির সীমা ছিল না, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেটার প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছে। নবজাত শিশুর তদারকি করা অপেক্ষা সে এখন বাইরে বাইরেই বেশি ঘুরে বেড়াচ্ছে: এবং যেমন প্রসবের আগে তেমনি প্রসবের পরে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছে।

কোম্পানী লক আউট প্রত্যাহার করার দিন তিনেক পরে এক সকালে লছমীকান্ত ওআর্কার্স্ ইউনিয়নের অফিসের সামনে হাজির হল। অফিস-বারান্দার কাছাকাছি ঘন-হওয়া লোকগুলি ইউনিয়নের থেকে পাশ নিতে এসেছে। পেছনে এদের থেকে একটু দূরে ইতস্তত লোকগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়, ওরা পাশ নিতে আসে নি, কিন্তু এই 'পাশ'-নেওয়া তামাশা সম্বন্ধেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ওরা। ওরা উত্তেজিত, এবং নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চালাচ্ছে। কিন্তু বারান্দার কাছাকাছি লোকগুলি চুপচাপ, বিমর্ষ, এবং যা করতে এসেছে ওরা তার সম্বন্ধে এখনো অনিশ্চিত। পেছনের

দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না ওরা, যেন ওদের ওপর পেছনের থেকে যে টিটকিরি ছুঁড়ে মারছে এমনি করেই তার থেকে নিজেদেরকে আড়াল করতে চায়।

লছমীকান্ত পাশ নিতে আসে নি, এবং নেবার ইচ্ছেও ছিল না তার। কুতকুতে চোখে একবার সে সামনের লোকগুলোর দিকে তাকালে, তারপর কিছু না ভেবেই একেবারে ওদের মধ্যে এসে পড়ল। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল, এখন কাদাটা প্যাচপ্যাচ করছে। কাগজের টুকরো, ছেঁড়া শালপাতা সব কাদায় মিশে একাকার হয়ে উঠেছে। ওরই মধ্যে জল জমেছে এখানে-ওখানে, নিচু জায়গায়। অবশ্য, বৃষ্টির পর আবহাওয়াটা খুব পরিষ্কার, ঝিকিয়ে রোদ উঠেছে। এদের বিমূঢ় ভাব, নিচের কাদা, কোনো কিছুর সঙ্গে তার মিল নেই যেন।

লছমীকান্ত কাদা জল কাটিয়ে কাটিয়ে এগোচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতে হল। দুটি লোক খুব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল ওকে। একজন জোয়ান গোছের লোক গোঁ-ভরে এগোচ্ছে। আর অন্যজন বুড়ো মানুষ, অনুনয় করে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করছে।

'বিনু, বিনোদ, আমার কথাটো শুন, শুনে যা······' বলতে বলতে নড়বড় করতে করতে এগোচ্ছিল বুড়োটা। কে একজন ভিড়ের মধ্য থেকে ওকে বললে, 'আরে দাদুভাই, পাশ লইবারে আইলেন না কি? ব্যাপার সব শুনেছেন······'

'কি···বিশে কুইলা দালাল নয়···,' হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো, অগ্নিদৃষ্টি হেনে লোকটাকে একবার দেখে নিলে। ছোকরাটি রুক্ষ মুখে বললে, 'কেন বিরক্ত করছ আমাকে, যাও তুমি···'

বুড়োর আগেকার তেজটা জলে-পড়া মাটির ডেলার মতো গলে গেল। জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে, 'বিনু, তুই আমার মায়ের পেটের ভাই নয় কিন্তু তুই আমার তার বাড়া। আজ দশ বছর এক সঙ্গে আছি এক ঘরে। কেনে তুই ঐটো করতে যাচ্ছিস। দেখ, এই কেঁচোগুলার দিকে চেয়ে···' বুড়ো নিজেই একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলে, মুহূর্তের জন্ম ওর ঘোলাটে চোখে সেই ঘৃণাটা দপ করে উঠল। বললে, 'ঐ লোকগুলার মতন হতে চাস তুই? ছিঃ, আমার কথা শুন, জেমসাহেবের 'পাশে' লাথ মেরে দে···'

বিনোদ থরথর করে কাঁপছিল। বুড়োর স্নেহপূর্ণ চোখের দিকে তাকাতে

গিয়ে ওর ক্রোধ কান্নার আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু তথাপি ও বললে, 'জেরসাহেবকে লাথ মারি, কিন্তু বউ-ছেলের পেটে ভাত দিবেক কে, তুমি?'

বুড়োর মুখখানা চুণ হয়ে গেল, যাদেরকে কেঁচো বলছিল ও তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো পিটপিট করতে লাগল ওর। এই প্রথম বোধ হয় ও বুঝলে মানুষ কতখানি অসহায়, কোন স্নেহের টান মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। কিন্তু সেটা কেবল মুহূর্তের জন্যে, নিজেকে সামলে বিনোদের হাতটা ধরে পরিষ্কার গলায় বললে, 'না, আমি তুমার পেটে ভাত দিব নাই··· এই বললম···'

লছমীকান্ত যেন টানা হয়ে এতক্ষণ ওদের দু'জনের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, এই কথায় মুচকে হাসল ও, জিব দিয়ে ঘনঘন ঠোঁট চাটতে লাগল। 'এ আচ্ছা বাত বলেছে বুড্ঢা···' মনে মনে ভাবলে লছমী। নিজের ছেলেটার কথা মনে পড়ল ওর, তারও জন্যে দুধের বন্দোবস্ত করতে হবে।

বিনোদ আর বিশে কুইলা দু'জনেই কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না, হঠাৎ অতবড় জোয়ান ছোকরা বিনোদ ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। হাতটা ঝিনকে নিয়ে চোখে জামার খুঁট চাপতে চাপতে যে পথ দিয়ে সে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে পালাল ও। এইটে লছমীকান্তকে হঠাৎ চেতন করে দিলে যেন। ওর মনে পড়ল, সেদিন অপি সাউ ওকে এই 'পাশ' নেবার নামে কী রকম তিরস্কার করেছিল। তাড়াতাড়ি ফিরে পালিয়ে এল ও, পেছনে তাকাতে তাকাতে, যেন এখনই কেউ জোর করে তার হাতে একটা ইউনিয়নের পাশ ঢুকিয়ে দেবে।

ফিরবার পথে 'নারায়ণ কেবিন'-এর সামনে একবার দাঁড়াল লছমীকান্ত। সকাল ন'টাতেই ভিড় জমে গেছে। গুলিবর্ষণের পর কিছুদিন রাস্তাগুলো খাঁ-খাঁ করত, এখন প্রত্যেকটি চা-দোকানে অসম্ভব ভিড় হচ্ছে। শ্রমিকরা একলা ডেরায় থাকতে যেন ভয় পায়, চা-দোকানে এসে পরস্পরের মুখ দেখে আর কারখানার পরিস্থিতি নিয়ে জল্পনা করে এক রকম আনন্দ পায়। 'নারায়ণ কেবিন'-এ এখন মৃত সুরেন সাহার পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে বংশী সাহা এসে বসেছে এবং পুরাণো 'বয়' বলরামের সাহায্যে দোকান বেশ চলছে। লছমীকান্ত একবার ভাবলে এক ভাঁড় চা নিয়ে বসবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মত বদলে ফেলে। ওবেলাই এখানে একটু বেশি সময়ের জন্য থাকা দরকার, সেই সময় পয়সা খরচ করা যাবে। লুব্ধ দৃষ্টিতে ও একবার

চা-পানরত প্রাণীকগুলির দিকে তাকালে, তারপর ওখান থেকে চলে এল। ওর মনে পড়ল, কয়েক মাস আগেও এখানে ওর চেনা লোকজন, রামেশ্বর সাহু, হোটেলাল, নব পাত্র, এরা সব ভিড় করে থাকত।

দামুনিয়া থেকে ফিরবার পথে মোটর এ্যাকসিডেন্টে সুরেন সাহার মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্যন্ত 'নারায়ণ-কেবিন' বন্ধ ছিল। তারপর জুনাপুরে ওরা জুনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এর জন্যে আরও কিছুদিন কেবিন খোলা হয় নি। তারপর যেদিন নেড়া মাথায় তার ছেলে বংশী এসে দোকানে বসল, সেদিন পথচারীরা অবাক হয়ে গেল; এটাও যে হবে তা যেন তারা ভাবতে পারে নি। আর আশ্চর্য এই যে দু'জন চার জন করে তারপর খদ্দের এসেও সেই পুরণো ঝাঁপের নিচে জড়ো হল এবং চায়ের অর্ডার দিতে লাগল। সুরেন সাহার মৃত্যুতে আকস্মিক ধাক্কা লেগে যেমন ওরা ভেবেছিল, 'এও তাহলে সম্ভব, এটা তাহলে এমনিই!' কিশোর বংশী সাহা দোকানে এসে বসবার পরও ঠিক তেমনিই ভাবল ওরা। প্রথম প্রথম বংশী চুপচাপ বসে থাকত, আর বলরাম অধিকতর মনোযোগের সংগে খদ্দেরদের চাহিদা মেটাতে আর বংশীকে তৃপ্ত করবার চেষ্টা করত; শোকাহত বংশীর জন্য এটা করা ও কর্তব্য বলে মনে করত। খদ্দেররাও মনে করতে লাগল, বংশীর প্রতি তাদেরও দাঁয়িত্ব আছে, আর অর্ডার দিয়ে তা পালন করবার চেষ্টা করত। তারপর, বংশীও তার দিক থেকে ভাবতে আরম্ভ করলে: এই যে এরা সবাই সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, আমার কি তা এমনিই নেওয়া উচিত? আমি পিতৃহীন, আমার এঁদের সদিচ্ছার যোগ্য হওয়া উচিত। এবং সে দোকানটাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। দোকানে চুণকাম করে, ভাঙা বেঞ্চ-আলমারি মেরামত করে, নতুন পর্দা টাঙিয়ে সে এমন করে দোকানটার ভোল বদলে দিলে যে, খদ্দেরদের তাক লেগে গেল। মৃত্যুর ওপর নতুন জীবন এসে কেমন করে দখল জারি করে বসল তা ওরা বুঝতে পারল না, বিশ্বাসঘাতীর মতো পুরণো জীবনকে তা কখন ভুলিয়ে দিলে। ফলে, যে বংশীর ওপর বলরাম এবং খদ্দেররা অনুকম্পা প্রকাশ করছিল সেই যখন কয়েকদিন পরে বলরামকে এটা-ওটা আদেশ করতে লাগল, এবং খদ্দেরদের সবিনয় চাতুর্যের সঙ্গে এটা-ওটা অর্ডার দেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, তখন আস্তে আস্তে তারা সেটা মেনে নিলে। ভাবলে,

এমনিই চিরকাল ছিল, অন্ত রকমটি কখনও থাকতেও পারত না। আর মৃত্যু যদি ঘটেও থাকে তাহলে, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রথম প্রথম চমকে উঠলেও এই ভেবে খুশি হয়ে উঠতে লাগল ওরা।

সেদিন সন্ধ্যায় লছমীকান্ত কেবিনটায় এল, তার পরদিন, আর তারও পরদিন···রোজই আসতে আরম্ভ করল ও। এইটে যেন নেশার মতো চেপে বসতে লাগল ওকে। কোনো দিন না আসতে পারলে নিজের মনে একটা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করত ও, ভাবত, অন্যেরা কেমন সহজেই সকলের সঙ্গে জমায়েত হতে পারে, না পারলেও কোনোরকম কষ্ট বোধ করে না। জানত না যে অন্যের অবস্থাও ঠিক তারই মতো। আসলে, অজান্তেই নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্য বোধ করত ওরা, যেটা ওদের বর্তমান কূলহীন বিপর্যয়ের মধ্যে দিশারীর মতো কাজ করত। যাই ঘটুক না কেন, সবাই মিলে তার উত্তাপটা বুক পেতে নিত ওরা।

এই অবস্থার নানা ঢেউ এসে আঘাত করতে লাগল ওদের, তার কোনোটা অনুকূল, কোনোটা প্রতিকূল। লক-আউট প্রত্যাহারের ঘোষণার পর দিন কয়েক যেতে না যেতেই এ্যাকশন কমিটির ধর্মঘটের ঘোষণা এল, ১লা জুলাই থেকে। ট্রেড্ ইউনিয়নসের বিশ্বসংস্থা যে অর্থসাহায্য করেছিলেন জুনাপুর শ্রমিকদের জন্য, তা মৃত ও আহত শ্রমিক পরিবারে ভাগ করে দেওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে। জুনাপুর সোসালিস্ট পার্টির তরফ থেকে মৃত শ্রমিকদের এক যৌথ শ্রাদ্ধ-বাসরের অনুষ্ঠান করা হ'ল। এই দুটি ঘটনা সাধারণ শ্রমিকদের মনে একটা অজানা উদ্দীপনা আর সান্ত্বনার সৃষ্টি করলে। এরই মধ্যে তলে তলে নানা গুজবও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রতন ধর এরই মধ্যে একটা রহস্যজনক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াল। শোনা গেল, হাজার খানেক ভলান্টিয়ার নিয়ে সে একটা গুপ্ত দল গড়ে তুলেছে, প্রয়োজন হলে আত্মপ্রকাশ করবে। জুন মাসের শেষ নাগাদ একটা উত্তেজক ঘটনাও ঘটল, শেষ রাত্রে একজন শ্রমিক আততায়ীর হাতে নিহত হল, লেবার গেট থেকে একটু দূরেই, রেলপথের ওপর। শ্রমিকটিকে কেউই সনাক্ত করতে পারল না। লোকে বলে, এটা রতন ধরের দলের কাজ, ইউনিয়নের লোক পেয়ে মেরেছে। অন্যদল বললে, লোকটা এ্যাকশন কমিটির ···ইউনিয়নের লোক শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু আরও একটা জোরাল গুজব ছড়ালো যে এটা স্বয়ং ব্যানার্জী সাহেবের কাজ। কী কারণে তিনি ক্ষিপ্ত

হয়ে তাঁর পোষা গুণ্ডাদের—যাদেরকে বেছে বেছে চাকরী দিয়েছিলেন তিনি এবং যাদেরকে কুস্তির আখড়ায় 'মানুষ' করে তুলেছেন—লেলিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত জুনাপুরটাকে লণ্ডভণ্ড করে ছাড়বেন তিনি। এইটেই অনেকে বিশ্বাস করতে লাগল।

এরই মধ্যে একটা সন্ধ্যা লছমীকান্তর পক্ষে অদ্ভুত অর্থপূর্ণ আর সুন্দর হয়ে উঠল। একই সঙ্গে অপি সাউ, রামেশ্বর সাহু এবং আরও কয়েকজন পরিচিতকে কেবিনে পেলে ও এবং পুরাণো দিনের আনন্দ পেতে লাগল। অথচ, বিকেলেও তার মনের অবস্থা ক্ষেপাটে লোকের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। ছোটেলালের (যে ছোট্টুলালকে সে সবচেয়ে অপছন্দ করত ও, তার নামটাই ঈষৎ বদলে নিজের ছেলের নাম রেখেছিল) জন্যে দুধের বন্দোবস্ত করেছে ও, কিন্তু অনেক মূল্য দিয়ে। বরসিংবাঁদের ঘোষবাবু কারখানারই মজদুর, এখন দুধের ব্যবসা করে বাবু হয়ে গেছে। লছমীকান্ত যতবারই তার কাছে গেছে, ততবারই লোকটা বলেছে, দুধ নাই, সব তার ওপরওয়ালা বড় সাহেবকে দিয়ে দিতে হয়। আজই লছমীকান্ত আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারে···জুনাপুরের বর্তমান অবস্থায় কোন মজদুরকে বিশ্বাস করে ধারে দুধ দিতে চায় না ঘোষবাবু। বুঝবামাত্র চিৎকার করে উঠেছিল লছমীকান্ত, তাকে অবিশ্বাস? পয়সা কটা আর সে দিতে পারত না? পয়সা তো একটা বাঁদরেও খেল দেখিয়ে রোজগার করে। স্ট্রাইক চলছে, তাই ধার চাইছিল সে। 'বিশোয়াস না হয় নগদ পয়সা দিব, কাল সকালেই আসব আমি, তুমি দুধ রাখবে···' বলে হাঁপাচ্ছিল লছমীকান্ত। হলে কি হবে, ঘোষবাবু কিন্তু এতেও রাগ করল না, গুড়্‌গুড়্‌ করে হুঁকো টানতে লাগল। তারপর, হুঁকোর মুখটা মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বললে, 'হাঁ-হাঁ, আমি ত এই কথাই বলছিলাম, নগদ টাকা দিবেক, মাল লিবেক, এর মধ্যে কোন গোল নাই। বড় সাহেবকে আধসের দুধ কম দিব, বলব, কম দিয়েছে···'। ওর কথার মাঝখানেই ঝটকা মেরে থামাল ওকে লছমীকান্ত। 'হাঁ, ওহী বাত···' বলে ঘৃণিত চোখে ঘোষবাবুর বারান্দা থেকে ছিটকে এসেছিল ও।

এর মিনিট দশেক পরে 'নারায়ন-কেবিন'এ পৌঁছানো মাত্র রামেশ্বরই ওকে ডাক দিয়ে নিলে। 'লছমীবাবু, আপনার ছোট্টু আপনাকে ছেড়ে দিলে?' বলে রামেশ্বর হাসলে। কোক ড্রাইভার রামেশ্বরের শুকনো চেহারা আরও

কাহিল হয়েছিল, তার ওপর দাড়ি-গোঁফ না থাকাতে আরো হতচ্ছাড়া দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করার মতো অবস্থা ছিল না লছমীকান্তর, তৎক্ষণাৎ ওর মনে হ'ল, সে বন্ধুর বিশ্বস্ত সাহচর্যের মধ্যে এসে পড়েছে, এবং এখানে সে দিল খুলে একটু বাতচিৎ করতে পারবে। মাথায় পাগড়ীর মতো করে জড়ানো গামছা খুলে মুখ মুছতে লাগল এবং করুণভাবে হেসে রামেশ্বরের পাশে বসে পড়ল ও। 'তারপর, আপনাদের কি কথাবার্তা চলছিল?' বলতে বলতে কেবিনের ভেতরের দিকে তাকাল ও এবং অপি সাউএর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকবার মুখেই ডানদিকের বেঞ্চিতে বসে চা খাওয়া শেষ করে বিড়ি টানছিল ও। লছমীকান্তর এই অবস্থাতেও মনে হল, অপি সাউ ভীষণ ক্রুদ্ধ, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে ওর। সম্ভবত, ওর পাশে যারা কথাবার্তা বলছিল তাদের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠেছে ও। কিন্তু পরমুহূর্তে অপিকে ভুলে গেল সে, এবং তার পাশেই যে গল্প চলছিল তাতে ডুবে গেল।

অধ্যায় ২৩

অপি সাউ সম্বন্ধে লছমীকান্ত যা ভেবে নিলে তা ঠিক নয়। অনেকক্ষণ থেকে অপি তার জন্যই অপেক্ষা করছিল এবং সে আসবামাত্র উঠবার উপক্রম করলেও, কিন্তু লছমীকে জড়িয়ে পড়তে দেখে আরও কিছুক্ষণ বসে যাওয়াই ঠিক করলে। ওর পাশে যারা উত্তেজিত ভাবে গল্প করছিল, তাদেরকে ও চিনত না। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবেছিল ও এবং যদিও তাদের দিকে ও তাকাচ্ছিল আর কারখানার আলোচনাই হচ্ছে এটা ধরতে পারছিল, তথাপি ওদের কথার একবিন্দুও খেয়াল করতে পারল না ও। ও আবার চায়ের অর্ডার দিলে এবং নাক সিটকে ভাবলে, 'অদ্ভুত! কারখানার কথা নিয়ে ওরা এত মাথা ঘামাতে পারে কি করে!'

ওর পাশের লোকগুলি ব্যানার্জী সাহেবের এখনকার গতিবিধি নিয়ে গল্প করছিল। এখন সন্ধ্যা হলেই ট্যাক্সি নিয়ে কুলি-ধাওড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মুখে বলছেন, 'আমি লেবার অফিসার, তোমাদের কী অভাব-অভিযোগ আছে বল···স্যার মুখার্জী অনেক টাকা দিচ্ছেন, তোমাদের ভাল করে দেব···' কিন্তু তলে তলে তাঁর পোষা গুণ্ডাদের নাকি শানিয়ে তুলছেন। তারপর রাত

দশটার তাঁর ক্লাবে ফিরে যান তিনি আর সারা রাত ধরে দাপাদাপি করেন। উপস্থিত সকলেই বললে, তারা কোথাও না কোথাও ব্যানার্জী সাহেবকে সন্ধ্যার পর কুলি-অঞ্চলে দেখেছে। সমস্ত জুনাপুরটাই লোপাট করে দিতে চান তিনি। এরই মধ্যে একটা খুন হয়েছে।

অপির বাঁ-দিকের বিরলকেশ মোটা মতো লোকটি হঠাৎ দুই কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল, অপিকে পেরিয়ে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু এইটা মনে রেখ হে, ব্যানার্জী সাহেবেরও গদা তৈরী হ'চ্ছে। তামাম লেবার লোক ক্ষেপে গেছে…'

'আরে থাম তুমি। ব্যানার্জী সাহেব তুমার আমার মতন বয়াটে আদমি যে কুলি-বস্তীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন…কেনে, ছুকরী পটাবার জন্যে?' ওদিকের লোকটিও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

মোটা লোকটা জবাব দেবার আগেই তার পাশে এক বুড়ো গোছের লোক বললে, 'নিচের দিকে চোখ রেখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে, 'তাই বা নয় কেনে, কত রকম শুনি। তবে এই যে ঘুরে বেড়ানার কথা বলছ, এইটো সত্যি। শুনলম কুম্পানীর সঙ্গে তেনার মনের অমিল হয়েছে… কি তা বলতে লারব। তবে ধর না উনি হলেন কুম্পানীর ডান হাত, মজুরদিকে বলতে গেলে উনি হাতে রেখেছেন। আর কুম্পানী যদি তেনাকেই ক্ষেপায়…'

'হুঁ-হুঁ, ঐ কথাই বটে, তবে আমি বলছি কি মজুররাও পাড়ায় পাড়ায় তৈরী, তাদিকে আর 'হাতে' রাখতে হবেক নাই…' সহসা কনুয়ের ভর ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল মোটা লোকটি।

এদের কথাবার্তা যেমনি চলুক, লছমীকান্তদের কথাবার্তা আর তার আমেজ বেশ উচ্চগ্রামে উঠেছিল। ধর্মঘট, গুলিবর্ষণ, গুণ্ডামি, রাহাজানির গল্পই করছিল ওরা এবং ওদের ওপর এগুলির যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—আশঙ্কা, সংশয়, বিতর্ক, ভয়, তাও প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু তবু এসবের মধ্যে থেকেও এসবের অনেক ওপরে ছিল ওরা। ওরা জুনের আগে এবং পরে শ্রমিকদের মনোভাবের পার্থক্য এইখানেই। মে মাসের শেষে উত্তাপ যখন একশো ষোলো ডিগ্রির কাছাকাছি, তখন মানুষ আপ্রাণ যন্ত্রণা ভোগ করেছে এবং কতক্ষণে সেটার থেকে রেহাই পাবে সেজন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই অসহ্য উত্তাপের পর তারই ফলে যখন কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি, বর্ষা, শ্রাবণের ধারা, এবং প্লাবন নেমে আসে তখন মানুষ ঠিক আগেকার

মতোই প্রকৃতির হাতে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে বটে কিন্তু মনোভাবটা বদলে যায়। ভাবে, যত আঘাতই আসুক না কেন, এটাই এখন প্রকৃতিকে শস্যপূর্ণ করে তুলবে। তেমনি ৩রা জুনের মৃত্যুর পটভূমিকায় জুনাপুরের শ্রমিক নিজেকে দেখে নিয়েছিল। তারপর, তাদের জীবনে ধর্মঘট, রাহাজানি যা-ই আসুক না কেন, তা সোনার ফসল ফলিয়ে তুলবে, নিজের অজান্তেই এই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলে।

এদের কথাবার্তায় লছমীকান্তই সব চেয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছিল বেশি। ও ঘন ঘন নিজের জিব চাটছিল আর হেসে হেসে রামেশ্বরকে তার গল্প আরম্ভ করবার জন্য বার বার অনুরোধ করছিল। রামেশ্বর বিনীতভাবে ওদের বলছিল, 'ভাই, আর গল্প নাই মজুরদের জীবনে, এস-ডু'র বাংলার সামনে সব খতম হয়ে গেছে....' আর চুপচাপ বিড়িটা টানছিল। ৩রা জুনের সেই অভিযান আর তার পরিণাম চোখের সামনে যেন ভাসছিল ওর। কিন্তু সহসা মানুষ যেমন করে তন্দ্রাস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ওঠে, তেমনি চমকে উঠে ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সেখানে কোথাও শোক, দুঃখের চিহ্ন পর্যন্তও নাই। প্রত্যেকের চোখেই একটা নিবিড়, তীব্র আগ্রহ দেখতে পেল ও, মুহূর্তে ওর বুকের ভেতরটাও দপ করে উঠল যেন, একই রকম আগ্রহ বোধ করল ও। পর পর কত ঘটনার কথা মনে পড়ল ওর, মনে হল কতবার এরা এমনি গল্প শুনতে চেয়েছে আর সে নিজে গল্প শুনিয়েছে। মাঝখানে কোথাও ফাঁক ছিল না, ৩রা জুনের পরও নয়।

শেষ হয়ে আসা বিড়ির মুখটা বেঞ্চির গায়ে চেপে নেবাল রামেশ্বর, সেইটে মাটির ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আরম্ভ করলে, 'একটো আদমিকে সেদিন দেখলম হাট করতে। সন্ধেবেলা আলো-আঁধারি চেনা যায় না, তায় আবার ঘোমটা দেওয়া টুপি পরেছে মাথায়। আমার যায় কি কেমন কেমন লাগল যেন। দেখি কি, লোকটা সারা বাজার ঘুরছে কিন্তু তবু তার থলের এক কোণাও ভরল নাই। লোকটা জান কে, কম্যুনিস্ট পার্টির রতন ধর। পরে জানলম, লোকটা সওদা করছিল বটে, কিন্তু মানুষের সওদা, অবস্থার হালচাল বুঝছিল...'

রামেশ্বর থামবার আগেই হেসে ফেলল ওরা, সোচ্চার নয়, কিন্তু এইটেই বোঝাল, ওদের খুশি কতখানি গভীর। রামেশ্বরের কথার মধ্যে হাসির কিছু ছিলনা, সেজন্যেও হাসে নি ওরা, কিন্তু ওরা সকলেই অনুভব করেছিল এর মধ্যে

ওদের নিজেদের কথাই আছে, এই সব কথা আগেও বলেছে বা শুনেছে ওরা। যদি মৃত্যু, যদি আঘাত এসে থাকে, তাহলে তার খুবই প্রয়োজন ছিল।

নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল ওরা।

* * *

'নারায়ণ কেবিন' থেকে বেরিয়ে খুশিতে ভরা-ভরা হয়ে পথ হাঁটছিল লছমীকান্ত। রাইবাবুর ডাক্তারখানা পেরিয়েছে এমন সময় পেছন থেকে অপি সাউ এসে ওকে ধরলে। অপির কথা ভুলেই গেছল ও। অপি ওকে কোনো কথার বলা অবকাশ না দিয়ে এবং নিজে কোনো রকম ভূমিকা না করে বললে, 'লছমীবাবু, আপনি আগামী কাল একবার চলেন। বলতে গেলে সব এক রকম ঠিকঠাক হয়ে আছে, কেবল আশীর্বাদীটা বাকি। ঐটো হয়ে গেলেই ভাল হয়···' বলতে বলতে একটুখানি থামল। চোখ দুটো কি জন্যে বুজে এলো যেন। তারপর হঠাৎ তাড়াতাড়ি করে বললে, 'হুঁ, ঐটো হয়ে গেলেই ভাল, আমার বুকের ভিতরে কেমন ভয় ভয় করে!'

লছমী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। অপির সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেই ও কেমন আড়ষ্ট বোধ করত, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে হ'ল তার কোন প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ অপির সেই ঠেলে-আসা সেই ঘোলাটে চোখটা ঢাকা পড়াতে কেমন ওকে অস্বাভাবিক কিন্তু ছেলে-মানুষ মনে হ'তে লাগল। একটু হেসে ও বললে, 'মাৎ ডর করো, অপি বাবু। ডর কেঁও করেগা···লেকিন, একঠো বাত শুনিয়ে, আপকা লড়কী কা সাদী দো-দশ-দিন কে বাদ করিয়েগা, আব্ তো স্ট্রাইক ভী চল্‌তা হ্যায়··· ক্যায়সে...'

'নেহী, নেহী, ও-আভী করনা পড়েগা, জরুর...'অপির ছোট হয়ে আসা চোখ দুটো আবার দপ করে উঠল যেন।

'হাঁ-হাঁ···তা করতে হবে বৈ কি...' তৎক্ষণাৎ লছমীকান্ত ঠোঁট চেটে চেটে বললে।

একটু পরে অপি ওকে বললে, 'লছমীবাবু, সব শুনেন। স্ট্রাইকের কথা বলছেন, ঐ স্ট্রাইকের শেষ হবে না—কি হবে ভগমান জানেন। কিন্তু ই হচ্ছে কি জানেন, সব্বনেশে স্ট্রাইক, সব শেষ হয়ে যাবে···' হঠাৎ অপি লছমীর কাছে সরে এসে ওর হাতটা ধরে ফেললে। চকিতে পেছন ফিরে দেখে নিলে

ওদের কেউ দেখেছে কি না, তারপর প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে ফিসফিস করে বললে, 'লছমীবাবু, দুর্দিনের বন্ধু হচ্ছে আসল বন্ধু। আমার ই কথা আর কাকেও বলি নাই আমি, শুধু আপনাকে বলছি। কেনে বলছি আমি জানি নাই, কিন্তু আপনাকে না বললে, চলবেক নাই। আমার দু'শ সাতচল্লিশ টাকা ছিল, তায় হাত পড়েছে। কাল রাতে খাই নাই, শুনেন···আজ দু'পর বেলা ভাত খেইছি···কি জানেন, গায়ের রক্ত শুষে খেইছি। সব যাবে লছমী-বাবু, পেটে সব যাবে, এই পেটে...'

'ক্যা করেগা, ভাইয়া, ক্যা...' অপি পেটে খোঁচা দিচ্ছিল, ওর হাত দুটো লছমীকান্ত টেনে ধরল। লছমীর নিজের কথাটা চকিতে ওর মনের ওপর ভেসে গেল, সারাদিন ওরও খাওয়া হয় নি, তের-চোদ্দ দিনের ছেলেটা এক ফোঁটা দুধ পাচ্ছে না। কিন্তু এ চিন্তা চকিতে তলিয়ে গেল ওর; রুক্ষ মেজাজী অপির এই অবস্থা! যাকে সে ভয় করে চলত? লছমীকান্ত একটু সরে এসে একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ নিজের বুকখানা ভরে উঠ্‌ল ওর, ভাবলে, ওর এখনই কিছু করার রয়েছে, অপিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

অপির হাতটা তেমনি টানা হয়ে রয়েছে লছমীর হাতে, ও বললে, 'এর পর আমি না খেতে পাই ভিক্ষা করব, ভিক্ষা না পাই তবু বেঁচে থাকব, কিন্তু মেয়েটার বিয়া না দিলে আমি বাঁচব নাই। ই আমার পণ···যদি এইটো ভেঙে যায় জানবেন, সেই মুহূর্তে মরে যাব আমি···'

লছমী উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'আপ চলিয়েগা, হাম জরুর আপকা সাথ যায়েগা, লেকিন···' ওর কণ্ঠস্বর দ্বিধায় নরম হয়ে এল, 'লেকিন দেখিয়ে, বাঙালী-লোগোঁকী সাদী...হাম ক্যা করনা সকতা...আউর দুসরা কৌন আদ্‌মী...'

'নেহিঁ, নেহিঁ, বাঙালী-হিন্দুস্থানী মানুষ, সব ভাই-ভাই। তাছাড়া, দিল চাই লছমীবাবু, এই এখেনে কিছু থাকা চাই...' বলে ও নিজের বুকের ওপর আঙুল ঠেকালে। তৃপ্তির সঙ্গে বললে, 'আপনি যদি সঙ্গে থাকেন... আমার এখন মাথার ঠিক নাই, বেঠিক কিছু...না, আপনি থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে···'

'কুছু চিন্তা করবেন না, চলিয়ে···'

হঠাৎ অপির সুর বদলে গেল, ঈষৎ কর্কশ স্বরে ও বলে উঠল, 'কিন্তু আপশোষ কি জানেন, লোকটা মরে গেল···আর ক'টা দিন বাঁচল নাই...'

'ক্যা' কৌন আদমী···'

চন্দ্রকান্তর নামটা মুখে আনতে গিয়ে থমকে গেল অপি, 'ছোড়িয়ে··· আর চলিয়ে, দের হো যায়গা···' বলে লছমীকান্তকে এক রকম টেনে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে।

কতক্ষণ চুপচাপ হাঁটছিল ওরা, হঠাৎ লছমীকান্ত রুদ্ধস্বরে বললে, 'অপিবাবু, আপনি আমার দাদা আছে। আপনি আমাকে বিশোয়াস করেছেন। আর আপনাকে বলি আমি এক বাত। আজ ঘোষবাবুর সঙ্গে আমার এক দফা হয়ে গেল······'

অপি চমকে ওর দিকে তাকাল, ব্যাপারটা বুঝতে পারল না ও। কিন্তু যখন লছমীকান্ত সমস্তটা খুলে বললে, তখন অপি সাউ সংক্ষেপে বললে, 'শালা চামার!'

লছমী মাথা নিচু করে হাঁটছিল, হঠাৎ একটা লাইট-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'আপনাকে মিছা কথা আমি বলব নাই, আমার চোবিশ রুপিয়া আছে। পেটে দিই নাই, কখন কি হয়। লেকিন ঘোষবাবুর কথা সহ্য হল নাই·· তা ছাড়া ছোট্টুলাল আছে। মানুষের ইজ্জৎ আগে, না জান আগে। আমি বাঁচব নাই···লেকিন আমার আফশোষ নাই··· 'অপির ডান হাতটা মোচড়াচ্ছিল লছমীকান্ত। কিন্তু অপির চোখের দিকে (অপি কিছু না বলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে) তাকিয়ে দেখলে সেখানে কোনো দুঃখ নাই, যদিও একটু আগেই সে দুঃখের কথা বলছিল এবং এইমাত্র তার থেকে দুঃখের কথা শুনছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে নিজের বুকের মধ্যেও সেই একই সান্ত্বনা, একই সুখ উৎসারিত হতে অনুভব করলে। সত্যিই হয়তো তারা দু'জনেই মরে যাবে, তারা এই মুহূর্তেও মরছে, কিন্তু তার মধ্যে তারও বেশি কিছু ওদের অজান্তেই খুশি করে তুলছে ওদেরকে।

অধ্যায় ২৪

মেনকার বিয়ের কথা ছিল শ্রাবণ মাসের প্রথমে, কিন্তু অপির আগ্রহে সেটা এগিয়ে এনে আষাঢ় মাসেই করা হ'ল। বিয়ের মাত্র দু'দিন আগে সন্ধেবেলা অপি সাউ কাদুকে সমস্ত কথা বললে। বললে যে, অনেকদিন আগে থেকেই কথাবার্তা চলছিল। আশীর্বাদীর সময় পাশের বাড়ির লছমীকান্তকেও

নিয়ে গিয়েছিল ও। বিধুভূষণের (পল্টা মণ্ডল) জ্যাঠা গোষ্ঠবাবু লোকটিও খুব ভাল। মেয়েকে ধান-দুর্বো দিয়ে ঘরে দেবে অপি, উনিও তাই স্বীকার করেছেন।

অপি বাইরে থেকে, হঠাৎ ঘরের মধ্যে আসাতে ঘামতে আরম্ভ করেছিল। আলনা থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে ঘাড়-মুখ মুছলে ও। কথা বলতে বলতে ওর মনে হল, এসব কথা তার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। যতদিন সে কথাগুলো কাদুকে বলে নি, ততদিন ওর মনে একটা প্রতিহিংসার আনন্দ ছিল। কেমন করে ওর ধারনা হয়েছিল, চন্দ্রকান্ত ওর যে অপমান করেছিল, তার সঙ্গে কাদুর এবং মেনকারও কোথায় যোগ আছে। ওদের কথাবার্তা, কাজকর্ম তার সেই অপমানের জ্বালাটাই উস্কে তুলত। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মনে হল, এর আগাগোড়া সমস্তটাই মিথ্যে। শেষের দিকে ওর কথাগুলো জড়িয়ে এল, হঠাৎ লজ্জা পেয়েছে এমনি করে কাদুর মুখের থেকে চোখটা সরিয়ে নিলে, আর সেই অবস্থায় বললে, 'এখনও মাঝে আর একটা দিন···এইটো আমাদের দেশ-গ্রামও লয়···তুমাকেই সব করতে হবেক। যা দরকার আমাকে সব বল, আর···'

'হুঁ···' কাদুর মুখখানা ফাঁক হয়ে গেছল, ও একটা ঢোক গিললে। অপি কি বলছে তার ঠিক অর্থটা যেন ও ধরতে পারছিল না। হঠাৎ অবাক হয়ে গেছে এমনি করে ও তাকিয়ে রইল।

অপি চকিতে ওর দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে, তাড়াতাড়ি করে বললে, 'আর যদি কাকেও পাড়ায় পাও তো দেখ, কাল সকাল থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবেক···' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কাদু হাত বাড়িয়ে আলনাটা ধরলে, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মেনকা প্রথম থেকেই রান্নাঘরে ছিল, তার পক্ষে কথাগুলো না শোনার কথা নয়। কাদু তবু বললে, 'তোর যে বিয়ার সব ঠিক হয়ে গেল রে, তুর বাবা বলে গেল···' ওর কণ্ঠস্বরে সেই অবাক ভাবটা এখনও কাটে নি, কিন্তু কথাটা বলেই ও একটু হাসলে, যেন আর যাই হোক না কেন, খবরটাতে একটা কৌতুকের ভাব তবু আছে।

মেনকা উনুনের দিকে মুখ ফিরিয়েই বসেছিল,মায়ের কথায় ও পিঠের ওপর আঁচলটা আরও খানিকটা টেনে ঢেকে দিলে, তারপর খুন্তিটা নাড়তে লাগল।

বিছানায় যেতে যেতে কাদুর অনেক রাত্রি হয়ে গেল, আর তার

পরের দিন সকালে যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। ধড়মড় করে উঠে ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে এল ও, বাঁ হাতটা বাড়িয়ে খুঁটির ওপর রাখলে, চাবির গোছা শুদ্ধ আঁচলটা কনুই পর্যন্ত বেড় দিয়ে ঝুলতে লাগল। উঠোনের ওপর মেনকা ওদিকে ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে, বাসনগুলো ধুয়ে তুলছিল সে। এরই মধ্যে মেয়েটা কখন বাইরে থেকে জল তুলে এনেছে, ধোয়া-মোছা শেষ করে ফেলেছে। 'আঃ, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, গতরে পোকা ধরছে আর কি···' হাই তুলতে তুলতে উঠোনে নেমে পড়ল কান্থ, বালতিটার কাছে গিয়ে চোখে-মুখে জল ছিটোতে লাগল, 'মাঝখানে আজের দিনটা কেবল, মাগো, কি করে কি হবে······'

ঘুম থেকে জেগে ওঠার মুহূর্তে কান্থর এই চিন্তাই সব কিছুর গতিপথ ঠিক করে দিলে। ভাগ্য ভালো যে ও বলে বসে নি, 'এই বিয়াতে আমার করার নাই কিছু, আমাকে জব্দ করার জন্যে উনি এমনি করেছে······,' তাহলে ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াত কে জানে। কান্থর আহত-আমি এতদিন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছটফট করে মরছিল, ঠিক যে মুহূর্তে ওর ঝাঁপিয়ে পড়ার আশংকা সব চেয়ে বেশি ছিল, সেই মুহূর্তে তা আহত কুকুরের মতো দূরে সরে গিয়ে মুখ গুঁজে মিটমিট করে তাকাতে লাগল। আর ওর মধ্যেকার চিরকালের যে মেয়েটি পান-দোক্তা চিবোতে-চিবোতে এই সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে, সে কোমরে কাপড় জড়ালে, শিথিল চুলের গোছাটা টেনে ঝুঁটি করে নিলে, তারপর মেনকাকে ডেকে বললে, 'দেখি, আমি পল্লীর মায়ের কাছে যাই, বড় কড়াই দুটা আর গামলাটা আনতে হবেক। তাছাড়া, এয়ো ক'জন দরকার···কে কি আসবেক তা ত জানি নাই······'

মেনকা উঠোন থেকে বাসন ক'খানা উঠিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। কান্থ খ্যাংরা ঝাঁটার মুঠিটা ধরে বারান্দা থেকে ঘরে গিয়ে পড়ল। ঘরটার চারদিকে আর ওপরে ওর চোখ দু'টো ঘুরে এল, মুহূর্তের জন্য ওর উদ্যত হাতটা শিথিল হয়ে এল যেন, ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। খাপড়া আর বাতা থেকে ঘুণ ঝরে ডেল-ডেলা আটকে রয়েছে, মাকড়সার জালের এখানে-ওখানে ঝুলে-ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ এইটে আশ্চর্য মনে হয় যে এগুলোও আস্তে আস্তে কবে থেকে এখানে নিজেদের অধিকার চাপিয়ে বসে আছে। চোখের ওপরেই তো এগুলো জীর্ণ হয়ে যায়, তারপর একদিন মট করে ভেঙে পড়ে? 'ওঃ···ই যে মাকড়সার বাদাড় হয়ে গেছে

গো…' বলতে বলতে কাছু হাতের ঝাড়ুটা তুলে এক ঘা দিলে খাপরার চাঁচের ওপর, দিয়েই একটা চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে এ'ল। একটা ছুঁচো চিরিক করে চাঁচের ফাঁক দিয়ে ছুটে গেল; মেঝের ওপর একগাদা ঘুণ ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। 'ই এখন রইল বাবা, আমার দ্বারায় হবেক নাই…,' কাছু বিরক্ত হয়ে ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। বারান্দার চালের অবস্থা আরও খারাপ, কতরকম নেকড়া পুঁটুলি গোঁজা রয়েছে, ঝোলানো রয়েছে তার ঠিক নেই। একটা ছোট্ট পুঁটুলিতে টান দিলে কাছু, জীর্ণ নেকড়া পড়াৎ করে ফেটে গেল, আর কবেকার পুরনো কুমড়ো বীচি বেরিয়ে পড়ল। আর একটা পুঁটুলি সাবধানেই খুলল কাছু, প্রথমটা ও চিনতেই পারল না জিনিসটা কি, কালো কালো গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে গেছে। ও নিজেই কবে বড়ি রেখেছিল, তারপর ভুলে গেছে। এরপর আর খুলতে সাহস পেল না কাছু। এর কোনটা রেখে কোনটা বাদ দেবে, ওখান থেকে নামিয়েই বা কোথায় রাখবে, বুঝতে পারল না।

বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর পরক্ষণেই 'মা, ওমা …কানের মাথা খেঁইছিস না কি…' বলতে বলতে গোবিন্দ ঘরের মধ্যে হুড়্ মুড় করে এসে পড়ল। গোবিন্দকে দেখবার আগেই কাছু ওর ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলে, বুঝতে পারলে একটা বড় মোট নিয়ে এসেছে ও। তাড়াতাড়ি ফিরে এগোতে গিয়ে ওর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। গোবিন্দ দুই হাঁটু বাঁকিয়ে নুয়ে পড়েছে, যাতে মাথার ঝাঁকাটা চৌকাঠে না লাগে। ডান হাত বাড়িয়ে কপাটটা ধরে সাবধানে চৌকাঠ পেরোল, বোঝাটা নামিয়ে বিড়ে পাকানো গামছাটা মাথা থেকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস করতে লাগল ও। মুহূর্তে স্থির হয়ে কটমট করে তাকাতে লাগল ও, বললে, 'কি ঘোড়ার ডিমের কাজ করছ তুমি, লাটসাহেবের ঝি…ডেকে যে গলা ফাটি' ফেললম,…উ কি হচ্ছে কি, ঘর ঝাড়া হচ্ছে! উ-কাজ তুমার দ্বারা হবেক? রামছাগলে গোরুর গাড়ি টানবেক আর কি …, গোবিন্দ পরিশ্রম করে এসেছিল, সুতরাং এই মুহূর্তে অন্যের 'আলসেমির ওপর তাচ্ছিল্য করবার অধিকার ওর জন্মেছিল। 'যাও, যাও, তুমার কাজ তুমি করগা…হাঁড়ি-সরা-খড়ি পাঠি দিছে বাবা, এখন কি করবে কর…' বলতে বলতে নামিয়ে রাখা ঝাঁকাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে ও। 'আমি বরঞ্চ দেখছি কি ঝাড়াঝাড়ি করতে হবেক…'

তার আগেই কাছু হাতের ঝাঁটাটা বারান্দার উপর ফেলে দিয়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসে বাঁকা থেকে দুটো সরা নামিয়ে মেঝের ওপর রাখল ও, নামিয়ে একবার করে সব জিনিসগুলো দেখে নিতে চাইলে কিন্তু পরক্ষণেই আবার তুলে রেখে দিলে। বারান্দার যা অবস্থা, এর মধ্যে সেটা সম্ভব নয়। বাঁকাটা সে তুললে দু'হাতে করে, ভারের জন্যে ওর শরীরটা নড়বড় করে উঠল, ঐ অবস্থায় রান্নাঘরের সামনেটায় নিয়ে গিয়ে নামাল ও, বললে, 'মেনি, তুই এইটা দেখ, কেউ যেন না হাত দেয়···আমি আর দেরি করব নাই, যাই দেখি পরীর মায়ের কাছে। উ লয় আসুক, খড়ি গুলে হাঁড়ি-গুলায় দিক···'

গোবিন্দ এর মধ্যে একটা কোদাল জোগাড় করে আনলে, উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে মালকোঁচা মারতে মারতে কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'আরে, আগে এই জঙ্গলটা সাফ হোক, তারপর ঘরের কথা···ই কি হইছে দেখছিস্···' বলতে বলতে পেঁপে গাছ আর নিচে আগাছার ঝাড়গুলোর দিকে তাকাল ও। একই সঙ্গে ওর চোখে বিরক্তি, আর এখনই ওগুলো নির্মূল করতে লাগবে সেজন্য উৎসাহ ফুটে উঠল। বললে, 'ইখেনেই ত ছাঁদনাতলা হবেক, এই হচ্ছে আসল জায়গা···' বলে ও রান্নাঘরের দিকে একবার তাকালে, কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললে, সে ভেতর থেকে কোন কথা বললে না।

গোবিন্দর সেদিকে খেয়াল করার মতোও অবস্থা ছিল না। কয়েকটা কোপ চালিয়ে ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি করে চিৎকার করে উঠল ও, 'এই দিদি, শুনে যা, শুনে যা···' রান্নাঘরের ভেতর থেকে ও বাসনপত্র নাড়ার শব্দ পেলে, কিন্তু ওর বিন্দুমাত্র তর সইল না, লাফিয়ে নিজেই রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে খুব একটা গোপনীয় কথা বলছে এমনি ভাবে ফিসফিস করে বললে, 'জানিস দিদি, আমি একটা বন্দোবস্ত করেছি, লাউড-স্পীকার আসবেক কাল সকালে, দেখবি। দেখ, তোর বিয়া হবেক, আর গান হবেক নাই!···'বলতে বলতে পেছন ফিরে চকিতে দেখে নিলে ও, কেউ আসছে কি না। ঐ 'শীতল স্টুডিও' আছে না, আমার বন্ধু মিন পয়সায় আসবেক, কেবল ব্যাটারীর খরচ দিতে হবেক এই যা। বাবা যদি কিছু বলে ত দেখবি···চুক্ করে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করল গোবিন্দ। 'কুম্ শালার পয়সা লিই নাই আমি, আমার জমানো পয়সা ছিল, আমার ইচ্ছা, আমি খরচ করব···' বলতে বলতে লাফ দিয়ে আবার উঠোনে নেমে এল ও। কাল্পনিক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে চোখ-মুখ ঘুরে উঠল ওর।

অধ্যায় ২৫

যখন মেনকা শুনলে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে এবং বরসিংবাঁদের বিধুভূষণের সঙ্গে হবে, তখন আকস্মিক ভয়ে ওর হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। মানুষ মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হলে যেমন হয়, ওরও সেই রকম বোধ হতে লাগল। মনে হল এতদিন ও যা নিয়ে রয়েছে সেই সব কিছুর শেষ হয়ে যাবে। কোথায় কোন অন্ধকারে তাকে টেনে নিয়ে যাবে···যে নিয়ে যাবে সে এসে গেছে। কারখানার আন্দোলন, ধর্মঘট এসবের কথা কোন দিন ভাবে নি সে, শিবলালের সঙ্গে এত কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও, কিন্তু সহসা সেদিনকার সেই গুলি ছোঁড়ার কথা মনে হ'ল তার, এবং ভাবলে তারও বুকের ভেতর কে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

কিন্তু এই বোধ ওর স্থায়ী হল না। সমস্ত ব্যাপারটা আস্তে আস্তে আগাগোড়া যখন সে চিন্তা করতে পারলে, তখন বুঝলে যে যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে, এ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারত না। আশ্চর্য হয়ে আরো সে দেখলে, ঠিক এই জিনিসটাই সে ভেতরে ভেতরে কামনা করে এসেছিল। তৎক্ষণাৎ এটার কাছে সে আত্মসমর্পণ করলে এবং মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করলে। 'ওনারা যা চেয়েছিলেন তাই হল, আমি সেটা মেনে নিচ্ছি···' বারবার করে ভাবলে ও, এবং সে আত্মত্যাগ করছে এমনি একটা গর্বে তার বুক ভরে উঠল।

ওর চারদিকে বিয়ের আয়োজন খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। বিয়ের আগের দিন দুপুরের মধ্যে ওদের ঘরদোর পরিচ্ছন্ন হয়ে যেন কিসের অপেক্ষা করতে লাগল। গোবিন্দ আর বাবাকে বারবার বেরিয়ে যেতে এবং ঘরে ফিরে আসতে সে দেখলে, খুশি মনে কাজ করছে ওরা। এত জিনিসপত্র সব আসতে লাগল, তার অনেক কিছুর নামও সে জানত না, প্রয়োজনও বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু বুঝলে, এর জন্যে তলে তলে অনেকদিন ধরে বাবা চেষ্টা করেছেন, ঠিকঠাক করে রেখেছেন। বিকেলে যথারীতি গায়ে-হলুদ পড়ল ওর। পরীর মায়ের সঙ্গে আরো যেসব মেয়েরা এল, তাদের দেখে মেনকা অবাক হয়ে গেল। যাদেরকে কখনও শক্ত

কিংবা আপনার বলে কখনও ভাববার অবকাশ হয় নি, তারাই একান্ত আপনার জনের মতো হেসে, আনন্দ করে সব কাজ করলে। শ্বশুর বাড়ি থেকে গয়না এল, নিচের হাত, ওপর হাত এবং গলার। বাবাও দিয়েছেন, কানের আর পায়ের, আঙুলে আংটি। মেয়েরা কতরকম করে নাড়াচাড়া করে ওকে পরালে। এইসব পরে, কখনও স্পষ্ট করে, কখনও অস্ফুটে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মেনকার মনে হতে লাগল, সে আর এক মেয়ে হয়ে উঠেছে, এতদিন যেমন করে কাটিয়েছে এ যেন সে-মেয়ে নয়। আর, এই সব কিছুর সংগে, এইসব মেয়েদের আনন্দের সঙ্গে, যাঁরা আগামী কাল আসবেন··· সেইসব কিছুর সঙ্গে এই নতুন মেয়েটির কোথায় যোগ আছে।

ভালো ক্যামেরার সন্ধানী-চোখ যেমন ক্যামেরাম্যানের চোখকেও পেরিয়ে যায়, এবং যা খুঁটি-নাটি চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল তা তুলে ধরে' ফটোচিত্রকে নতুন অর্থব্যঞ্জনা দান করে, মেনকার অবস্থাও কতকটা সেইরকম দাঁড়াল। ওকে ঘিরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছিল, সেগুলো পেরিয়ে মানুষের মনও দেখতে পেলে ও। ওর বুঝতে অসুবিধা হল না, তার এই বিয়েতে বাবা একটা চাপা আনন্দ অনুভব করছে এবং তার সেই রুক্ষতা নেই। কাদু সমস্ত কাজই করছে তবু কোথায় যেন এসবের থেকে দূরে সরে রয়েছে ও, মেয়ে হয়ে এই অভাবটা সে না বুঝে পারে না। যতই বিয়ের কাছাকাছি এগিয়ে এল ও, ততই তার এই চেতনা আরো সূক্ষ্ম, আরো নিগূঢ় হয়ে উঠল। শিবলালের প্রসঙ্গ মনে পড়ল ওর, জুনাপুরে আসার প্রথম দিনটির থেকে এই সেদিনকার শিবলালের খেয়ে যাওয়া পর্যন্ত···তার সব কথা, খুঁটি-নাটি আর সমগ্রের অনুভূতি ওর মনের ওপর স্বতই জেগে উঠল, কিন্তু সেজন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল না। তার সব কিছুই তাকে প্রীত করলে। সেগুলোকে ভাল না বেসে সে পারল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মনে হতে লাগল, 'আমি জানতম, উসব আমার জন্যে নয়,' আর সেই এক ত্যাগের অনুভব ওকে আনন্দ দিলে।

যা সে আশংকা করতেও পারে নি, তাও হল, শিবলালও বিয়ের রাত্রে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিল। ঘরের মধ্যে মেয়েরা ওকে সাজিয়ে তুলছিল, আলোকিত বারান্দায় বরাসন করা হয়েছিল, সেদিকে চকিতে তাকিয়ে বাইরে লোকজনের মধ্যে শিবলালকে কার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে। তখনই মেনকা বুঝলে, বাবা ইচ্ছে করেই ওকে নিমন্ত্রণ করেছেন এবং তার কারণটাও ও বুঝতে পারলে। মুহূর্তের জন্য বুকের ভেতরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল ওর,

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে, তার কোনো ভাবনাই এখন নিজের জন্য হতে পারে না। তার নতুন জীবনের কথা মনে পড়ল ওর, আর সব কিছুই যেমন মেনে নিয়েছিল, তেমনি শিবলালের উপস্থিতিও মেনে নিলে।

শুধু তাই নয়, পরদিন সকালে আশীর্বাদীর সময় এমন আরো এক ঘটনা ঘটল, যা তার হৃদয়কে বিদ্ধ করলে। কিন্তু তার মনের এই ভাবটিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারল না।

গতকাল যেখানে ছাতনাতলা হয়েছিল, সেখানেই শ্বশুর-বাড়িতে যাত্রা করার আগে বর-কন্যাকে দাঁড় করানো হয়েছে। একটু আগে পর্যন্ত গোবিন্দদের লাউড-স্পীকারে গ্রামফোনের রেকর্ড বাজছিল, বকে-ঝকে থামানো হয়েছে। যৌতুকের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে আসছে, এমনি সময় শিবলাল হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। উঠোনে পৌঁছোবার আগেই ঘরের ভেতর থেকে ক্লান্ত কিন্তু সংকোচহীন স্বরে বললে, 'ও, সব হয়ে গেল না কি, আর এক মিনিট অপেক্ষা করতে হ'বে···'

মেনকা চোখ নিচু করেছিল, (নিজের অজান্তেই মাথা নিচু করা ভঙ্গিটা যেন অভ্যাস করছিল ও) সেই অবস্থাতেই বুঝতে পারলে শিবলাল পরপর উপহারগুলো সাজিয়ে রাখছে। উপহারগুলো সে দেখতে পায় নি, দেখবার ইচ্ছেও করল না ওর। একটু পরেই মাথার ওপর ধান-দূর্বা পড়ল এটাও অনুভব করলে, এবং সহসা একটা অদম্য ইচ্ছে চেপে বসল ওর ওপর, যেন সে কামনা করলে স্বামীর মাথাতেও ধান দূর্বা পড়ুক···আর সেই মুহূর্তে মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকালে আর ঠিক সেটাই দেখতে পেলে। আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে ও, এবারেও শিবলালের উপহারগুলোর দিকে তাকাল না ও, কিন্তু গভীর স্বস্তিতে ওর বুক ভরে উঠল। যেন এটার জন্য অপেক্ষা করছিল ও।

কানু পাশেই ছিল এতক্ষণ, ফিসফিস করে এটা-ওটা করবার নির্দেশ দিচ্ছিল। শিবলালকে গত রাত্রে দেখে ভাল লাগে নি ওর, কিন্তু অপির বিরুদ্ধে যাব বলে কোন কথা বলে নি। কিন্তু আজ আশীর্বাদীর সময় শিবলালকে দেখে ও থমকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু শিবলালকে যখন কুলির হাত থেকে পর পর শাড়ি, চায়ের সরঞ্জাম, বই···সব সাজিয়ে রাখতে দেখলে, তখন খেপে গেল ও। শিবলালের সঙ্গে মেনকার বিয়ে হোক, এটা চেয়েছিল সে, সেটা কেন হল না বুঝল না। এ বিয়ে না হওয়ার জন্য শিবলালেরই

বা বেদনা কতখানি, তার সান্ত্বনাই বা কোথায়, তাও ভাবল না কানু। ওর ভেতরটায় যেখানে অহরহ পুড়ছিল সেখানটা ছাই সরে যাওয়া আগুনের মতো দপ করে উঠল, মাথার কাপড়টা খুলে পড়ল ওর। সহসা একটু এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'তুমি বাছা আবার এই সব করছ কেনে…' এইটে এতখানি আকস্মিক আর এমনি আর্ত চিৎকারের মতো শোনাল যে শিবলাল তো বটেই যারা উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই চমকে উঠল। ছোট ছোট ছেলেরা এবং মেয়েরা চুপ করে গেল। কানু বলে উঠল, 'এইটো হচ্ছে যৌতুকের আশীর্বাদী, আপনার লোকজনরাই করে, তুমার ত দরকার নাই…'

অনেকগুলি চোখ শিবলালের ওপর পড়ল। একটু আগে ওকে উপহার দিতে দেখে যে সপ্রশংস কৌতূহল বোধ করছিল ওরা, সেইটে মুহূর্তে নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতায় পরিণত হল। শিবলালের মুখের ওপর ক্ষণিকের জন্য লজ্জার কালিমা পড়ল, কিন্তু তারপরেই মৃদু হেসে বললে, 'মাসিমা, মেনকাকে আপনিই শিখিয়েছিলেন আমাকে শিবুদা বলে ডাকতে, আর সেজন্য আমি যদি…'

'শিখিয়েছিলম, আমার ঘাট হইছিল…' শিবলালের মৃদু কণ্ঠস্বর কানুকে শান্ত না করে আরো তাতিয়ে তুললে, কিন্তু সে ভীষণ হাঁপাতে লাগল। বললে "বাছা, সমানে-সমানে কুটুম্বিতা হয়। গায়ে পড়ে করতে গেলে টিকবেক কেনে? এই যে তুমি সব দামী দামী জিনিস দিচ্ছ, আমার মেয়ে জামাই কোনদিন তার পাল্টা দিতে পারবে, না কি, আমরাই পারব, হুঁ…' বলে ও দম নিলে, যেন একটা কথার দলা ওর গলায় আটকে গিয়েছিল।

শিবলালের ঠোঁট দুটো কাঁপছিল, বাঁ হাতটা তুলে নিজের মুড়োন মাথায় একবারের জন্য রাখলে, তারপর নতমুখ দম্পতির দিকে তাকিয়ে তেমনি পরিষ্কার স্বরে বললে,…নেড়া মাথার জন্য ওর শুকনো, চোখদুটো সজল দেখাতে লাগল…'দেখুন, মানুষ যখন স্নেহের উপহার দেয়, তখন দামের হিসাব করে না। আপনাদের মেয়ে আমার স্নেহের পাত্রী, বাবাও আপনাদের ভালবাসতেন, আপনাদেরকে এখানে এনেছিলেন তিনি… আপনার এই তিরস্কারকে আমি মেনে নেব না…আপনার কন্যা-জামাতার কল্যাণ কামনা করি বলেই এই উপহার দিলাম, 'গ্রহণ করা বা না কর আপনার ইচ্ছা…' শিবলালের চোখ দুটি সরে গিয়ে পাশের লোকজনদের

জুনাপুর স্ট্রীট

ওপর দিয়ে একবার ঘুরে এল, যেন নিজের কথাগুলোর সমর্থন খুঁজছিল ও। তারপর ধীরে ধীরে লোকজনদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

গতকাল, অর্থাৎ বিয়ের দিন সকালে শিবলাল যখন নিমন্ত্রণ পেয়েছিল, তখন যতই আহত আর বিস্মিত হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে হয়েছে যে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে। সন্ধ্যার সময়ই চলে এসেছিল সে এবং নিজে উপযাচক হয়ে অপির এটা-ওটা সাহায্যও করেছে। কিন্তু সমস্ত ক্ষণ একটা কথা কেবলই ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে যে কেমন করে কোথায় যেন মেনকার অপমান করেছে ও। যেখানে তার দায়িত্ব ছিল, সেখান থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ও। তারপর ছাতনাতলায় বর যখন অগ্নিসাক্ষী করে কন্যার করগ্রহণ করছিল, তখন সহসা নতুন করে পল্টাকে দেখতে পেলে ও। পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় এই পল্টাকেই সে দেখেছিল, লুব্ধ, কুৎসিৎ বলে। সেই পল্টাই আজ এই মেয়েটিকে জীবনে গ্রহণ করে তাকে সমস্ত অপমান, আর গ্লানির থেকে উদ্ধার করে গৌরবের আসনে বসিয়েছে। তখন আস্তে আস্তে ও ভুলে গেল যে সে নিজে সত্যিই কখনো মেনকার অপমান করতে পেরেছিল কিংবা পল্টা সেদিন লীলার পেছনে ধাওয়া করে কোনো অসম্মান করেছিল তার...পুরুষ স্ত্রীলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার করতে পারে তাকে তার গরবিনীর যথার্থ আসনটিতে বসিয়ে দিয়ে, পল্টা এখন যা করছে।

তারপর, সকালে উপহার বয়ে নিয়ে এসেছিল সে। ঘুণাক্ষরে ভাবতেও পারে নি যে কাহ্ন ব্যাপারটা এই ভাবে নেবে। কিন্তু যখন সে বেরিয়ে এল, তখন তার মনে কোন কষ্ট ছিল না। বাইরের উজ্জ্বল, উত্তপ্ত আলোতে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে সে। তার রোগা মুখের ওপর একটা বিষণ্ণ অথচ তৃপ্ত ভাব ফুটে উঠল : যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে!

শিবলাল যখন বেরিয়ে গেল, তখন কতক্ষণ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাহ্ন। চারপাশের ওরা সবাই তখন তারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সবার দিকেই চোখ পড়ল ওর, কিন্তু ওদের চোখে কি রয়েছে বুঝতে পারল না। তারপর, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চলে গেল ও।

অপিও তার আগে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তার আদৌ ইচ্ছে ছিল, চন্দ্রকান্তকে নিমন্ত্রণ করে এনে তার চোখের

সামনে সমারোহ করে মেয়ের বিয়ে দেবে। তা যখন হল না, তখন শিবলালকেই নিমন্ত্রণ করেছিল ও। কিন্তু এত আগ্রহ নিয়ে শিবলাল ওর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলে, আর ওর কাজে সাহায্য করতে আরম্ভ করলে যে ওর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে আরম্ভ করল। মনমরা হয়েই ছিল ও, সমস্ত বিয়ের ব্যাপারটা তার কাছে ফ্যাকাশে মনে হতে লাগল। তারপর যখন উপহার দেবার সময় কাদু শিবলালকে কথা শুনিয়ে দিতে আরম্ভ করল, তখন লুব্ধ, আর নিরাশ পথিকের সোনা কুড়িয়ে পাওয়ার মতো সেটাকে সে লুফে নিলে। মুচকে হেসে উঠল ও, কিন্তু পাছে কাদু তার সামনে ওকে কথা শোনাতে ভয় পায়, সেই জন্যে ঘরের ভেতর সরে গেল। কাদু যখন বলছিল, 'বাছা সমানে সমানে কুটুম্বিতা হয়, গায়ে পড়ে করতে গেলে টিকবেক কেনে?' তখন তার সেই সকাল বেলাকার কথা মনে পড়ল, যখন চন্দ্রকান্ত তার মুখের ওপর বলে গিয়েছিল, 'তুমার এখেনে কুটুম্বিতা করতে আসি নি হে'! 'আঃ, কাদু ঠিক জবাব দিয়েছে··· উয়ার মাথায় ঠিক খেলেছে, আমি পারতম নাই ..' একটা পৈশাচিক আর তৃপ্ত হাসিতে ওর মুখখানা কুৎসিৎ হয়ে উঠল, চোখ দুটো বুজে এল ওর। মেঝের ওপর গত রাত্রির বাসরের বিছানা-পত্র গুটোন অবস্থায় পড়েছিল, সেগুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ল ও।

* * *

দুপুরে যখন মেনকারা চলে গেছে (গোবিন্দ ওদের সংগে গেছে), কাদু বোধ হয় ভেতরের বারান্দায় কি করছে আর অপি মেঝেতে নেতিয়ে পড়েছিল, তখন পিওন চিঠি নিয়ে ডাক দিলে। তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসে চিঠি পেয়ে ঢুলে-আসা চোখ তুলে বললে, 'কি, কোম্পানীর চিঠি দেখছি···'। আস্তে আস্তে খামটা খুললে ও, তারপর বলে উঠল, 'আরে ই যে ইংরেজি লিখা, ও ভাই, শুনেন, একটু পড়ে দিবেন···'

পিওন ফিরে এসে পড়লে, সহসা মুখখানা টান হয়ে উঠল তার। আমতা আমতা করে বললে, 'এই চিঠি ত কোম্পানীর অনেক আগে লেখা, এত দেরি হল কেন কে জানে। আপনার চাকরী নিয়ে কোনো গোলমাল···মানে, আপনার চাকরী নাই! কারণ লিখেছে···'

'তাই না কি?' অপির ঢুলে-আসা চোখের পাতা একবার উঠেই আবার নেমে এল। মুহূর্তে চন্দ্রকান্তর কথাই মনে হল ওর! লোকটা তাকে চাকরী দিয়ে এনেছিল, যদি সেই কিছু করে গিয়ে থাকে? হঠাৎ পিওনের হাত থেকে

চিঠিটা ছিনিয়ে নিলে ও, 'থাক, আর কারণ বলতে হবেক নাই…' বলে ঘরের ভেতর চলে গেল।

কান্থকে ডেকেও বলল না কিছু, বালিশের নিচে দুমড়ানো কাগজটা গুঁজে দিয়ে আগেকার মতো নেতিয়ে পড়ল ও। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুজে এল ওর। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চাকরীর কথাটা একবারও মনে পড়ল না ওর, মেনকার বিয়ের কথাটাই আগাগোড়া ভাবতে লাগল। আঃ, বেশ হয়েছে…সব কাজ ভাল ভাবে মিটে গেছে! যেমনটি সে চেয়েছিল তেমনটিই হয়েছে। সবার ওপর কান্থর কথা মনে পড়ল ওর। তার স্ত্রী আজ তার মান রেখেছে। মেয়েটাকে সব সময় বুঝতে পারে না ও, কিন্তু…অপি পাশ ফিরে শুলে।

অধ্যায় ২৬

এ্যাকশন কমিটির ধর্মঘট ডাকা উচিত এই মন্তব্য লিখে শিবলাল আরানসোলে মনোতোষবাবুর কাছে চিঠি দিয়েছিল, করালী বারুইএর হাতে। মনোতোষবাবু সেই কাগজেরই উল্টো দিকে লিখেছিলেন, 'ভাই শিববাবু, আপনার সিদ্ধান্তের জন্ম অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। আগামী কাল বিকেলে 'শান্তি-ভিলা'-য় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন? খুব কাহিল হয়ে পড়েছি, এখন যাকে বলে জরদ্গাব, তাই। ইতি ২৮শে জুন, গুণাম্বরক্ত, মনোতোষ মুখার্জী।'

তাঁর কথা অনুযায়ী দেখা করতে গিয়েছিল শিবলাল কিন্তু তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হ'ল। মনোতোষবাবুর অসুখটা হঠাৎ আবার বেড়ে যায়, এবং ডাক্তারেরা কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে প্রেসিডেন্টের কোনো মতামতই শিবলাল পেল না তাই নয়, ধর্মঘটের সমস্ত দায়িত্ব তারই ওপর এসে পড়ল। আরানসোল থেকে জুনাপুর পর্যন্ত সমস্ত পথটায় বাসের এক কোণে নিঃঝুমের মতো বসে রইল ও, একটা অনিশ্চিত, বিমর্ষভাব ওর ওপর চেপে বসল। কিন্তু জুনাপুর বাস-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছানো মাত্র সহসা একটা জিনিস দেখতে পেলে ও, এবং আর এক দিক থেকে তার মনটা অদ্ভুত বিস্ময়ে কানায় কানায় ভরে তুললে। 'এই যে আমি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করলাম, আর কারখানায় তা চালু হবে, হয়তো সফল হবে…এতো আমার

নিজেরই, একলারই...' শিবলাল মনে মনে ভাবলে। 'অথচ মনোতোষবাবুকে আমরা তীব্র আক্রমণ করেছি, তাঁর একলার ইচ্ছা কমিটির ওপর চাপিয়ে দেন বলে। আশ্চর্য!'

যখন সমস্ত যাত্রী নেমে গেছে এবং কণ্ডাক্টররা অবাক হয়ে দেখছে ও বসেই থাকবে কি না, তখনও চিন্তা করছিল শিবলাল। নতুন যাত্রীরা উঠে বসতে আরম্ভ করতেই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল শিবলাল, আর তাড়াতাড়ি নেমে এল। শেষ বিকেলের আলোয় সমস্ত আবহাওয়াটা কি রকম মৃদু আর রঙীন হয়ে উঠেছে। শিবলাল ভাবলে মনোতোষবাবুর সঙ্গে সত্যিই কোনো দিন তার বিরোধিতা ছিল কি না। যে ভাবে মনোতোষবাবু প্রকাশ্য সভায় সহকর্মীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে স্লো-ডাউনের কার্যক্রম দিয়েছিলেন, কিংবা জেনেরাল ম্যানেজারের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন, সবই মনে পড়ল তার। মনে হল, যথার্থ নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আগে তার অংকুর দেখা দেয় ব্যক্তির কাছে, তারপর সকলের কাছে তা বনস্পতির মতো হয়ে দেখা দেয়। কে জানে, এর প্রকৃতিই বোধ হয় এমনি।

কারখানায় ১লা জুলাই থেকে ধর্মঘট আরম্ভ হ'ল, আর শিবলাল যা আশাও করতে পারে নি, মজদুরদের খুব সামান্য অংশ বাদে বাকি সকলেই ধর্মঘটের নির্দেশ মান্য করলে। কিন্তু যেমন এক কৌটা কূপের জল এক ঘড়া গঙ্গা-জলকে অশুদ্ধ করে দেয়, তেমনি একটি মাত্র ঘটনা তার সমস্ত সাফল্যের আনন্দকে ম্লান করে দিলে। লেবার গেটের অদূরে কে বা কারা একজন মজদুরকে হত্যা করেছে। শিবলাল বুঝলে, ধর্মঘট ডাকা ভুল হয়েছে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে এতদিন যে-রোষ তারা জাগিয়ে তুলেছে, পুষ্ট করেছে তা আজ ছুরি হয়ে একজন শ্রমিকের বুকে বসল। 'শ্রমিকরা আত্মঘাত শুরু করেছে, তাদেরকে থামাতে হবে....' এইটেই তার অশান্ত চিত্তে বারবার মনে হতে লাগল, কিন্তু কি করে করবে তা বুঝতে পারল না। সে এখনই ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে পারে; শুধু তা কেন, প্রয়োজন হলে সে এ্যাকশন কমিটিও উঠিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কে জানে, এখনই ধর্মঘট উঠিয়ে দিলে শ্রমিকরা হয়তো আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। যা সে এড়াতে চায়, সেটাই হয়তো আরো উস্কে দেওয়া হ'বে। ধর্মঘটের ডাক দিয়ে নিজের নেতৃত্বের অনুভবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ও, তারই প্রয়োগে যখন এই হল তখন ভাবলে: এটা তার অশুভ যাত্রা হয়েছে, এটা থামাতে হবে, কিন্তু কেমন করে সেইটে বুঝতে পারল না।

এমনি সময়ে আবার মনোতোষবাবুর ডাক এসে পৌঁছাল। ৫ই জুলাইয়ের দুপুরে খবর পেল শিবলাল, আর সেদিন বিকেলেই দেখা করতে গেল তাঁর সঙ্গে।

'শান্তি-ভিলা'-র গেটে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেলে না শিবলাল। সমস্ত বাড়িটা পরিত্যক্ত, নির্জন বলে মনে হতে লাগল। কৈলাসবাবুর কন্যা এবং পুত্রবধূরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেছে, জুনের শেষে এবং জুলাইয়ের প্রথমে স্কুল-কলেজ খুলে যাওয়ার জন্য। কেবল বিষ্টুচরণকে নিয়ে কৈলাসবাবু রয়ে গিয়েছেন, এবং মনোতোষবাবুর জন্য কিছুদিন এখানে থাকবেনও।

শিবলাল গেটের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুলে-পড়া হরগৌরী লতার ডগাটা বাঁ-হাতে করে সরিয়ে ধরলে, যেন নিচের বা ওপরের বারান্দায় কাউকে দেখতে পায় কি না দেখতে চাইলে। বাড়িতে কেউ আছে বলে আবারও মনে হল না ওর। এ বাড়ি তার অচেনা, তবু ফিরে গেলে চলবে না তার। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বাগানটা পেরিয়ে বারান্দায় চলে এল ও। তখন, ওপরে উঠবার সিঁড়ির বাঁকের মুখে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলে। মাথায় নার্সদের মতো করে রুমাল বাঁধা আর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ওপরে কার সঙ্গে (যাকে শিবলাল দেখতে পাচ্ছিল না) কথা বলছেন। পথহারা পথিক হঠাৎ পথের নিশানা পেলে যেমন হয়, তেমনি উৎফুল্ল স্বরে শিবলাল বললে, 'দেখুন, আমি মনোতোষবাবুর সঙ্গে…' কিন্তু বলতে বলতে থেমে গেল শিবলাল, অবাক হয়ে বলে উঠল, 'আপনি!'

শঙ্করীও চমকে উঠেছিল, আসলে ওপরে কারও সঙ্গে কথা বলছিল না ও, নিচে নেমে আসতে আসতে সিড়ির মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বাবার সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে এসেছে সে, ভাবছিল আবার ফিরে যাবে কি না। শিবলালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, 'বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান তো, ওপরে চলে যান…'

শঙ্করীর এমনি নার্সের মতো পোষাক দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল শিবলাল। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলে, 'মনোতোষবাবু ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ভাল আছেন।…সোজা ছাদে চলে যান, সেখানেই আছেন তিনি। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' বলে আর কোনো কিছুর অপেক্ষা না করে চলে গেল ও।

নিজেরই, একলারই…' শিবলাল মনে মনে ভাবলে। 'অথচ মনোতোষবাবুকে আমরা তীব্র আক্রমণ করেছি, তাঁর একলার ইচ্ছা কমিটির ওপর চাপিয়ে দেন বলে। আশ্চর্য!'

যখন সমস্ত যাত্রী নেমে গেছে এবং কণ্ডাক্টররা অবাক হয়ে দেখছে ও বসেই থাকবে কি না, তখনও চিন্তা করছিল শিবলাল। নতুন যাত্রীরা উঠে বসতে আরম্ভ করতেই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল শিবলাল, আর তাড়াতাড়ি নেমে এল। শেষ বিকেলের আলোয় সমস্ত আবহাওয়াটা কি রকম মৃদু আর রঙীন হয়ে উঠেছে। শিবলাল ভাবলে মনোতোষবাবুর সঙ্গে সত্যিই কোনো দিন তার বিরোধিতা ছিল কি না। যে ভাবে মনোতোষবাবু প্রকাশ্য সভায় সহকর্মীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে স্লো-ডাউনের কার্যক্রম দিয়েছিলেন, কিংবা জেনেরাল ম্যানেজারের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন, সবই মনে পড়ল তার। মনে হল, যথার্থ নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আগে তার অংকুর দেখা দেয় ব্যক্তির কাছে, তারপর সকলের কাছে তা বনস্পতির মতো হয়ে দেখা দেয়। কে জানে, এর প্রকৃতিই বোধ হয় এমনি।

কারখানায় ১লা জুলাই থেকে ধর্মঘট আরম্ভ হ'ল, আর শিবলাল যা আশাও করতে পারে নি, মজদুরদের খুব সামান্য অংশ বাদে বাকি সকলেই ধর্মঘটের নির্দেশ মান্য করলে। কিন্তু যেমন এক ফোঁটা কুপের জল এক ঘড়া গঙ্গা-জলকে অশুদ্ধ করে দেয়, তেমনি একটি মাত্র ঘটনা তার সমস্ত সাফল্যের আনন্দকে ম্লান করে দিলে। লেবার গেটের অদূরে কে বা কারা একজন মজদুরকে হত্যা করেছে। শিবলাল বুঝলে, ধর্মঘট ডাকা ভুল হয়েছে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে এতদিন যে-রোষ তারা জাগিয়ে তুলেছে, পুষ্ট করেছে তা আজ ছুরি হয়ে একজন শ্রমিকের বুকে বসল। 'শ্রমিকরা আত্মঘাত শুরু করেছে, তাদেরকে থামাতে হবে….' এইটেই তার অশান্ত চিত্তে বারবার মনে হতে লাগল, কিন্তু কি করে করবে তা বুঝতে পারল না। সে এখনই ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে পারে ; শুধু তা কেন, প্রয়োজন হলে সে এ্যাকশন কমিটিও উঠিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কে জানে, এখনই ধর্মঘট উঠিয়ে দিলে শ্রমিকরা হয়তো আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। যা সে এড়াতে চায়, সেটাই হয়তো আরো উস্কে দেওয়া হ'বে। ধর্মঘটের ডাক দিয়ে নিজের নেতৃত্বের অনুভবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ও, তারই প্রয়োগে যখন এই হল তখন ভাবলে : এটা তার অশুভ যাত্রা হয়েছে, এটা থামাতে হবে, কিন্তু কেমন করে সেইটে বুঝতে পারল না।

এমনি সময়ে আবার মনোতোষবাবুর ডাক এসে পৌঁছাল। ৫ই জুলাইয়ের দুপুরে খবর পেল শিবলাল, আর সেদিন বিকেলেই দেখা করতে গেল তাঁর সঙ্গে।

'শান্তি-ভিলা'-র গেটে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেলে না শিবলাল। সমস্ত বাড়িটা পরিত্যক্ত, নির্জন বলে মনে হতে লাগল। কৈলাসবাবুর কন্যা এবং পুত্রবধূরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেছে, জুনের শেষে এবং জুলাইয়ের প্রথমে স্কুল-কলেজ খুলে যাওয়ার জন্য। কেবল বিষ্টুচরণকে নিয়ে কৈলাসবাবু রয়ে গিয়েছেন, এবং মনোতোষবাবুর জন্য কিছুদিন এখানে থাকবেনও।

শিবলাল গেটের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুলে-পড়া হরগৌরী লতার ডগাটা বাঁ-হাতে করে সরিয়ে ধরলে, যেন নিচের বা ওপরের বারান্দায় কাউকে দেখতে পায় কি না দেখতে চাইলে। বাড়িতে কেউ আছে বলে আবারও মনে হল না ওর। এ বাড়ি তার অচেনা, তবু ফিরে গেলে চলবে না তার। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বাগানটা পেরিয়ে বারান্দায় চলে এল ও। তখন, ওপরে উঠবার সিঁড়ির বাঁকের মুখে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলে। মাথায় নার্সদের মতো করে রুমাল বাঁধা আর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ওপরে কার সঙ্গে (যাকে শিবলাল দেখতে পাচ্ছিল না) কথা বলছেন। পথহারা পথিক হঠাৎ পথের নিশানা পেলে যেমন হয়, তেমনি উৎফুল্ল স্বরে শিবলাল বললে, 'দেখুন, আমি মনোতোষবাবুর সঙ্গে…' কিন্তু বলতে বলতে থেমে গেল শিবলাল, অবাক হয়ে বলে উঠল, 'আপনি!'

শঙ্করীও চমকে উঠেছিল, আসলে ওপরে কারও সঙ্গে কথা বলছিল না ও, নিচে নেমে আসতে আসতে সিঁড়ির মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বাবার সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে এসেছে সে, ভাবছিল আবার ফিরে যাবে কি না। শিবলালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, 'বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান তো, ওপরে চলে যান…'

শঙ্করীর এমনি নার্সের মতো পোষাক দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল শিবলাল। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলে, 'মনোতোষবাবু ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ভাল আছেন।…সোজা ছাদে চলে যান, সেখানেই আছেন তিনি। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' বলে আর কোনো কিছুর অপেক্ষা না করে চলে গেল ও।

শঙ্করীর এই দ্রুততাই কিন্তু শিবলালের চলাটা মন্থর করে দিলে, অন্যমনস্কভাবে ওপরে উঠতে লাগল ও। শঙ্করীকে সহসা তার অত্যন্ত অপরিচিত, রহস্যময় বলে মনে হ'ল। এতদিন কাছাকাছি থেকেও ওঁকে বুঝতে পারে নি শিবলাল। ওর কেবলই মনে হ'তে লাগল, শঙ্করী ওর ডাক শুনে চমকে উঠেছিলেন, আর ওকে এড়িয়ে চলে গেলেন।

ছাদে ঢুকবার দরজাটা আদ্ধেকটা খোলা, ছাদে পা দিয়েও কাউকে দেখতে পেলে না শিবলাল। সামনে একটা সরু প্যাসেজ, তারপর রেলিঙ। তারপর বাঁ দিক থেকে ডাক এল, 'আসুন, শিববাবু। আমি কিন্তু উঠে যেতে পারব না, আপনাকে আসতে হবে। কিন্তু এ কি, চুল ফেলেছেন কেন, কি হয়েছিল...'

শিবলাল একটু এগিয়ে গিয়ে মনোতোষবাবুকে দেখতে পেলে। চিলে কোঠার ছায়াতে রোদের আড়াল হয়েছে, সেখানে একটা ছোট্ট চৌকিতে মাদুর পেতে বসেছিলেন মনোতোষ। খুব মোটা মানুষ হঠাৎ রোগা হয়ে গেলে যেমনি শিথিল আর অস্বাভাবিক দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছিল ওঁকে। শিবলাল ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গেল, বলে উঠল, 'এ কি শরীর হয়েছে আপনার?' শিবলালের প্রথম মনে হ'ল মনোতোষবাবুর গলার স্বর বসে গেছে, কিন্তু তার পরেই বুঝতে পারলে, দুর্বলতার জন্যে ঐরকম শোনাচ্ছে।

মনোতোষবাবু ডান হাতের তেলোটা মাথার ওপর বুলিয়ে আনলেন একবার, ক্ষীণ হেসে বললেন, 'নার্ভাস শক পেয়েছি...কাবু করে দিয়েছে একেবারে। তার ওপর ডাক্তারেরা বিছানায় বেঁধে রেখেছে! জানেন তো সব...'

এই 'সব' বলতে কি বোঝায় জানবার কথা নয় শিবলালের, কিন্তু ওর মনে হল ও ব্যাপারটা বুঝেছে, আর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

'যাক-গে সেসব কথা। কিন্তু আপনার কথা বললেন না তো কিছু, নেড়া হয়েছেন কেন?' শিবলাল বাবার মৃত্যুর কথা মনোতোষবাবুকে জানালে। শুনে মনোতোষবাবু কেমন হয়ে গেলেন যেন। দু'একটা কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন, তারপর চুপ করে গেলেন। অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না।

শিবলালও চুপ করে গেল। বুঝল না যে মনোতোষবাবু জুনাপুরের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করেছেন। মৃত্যু সংবাদ শুনে

নিজেরই হয়তো বিদায় নেওয়ার কথা মনে পড়েছিল তাঁর, তাই চুপ করে গিয়েছিলেন। শিবলাল মনোতোষবাবুর কাছে আসবার আগে পর্যন্ত যা ভেবেছে তার ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা ওর মনকে আচ্ছন্ন করে বসল। কারখানার বর্তমান ধর্মঘট, শ্রমিকদের আত্মঘাতী রাহাজানি, এ্যাকশন কমিটির পুনর্গঠন এইসব নিয়েই আলোচনা করবে ভেবেছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনে হল, তার কোন প্রয়োজন নেই। মনোতোষবাবু জুনাপুর আন্দোলনের যে উত্তাপ উত্তেজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা যেন ছাইএর মতো তাঁর চার-পাশে ঝরে পড়েছে, এখন কেবল আগুনটাই জ্বলছে। শিবলালের আবার মনে হল, মনোতোষবাবুর সঙ্গে কোনো কালে তার কোনো বিরোধ ছিল না, তাঁর থেকে এখন শুধু শিক্ষাই গ্রহণ করা যায় এবং ঠিক সেই জন্যেই সে এসেছে। শিবলালের এখনও সংশয় হতে লাগল যে, আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো সত্যকার বিরোধই নেই, না মালিক-শ্রমিকের, না নরনারীর, না বিভিন্ন দলের।

এক সময়ে মনোতোষবাবু মুখ ফিরিয়ে শিবলালের দিকে তাকালেন, তাঁর খাটো করে ছাঁটা চুলের নিচে কপালটা একটুখানি কুঁচকে গিয়ে মসৃণ হয়ে উঠল। বললেন, ‘শিববাবু, আপনাকে দেখে আমার আজ কি মনে হচ্ছে জানেন, বছর ত্রিশেক আগে আমি যেমনটি ছিলাম, আপনি আজ সেই রকম হয়েছেন। কিন্তু কেন মনে হচ্ছে তাই বলি। তখন সত্যাগ্রহ করব, তার দুদিন আগে মাসিমার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হয়েছে। আমিই মুখাগ্নি করেছিলাম, আপনারই মতো তখন মুণ্ডিত-মস্তক। কিন্তু একটুও শোক পাই নি, সব শোক আমার অন্য কিছু হয়ে গিয়েছিল।

‘কাল সত্যাগ্রহ আর আশ্রমের বারান্দায় চুপ করে বসে আছি, সবাই দেখাশোনা করতে গেছে, কিন্তু আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না…’ বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে উঠলেন মনোতোষ, তারপর মৃদু হেসে বললেন, ‘তবে আপনি বোধ হয় বয়সের তুলনায় বেশি অভিজ্ঞ, আন্দোলন সম্বন্ধে। জ্ঞান বেশি। তখন আমাদের ইমোশন ছিল খুব বেশি…হ্যাঁ, ওটা আমাদের খুব ছিল, তা না হলে তখন নড়াচড়া সম্ভব ছিল না।’ বলে তিনি আবার বিষণ্ণ ভাবে হাসলেন।

শিবলাল সহসা কোনো উত্তর দিলে না, কেবল মনোতোষবাবুর দুর্বল কিন্তু কি রকম উজ্জ্বল-হয়ে-ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা কঠিন

ব্রতের চেতনা এবং নূতন দায়িত্ববোধ সেই মুহূর্তে ওকে পূর্ণ করে তুলছিল। 'উত্তরাধিকার.. উত্তরাধিকারী হওয়া যথার্থ কঠিন...' মনে মনে ভাবলে শিবলাল, আর সেই মুহূর্তে পিতা চন্দ্রকান্ত, কম্যুনিস্ট পার্টির ইসমাইল এবং মনোতোষবাবুর কথাও স্বতই তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল। 'জাতীয় আন্দোলন আর শ্রমিক আন্দোলন পাশাপাশি রয়েছে, এদেরকে ঠিক মতো বোঝা চাই। পিতার শিক্ষা পুত্র ঠিক মতো নিতে না পারলে...এখানেও তাই।' শিবলাল মনে মনে ঘাড় নাড়লে।

প্রকাশ্যে বললে, 'দেখুন, আমাদের এই আন্দোলন সম্বন্ধে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। এত বিভিন্ন শক্তির জোরে এই আন্দোলন চলছে, তবু কি না এটাকে আমরা শ্রমিক আন্দোলন বলি। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় কি জানেন, নিজেদের শক্তি কতটা, তা যাচাই করে নিই। সন্দেহ হয়, আমি নিজেই চলছি, না কি কেউ চালাচ্ছে...' ক্ষণিকের জন্য চুপ করে গেল শিবলাল, এই আন্দোলনের আগাগোড়া, তার বিভিন্ন শক্তির সংঘাতের ওপর দিয়ে যেন নিস্পৃহ ভাবে চোখ বুলিয়ে এল ও। তারপর বললে, 'এটাও আপনাদের মতো ইমোশন, জ্ঞান কই। জানতে তো চাই...চোখ তেড়ে রয়েছি। কিন্তু কি জানেন, সোজা মরণ পর্যন্ত ছুটে যেতে পারি, কিন্তু বুঝতে পারি না, দেখতে পাই না...'

মনোতোষবাবু চমৎকৃত হলেন। এই যুবকটির মস্তিষ্কে কোন আলো ফুটছে, হৃদয়ে কি ঝড় বইছে, তা দেখতে পেলেন যেন। বললেন, 'আরে, এটাই তো জ্ঞান। জ্ঞান আর ভাব দুইই চাই। যাক গে...' মনোতোষবাবু স্পষ্টত থেমে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি করে বললেন, 'যাকগে ওসব কথা। সমীরবাবুর খবর জানেন তো? কাল এসেছিলেন তিনি, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। এখন দেবীপুরে কাজ করবেন তিনি। সেখানে শ্রমদান আন্দোলন আরম্ভ করবেন।'

'শ্রমদান আন্দোলন?' শিবলাল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

'হ্যাঁ। লোকে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সকলের জন্য, সমষ্টির জন্য নিজের যা আছে তাই দান করবে। কেউ দেবে অর্থ, কেউ দৈহিক শ্রম, কেউ ভূমি...বাধ্যবাধকতা নেই, ভালবেসে দান করবে। শঙ্করীও গেল সেখানে।...আমাকে কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করবেন না এ সম্পর্কে, কেন না, এর বেশি কিছু জানি না আমি..'

শিবলাল চুপ করে রইল। সমীর সেন পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল এটা সে জানত, কিন্তু এই শ্রমদান আন্দোলনের কথা সে শোনে নি। তাছাড়া সে বুঝতেও পারল না, এর সঙ্গে তার কোন যোগ আছে কি না।

প্রথম কথা বললেন মনোতোষ, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবং বালিশের নিচে থেকে ওষুধের প্যাকেট বের করতে করতে বললেন, 'শিববাবু, কিছু মনে করবেন না, আমার ঘর থেকে এক গ্লাস জল এনে দেবেন? একটা বড়ি খেয়ে নিই। তেতলায় নামলেই সিঁড়ির বাঁদিকে আমার ঘরের দরজা…'

'নিশ্চয়ই, আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি…' বলে তাড়াতাড়ি উঠে গেল শিবলাল। একটু পরেই জল নিয়ে উঠে আসছিল, কিন্তু সহসা একটা অভাবনীয়ের সামনে উপস্থিত হল ও।

ছাদের যেখানটায় পা দিয়ে প্রথম মনোতোষবাবুর ডাক শুনতে পেয়েছিল শিবলাল, সেখানটায় ফিরে আসতেই আর একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জগৎ ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল। মুখ তুলেই মুগ্ধ হয়ে গেল ও! সমস্ত আরানসোল এলাকাটা ওর সামনে ছড়িয়ে রয়েছে। চঞ্চল দৃষ্টিতে তরতর করে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলে ও, অস্ত সূর্য যেমন করে পড়েছে তার ওপর, তেমনি ওর দৃষ্টি দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিলে যেন। দূরে দূরে কারখানার চিমনী, ধোঁয়া উঠছে; গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে শহর থেকে বাস বেরিয়ে যাচ্ছে, শহরের দিকে ছুটে আসছে; উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো জমি, রেলের কোআর্টার আর নাগরিকদের প্রাসাদ, ওধারে বস্তি…এত পৃথক সব কিছু মিলে যা সামনে এমন করে বিস্তৃত তা সম্পূর্ণ হয়েছে। সূর্য এখনই ডুববে, তার রক্তবর্ণ আলো সব কিছুর ওপর মায়া বুলিয়ে দিয়েছে যেন, তা না হলে এমনটি দেখা যেত না। রক্তবর্ণ আলোটা দেখতে মনে হয় ফার্নেসের আগুনের হলকার মতো, কিন্তু ঠিক তা নয়। হল্‌কার থেকে জ্বালাটা বাদ দিলে যা থাকে এটা ঠিক তেমনি। এটা দগ্ধ করে না, এ সব কিছুকে স্পর্শ করে প্রকাশ করেছে।

অধ্যায় ২৭

মনোতোষবাবু ওষুধ খাওয়া শেষ করেছেন, এমনি সময় নিচে সিঁড়িতে ভারী ভারী কিন্তু ঈষৎ অনিয়মিত পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই পাইপের সুগন্ধ ছড়িয়ে গম্ভীর মুখে কৈলাসনাথ ছাদের ওপর এসে পৌঁছোলেন। পরনে শুভ্র পাজামা, গায়ে সিল্কের গেঞ্জি, যা তাঁকে একটা ঘরোয়া ভাব দিয়েছে। বুকের অনেকখানি অনাবৃত, গেঞ্জির বর্ডারের ওপর দিয়ে চাপ-চাপ কাঁচা-পাকা লোম উঁকি মারছে। শিবলাল এঁকে আগে দেখে নি, তৎক্ষণাৎ কৈলাসনাথকে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হ'ল ওর।

কৈলাসনাথ সোজা তক্তপোষের ধার পর্যন্ত এসে, শিবলালের মুখের দিকে পরীক্ষার দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। 'আপনার নাম শিবলাল দাস তো?' নামটা এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি যেন তাঁর কাছে কোনো পদপ্রার্থী ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। তারপর হেসে নিজেই বললেন, 'ভাববেন না জ্যোতিষ জানি। আজ আপনার আসার কথা ছিল…'

কৈলাসনাথ বসবার জন্য চোখ চারাতেই শিবলাল একটু সরে বসতে যাচ্ছিল, উনি তার কাঁধে চাপ দিয়ে নিষেধ করে তার পাশেই বসে পড়লেন।

'কি কথা হচ্ছিল তোদের? আন্দোলনের কথা নিশ্চয়ই…' কৈলাসনাথ পাইপটা ঠোঁটের কোণায় ঝুলিয়ে, কিন্তু না টেনেই বলতে লাগলেন। অন্য সময় হলে তাঁর এই ধরণের কথায় একটা তাচ্ছিল্য ফুটে উঠত, কিন্তু এখন তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর ছাপিয়েও একটা কারুণ্য ফুটে উঠল।

'চালিয়ে যা তোরা! আমি ওসব বুঝি না, বুঝতেও চাই না। কিন্তু কেমন আছিস তুই?' তাঁর কথার ধরণ দেখে শিবলালের বুঝবার উপায় ছিল না যে এই কৈলাসনাথই কয়েক দিন আগে মনোতোষের আন্দোলনে থাকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

মনোতোষ হেসে বললেন, 'ভাল…এমনি কথা বলতে পারাও ভাল। নেশাড়ীর মদটানা বারণ হলে বোতল থেকে জল ঢেলে খেতেও ভাল লাগে, না কি বলেন শিববাবু?'

শিবলাল এ কথার কোনো উত্তর দিল না, মনোতোষবাবু এবং কৈলাসনাথের সম্পর্কের কোনো কিছু না জানা সত্ত্বেও এঁদের দু'জনের বন্ধুত্বের গভীরতাটা সে বুঝলে, এবং কেমন করে ওর মনে হল তা একটা বেদনা পেয়েছে।

কৈলাসনাথ মনোতোষের কথার উত্তরে কেবল বললেন, 'বেশ…' তারপর সমস্ত সময়ের জন্যে চুপ করে রইলেন। এদের কথাবার্তা তাঁর কানে গেল না তা নয়, কিন্তু, তাঁকে কথাবার্তায় টেনে নামাতে পারল না।

কৈলাসনাথের নিকট সান্নিধ্যের জন্যে প্রথমটা অস্বস্তি বোধ করছিল শিবলাল, তারপর যখন দেখলে মনোতোষ কৈলাসনাথকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আলোচনা করছেন তখন সেও ভুলে গেল। কারখানার বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে আর কথাই বলল না ওরা। মনোতোষবাবু নিজের পূর্ব-পূর্ব আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে বললেন কিছু। বললেন, 'কোনো আন্দোলনই বিচ্ছিন্ন নয়, একটার থেকে আর একটা শিক্ষালাভ করতে পারে।' কথায় কথায় প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবন, চতুবর্ণের বিভাগ, ধর্ম আর রাজনীতির সম্পর্কের কথায় চলে এলেন মনোতোষ। শিবলাল অবাক হয়ে গেল মনোতোষবাবুর জ্ঞান দেখে। কিন্তু শুধু মনোতোষবাবুর জ্ঞান এবং বলবার ক্ষমতাই নয়, শিবলালও এমন সব প্রশ্ন আর মন্তব্য করছিল যে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। প্রাচীন ভারতের বিষয় থেকে অন্য দেশের শাসন-ব্যবস্থা বিষয়ে সরে গেল তাদের আলোচনা। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার গণতন্ত্রের কথা উঠল। মনোতোষবাবু বললেন, 'এদের থেকে আমাদের শিখবার রয়েছে, কিন্তু দোহাই, গণতন্ত্রের ফাঁকিটা যেন না শিখি…'। শিবলাল ভেবে পেল না, এরপর ওরা কোন্ বিষয়ে আলোচনা করবে।

কৈলাসনাথ কখন উঠে গিয়েছিলেন এরা কেউ খেয়াল করে নি! ছাদের দূর প্রান্তে পেছনে দুটি হাত রেখে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিলেন তিনি। আরো দূরের বৈদ্যুত আলোর অস্পষ্ট আভাস এসে তাঁর মুখখানাকে কঠিন ব্রোঞ্জের মতো করে তুলেছিল। কৈলাসনাথ চেয়েছিলেন মনোতোষ রাজনীতি থেকে সরে আসুন। তাঁর ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। কিন্তু তিনি সুখী হতে পারেন নি। ঠিক এই জিনিসটাই তিনি চান নি। সবচেয়ে লেগেছে তাঁকে শঙ্করীর ব্যবহার। শঙ্করী যদি তাঁদের বিরুদ্ধতাও করত, তাহলেও এতখানি আহত হতেন না তিনি। কিন্তু সে বাবাকে ছেড়ে শ্রমদান আন্দোলন করতে গেছে। সমীর সেনের সঙ্গে জেলে দেখা করতে গিয়ে নিজের সততার ওপর সংশয় হয়েছে তার, আর নিজের জীবনকে সত্য আর প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে গেছে। স্ট্রেঞ্জ!

শিবলাল আর মনোতোষবাবুর কথাবার্তা ক্রমশ গম্ভীর এবং আনন্দদায়ক

হয়ে উঠছিল। ছাদের আলো জ্বালায় নি ওরা, খুব উঁচু ছাদ বলে বাইরের আলো এসেও ওদের ওপর পড়ে নি। স্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে ওরা খুব কাছাকাছি হয়ে উঠেছিল। শিবলালও সমানে কথা বলতে লাগল। শেষকালে এমন হল, ধ্বনির অপরিহার্য প্রতিধ্বনির মতো একজন কথা বললেই আর একজনের হৃদয়ে তার সমর্থন পেলে, এবং একটা কথা ভাববার সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে দেখলে অন্যে ঠিক সেই কথাটাই বলছে।

'আচ্ছা, বলতে পারেন শিববাবু আমরা যে এই আন্দোলন করছি কিংবা সংসারে এত মানুষ এত রকম চেষ্টা করে চলেছে, তার উদ্দেশ্য কী, লক্ষ্য কোথায়?' মনোতোষবাবু প্রশ্ন করেই থামলেন, কিন্তু বোঝা গেল এর উত্তর তাঁর মনেই তখন এসে গেছে এবং এখনই তা বলবেন।

শিবলাল বললে, 'ঠিক তাই, এ প্রশ্ন অনেকবারই আমার মনে হয়েছে। এক একবার কি মনে হয় জানেন, সত্যিই আমাদের কোন লক্ষ্য নাই। আমরা কি শ্রমিকদের মঙ্গল করতে চেয়েছি? তাহলে শ্রমিকদের মৃত্যু-বরণ করতে হয় কেন। কেনই বা শ্রমিকরা রাহাজানি করে···বলুন, শ্রমিকদের ভাই-ভাই শিক্ষা দিতে পেরেছি আমরা···'

'আরে, সে তো অনেক আছে। শিফ্‌ট্‌ সাইক্‌লের বিরুদ্ধতা করেছিলাম আমরা, কিন্তু শিফ্‌ট্‌ সাইক্‌ল শ্রমিকদের পক্ষে ভালই ছিল···' মনোতোষবাবু হেসে উঠে বলতে লাগলেন। 'আসলে, মানুষের কল্যাণ হয় না, হতে পারে না। মানুষ সম্পূর্ণ হতে চায়, পারফেকশনই মানুষের লক্ষ্য, কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়, তা নিয়ে কি হবে, তার উত্তর নাই।

শিবলাল শেষের কথাটা লক্ষ্য করল না, নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বললে, 'মানুষ বড় অনিশ্চিত, সবই তার উল্টো-পাল্টা, একটা জিনিস নিয়ে এগোতে এগোতে সেইটে ভেঙে দিয়ে আর একটা জিনিস করে ফেলে। ধর্ম করতে গিয়ে অধর্ম করে ফেলে, মানুষ আসলে লক্ষ্যভ্রষ্ট···'

একটু জোরেই হেসে উঠলেন মনোতোষ: 'পাপ পুণ্যের কথা বলছেন? ও দুটো চিরকালই আছে এবং থাকবেও। তাই বলে, দুটো একই, পাপ-পুণ্যের বিচার নাই একথা বলছি না আমি, কিন্তু ও দুটোর একটাও অপ্রয়োজনীয় নয়। সবার সঙ্গে সবারই সম্পর্ক আছে, তবে তা বদলায়। জীবনটাই গতি। আপনার কাজ হবে সব কিছুকেই তার ঠিক জায়গাটি ছেড়ে দেওয়া, তা হলেই হল।'

মনোতোষবাবু ক্ষণিকের জন্য থামলেন, তারপর সহসা বললেন, 'আপনা-

দের সেখ সাহেবের কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। লোকটা গুলিতে মরে গেল। কিন্তু উনি জানতেন কোথায় কাকে মেনে নিতে হবে। আমি যখন আপনাদের প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসলাম, তখন আপনারা সবাই মুখ বেঁকিয়েছিলেন, হাঃ-হাঃ···কিন্তু উনি আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমার সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইসমাইল, তিনি আমাকে সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়েছিলেন···' মনোতোষ হাসলেন। অন্ধকারে তাঁর শুভ্র দাঁতগুলি এবং তার কথার ভঙ্গী শিবলালের কাছে আশ্চর্য মনে হ'ল। এই শুভ্রভাব একবার ওর কাছে ফ্যাকাশে এবং দুর্বল বলে মনে হতে লাগল, আবার মনে হল তা শুচিতা এবং বড়ো ভাবটাই প্রকাশ করছে।

এর পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ওরা। কৈলাসনাথ তখনও নিজের মনে পায়চারী করছেন, তাঁরই দিকে চোখ পড়ল ওদের। যে চিন্তাধারা ওদের দু'জনেরই বুকের মধ্যে বয়ে যাচ্ছিল, ওরা সেইটেই নীরবে কিছুক্ষণ অনুভব করতে লাগল যেন। এক সময় শিবলাল বললে, 'আজকের সন্ধ্যাটা আমার পক্ষে এতখানি অপূর্ব হয়ে উঠবে কল্পনাও করি নি। কিন্তু আপনি তো অসুস্থ, আপনাকে আর···'

শিবলালের কথায় বাধা পড়ল। মনোতোষ চোখ ফিরিয়ে শিবলালের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলে উঠলেন, 'জ্ঞান···জ্ঞানের কথা বলছিলেন শিব-বাবু, জ্ঞান-কর্ম দুই-ই চাই। দুয়ের সমন্বয়ই জীবন। এই সমন্বয়টাই আসল কথা, এটাই পারফেক্‌শন, কিন্তু এ বড় কঠিন ব্যাপার··' মনোতোষবাবু এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন, তারপর বললেন, 'আপনি মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বলছিলেন, কিন্তু তা নয়। এই হচ্ছে মানুষের লক্ষ্য, আর সে লক্ষ্যে মানুষ এ যুগেই পৌঁছোতে পারে: পারফেকশন, জাতীয় আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন যাই বলুন, সবেরই লক্ষ্য তাই। সেটাই হচ্ছে যথার্থ সাম্যবাদ। সাম্য, মানেই সমন্বয়: বিচিত্র এবং বিভিন্নকে (তার মধ্যে বিরোধীও আছে) যথাস্থান দেওয়া। এই হবে সমাজের চেহারা।···'

শিবলাল তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বললে, 'আপনি যা বলতে চান, আমি যেন তা বুঝতে পারি। আপনি যেভাবে চিন্তা করেছেন আমি তা করি নি। কিন্তু আমাদের কারখানায় ইস্পাত তৈরীর ব্যাপারটাও ঐ একই রকম। খনিজ লোহাকে ব্ল্যাস্ট-ফার্নেসে আর করি কি, না গালিয়ে তার থেকে সিলিকা কিংবা সালফার, কি কার্বন এগুলো বের করে দিই। এগুলো তখন

আমাদের শত্রু। ফ্ল্যাপেক্স প্ল্যান্টের ব্যাপারও তাই, সেখানে ধাতু-লোহার শেষ শুদ্ধি। কিন্তু সেটাতে কাজ হয় না কিছু। আসল কাজ…ইস্পাত তৈরীর কাজ হয় মেল্টিং শপে। মনোতোষবাবু, আপনি কখনো মেল্টিং শপে গিয়েছেন…'

মনোতোষবাবু এই উচ্ছ্বসিত অথচ গম্ভীর যুবকটির দিকে তাকিয়েছিলেন, অস্ফুটে কি বললেন বোঝা গেল না। শিবলাল বললে, 'সারি-সারি ফার্নেস, আর তার সামনের প্লাটফর্মের ওপর দেখবেন গাদা-গাদা ঐসব শত্রুকেই জড়ো করে রাখা হয়েছে, কার্বন, সিলিকা, সালফার…কেন? না মেশাবার জন্যে। এমনিতে এরা অবাঞ্ছিত কিন্তু প্রয়োজন মতো এরাই আবার বড় মিত্র। সালফারের কথাই ধরুন, ইস্পাতের মধ্যে একটা থাকলেই বিপদ, কোনো ঘা লাগলেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে; কিন্তু ইস্পাত যদি রেল তৈরীর জন্যে দরকার হয়, তাহলে লম্বা দিকে তার রোঁয়া টানা হয়ে যায়, তখন ক্ষতিতো হয়ই না, বরঞ্চ শক্ত হয়ে যায়। ফসফরাস থাকলে এমনিতে তা অকেজো, কিন্তু ইস্পাত দিয়ে টিন তৈরী করার সময় একটুখানি ফসফরাস মিশিয়ে নিতেও হয়। তাহলে একটার সঙ্গে আর একটা মিশে যায় না…'

'বেশ, বেশ! আমার মনে পড়ছে বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ কথা বলেছিলেন। আমরা কেবল তাঁর উপন্যাস পড়ি আর রোহিণীকে কেন গুলি করা হল, এই নিয়ে বিতর্ক চালাই। বলি, লোকটা ধর্মের ধ্বজাধারী, সংস্কারক। হাঃ-হাঃ…উনি বলেছিলেন, মানুষের জীবনে কাউকে বাদ দিলে চলবে না। দয়া, প্রীতি যেমনি লোভ, ক্রোধও তেমনি, তবে যার যা জায়গা, তাকে তা দিতে হবে। এই হচ্ছে পারফেকশন, তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের বড় কথা…মানে, এ যুগে সাম্যবাদেরও মূল কথা ঐটে। আপনারা আমরা তার পথ তৈরী করছি, কখন মানুষ সেখানে পৌঁছোবে কে জানে।…'সহসা থেমে গেলেন মনোতোষ। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু থাক, আলোচনা অনেক হয়েছে। মনীষীরা অনেক চিন্তা করেছেন, অনেক দেখেছেন এখন হয়ে-ওঠা চাই, নট্ টু নো হাউ টু লিভ্, বাট টু লিভ্ এ লাইফ!' মনোতোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

শিবলালও উঠে দাঁড়াল, তার একবারও মনে হল না যে মনোতোষবাবু আকস্মিকভাবে বিদায় নিচ্ছেন। তার মনে হল, 'সত্যি, বাঁচাটা জীবনে সত্য হওয়া চাই, কেবল জানা নয়।'

সিঁড়িতে নামতে নামতেও এই কথা মনে হল তার। জীবনে বিচিত্র এবং বিভিন্নকে স্বীকার করে নিতে হবে, সেটাই হচ্ছে পূর্ণতা। পৌষ-সংক্রান্তির সেই মেলার কথা সহসা মনে হ'ল শিবলালের। জীবনের বিরাট রূপ চোখের সামনে অবারিত হয়ে উঠেছিল তার, লোভ, ক্ষুধা, মৃত্যু, হাসি-কান্না, লালসা পৈশাচিকতা…ভাল মন্দ নয়…তা পূর্ণ তাই সুন্দর। সেদিন পূর্ণের সেই বোধ হারিয়ে ফেলেছিল সে, আবার কি তা সত্য হয়ে উঠবে জীবনে? শিবলাল হরগৌরী লতায় ঢাকা গেটটার নিচে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে একবার ফিরে তাকালে, তারপর রাস্তায় নেমে গেল।

মনোতোষ উঠেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, শিবলালকে এগিয়ে দিতে পারেন নি। কৈলাসনাথ এতক্ষণ রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, শিবলাল চলে যেতে এদিকে এগিয়ে এলেন আস্তে আস্তে। ভরাট গলায় বললেন, 'মনু, তোকে আমি রাজনীতি থেকে সরে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু এভাবে আসতে হবে এ আমি চাই নি। ছোকরার সঙ্গে এত আলোচনা করলি তুই, কিন্তু সে একবারও বুঝল না যে তুই সরে আসছিস। স্যার মুখার্জীও বোঝেন নি। আমারি ভুল হয়েছিল…'

মনোতোষ কৈলাসনাথের হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন, 'দুঃখ কোর না, কৈলাসদা, এমনিই হয়। ভগবানের ডানহাতের একটা আঙুল ভাঙা!'

'আর সেই ভাঙা-আঙুলের কাজ শোধরাবার জন্যে তোরা প্রাণান্ত করছিস আর ভেঙে পড়ছিস।'

'এই তো দাদার মতো কথা হ'ল। এ কি কম সান্ত্বনা কৈলাসদা…এই তো মনুষ্যত্ব। মানুষ ভগবানের বড়ো…' বলে মনোতোষ ওঁর হাতে আর একবার চাপ দিলেন।

। নবম পর্ব সম্পূর্ণ ।

পর্ব ১০

অধ্যায় ১

পুষ্প যে সন্ধ্যায় হরির মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঠিক করেছিল সেই-ই লালাদের বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসবে, তার পরদিন বিকেলেই তা সে করেছে। শিবলালকে তার যাওয়ার কথা বলে নি, চিত্ত থাকলে সম্ভবত তাকেও জানাত না। কয়েকদিন ধরে যা সে ভেবেছে, যাবার সময় সেটাই তার মনে হল, 'এই যে আমি একজন মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি, এতে ওদের করবার কিছু নাই। এটা ওঁদের ব্যাপার নয়।' কেবল হরির মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছল ও। সে যখন একটা রিক্সায় করে ওদের বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছে,তখন চোখের জল রোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল—গেল বার বাবার সঙ্গে এমনি করে গিয়েছিল সে! কিন্তু বরসিংবাঁধের বস্তি পেরিয়ে যতই ওদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে লাগল ও, ততই কি একটা প্রত্যাশায় ওর হৃদয় ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। একটা নতুন চেতনা এবং তৃপ্তি তার মনের ওপর ছুঁয়ে যেতে লাগল, যা সে এই যাত্রার থেকে পাবে ভাবতেও পারে নি।

সেখানে গিয়ে যতটুকু সময় সে থাকবে ভেবেছিল, তার থেকে অনেকক্ষণই কাটালে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথাই সে জিজ্ঞেস করতে লাগল। শম্ভুর সম্বন্ধে শুনলে, ছেলেটা আজকাল বাড়িতে থাকে খুব কম। একটা রাত্রি বাইরেও কাটিয়েছে। এখন কারখানার আন্দোলন নিয়ে খুব কথা বলে, লীলার ধারণা ও কিছু বোঝে না। পুষ্প এই প্রথম জানতে পারল, লীলার কাকিমা রাগ করেই বাপের বাড়ি গেছেন, বেলাকে নিয়ে। কলহের কারণটা লীলা বলে নি, পুষ্পও সাহস করে নি জিজ্ঞেস করতে। সব চেয়ে আশ্চর্য হল পুষ্প, বনমালীর প্রতি লীলার মনোভাব দেখে। একবার কথায় কথায় বললে, 'জান দিদি, কাকাকে নিয়ে আমার যত মুস্কিল। এখন ঘরে কিছু খেতেই পারে

না, বাইরে কিছু খায় বলেও মনে হয় না···কি করব জানি না আমি, কাকিমাও নাই···।' পুষ্প জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, শরীর কি খারাপ ?' লীলা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'কি জানি, ভাই ! এখন ত' ওনার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বইছে। এই সেদিন এ্যাকসিডেন্ট হল ট্যাক্সি থেকে, কারখানার গোলমাল চলছে···।' পুষ্প চমকে উঠল, এটা তো দোষীর মত কথা নয়। বিশেষ করে যে তার সর্বনাশের মূল, তার ওপর এই মমতা-বোধ জন্মায় কি করে ?

যতক্ষণ ওখানে ছিল পুষ্প, তার মধ্যে এই কথাগুলো হতে আর কতটুকুই বা সময় লেগেছে। তাও আবার একই সঙ্গে হয় নি। কিন্তু প্রতিবারই পুষ্পর দৃষ্টি সন্ধানী, উৎসুক হয়ে উঠেছে, লীলার মধ্যে কিছু একটা খুঁজে বেড়িয়েছে সে। তার মনোভাবটা হয়ত এই রকম : 'লীলা তো জানে দাদার সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা ছিল, সে সম্বন্ধে ওর মনটা এখন কী ? বাবার টাকার কথা তো জানে ও...তবে ?' কিন্তু এর কোন উত্তর লীলার ব্যবহারে, কথাবার্তায়, হাবভাবে খুঁজে পেল না সে। লীলা মাঝে মাঝে চমকে উঠে নিজেকে তিরস্কার করতে লাগল। মনে মনে তীব্র বেগে যতই বলতে লাগল, 'না, আমার এটা ভাল মন নয়, এই জন্যে আমি আসি নি···' ততই নিজের কাছে হেরে যেতে লাগল সে। সেই যে প্রথমবার বাবার সঙ্গে এসে লীলার সম্বন্ধে একই রকম অস্বস্তিকর কৌতূহল বোধ করেছিল সে, এখন মাঝে মাঝে সেটা আরো তীব্র হয়ে উঠতে লাগল।

হরির মার ব্যবহার দেখেও পুষ্প বিস্মিত হ'ল। এই লীলা সম্পর্কে তার বিরুদ্ধতা আর ঘৃণা কয়েকদিন আগেও নিজের চক্ষে দেখেছে সে। এখনও হরির মা চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলছে, কিন্তু তার সেই ধার আর নেই। হরির মা একবার বলেও বসল, 'বাছা, তুমি যে সেই কত্তাবাবু সগ্‌গে যাবার পরদিন চলে এলে, তারপর আর গেলে নাই। সব সম্পক্ক সেখানেই চলে গেল না কি ?' লীলা শুনে হরির মার মুখের দিকে তাকালে, স্পষ্টত ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু উত্তর করলে না।

পুষ্প আঙুল কামড়ালে, একথা ত' সে-ই বলতে পারত ! যা হরির মা সহজেই বলতে পারল তার নিজের কথা হলেও তা সে বলতে পারে নি কেন ?

ওখান থেকে যখন ফিরল পুষ্প, তখন রাত ন'টার কাছাকাছি। তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সেরে (এটা খুবই সংক্ষিপ্ত করতে হল অবশ্য) শিবলালকে

খেতে দেওয়ার জন্য হরির মাকে বলে শুয়ে পড়ল। পুষ্প জানত, আজ হঠাৎ তার ঘুম আসবে না, আর হলও তাই। কিন্তু তার মনের মধ্যে সহসা একটা পরিবর্তন এল। ওখানে থাকার সময় যে একটা অস্বস্তিকর শুকনো কৌতূহল বোধ করছিল সে, সেটা তার চলে গেল। ভাবলে, এই যাওয়াটা তার ভালই হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাবলে যে লীলার যাতে ভাল হয়, সেটা তাকে করতে হবে। এটার দায়িত্ব কেমন করে সে নিজের বলে মনে করলে তা সে জানত না, কিন্তু এটা যে তাকেই করতে হবে সে সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না তার। বরঞ্চ ভাবলে, বাবা যে তাঁর টাকা লীলাকে আর তাকে দিয়ে গেছেন, তাতেই তাদের দু'জনের ভাগ্য বেঁধে দিয়ে গেছেন একসঙ্গে। তিনি সবই জানতেন। তাকেই লীলার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

দিন চার পাঁচ ছাড়া ছাড়া আরও বার দুই হরির মাকে লীলাদের ওখানে পাঠিয়েছে পুষ্প। প্রত্যেকবারই হরির মা লীলার সম্বন্ধে উঁচু ধারণা নিয়ে ফিরে এসেছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে, 'মেয়েটা ভারী লক্ষ্মী হইছে, মা। কেমন মিষ্টি কথা, শুনলে চিত্তি ঠাণ্ডা হয়। গুমার-চ্যাটম নাই। আমি কুথাকার কে, আমাকেই যত্ন-আত্তি করে কত। আহা, মেয়ের মত মেয়ে···যত খেলে উয়াকে ওর খুড়া, নাহলে ঘর আলো-করা মেয়ে-ছেলে আমার······'

শুনতে শুনতে বুক ভরে উঠত পুষ্পর, আর মনে হত, এসব যা সে শুনছে, সবই যেন সে প্রত্যাশা করেছিল, লীলার সম্বন্ধে অন্যরকম কেউ যেন বলতেই পারে না। সেও কোনদিন ভাবে নি। আরও একটা কথা মনে হয় তার, লীলা দুঃখ পেয়েছে, না কাঁদলে মেয়ে-জন্মের শুদ্ধি হয় না। তাই এমনটি হতে পেরেছে লীলা।

'ওর কাকার সঙ্গে দেখা হয় না তোমার, হরির মা?'

'ঝাঁটা মার মুখ-পড়াকে···' হরির মা মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল। 'হইছিল একদিন, আমি কথা কই নি। মুখ-পড়া শুনি তার সাহেবের সঙ্গে রাত্রে ঘুরে বেড়ায়···সেই যে গো সেই সাহেব!' হরির মা চোখ ঘোরানোর মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে তুলতে চাইলে। 'লজ্জা নেই তোর, ভাইঝির সর্বনাশ করলি, আবার···'

পুষ্প সরে যায়, একথা শুনবে না সে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই তার। লীলা তার কাকার সম্বন্ধে কত স্নেহশীল! কত উদ্বিগ্ন! আর সেই কি না হেরে যাবে?

অধ্যায় ২

'কিন্তু আমি কি করে ওর ভালো করব, আমার হাতে কি আছে···' পুষ্প মনে মনে ভাবল। কাতরচিত্ত অথচ নিঃস্ব ব্যক্তি যেমন অন্যের দুঃখ দেখে খেদ করতে থাকে অথচ সাহায্য করতে পারে না, পুষ্পরও তাই হল। কয়েক দিন যেতে না যেতেই ওর মনে হল এই যে লীলার ওপর ভালোবাসায় তার বুক ভরে উঠেছে, এতে তো আর কিছু হবে না। শিবলালই তার জীবনকে ভরে তুলতে পারত, বাবা যা ভেবেছিলেন। সে নিজে স্ত্রীলোক হয়ে এটুকু বুঝতে পারে, স্ত্রীলোকের জীবনের সার্থকতা কোথায়। হায়, আর পুষ্প এই কয়েকদিন আগেও ভেবেছিল, পুরুষ স্ত্রীলোকের দুঃখ বোঝে না, তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কোন সম্পর্ক নেই! কিন্তু তাও না হয় হল, কিন্তু শিবলালকে কী করে বলবে সে ঐ মেয়েকে গ্রহণ করতে? অসম্ভব, সে তার বোন হয়ে তা হতে দিতে পারে না। অথচ, লীলার মতো মেয়েও কী নষ্ট হয়ে যাবে? এমনি এক দোষের জন্যে, যার জন্যে ওর কোনো দায়িত্ব নেই? পুষ্পর স্ত্রীলোকের মন এতেও না-না করে ওঠে।

পুষ্প ভেবেছিল, এবার লীলাদের বাড়ি আর হরির মাকে পাঠাবে না, নিজেই যাবে। কিন্তু যখনই যাবার কথা ভাবে ও, তখনই ওর কেমন করে মনে হতে থাকে, এই যাওয়াটা শুধু তার ফাঁকিই দেওয়া হবে। ও যেন সেখানে যেতে চায় লীলার দুঃখটা, তার ক্ষতস্থানটা উল্টে-পাল্টে দেখার জন্য। এতে ওরই অভিমান তৃপ্ত হয়, অথচ লীলার কিছু করা হয় না। সুতরাং সেদিনও আর তার যাওয়া হয় না। দিনের পর দিন কেটে যেতে থাকে, পুষ্প ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে, অথচ পথ খুঁজে পায় না।

আজকাল শিবলাল একটু ঘরঘেঁষা হয়েছে, কে জানে ওর কমিটির কাজ-কর্ম কমে গেছে কি না। কারখানায় তো এখন ধর্মঘট চলেছে। শিবলাল যতক্ষণ ঘরে থাকে পুষ্পর সঙ্গে কম কথা বলে, কেবল দরকার ছাড়া আর কোন কথা হয় না। পুষ্প কি ভাবে, তার কি অভাব-অভিযোগ এসবের দিকে চোখের কোণেও দেখে না সে। পুষ্প দেখে আর ওর বুকের ভেতর জ্বালা দিয়ে ওঠে, 'কেন আমি এখানে আছি, 'তার' সঙ্গে আমি চলে যাই নি কেন?' পুষ্পর চোখ এড়ায় না, এই ক'দিনেই শিবলালের স্বাস্থ্য অনেকখানি ভালো হয়েছে। ওর সব কাজ, খাওয়া-শোওয়া কথা এখন খুবই নিয়মিত,

মাপামাপা। বাবার সমস্ত 'আটিকুটি' এখন ওর মধ্যে প্রকাশ পেতে আরম্ভ' করেছে। এমনকি ওর মুখের সেই নরম-নরম ভাবটাও নাই, ওর নতুন গজিয়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা চুলের জন্যে মুখখানা বাবার মত রুক্ষ দেখায়।

পুষ্পর দিকে লক্ষ্য করে না শিবলাল, এটা একরকম ভালই হয়েছে। পুষ্প নিজেই শিবলালকে লক্ষ্য করে করে দেখে। কেমন করে একটা অস্বস্তিকর চেতনা তার মধ্যে জেগে উঠতে থাকে যে, তার সমস্ত দুঃখের জন্য যদিও ও দায়ী নয়, তবু ওই ইচ্ছে করলে তার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে দেয় না কেন ও? কেমন একটা আক্রোশ বোধ করে পুষ্প, আর অস্থির হয়ে ওঠে।

এরও পরিবর্তন হয়, আর পুষ্প নিজের মনে ছি ছি করে ওঠে। দাদার নামে এসব চিন্তা করেছে সে। তখন তার মনে হয় তাকেই এর একটা সমাধান করতে হবে। কি করে করতে হবে বুঝল না। কিন্তু কোনো রকমে, কোন একটা বড় ত্যাগ করেও হয়তো তা করতে পারবে সে।

তার পরদিন সকালে শিবলালের চা খাওয়া শেষ হয়েছে, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ওর জুতো জোড়াটা ডান পায়ের আঙুলে চেপে শিবলাল টানছে, এমন সময় পেছন থেকে পুষ্প ডাকলে, 'দাদা…'

'কি…' জুতোর ফিতে পরাতে পরাতে শিবলাল বললে। 'কি রে, কি বলছিস?'

পুষ্প ডেকেই থতমত খেয়ে গেছল, কি বলবে বুঝতে পারল না। শিবলাল পুষ্পর উত্তর না পেয়ে আবার বললে, 'পুষ্প, তুই নাকি লীলাদের বাড়ি গিয়েছিলি?

'হ্যাঁ, যাবে তুমি?' আগ্রহে তাড়াতাড়ি বলে পুষ্প, বলেই চমকে উঠল, হঠাৎ একি কথা বলে ফেলেছে সে। শিবলালের প্রশ্নের সঙ্গে এর তো কোন সম্পর্ক নেই!

'বেশ তো চল না একদিন…' শিবলাল সেই রকম উদাসীন অথচ প্রাণবন্ত স্বরে বললে। 'কিন্তু এখন থাক, দুপুরে এসে তোর সঙ্গে কথা বলব।' বলে বেরিয়ে গেল শিবলাল।

মৃদু উত্তেজনা আর উদ্বেগে পুষ্পর বুক টিপটিপ করছিল, কিন্তু ওরই মধ্যে খুশী হয়ে উঠল সে। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঠেকল, কিন্তু তবু এটাকে বিধিনির্দিষ্ট বলে মনে হতে লাগল তার। দাদাকে সে যখন

'ভেকেছে তার আগে পর্যন্ত সে ভাবে নি যে সকালে ওদের কোন কথাবার্তা হবে। কিন্তু তারও বাড়া আশ্চর্য—যে কথাবার্তা ওদের মধ্যে হয়েছে, পুষ্প যা বলেছে! 'যাবে তুমি?'—পুষ্পর এই কথা তো শিবলালের প্রশ্নের উত্তর নয়। কিন্তু তবু যখন সে বলেছে, তখন নিশ্চয়ই এর কোন একটা ফল আছেই। পুষ্পর মনে পড়ল, আজ ঘুম থেকে উঠেই তার বাঁ চোখ নাচছিল, সেটা নিশ্চয়ই তাহলে এইজন্যে। লীলার সঙ্গে শিবলালের বিবাহ বা এই রকম কিছু এই প্রসংগে তার মনে হল তা নয়, কিন্তু লীলাকে নিয়ে তার মনের ওপর এই কদিন ধরে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, তার মনে হল এর মধ্যে সেটার একটা কোন সমাধান আছে।

যখন পুষ্পর মনে এমনি একটা বোঝাপড়া হচ্ছে, তখন এ্যাকশন কমিটির অফিসে যেতে যেতে শিবলালের মনেও একটা অনুরূপ উচ্ছ্বাস আর শান্তির পালা চলছে। জুনাপুরের গুলিবর্ষণ, পিতার মৃত্যু, নতুন করে এ্যাকশন কমিটির কার্যক্রম ঠিক করা, এসবের মধ্যে এমনি দিশাহারা হয়েছিল শিবলাল যে, মেনকা বা লীলা কারও সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তাই তার মনে ছিল না। তার অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে বাবার মৃত্যুর দিন একবার মাত্র লীলাকে দেখেছিল শিবলাল। কেমন করে জানি লীলার মুখে একটা শুকনো, মৃত্যু-আহত চেতনার ছাপ দেখেছিল সে। তারপর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল ও। বাবার উইলের প্রসঙ্গে আরও একবার লীলার কথা উঠেছিল, তখন কেবল ভেবেছে, তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মেনকার বিয়ের দিন থেকে অন্যরকম করে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে ও। মেনকাকে সে ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিল, যে কারণে তা হল না, তার মধ্যে নিজের অবহেলা আর বিস্মৃতিকেই প্রধান বলে মনে করেছে ও! কিন্তু এই বিয়েতে যেটা সবচেয়ে ওকে নাড়া দিয়েছে তা হচ্ছে পল্টা মণ্ডলের ব্যাপার। এই কদিন বারবার তার মনে হয়েছে, পৌষ সংক্রান্তির মেলায় পল্টার ওপর অত্যন্ত ভুল বিচার করেছিল সে। পল্টাকে যেভাবে দেখেছিল সে, সেটা কখনই তার সত্য রূপ নয়। আর লীলা? লীলার সম্বন্ধে কোনো বিচারই সে আগে করে নি, এখনও তা ওর মনে এল না। কিন্তু কেমন করে ওর মনে হতে লাগল, লীলার সম্পর্কে শুধু উদাসীনভাবে থাকা নয়, তার প্রতি ওরও একটা করার কিছু আছে। তা কর্তব্য নয়, পরোপকার নয়, লীলাকে দয়া করাও নয়—

কিন্তু তথাপি ওরই মধ্যে এমন কিছু করার আছে যাতে লীলা তার উপযুক্ত স্থানটি জীবনে পায়, তার গৌরবের জায়গাটি পেতে পারে। সেই জন্যে সকালে কথাটা পুষ্পকে বলেছে ও।

দুপুরে খেতে বসে শিবলালই আবার কথাটা তুললে। বললে, 'পুষ্প, আজ যদি তোর সময় থাকে তো চল, সন্ধেবেলা যাই।'

পুষ্প যদিও শিবলালের যাবার প্রস্তাবে খুশি হয়ে উঠেছিল, তবু সংশয়ের একটা কালো ছায়া ওর মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। শিবলালের এতখানি আগ্রহের অর্থ ও বুঝতে পারল না। কিন্তু সেটা কেবল মুহূর্তের জন্য। শিবলালের খোঁচা-খোঁচা চুল শুদ্ধ মুখের দিকে তাকাল ও, মুখখানাকে কঠিন এবং দায়িত্বশীল মনে হল ওর, এবং তৎক্ষণাৎ ও ভাবলে, এতে কখনোই খারাপ কিছু হতে পারে না। বাবার ওপর যেমন হত ওর, তেমনি শিবলালের বেলায়ও একটা অখণ্ড বিশ্বাস মনটাকে ভরে তুললে।

'আমার আবার সময় অসময় কী, চল না আজই যাই···' পুষ্প খুশি হয়ে বললে। ও আবার শিবলালের মুখের দিকে তাকালে, তারপর কি ভেবে হঠাৎ বললে, 'তুমি জান, দাদা, বনমালীকার ছেলেটা আজকাল ভীষণ দুরন্ত হয়ে উঠেছে, তোমাদের কারখানার ঐসব গোলমালের কথা বলে···' কিন্তু এই কথা বলতে গিয়েই ওর মুখ খুলে গেল যেন। বললে যে সাবিত্রী এখন জুনাপুরে নাই, এবং তারপর এই রকম কথা বলতে আরম্ভ করল।

শিবলাল আগ্রহের সঙ্গে সব কথা শুনলে। নিজেদের কথা, ওদের কথা, লীলার কথা সবই মনে হতে লাগল ওর, আর ভাবলে, কোন কিছুই অর্থহীন নয়, অপূর্ণ নয়, সবেরই একটা শেষ সার্থকতা আছে। কেবল আমরা সেটা ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেই হয়।

সন্ধ্যার একটু আগে পুষ্প হরির মাকে লীলাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। শিবলালের কথা নয়, কেবল ওর নিজের যাবার কথাই বলে দিলে। হরির মাকে বললে, যদি লীলা বাড়িতে না থাকে, তাহলে যেন সে ফিরে এসে খবর দেয়। তারপর, মণ্টুকে নিয়ে সে সাজাতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যার কাছাকাছি একটা ঝড়ের মতো উঠল এবং একটু পরেই বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল, কিন্তু পুষ্প সেদিকে খেয়াল করল না। সন্ধ্যায় রওনা হবার কথা থাকা সত্ত্বেও শিবলালের ফিরতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য

এই, সে নিয়ে পুষ্প কিছু জিজ্ঞেস করলে না, শিবলালও বললে না কিছু। শিবলাল তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলে।

ঘর থেকে বেরোবার মুখে শিবলাল দেখলে, পুষ্প মন্টুকে কোলে করে নিয়ে দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। শিবলাল কিছু না ভেবেই মুচকে হেসে ফেললে। 'কি রে, কি বলছিস?'

'আচ্ছা, দাদা…' পুষ্প চিবুক টান করে চোখ দুটো মিটমিট করে বললে, 'তুমি আজ সকালবেলা হঠাৎ আমাকে লীলাদের বাড়ি যাবার কথা জিজ্ঞেস করলে কেন। আচ্ছা, কি করে তুমি বুঝলে যে আমি সেই কথাই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম?'

'তাই বই কি! তুই বল দিকি কি করে তুই আমার মনের কথা বুঝলি যে আমি ওখানে যেতে চাই…' শিবলাল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কিন্তু ঠিক পুষ্পর মতো চোখ মিটমিট করতে করতে বললে, আর একসঙ্গে দুজনেই হেসে উঠল।

ওরা যখন রিক্সায় উঠল, তখন বৃষ্টি আর বাতাস দুইই থেমে গেছে। কিন্তু সেদিকে খেয়ালই ছিল না ওদের, না থামলেও ওদের যাওয়া আটকাত না। ওদের কিন্তু মনে পড়ল, শুধু আজকেই নয়, কত আগেও কেউ কিছু না বললেও ওরা দুজনে দুজনের মনের কথা বুঝতে পারত। ছেলে বেলা খেতে বসে পুষ্প মাকে বলে দিত, দাদার কি চাই। পুষ্প কোনো সময় মুখ গোমরা করলে মা যখন কিছুতেই হদিশ পেত না, তখন শিবলাল তার কারণটা বলে দিত। মা এটাকে জুটি-পাকানো বলে কত বকুনি দিত আর হাসত। ওরা সেই সব কথা মনে করে বলতে লাগল আর হাসতে লাগল।

অধ্যায় ৩

সেই সন্ধ্যায় আরও একজন সহসা লীলার কথা চিন্তা করছিলেন, তিনি লেবার এণ্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রী অমরেশ ব্যানার্জী। স্রোতের ঘূর্ণির মধ্যেও একটা ফুল যেমন পাক খেতে থাকে, ডুবে তলিয়ে যায়, আবার কোথাও না কোথাও ভেসে ওঠে, তেমনি তাঁর উত্তেজিত বিহ্বল মস্তিষ্কে লীলার মুখখানা মাঝে মাঝে ভেসে উঠছিল। যে উদ্বেগ আর বিপর্যয় তাঁর পরিণত জীবনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে তার পটভূমিতে এ মুখ স্বতন্ত্র,

বিরোধী, এমন কি অস্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল, কিন্তু তবু এটাকে, তিনি এড়াতে পারলেন না।

একটি বিস্মিত তরুণীর মুখ, ঠোঁট দুটো একটুখানি ফাঁক হয়ে গেছে, রাস্তার ধারে সরে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছে—শ্রী ব্যানার্জীর মনে হল এটা তাঁর মনে পড়ার কথা নয়, দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চাইলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখখানা অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হতে লাগল তাঁর, খুঁটিনাটি পর্যন্ত যেন দেখতে পাচ্ছেন তিনি। কুস্তি প্রতিযোগিতার শেষে গাড়িতে করে ফিরছিলেন তিনি, আর মেয়েটি কাকার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

শ্রী ব্যানার্জী পাশের টিপয় থেকে আধভরা ডিকাণ্টারটা তুলে নিয়ে সামনে খেলাচ্ছলে ধরলেন। গভীর-রঙ, উজ্জ্বল পানীয়ের মধ্যে তিনি আবার ওকেই দেখলেন। কাকার মতো ও নত হয়ে নমস্কার করে নি, কিন্তু কাকারই সমস্ত শ্রদ্ধা যেন মুখে ফুটে উঠেছিল। বিস্ময়, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস—যা চিরদিন তিনি চেয়ে এসেছেন এবং যা এখন তাঁর চারদিক থেকে উঁচু পাড়ের নিচেকার বালির মত স্রোতের মুখে সরে সরে যাচ্ছে, তা তিনি ওর মুখে দেখেছিলেন। শ্রী ব্যানার্জী লীলাকে ফুলের মালা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর মনে হতে লাগল, সেটা ঠিক হয় নি। যা তাঁর করা উচিত ছিল (কী উচিত ছিল তা এখনও মনে করতে পারলেন না) তা তিনি করেন নি।

শ্রী ব্যানার্জী পাত্রটা নিঃশেষ করে টিপয়ের ওপর রাখলেন। আঃ-আঃ, সহসা আর একটা ঢেউ এসে তাঁর সামনে থেকে এই মুখটা সরিয়ে নিলে। শ্রী ব্যানার্জী মনে মনে উচ্চারণ করলেন, 'আজ বিকেলেই বনমালী এসেছিল, ওকে আনতে বললেই হত···একদিন বলতে হবে···,' যেন মনের মধ্য থেকে যে ছবিটা সরে যাচ্ছে সেইটে সামনে দেখতে চাচ্ছিলেন তিনি।

বুকের ভেতরটায় শক্ত হাতুড়ির ঘা পড়ছে, পাথরে পাথরে কোথায় ঠোকাঠুকি লেগেছে কে জানে। স্যার ধীরানন্দের চিঠি এসেছে দুদিন আগে। কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। কোম্পানীর নতুন নীতি নিয়ে উচ্চতম মহলে (তাতে ওপক্ষও থাকবে) গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় আলোচনা হবে। সেই সঙ্গে যে খবরটার ওপর আরো জোর দিয়েছেন তিনি সেটা এই : শ্রী অনিমেষ সেনগুপ্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসছেন এবং তাঁর কাছ থেকে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা যাচ্ছে। আজ আবার ট্রাঙ্ক-কল

পেয়েছেন তিনি, স্যার মুখার্জী এখনি কলকাতায় চলে যেতে বলেছেন তাঁকে। শ্রী সেনগুপ্ত কলকাতায় এসে গেছেন।

'না, তা কখনই হবে না। আমাকে এড়িয়ে গিয়ে তা হবে না...' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন শ্রী ব্যানার্জী, ট্রাঙ্ক-কল পাবার পর থেকে যা তিনি কয়েকবার করেছেন।

'ওয়েল, খালেক, লে আও আউর একঠো...' খালেক ভেতরে আসতেই, টিপয়ের ওপর খালি হয়ে আসা বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। খালেক সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে চলে গেল।

শ্রী ব্যানার্জী একটা কৌচের ওপর বসে আর একটা কৌচের উপর পা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাদামী রঙের পাতলুন হাঁটুর দিকে একটু টানা, তাঁর নিটোল লোমশ ঈষৎ অনাবৃত পা-দুটো অস্থিরভাবে মাঝে মাঝে দোলাচ্ছেন তিনি। খালেক চলে যাবার পর চোখ বুজে পেছনের দিকে হেলান দিয়ে পড়ে রইলেন ক্ষণিকের জন্য, যেন নিজের ক্লান্ত মস্তিষ্কটাকে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম দিতে চান। কিন্তু তা হবার নয়। গতকাল হেনরিয়েটা এসেছিল, তার বিয়ের নিমন্ত্রণ করে গেছে। তার ভাবী স্বামী একজন যুবক কেরানী, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। এখন তার নাম জানাতে দ্বিধা করে নি হেনরিয়েটা। কলকাতা থেকে সুমিত্রার বন্ধু রুমি চিঠি লিখেছে—আজই পেয়েছেন তিনি। *আশ্চর্য স্পর্ধা মেয়েটার, লিখেছে '...ওনার উপার্জনের স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্বের জন্যে নয়, কিন্তু আমারও ত' কিছু করা দরকার। আমি তাই বীণাপানি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করতে ইচ্ছে করেছি। আপনার আশীর্বাদ চাই।' এই মেয়েই বলাইয়ের জন্য তাঁর কাছে কেঁদে ফেলেছিল—আর তিনি তাকে নিজের কাছে থাকতে বলেছিলেন, সুমিত্রার সঙ্গে!

'আসলে, দে ডোণ্ট কেয়ার এ স্ট্র ফর দিস...দিস মিঃ ব্যানার্জী...' 'মিঃ ব্যানার্জী' কথাটা ব্যঙ্গের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন উনি।

কেউই বিশ্বাস করে না কাউকে। স্যার মুখার্জী আগেই সে বিশ্বাস ভেঙেছেন। হেনরিয়েটা যেজন্য তাঁকে এড়িয়ে গেছে তার কারণ ত ঐ একই। যে ছোকরাটি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে তাকেও কি অশুচি করছে না ও? আর রুমি, ঐ আদুরী মেয়েটাও নিজের পথ বেছে নিয়েছে। কেন? বিশ্বাস নেই বলে।

খালেক বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকল। কোমরে গোঁজা চাবির গোছাটা চলার জন্য একটু একটু শব্দ করছে। শ্রী ব্যানার্জীর কাছে গিয়ে বোতলটা কোলে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ও, যেন এটাই করতে বলা হয়েছে ওকে। যখন শ্রী ব্যানার্জী অত্যধিক মদ্যপান করতে থাকেন, তখন ভেতরে ভেতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে খালেক, আর এমনি করে তার প্রতিবাদ জানাতে থাকে। শ্রী ব্যানার্জী ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'খালেক, আমার গাড়ী তৈরী আছে? এখনই একবার বেরোতে হবে···, অর্থাৎ বলতে চাইলেন, 'আর দেরি করো না, তোমার কাজ করে দিয়ে চলে যাও।' খালেক এই ইঙ্গিত শুনেও শুনল না। অন্য সময় হলে এতেই করত সে, কিন্তু আজ শ্রী ব্যানার্জীর এই কথায় কেবল মাত্র একবার তার নুয়ে-পড়া দেহটা সোজা হয়ে আবার বেঁকে পড়ল। বললে, 'বাহার যাবেন ত' যান না, গাড়ি তৈয়ার আছে···', কিন্তু তেমনি করে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রী ব্যানার্জী খালেকের ইঙ্গিতটা বুঝলেন, কিন্তু বিরক্ত হতে পারলেন না। এবারে পরিষ্কার স্বরে বললেন, 'ওটা আমার হাতে দাও।' খালেক আস্তে আস্তে বোতলের মুখটা খুলে রাখলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সোডার বোতলের মুখও খুলে সামনে রেখে চলে গেল। অন্ততো, উনি যেন খানিকটা মিশিয়েই খান।

শ্রী ব্যানার্জী মদ্যপান করে কোনদিন মাতাল হন নি ভোগের সময় যেমন কখনো আত্মহারা হয়ে দাপাদাপি করতেন না। এই পানীয় তাঁর মত শক্তিমান পুরুষের ক্লান্তি দূর করে তাঁর শক্তিকে স্থিরতা দিত। কিন্তু আজকাল তা হচ্ছে না, স্পষ্টত হেরে যাচ্ছেন তিনি, ভেঙে পড়ছেন। সুরা এখন তাঁর চিন্তাকে পরিচ্ছন্নতা দেয় না, ঘোলাটে করে তোলে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত হেনরিয়েটাকে নিয়ে—হ্যাঁ, দাপাদাপিই করেছেন, কাঙালপনা করেছেন। এর থেকে আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

শ্রী ব্যানার্জী ডিকান্টারের মুড়িটা ঠোঁটের ওপর চেপে থমকে রইলেন কিছুক্ষণ। তরল পানীয়ের থেকে প্রতিফলিত আলোয় তাঁর মুখখানাকে রঙীন কিন্তু ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। শ্রী ব্যানার্জী বুঝলেন, ভেতরে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে যেন। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন তিনি, যেন যা একাকার হয়ে যাচ্ছে তার

মধ্য থেকে কোন একটা জিনিসকে স্পষ্ট করে দেখতে চান। আস্তে আস্তে তখন আরও একটা স্থির দৃষ্টি দেখতে পেলেন তিনি—প্রথমটা খেয়াল করতে পারলেন না, তারপর বুঝলেন এই দৃষ্টি কার। লীলা এখান থেকে, এই ঘর থেকে চলে যাবার সময় এমনি করে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। সে দৃষ্টি সেদিনও মুহূর্তের জন্য চমকে দিয়েছিল তাঁকে, আজও চমকে উঠলেন। কী বলতে চেয়েছিল মেয়েটা ?

দরজার মুখে টুক করে শব্দ হল: এবং যেখানে ঢুকবার মুখে কপাটের ছায়া অন্ধকার হয়ে পড়েছে, সেখানে পাগড়ীতে-পোষাকে ঢাকা লিকলিকে চেহারার একটি লোক দাঁড়াল এসে! শ্রী ব্যানার্জী একবার তাকিয়েই বললেন, 'কে, গাফিলুদ্দিন…'

সেলামের ভঙ্গীতে গাফিলুদ্দিনের দেহটা নত হয়েই আবার খাড়া হল, আলোতে পাগড়ীর নিচে ওর বিকশিত দন্ত-শ্রেণীই দেখা গেল একবারের জন্য। 'আমি এখুনি আসছি, গাফিল, তুই আমার গাড়িতে গিয়ে বোস…' একটু তাড়াতাড়ি ডিকাণ্টারটা ভর্তি করতে করতে বললেন শ্রী ব্যানার্জী। যেমন করে এসেছিল তেমনি করে অন্ধকার থেকে সরে গেল মূর্তিটা।

একটু পরে শ্রী ব্যানার্জী উঠতে যাবেন এমনি সময় আবার খালেক ঢুকল। সোজা এসে ওঁর পায়ের কাছে ধপ্ করে বসে পড়ল খালেক, তার কোমরে গোঁজা চাবির গোছাটা মেঝের ওপর ঝনাৎ করে শব্দ করল। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল ওর, হাঁপানো-হাঁপানো লাগল ওকে—মনে হল যে কথাটা ও বলতে চাচ্ছে, সেটা বলবে কি না তা নিয়ে অনেক দ্বিধা কাটিয়ে আসতে হয়েছে ওকে, এবং সেটা বলে ফেলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ও জানে গাফিলুদ্দিন কেন এসেছে এবং কেন শ্রী ব্যানার্জী কুলি-ধাওড়ায়, বস্তিতে বেরিয়ে যান। এসব আগেও দেখেছে সে, কিন্তু কী একটা বোবা ভয় এখন চেপে বসেছে ওর ওপর। ও বললে, 'গোস্তাকি মাপ করেন হুজুর, কিন্তু আপনি আর যাবেন না…' মনে হল যেটুকু দম নিয়ে আরম্ভ করেছিল খালেক সেটুকু শেষ হয়ে যেতেই ও চুপ করে গেল।

'কেন ?' শ্রী ব্যানার্জী কাঁপা কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু প্রশ্ন করেই চমকে উঠলেন নিজে। অন্য সময় হলে মৃদু হেসে খালেককে পেরিয়ে যেতেন তিনি, কিন্তু নিজের অজান্তেই যে উদ্বেগ তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল সেইটে অবাক করল তাঁকে।

'বাবু, আপনার পায়ের ধুলা, পায়ে রেখেছেন আছি, ঝেড়ে দিলেই নাই···', আহত ভীত মার্জারের মতো দৃষ্টি দিয়ে আরম্ভ করল খালেক। 'বাবু, উয়াদের মধ্যে আর আপনি যাবেন নাই···' বলতে বলতে ডান হাতটা এমনি করে বাইরে গাফিলুদ্দিনের দিকে বাড়াল যেন হাতখানা বিদ্যুতের আঘাত খেয়ে সহসা অবশ হয়ে গেছে।

মুহূর্তে শ্রী ব্যানার্জী বদলে গেলেন। 'খালেক, তুমি ডাইনিং রুমে যাও, সেখানে তোমার কাজ আছে···'তেমনি অবশের মত বসে কাঁপতে লাগল খালেক, বুঝলে শ্রী ব্যানার্জী অসহ্য ক্রোধ চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রী ব্যানার্জীর পুরোনো-আমলের বৃহৎকায় গাড়িটা যখন দক্ষিণ জুনাপুরের অভিজাত অঞ্চল ছাড়িয়ে উত্তরের কুলি বস্তিগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছিল এবং পেছনের সিটের একটা কোণায় ঘাপটি মেরে বসেছিল গাফিলুদ্দিন, তখন স্টিয়ারিংএর ওপর হাত রেখে একটা আহত তথাপি উদ্দীপ্তভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন শ্রী ব্যানার্জী। খালেক তাঁর মঙ্গল চিন্তা করছে! তাঁর শক্তির ওপর অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু ঐ খালেকের বাধাই তাঁকে পথ খুলে দিয়েছে যেন। একটু আগে কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি এই ভেবে যে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। 'কেন করবে?···'সহসা শ্রী ব্যানার্জী নিজের মনেই বিড় বিড় করতে লাগলেন। 'বিশ্বাস চাইলে কেউ বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস চুরমার করে দিয়েই বিশ্বাস টেনে আনতে হয়!' এর আগেও তিনি তো নিজে এটা করেছেন, এখনও তাঁকে তাই করতে হবে।

'গাফিল, তোমাকে যা বলেছিলাম ঠিক করে রেখেছ?'

'জী-হাঁ···'পেছনের সিটের কোণার অন্ধকার থেকে ফিসফিস্ করে গাফিল বললে।

বরসিংবাঁধের বস্তির মুখে গাড়িটা এসেই থেমে গেল। এখান থেকে বেঁকেই চাঁতা-ডাঙালে যেতে হয়, আজ সেখানেই যাবার কথা ছিল। পেছন থেকে বিনীত উদ্বিগ্ন স্বরে গাফিল বলে উঠল, 'ক্যা হুয়া বাবু?'

শ্রী ব্যানার্জী উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'আজ তুম উতার যাও, গাফিল··· দুসরে কামকে লিয়ে যায়েঙ্গে হাম···'

কিছুক্ষণ বোঝাই গেল না গাফিল কী করছে, বোধ হয় এই প্রস্তাবের অভিনবত্ব ক্ষণিকের জন্য তাকে বেকুব বানিয়ে দিয়েছিল। পরক্ষণেই কোঁচ্ করে দরজা খোলার শব্দ হল, আর রাস্তার মধ্যে পিছলে নেমে গেল

ও। শ্রী ব্যানার্জীর গাড়িখানার দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল সে।

বস্তির অপরিসর রাস্তায় হেড-লাইটের তীব্র আলো ফেলে উঁচু-নিচুতে আটকাতে আটকাতে গাড়িটা এগোতে লাগল। শ্রী ব্যানার্জী বরসিংবাঁধেই ঢুকলেন! সহসা, অন্ধকার পথ-হারানো মাঠে বিদ্যুৎ-চমকের মতো লীলার সেই দৃষ্টিটা ওর সামনে শুধু ভেসেই উঠেছিল তাই নয়, তার অর্থটাও বুঝতে পেরেছিলেন। একটু আগে যে ভেঙে ফেলার স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি, ঐ দৃষ্টির মধ্যে তারই ডাক শুনতে পেলেন যেন। লীলার সেই বিবশ, নিমীলিত চোখের কথা মনে পড়ল ওঁর। একটা ফুল বাতাসে দোল খেতে খেতে ডেকেছিল তাঁকে, 'এস, আমাকে ছিঁড়ে নাও, তোমার লোলুপ দৃষ্টি আর নাসিকার সামনে একবার ধরো, তারপর ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলো,' কিন্তু তখন সেটা বুঝতে পারেন নি। সেইজন্য লীলা যাবার সময় কঠিন দৃষ্টি হেনে তাঁকে তিরস্কার করে গিয়েছিল।

হেডলাইটের আলোটা কখনো বস্তির ভাঙা-বাড়ি, জড়াজড়ি করা খড়ের টালির চাল, কখনো ভাঙা নর্দমা আর বহুদিনের জমানো আবর্জনার ওপর পড়ে পড়ে সরে যেতে লাগল। মানুষগুলোকে কিন্তু কী রকম অস্বাভাবিক দেখাতে লাগল। কোথাও কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে উত্তেজিত স্বরে গল্প করছে, কোথাও একসঙ্গে কতকগুলো স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে কেন জড়ো হয়েছে। শ্রী ব্যানার্জীর মনে পড়ল, একদিন অনিমেষ সেনগুপ্তকে এই পথে আনবার সময় লোকটা কি রকম বেকুব হয়ে গেছল। রাস্তার মজদুরদের সম্বন্ধে অনিমেষের মতো উন্নাসিকতা সেদিনও বোধ করেন নি তিনি, আজও করলেন না। কিন্তু কেমন করে তাঁর মনে হতে লাগল, এই সব জীর্ণ নোংরা লোকগুলো মরেই আছে, কারো পায়ের তলায় পিষে মরতে পারলে এদের সেই বাঞ্ছিত পরিণামই এরা পাবে। কতকগুলো মজদুর ওঁর গাড়ির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওদের বিস্ময় কাটতে না কাটতেই পেরিয়ে গেলেন উনি। পেছন থেকে ওদের অপ্রত্যাশিত রুষ্ট স্বর শোনা যেতে লাগল। শ্রী ব্যানার্জী মনে মনে হেসে উঠলেন, কেন তা বুঝলেন না।

একটু পরে গাড়িটা মৃদু গর্জন করে বনমালীদের বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। সামনের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শ্রী ব্যানার্জী নেমে এলেন। একটু আগেকার বৃষ্টি হওয়া ভিজে অন্ধকারে কালো গাড়িটা মিশে গেল।

প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্রী ব্যানার্জী, মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলেন, তারপর সজোরে কড়া নেড়ে দিলেন। মনে হল, ভেতরে যে কথাবার্তা চলছিল তা সহসা বন্ধ হয়ে গেল। আবার কড়া নাড়তেই হরির মা বিরক্তির সঙ্গে কর্কশ স্বরে বললে, 'কে গো বাছা, এমন ঘটাং ঘটাং করে শিকল নাড়ছ, মুখে কথা নাই কেনে···'। ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, কিন্তু সহসা ওর গলাটা চেপে ধরল যেন কেউ। এক পা পিছিয়ে গিয়ে···'আঁক্' করে উঠল ও। ঘরের ভেতরকার হারিকেনের আলোতে—যে আলোটা মাঝখানে রেখে মেঝের ওপর বসে লীলার সঙ্গে কথাবর্তা বলছিল ও—শ্রী ব্যানার্জীকে উত্তেজিত, অস্থির ও ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল। হরির মায়ের চিবুকটা টান হয়ে পড়াতে গোল মুখখানাকে লম্বাটে দেখাচ্ছিল। শ্রী ব্যানার্জীকে দেখে তার ভীত দৃষ্টির মতো সেও যেন টানা হয়ে আটকে পড়েছিল, তারপর মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে ভেতরের দরজা দিয়ে বারান্দায় ছুটে গেল ও। যখন ওর একটু সম্বিৎ ফিরে এল, তখন ওর মনে হল যেঘরের ভেতর থেকে লীলা ওর সঙ্গে পালিয়ে আসে নি। শুধু তাই নয়, লোকটা লীলাকে কি বলছে আর লীলাও তার উত্তর দিচ্ছে। একটু পরেই ওর বুঝতে বাকি রইল না, লোকটা কে। ওর ভয়টা কেটে গিয়ে লীলার ওপর তীব্র ঘৃণায় ওর মনটা বিষিয়ে উঠল। ছি-ছি, কি কুক্ষণেই সে এ-বাড়িতে এসেছিল!

অধ্যায় ৪

যেমন করে তাঁর সামনে আঁতকে উঠল হরির মা আর পালিয়ে গেল, সেইটে দেখে উচ্চহাস্য করে উঠলেন শ্রী ব্যানার্জী, একটু আগে পথে আসবার সময়ও মজদুরদের বিস্মিত এবং রুষ্ট মন্তব্য করতে দেখে যেমন হেসে উঠেছিলেন। পেছনে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে এমনি করে এগিয়ে গেলেন, যেন এখনই আর একটা আর্তনাদ (লীলার কাছ থেকে) শুনতে পাবেন এবং আর একবার অট্টহাস্য করবেন।

'আপনি! আপনি···কাকাতো এখন বাড়ি নেই!'

শ্রী ব্যানার্জীকে ঘরে ঢুকতে দেখে লীলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, পিঠের আঁচলটা টেনে ঠিক করতে করতে বললে।

শ্রী ব্যানার্জী চমকে উঠলেন, লীলা একটুও ভয় পায় নি। উনি এতক্ষণ

ভেঙে ফেলার যে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন, পথে আসবার সময় মজদুরদের মধ্যে এবং এখানে যা দেখেছেন, লীলার মধ্যে যেন তার স্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন। কিন্তু তখনও পুরোপুরি দেখবার মতো দৃষ্টি তাঁর খোলে নি। তাই জড়ানো পরিহাসের সুরে বললেন, 'কাকা! কাকাকে কি হবে, আমি তোমার কাছেই তো এলাম…' বলে আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন, সে হাসি যেমনি শুকনো, তেমনি অর্থহীন শোনাল।

লীলার বুকের ভেতরটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু সহজ কণ্ঠে ও বললে, 'আমার কাছে?…কেন…বলুন!'

ওর বাঁ দিকে টেবিলের ধারে যে চেয়ারটা ছিল, সেটা একটুখানি ঘুরিয়ে ওঁকে বসতে দিলে লীলা। মেঝের ওপর থেকে হারিকেনের আলোটা তুলে টেবিলের ওপর রাখলে। সেই আলোর সামনে লীলার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাকিমার একটা পুরাণো লাল পাড় সাদা-শাড়ি পরেছিল ও। চুলগুলি আজ বিকেলে বাঁধবার সময় হয় নি, এলো খোঁপার মতো জড়িয়ে রেখেছে। লীলার এই ঘরোয়া ভাবটি চোখে পড়তেই যেন শ্রী ব্যানার্জী সচেতন হয়ে উঠলেন। স্বপ্নের মধ্যে লুব্ধ এবং উত্তেজিত অবস্থায় থেকে চট্‌কা লেগে ঘুম ভেঙে গেলে যা হয়, ওঁরও তাই হল। এতদিন যে ব্যর্থতা আর নৈরাশ্যের মধ্যে কাটাচ্ছিলেন আর ভাঙা-বিশ্বাসের টুকরো মাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তার থেকে এর কত পার্থক্য। লীলা পরম বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে আর বসবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে! তাঁর একবার সন্দেহ হল, এই মেয়েটিকেই বনমালী সেদিন তাঁর বাংলোয় নিয়ে গেছল কি না।

শ্রী ব্যানার্জী আস্তে আস্তে এসে চেয়ারটাতে বসলেন, তখনও তাঁর দৃষ্টি লীলার ওপর বদ্ধ। তখন ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে তাঁর মনে আর একটা চিন্তা এবং অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল…যা তাঁর একটু আগেকার উত্তেজনার থেকে, বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, আকস্মিক। অথচ তাঁর মনে হল যেন এর জন্যই তিনি এসেছিলেন। ফুল ছিঁড়তে এসে কেউ ফুলের সৌন্দর্যের তারিফ করতে থাকলে যেমন হয় এও তেমনি। তাঁর মনে হতে লাগল, এর আগে সত্যিই তিনি লীলার দিকে তাকিয়ে দেখে নি। লীলাকে সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু সে সৌন্দর্য যে

কী, এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত তা তিনি বুঝতে পারেন নি। দেহ নয়, আত্মাই মানুষকে সুন্দর করে তোলে। শ্রী ব্যানার্জী জানতেন না কী দুঃখের আগুনে পুড়ে লীলার সৌন্দর্য স্থির, শান্ত হয়ে উঠেছিল।

'লীলা, তুমি কি ভাববে জানি না, কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমাকে বিবাহ করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে?'

ক'টি কথা বলতে বলতে বলতে কেন জানি শ্রী ব্যানার্জী লজ্জিত হয়ে পড়লেন। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লীলার থেকে চোখ সরিয়ে আনলেন তিনি। কিন্তু সে কথা নয়, যা তিনি এক মুহূর্ত আগেও বলবেন বলে ভাবেন নি, তাই বলে ফেলে তাঁর মনে হল, ঠিকই হয়েছে। এরই মধ্যে তাঁর বিক্ষুব্ধ জীবনের একটা সমাধান রয়েছে। একটু আগে যে শ্রমিকদের ঘৃণা করছিলেন তিনি, সেইটে এই মুহূর্তে বিঁধতে লাগল ওঁকে। মনের ভেতর জোর দিয়ে বললেন, না তা কখনো সত্য নয়। মজুরদের চিরকালই তিনি ভালবেসেছেন। শ্রদ্ধা করেছেন। কোনো দিন তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারায় নি, তিনিও চিরদিন তাদের বিশ্বাস করে এসেছেন। এসব তাঁর কাছে অত্যন্ত সত্য বলে মনে হতে লাগল।

শ্রী ব্যানার্জী বলতে গেলেন, 'লীলা, আমার পদমর্যাদা, আমার বয়স, এসব মনে করলে আমার প্রস্তাব অসঙ্গত, এমন কি হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু তবুও কি এটা একেবারে অসম্ভব....', কিন্তু না বলে চুপ করে লীলার উত্তরের অপেক্ষা করে রইলেন।

'এ কি বলছেন আপনি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...' আঁচলটা আঙুলে খুঁটরোতে খুঁটরোতে লীলা বললে, মুহূর্তের জন্য লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল ওর। কিন্তু তারপরই যেন সচেতন হয়ে উঠল লীলা, আঁচলটা ছেড়ে দিলে ও, তার নাড়া-খাওয়া হৃদয় শান্ত হয়ে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে শ্রী বানার্জীর দিকে তাকিয়ে তেমনি শান্ত, দৃঢ় স্বরে বল্ললে, 'না, তা হয় না।'

এই পরিবর্তন শ্রী ব্যানার্জীর চোখ এড়াল না, কিন্তু মুহূর্তের জন্য লীলার মুখে তিনি যে লজ্জা ফুটে উঠতে দেখেছিলেন সেইটে তাঁকে তৃপ্ত কিন্তু লুব্ধ করে তুলেছিল। বিহ্বল, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি বললেন, 'কেন হয় না! আমি...' বলতে বলতে থমকে গেলেন তিনি। লীলার চোখে একটা নিশ্চিত 'না' ফুটে উঠতে দেখলেন। হঠাৎ পৃথক স্বরে বললেন, 'আচ্ছা লীলা,

'আমাকে গ্রহণ করা বা আমাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে কি এতই অসম্ভব? তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও? বেশ, তাই হোক···তুমি আমাকে কথা দাও, যতদিন বলো আমি অপেক্ষা করব। বনমালীকে ডেকে কালই আমি সব কথা বলব···' আগ্রহে শ্রী ব্যানার্জী সামনে ঝুঁকে পড়লেন একটুখানি।

লীলা চোখ নামাল, এতে তার মুখের ওপর থেকে উদ্দীপ্ত দৃঢ় ভাবটা সরে গিয়ে সেটাকে বিষণ্ণ দেখাতে লাগল, যেন শ্রী ব্যানার্জীর কঠিন ক্ষমতার আড়ালে আর্ত হৃদয়টা চকিতে ও দেখতে পেলে। ধীরে ধীরে বললে, 'এসব কথা আমাকে কেন বলছেন, আমি জানি, না······সব বুঝতেও পারছি না আমি···কিন্তু আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না।'

সহসা উচ্চহাস্য করে উঠতে চাইলেন শ্রী ব্যানার্জী, 'যেদিন বনমালীর সঙ্গে আমার বাংলোয় গিয়েছিলে, সেদিনের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি তুমি······' কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন তিনি। নিজের মধ্যে এই মুহূর্তে তিনি সেই পৌরুষ অনুভব করছিলেন যা নারীকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখে নিজেকে ছোট করে না, তাকে সম্ভ্রমের আসনে বসিয়ে আপনাকে সম্মান দেয়। তাছাড়া কেমন করে তাঁর নিজের মনেও সংশয় হতে লাগল, সেই ঘটনার সঙ্গে আজকের এই ঘটনার সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

'তোমাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো······'শ্রী ব্যানার্জী তাঁর পকেট থেকে পাইপটা বের করে হাতে রাখলেন, ধরালেন না। 'তোমাদের এই বস্তির মধ্যে শীগ্রিই নতুন আলো দেখা দেবে। আমরা মরে গেছি······ দেয়ার উইল বী নো মুখার্জীস্ এ্যাণ্ড ব্যানার্জীস্, আমি বলছি······এতদিন তোমরাই মরেছিলে, মরতে মরতে এখন নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়েছ তোমরা······'

বাইরে রাস্তার ওপর কিসের একটা শব্দ উঠতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল সন্ধ্যার যে ঝড়ো হাওয়াটা থেমে গিয়েছিল, সেটা আবার আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু শব্দটা একটু কাছাকাছি হতেই বোঝা গেল কতকগুলো লোক উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ স্বরে কী বলছে এবং আরো কতকগুলো লোকের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া চলছে। লীলা উদ্বিগ্ন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকাল এবং মনে হল এখনই গিয়ে ও দরজা খুলবে। শ্রী ব্যানার্জী মুচকে হাসলেন, পাইপ শুদ্ধ হাতটা তুলে নিষেধ করলেন লীলাকে, যেন বলতে

চাইলেন, 'ওতেও আবার ভয় করে!' হাত নামালেন কিন্তু চোখ ফেরাতে পারলেন না। লালার চকিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি একটু আগে যে নতুন প্রাণের কথা বলছিলেন যেন সেইটে দেখতে পেলেন। ওঁর নিজের চোখ কুঁচকে এল, স্বতই একটা অনুনয় ফুটে উঠল তাতে। বললেন, 'লীলা, তুমি আমাকে স্বীকার কর। কত রাত্রির স্মৃতি আমাকে উত্তেজিত করে, দগ্ধ করে, কিন্তু শান্তি দেয় না……' এক মুহূর্ত থামলেন শ্রী ব্যানার্জী: মিসেস রয়, হেনরিয়েটা —সিনিয়র ক্লাবের তীব্র ঈর্ষা আর রেষারেষি মুহূর্তে মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেল তাঁর। 'এখন আমাকে একটু শান্তি দাও তুমি, ভালবাসতে দাও ……'শ্রী ব্যানার্জী লীলার নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

বাইরে গোলমালটা বেড়ে উঠল, কয়েক জন দরজার কাছ পর্যন্ত ছুটে এল যেন। তারপর সজোরে কড়া নড়ে উঠল, একটা ধাক্কাও পড়ল দরজার ওপর। একবার সেদিকে তাকিয়েই আবার লীলা শ্রী ব্যানার্জীর মুখের দিকে তাকাল, যেন জানতে চাইল গিয়ে খুলে দেবে কি না। শ্রী ব্যানার্জীর চোখও, দরজার ওপর পড়েছিল, কিন্তু মনে হল না যে ধাক্কা দেওয়াটা আদৌ খেয়াল করেছেন তিনি। তাঁর ক্লান্ত, বিষণ্ণ দৃষ্টি এই নতুন ঘরখানার দেয়াল, দু'একটা সামান্য আসবাব, কোণায় গুটিয়ে রাখা বিছানার ওপর দিয়ে ঘুরে আসতে লাগল। এর সব কিছুই তাঁর অনুগ্রহের দান—অন্য সময় হলে তাই মনে হতে পারত তাঁর, কিন্তু এখন ভাবলেন, এর সব কিছুই তাঁর আয়ত্তের বাইরে। সামান্য জিনিসগুলোই তাঁর কাছে নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিল।

দরজার ওপর ঘা পড়ল, একই সঙ্গে অনেকগুলি ঘা—ভেতরে দরজাটা কেঁপে কেঁপে থেমে গেল। মনে হ'ল, না খুলে দিলে এখনই ওরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে। শ্রী ব্যানার্জী অবজ্ঞার সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠলেন, 'আমি খুলে দিচ্ছি……', বলে এক পা এগিয়ে লীলার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, কিন্তু তুমি আমার কথার জবাব দিলে না তো। শেষ বারের জন্য আমি তোমায় বলছি, আমাকে……'

লীলা দরজার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, বললে, 'দেখুন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু আপনার কোনো ভয় নাই তো?'

শ্রী ব্যানার্জী তৎক্ষণাৎ বুঝলেন, এর মধ্যে আর যাই থাক, তিনি যা চাচ্ছিলেন তার উত্তর নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, তারপর যন্ত্রবৎ মেঝেটা পেরিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

অধ্যায় ৫

সিঁড়ির ওপরই উঠে এসেছিল কয়েক জন, দরজা খোলা মাত্র শ্রী ব্যানার্জীর সামনে থেকে পিছলে নিচে ভিড়ের মধ্যে পড়ল। মনে হল না যে এরাই শ্রী ব্যানার্জীর বেরিয়ে আসার জন্য দরজায় ধাক্কা মারছিল। ওধারে লাইট-পোস্টের থেকে আরম্ভ করে একেবারে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত মজদুররা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কতক্ষণ ধরে এরা জমায়েত হয়েছে কে জানে : শ্রী ব্যানার্জী এখানে পৌঁছোবার সময়ও এরা এখানে ছিল, নাকি, তারও আগের থেকে তাঁর আসার কথা জেনে এখানে-ওখানে লুকিয়ে ছিল, তারপর বেরিয়ে এসেছে? শ্রী ব্যানার্জীর মূর্তিটা দরজার মুখে দেখা দেওয়া মাত্র সমস্ত গোলমাল মুহূর্তে ঝটকা মেরে নিবিয়ে দিলে যেন কেউ। কেবল সকলেরই মুখে একটা ক্রুদ্ধ কঠিন দৃষ্টি গুলি পাকিয়ে রয়েছে, যেন ওরা যা করতে যাচ্ছিল এই মাত্র তা ভুলে গিয়ে থমকে গেছে।

'ক্যা হুয়া?' শ্রী ব্যানার্জী জড়িত স্বরে, অন্যমনস্কভাবে বললেন। স্পষ্টত, তখনও নিজের নতুন অনুভূতির সঙ্গে বোঝা-পড়া করছিলেন তিনি।

মজদুররা তেমনি নীরব, বিভ্রান্ত। কেবল চকিতে কেউ কেউ একবার পাশের দিকে তাকাল, যেন অন্য জনকে জিজ্ঞেস করলে, 'ক্যা হুয়া? আমরা এখানে*কেন?' কিন্তু সঙ্গীর মুখে ঐ একই প্রশ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলে। সমস্ত ব্যাপারটা অর্থহীন পাগলামি বলে মনে হত লাগল ওদের।

শ্রী ব্যানার্জী আবার তেমনিভাবে প্রশ্ন করলেন, 'ক্যা হুয়া......ক্যা মাঙতা তুম্?' একটি সহজ উদার (এখনও অন্যমনস্ক) ভাব ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে, যেন ওরা এখনই কিছু প্রার্থনা করবে এবং তিনি তা পূর্ণ করবেন।

'এ গরীবোঁকে বস্তি হ্যায়......এ জগহ্ মেঁ কিসীকে লিয়ে......' একটা আড়ষ্ট, ভীত কণ্ঠস্বর ভিড়ের মধ্য থেকে শুকনো পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল। 'কিসীকে লিয়ে ইঁহা গাড়ি আতী হ্যায়......'

লোকটাকে দেখা গেল না। তার কণ্ঠস্বর এত দুর্বল যে যে-কোনো সময় তা আটকে যেত কিন্তু যে-কথাগুলো সে উচ্চারণ করছিল তা চাবুক মেরে লোকগুলোকে চেতন করে দিলে যেন। বন্দুকের হঠাৎ আওয়াজে নিঃশব্দ তেঁতুল গাছের মাথা থেকে যেমন করে এক ঝাঁক বাদুড় বেরিয়ে

আসে, তেমনি এলোমেলো এক ঝাঁক মন্তব্য, অস্ফুট চিৎকার ছিটকে পড়ল। থমকে-যাওয়া মজছুরেরা নড়া-চড়া করতে আরম্ভ করল। 'হাঁ, কেঁও ইঁহা ট্যাক্সি আয়া……' হুংকার দিয়ে উঠল ওরা। ওদের মনে হল, এরই কৈফিয়ৎ চাইবার জন্যে ওরা এখানে এসেছে এবং এই মুহূর্তেই সেই কৈফিয়ৎ আদায় করবে ওরা। সুবৃহৎ গাড়িটার দিকে সকলেরই চোখ পড়ল। জন-কয়েক মজদুর গাড়ির ছু'দিকের পা-দানিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এতগুলি দৃষ্টির সামনে সহসা কাঁচুমাচু হয়ে উঠল ওরা, কিন্তু নামতে পারল না। তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

'কেয়া বোলা হ্যায়! কৌন্ বোলা……' শ্রী ব্যানার্জীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, মনে হল এতক্ষণে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি, তাঁর দেহটা সামনে অলক্ষিত বক্তার দিক বরাবর ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল।

গোলমালটা মুহূর্তের জন্য একটা ধাক্কা খেয়ে স্তিমিত হয়ে এল যেন, তারপর আবার ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের থেকে কে একজন চিৎকার দিয়ে উঠল। তীব্র, কর্কশ কণ্ঠ, আগেকার লোকটির মতো ছুর্বল নয়— 'কেনে…… আপনি সাহেব লোক আছেন, কুলিদের ঘরে এসছেন কেনে, হঁ?'

'হঁ, কেনে……' স্ফুট, অস্ফুট সমর্থন এবং মন্তব্য তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ল।

শ্রী ব্যানার্জীর ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া দেহটা খাড়া হয়ে উঠল, প্যাণ্টের ছুই পকেটে সবেগে হাত ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর মুঠি ছুটো পকেটের ভেতর থেকে সামনে ঠেলা হয়ে বড়ো আর শক্ত দেখাতে লাগল। শ্রী ব্যানার্জী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লোকটার দিকে (তাকে দেখা যাচ্ছিল না পৃথক করে) একবার, তারপর সকৌতুকে তাঁর চারদিকে মজছুরদের দিকে তাকালেন। তারপর, যেন লোকটার কাছে পৌঁছাতে চান এমনি করে নিশ্চিতভাবে অথচ ধীরে সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি। নদীর অবিচ্ছিন্ন জলধারা যেন মাঝখানে ফাঁক হয়ে পথ করে দিলে: জমায়েতী মজছুররা সরে সরে যেতে লাগল। মনে হল, চিরকাল যা তারা করে এসেছে, শ্রী ব্যানার্জীকে সম্মান দেখাবার জন্যই যেন তারা এখনও জমায়েত হয়েছিল।

'এই শালারা কেঁচোর দল, শালারা বুকে হাঁটিস না……' সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠ-

স্বর ওদের গোলমাল ছাপিয়েই উঠল না কেবল, ওদের বুকে বিঁধে ওদেরকে অস্থির করে তুলল। যে জনতা ফাঁক হয়ে সরে যাচ্ছিল, আত্মগ্লানিতে দ্বীপের চারধারে উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতো শ্রী ব্যানার্জীর চারধারে আছড়ে পড়ল, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। সেই কণ্ঠস্বর পেছন থেকে ওদের চাবকাতে লাগল, 'মর্দানা মাফিক পায়ের উপর দাঁড়া। তোদের ইজ্জত নাই, লেবার সাহেব তোদের বুকে লাথ মারছে শালা দেখ, তোদের আঁখকে উপর তোদের জরু লিয়ে খেলছে……'

শ্রী ব্যানার্জী হাসলেন, এখানে আসবার আগে যে প্রচুর মদ্যপান করেছিলেন তিনি তা এতক্ষণে তাঁকে স্থিরতা দিয়েছে যেন। বুঝতে পারলেন, লীলার সম্বন্ধেই ওদের অভিযোগ, সেইজন্যেই ওরা এসেছে। 'কিন্তু বাঁদরগুলো জানেও না লীলা কোন্ টাইপের মেয়ে, আর এই রত্ন ওদের মধ্যেই আছে!' মনে মনে আবার হাসলেন শ্রী ব্যানার্জী, ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন পেছনের দিকে, যেন লীলাকেই আর একবার দেখে নিতে চান। তাঁর দৃঢ়তাকে ঘিরে কোথায় একটা বিষণ্ণতা পাক দিয়ে উঠতে লাগল যেন।

তবু এই মুহূর্তেই পরিষ্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর চারপাশে থমকে-যাওয়া মজদুরদের দিকে তাকালেন। ওদের ভীত, উত্তেজিত, অপরাধী মুখগুলো ওঁর সমস্ত মনটাকে একটাকে অপূর্ব সহানুভূতিতে ভরে তুলল। এই বস্তির মধ্যে প্রথম ঢুকে গাড়ি চালিয়ে আসবার সময় এদেরকেই শুকনো, মৃত মনে হচ্ছিল তাঁর! কিন্তু এত কাছাকাছি এদের মলিন, বিবর্ণ, আহত মুখ আর চেহারার আড়ালে একটা নতুন কিছু দেখতে পেলেন।

সহসা একটা রুক্ষ, ক্ষিপ্ত লোককে ভিড় কেটে এগিয়ে আসতে দেখলেন তিনি। সাঁতার কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে গেলে লোকে যেমন করে জল ভাঙে, তেমনি দু'হাতে মজদুরগুলোকে ঘা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল ও। সামনে পৌঁছেই দু'হাত মেলে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। মনে হবে উত্তেজিত লোকগুলোকে হাত বাড়িয়ে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে, নয়তো, এমনি করে দুই হাতে ভর দিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে—কিন্তু শ্রী ব্যানার্জী ওর দৃষ্টির আসল অর্থটা বুঝতে ভুল করলেন না। লোকটাকে চিনতে পারলেন তৎক্ষণাৎ।

তুমি? শ্রী ব্যানার্জীর ঠোঁটের কোণাটা অস্বাভাবিকভাবে ডান দিকে একটু বেঁকে গেল। ওর নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি। এই লোকটিকেও গাফিলুদ্দিনের মতোই তিনি চাকরী দিয়েছিলেন।

'হুঁ, আমি স্যার……', লোকটা শিকারী কুকুরের মতো তাকিয়েছিল শ্রী ব্যানার্জীর দিকে। ওর পাঁজরটা এত জোরে ওঠানামা করছিল, মনে হল কথাগুলো ওর সমস্ত বুক তোলপাড় করে বেরিয়ে আসছে। 'আর কতদিন এমনি চালাবেন, হুঁ…মজদুরদের বাপ-মা নাই, হুঁ…'

যা কখনও হয় নি, শ্রী ব্যানার্জীর বুকের ভেতরটা দুলে উঠল, তাঁর নিজের গড়া হাতিয়ার তাঁর নিজের বিরুদ্ধেই উঠতে দেখছেন তিনি। এতক্ষণ এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও মনে হয় নি যে এরা তাঁকে স্পর্শ করবে, কিন্তু এখন তাই হল। শুধু তাই নয়, এইমুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল, ওই লোকটার আগেই তাঁকে ঘা মেরেছেন স্যার মুখার্জী, হেনা, এমন কি তাঁর কন্যার বন্ধু রুমি পর্যন্ত। সেখান থেকেই পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু যেমন কালো মেঘের প্রান্তে সোনালি আলো ঝিকিয়ে ওঠে, তেমনি আর একটা অনুভূতি তাঁর মনকে ভরে তুললে। যা তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, সেটা তাঁরই হাতের তৈরী! আর কোথায় নিজের ভেতরে সকৌতুকে হাসতে লাগলেন তিনি।

ঠিক সেই সময় এখান থেকে অদূরে ভিড়ের মুখে একখানা রিক্সা এসে থেমে গেল, এগোতে পারল না। পুষ্প আর শিবলাল এসবের কিছুই জানত না। ঘর থেকে বেরিয়ে নিজেদের ছেলেবেলার কথা, বাবা-মা'র কথা, তখনকার ভাবনা এই সব নিয়ে এত অন্যমনস্ক ছিল যে এদের গোলমালটা বাঁকের মাথায় এসেও ওরা শুনতে পায় নি। রিক্সাটা থামতেই পুষ্প বলে উঠল, 'কি হল, এত গোলমাল কেন…'। একটু আগেই যে-খুশিটা বুক ভরে দিয়েছিল ওদের, তা ছাপিয়ে ওর উদ্বেগটা যেন প্রকাশ হতে পারল না। শিবলালও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিল, বুঝতে পারল কোনো একটা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ জানতে পারল না। রিক্সা থেকে নামতেই পুষ্প আবার বললে, 'কিন্তু লীলাদের কিছু হয় নি ত? ওদের বাড়ির সামনেই দেখছি…' পুষ্প একটু ঝুঁকে পড়ে ওদের ঘরটার দিকে তাকাল কিন্তু এত দূর থেকে অন্ধকারে ঠিক কিছু বুঝতে পারল না।

'তাই তো দেখছি…'

বলে শিবলাল এগোবার উপক্রম করতেই পুষ্প হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরে ফেললে, 'দাদা, তুমি যাচ্ছ না কি?' রিক্সাওয়ালাও ওকে সমর্থন করলে, 'মাৎ যাইয়ে বাবু…'। শিবলাল বোনের মুখের দিকে একবার তাকাল,

একটা নীরব মৃদু তিরস্কার ফুটে উঠল মুহূর্তের জন্যে, 'ছি…,' তারপর হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। পুষ্প অসহায়ভাবে মণ্টুকে কোলে টেনে নিয়ে চেপে ধরলে। গোলমালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর, এতগুলি লোককে সামনে দেখে গোলগোল দু'হাত তুলে নাড়তে লাগল আর খুশিতে কলকল করে উঠল।

ভিড় ঠেলে এগোতে দেরী হচ্ছিল শিবলালের, কিছুতেই লীলাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছিল না। 'লীলাদের কিছু হয় নি ত?'—পুষ্পর এই কথাটা সহসা তার বুকের ভেতটায় মুচড়ে ধরলে যেন। যাদের মধ্যে দিয়ে ও এগোচ্ছিল, তাদের উত্তেজিত অথচ বিমূঢ় ভাবটাও বুঝতে পারল না, তারাও ওকে চিনতে পারল বলে মনে হয় না। ওর চোখের সামনে কেন জানি লীলার আহত, রক্তাক্ত মূর্তি ভেসে উঠতে লাগল এবং মনে হল এই মুহূর্তেই সেটা ও দেখতে পাবে। একটু পরেই দেখলে ওদের দরজাটা খোলা, আর যেন লাফ দিয়েই ওদের সিঁড়িতে এসে ও পৌঁছাল। পরমুহূর্তেই ওর পরিচিত মূর্তিটা ও দেখতে পেলে: দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সহসা অপ্রত্যাশিত আনন্দে ওর বুকখানা ভরে উঠল। লীলার বিষণ্ণ, উৎ-কণ্ঠিত ভাবটা চোখ এড়িয়ে গেল ওর, কিন্তু ওর সামান্য পোষাক, একটুখানি ফাঁক হয়ে যাওয়া মুখ শিবলালের মনে এমনি একটা সান্ত্বনার ভাব এনে দিলে যে ওর মনে হল, আজকে এখানে আশা ওর সার্থক হয়েছে।

'আপনি!' লীলা ফুঁপিয়ে উঠল। তারপরই নিজেকে সামলে বললে, 'আসুন…'।

লীলার এই স্বর মুগ্ধ করল শিবলালকে। ও বললে, 'কিন্তু তোমাদের বাড়ির সামনে এত গোলমাল…কি ব্যাপার?' লীলার উৎকণ্ঠা আর বাইরের মজদুরদের উত্তেজনার সঙ্গে শিবলালের এই কণ্ঠস্বরের কোনো মিল নেই, বরঞ্চ তা আশ্চর্য শান্ত এবং পূর্ণ বিশ্বাসে ভরপুর।

লীলা তাড়াতাড়ি করে বললে, 'লেবার অফিসারকে ধরে নিয়ে গেল ওরা…ঐ যে…' লীলা বোধ হয় ডান হাতখানা একটুখানি উঠিয়েছিল দেখাবার জন্যে কিন্তু তার আগেই চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল ওর আর দুটি ধারা নেমে এল। শিবলালকে এটা চমৎকৃত করল। এই চোখের জল মুখখানাকে অপূর্ব সুন্দর করে তুললে শুধু তাই নয়, তার করুণাপূর্ণ হৃদয় ওকে স্পর্শ করল।

'কেন, কি হয়েছিল বলতে পারো? উনি এখানে এলেন কি করে?'

শিবলাল লীলাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল আর সেই সঙ্গে সতৃষ্ণ অথচ পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, 'এই করুণাই তো সব, এতদিন পুষ্পকে দেখে আমি তা বুঝেও বুঝতে পারি নি।'

'উনি এখানে এসেছিলেন, তারপর এই হয়েছে···' লীলা নিজেকে সামলে শিবলালের মুখের দিকে তাকালে এবং নিজের বুকের মধ্যে একটা ভরসা পেলে যেন।

উজ্জ্বল আকাশে মেঘের ছায়া পড়লে যেমন হয়, চকিতে শিবলালের মুখখানা তেমনি হয়ে উঠল।

'লেবার অফিসার এখানে এসেছিলেন, কেন?' শিবলাল জিজ্ঞেস করতে করতে চকিতে পেছন ফিরে ভিড়ের মধ্যে তাকাল আর চঞ্চল হয়ে উঠল।

সহসা গোলমালটা চরম হয়ে উঠল, এবং ভিড়ের কোনো অংশে চাপা গর্জনের মতো শোনাতে লাগল। শিবলাল ফিরে আবার জিজ্ঞেস করলে, 'লেবার অফিসার তোমাদের এখানে এসেছিলেন? সত্যি বলছ!' একই সঙ্গে আর্তনাদ আর অনুনয় ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে।

লীলা উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল, মুহূর্তে মুখখানা কালো হয়ে উঠল ওর। কিন্তু এটাই শিবলালকে ক্ষিপ্ত করে তুললে, যে বিষের ছুরিটা বুকের মধ্যে সহসা বসেছিল সেটা আরও জোরে চেপে ধরল ও। 'লেবার অফিসার তোমার কাছে এসেছিলেন, এঁ্যা···' কেমন নিস্তেজ শোনাল ওর এবারকার প্রশ্ন।

তাহলে—এই হচ্ছে সত্য? আর এই সত্য এত নির্লজ্জ। তারই চোখের সামনে তাহলে সেটাই ঘটছে, যা সে বারবার দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে···আর লীলার চোখের জল তারই জন্য।

'উনি এখানে এসেছিলেন, তারপর ওনাকে নিয়ে গেল'···আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠস্বর লীলার, যেন শিবলালের বিশ্বাসের কাছে অনুনয় করছে। 'ওরা বোধ হয় একটা খুনাখুনি করবে···'

মুহূর্তের জন্যে বিভ্রম হল শিবলালের, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চাইলে লীলার ঐ করুণাপূর্ণ কথাগুলো। কিন্তু পরক্ষণেই শিউরে উঠল ও, 'ছি-ছি, মিথ্যা, মিথ্যা, প্রতারণা···' লীলার চোখের জল, তার অনুনয়, সব মিথ্যা বলে মনে হল ওর কাছে। লীলা খুনের কথা বলছে, কিন্তু ওরই সামনে দাঁড়িয়ে হাসি-মুখে ওরই বুকে ছুরি বসাচ্ছে না? এটাই সত্যি! এটাই অহরহ ঘটছে। এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন এই করেই হয়েছিল,

'তার শেষ-অভিযানের মধ্যেও তাই হয়েছে। সেদিন এক মজদুরের বুকে আর এক মজদুর ছুরি মেরেছে। সে নিজেই কত ছুরি মেরেছে, বাবার বুকে, মেনকার বুকে। এমনিই হয়। আজও তারই সামনে লীলারও ছুরি উঠেছে। 'হ্যাঁ, তাতে আর আশ্চর্য কি…' শিবলাল যেন সেই ছুরিটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখবার জন্যে লীলার মুখের দিকে তাকাল।

ঠিক সেই সময় আবার একটা আওয়াজের ঢেউ উঠল। আর ফিরে তাকাতে হল শিবলালকে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল শিবলাল, তারপর সিঁড়িতে নেমে এল। স্পষ্টত, ও ফিরে যেতে চায়।

'দেখুন, আপনার সঙ্গে পুষ্পদির আসার কথা ছিল, তিনি কি এসেছিলেন? আপনি…আপনি বসবেন না?'

চমকে উঠল শিবলাল, লীলা কি মায়াবিনী? এই স্বর, ওই মুখ, একে সে অবিশ্বাস করবে কি করে? আস্তে আস্তে বললে, 'সে এসেছিল, ওখানে আছে…' কিন্তু কোথায় আছে তা দেখিয়ে দিলে না, লীলার মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল। একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তার এক মুহূর্ত আগেকার নিরাসক্ত বিষণ্ণতাকে ভাসিয়ে দিলে যেন। ভাবলে, 'এই যদি সত্যি হয় তো তাই হোক। ফুলের ভেতর যদি পোকা থাকে তো থাক, ফুলটাই দেখব আমি।'

যেখানে গোলমালটা সব চেয়ে দানা পাকিয়েছিল, সেই দিকে কেমন করে তাকাতে লাগল শিবলাল। 'ওরা একটা খুনাখুনি করবে…,' লীলার কথাটা একটা নতুন অর্থ নিয়ে সহসা মনে পড়ল ওর আর ও বিড়বিড় করতে লাগল, 'না না, আর খুন নয়, এইবার সব বন্ধ হোক…'

লীলা সভয়ে দেখলে শিবলাল ভিড়ের মধ্যে গোলমালের দিকে এগিয়ে গেল। 'কোথা যান আপনি…', কথাগুলো তার আড়ষ্ট কণ্ঠে আটকে গেল যেন, শিবলালের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাল না।

শ্রী ব্যানার্জীর চারি পাশের লোকগুলি তখন শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। আর কয়েক আঙুলের মাত্র ফারাক। নখ, দাঁত সবই অত্যন্ত উদ্যত, সবই আসন্ন, কেবল সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটিই এখন বাকি যা এককে আর এক করে তোলে, গুণদাত পরিবর্তন ঘটিয়ে। যে লোকটি শ্রী ব্যানার্জীর সামনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এসেছিল, সে তারপর আর এগোয় নি। কিন্তু বোঝা গেল প্রথম তারই সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। কেমন একটা টানা শব্দ করে যাচ্ছিল ও, এবং কোনো রকম সাংঘাতিক কিছু ঘটার আগে যেমন মুহূর্তের জন্য একটা

নিঃস্পন্দভাব আসে, তেমনি ওর ছড়িয়ে দেওয়া হাত দুটো অবশের মতো ঝুলে পড়েছিল। চিবুকটা টানা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও কি রকম ঝিম-ধরা। লোকটা আর শ্রী ব্যানার্জীর মুখের দিকেও তাকাচ্ছিল না। তাঁর ফর্সা, নিটোল হাতখানার (প্যাণ্টের পকেট থেকে ইতিমধ্যে একখানা হাত বের করেছিলেন তিনি) দিকে মরিয়া হয়ে তাকিয়েছিল ও। মনে হবে ঐ হাতখানারই আত্যন্তিক চেতনা লোকটাকে আত্মবিস্মৃত, অপরাধী এবং আতঙ্কের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল। তার ডান হাতটা নড়ে উঠল, কী একটা বলতে চাইলে ও, সম্ভবত 'ইনকিলাব…', কিন্তু সেটা গোঁ-গোঁ শব্দের মতো শোনাল, তারপর খপ করে শ্রী ব্যানার্জীর হাতটা ধরে ফেললে। বিদ্যুৎবেগে আরও কয়েকটি হাত লাফিয়ে পড়তে গিয়েই থেমে গেল, পেছন থেকে কে 'নেহী', নেহী…' বলে চিৎকার করে উঠেছে।

শিবলালের শার্টের বোতাম খুলে একদিকে ঝুলে পড়েছে, এতখানি ভিড় ঠেলে আসতে সেও হাঁপিয়ে উঠেছিল। এই শ্রমিকগুলির মতো তারও বিপর্যস্ত অবস্থা। কিন্তু তার ঘর্মাক্ত মুখে আশ্চর্য একটা নরম ভাব। তার কালো-কালো, পূর্ণায়ত, শিশুর মতো ঈষৎ চঞ্চল চোখগুলিতে একটা করুণা আর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছিল। 'এ চলেগা নেহী, ভেইয়া…' শিবলাল তাড়াতাড়ি এসে সেই লোকটির হাত থেকে শ্রী ব্যানার্জীর হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে। এমন করে তাঁর মুখের দিকে তাকাল, যেন বলছে, 'আপনি কিছু মনে করবেন না।'

তারপর মজদুরদের দিকে ফিরে বললে, 'ভাইয়োঁ, হাম শিবলাল দাস, আপলোগোঁকে এ্যাকশন কমিটিকা সেক্রেটারী, হাম বোলতে হ্যায়, এ্যায়সা মৎ করিয়ে। আপনারা…' শিবলাল স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে ওর চারপাশে মজদুর-গুলির মুখের ওপর তাকিয়ে নিলে। 'আপনারা 'ইনকিলাব' আওয়াজ দিচ্ছেন কিন্তু এটা ইনকিলাব নয়। ভাই সব, মজদুররা এর থেকে অনেক বড়, আপনারা সেটা এখনই বুঝতে শিখুন…' বলতে বলতে হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ। বলেন, 'বলুন, অনেক মজদুর এ পর্যন্ত প্রাণ দিয়েছেন, আর কাউকে যেন প্রাণ দিতে না হয়…'

স্বপ্নের থেকে মজদুররা জেগে উঠল যেন। কিন্তু শিবলালকে কি বলতে গিয়ে, সমর্থন করতে গিয়ে কিছুই বলতে পারল না। হ্যাঁ, এই তো তাদের নেতা এসে গিয়েছেন। কতবার কত রকম করে এঁর কথা শুনেছে তারা। মনে

পড়ল, এই সেদিনও তারা অভিযান করে গিয়েছে এস-ডি-ও'র বাংলোর সামনে, কিন্তু সে এর জন্যে নয়। কেউ কেউ মুখ লুকোল, এগিয়ে এল কেউ, কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে। সেই মুহূর্তেই তারা বুঝতে পারল তারা কী করতে যাচ্ছিল, আর শিউরে উঠল।

শিবলাল শ্রী ব্যানার্জীকে নিয়ে গাড়িটার কাছে গেল। যারা তখনও দাঁড়িয়েছিল পা-দানির ওপরে, তারা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল, গ্লানিতে মুখগুলো কালো করে। শিবলাল দরজা খুলে ওঁকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে। তারপর আবার মজদুরদের সম্বোধন করে বললে, 'আপনারা অনুমতি করুন, আমি এঁকে চলে যেতে বলি।'

একই সঙ্গে ঘাড় নেড়ে চিৎকার করে উঠল সবাই। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ…', 'আপ বলিয়ে জী…।' কী রকম বিচিত্র, উল্লসিত কণ্ঠস্বর শুনল শিবলাল। যা হতে যাচ্ছিল তা যে হয় নি, ওরা যে তার থেকে রেহাই পেয়ে গেছে, এটাই ওদেরকে খুশি করে তুললে। গাড়ির সামনে পথ করে দিলে ওরা।

গাড়িটা স্টার্ট নিলে, সেই সঙ্গে আরও একটা গর্জন উঠল, 'খবর্দার, শিববাবু সাবধান…।'

পেছন ফিরেই শিবলাল দেখলে, কয়েক হাত দূরে একটা লাঠি উদ্যত হয়ে ছুটে আসছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে হ'ল, 'মৃত্যু! এখনই আমাকে মরতে হবে…?' একটি মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু যেমন একটি শিশিরবিন্দুর ওপর সকাল বেলাকার সমস্ত বর্ণচ্ছটা সংহত হতে পারে, তেমনি বহু চিন্তা আর অনুভূতিতে এই মুহূর্তটি নিটোল হয়ে উঠল। যে মজদুরদের মধ্যে এতক্ষণ কাটাচ্ছিল শিবলাল, যাদেরকে সে গ্লানির থেকে মুক্তি দিয়েছিল আর আনন্দিত হয়ে উঠেছিল, তাদেরকে আর দেখতে পেল না ও। একখানা উদ্যত লাঠি আর তার পেছনে কালো, শূন্য আকাশটাকেই দেখতে পেলে। ওর বুক কাঁপল না, একটু আগেকার সেই হাসি ভাবটা তখনও লেগেছিল ওর মুখে। আশ্চর্য হয়ে ও ভাবলে, 'এই তাহলে মৃত্যু এত চেনা! এত সহজ, স্বাভাবিক, অথচ এত লুকানো ছিল!'

পরক্ষণে কিসের যাতনা সব ওলট-পালট করে দিলে। একটা নিশ্ছিদ্র, কালো অন্ধকার নেমে এল।

অধ্যায় ৬

ঋতুচক্র একবার ঘুরে এসে সম্পূর্ণ হল। প্রায় এক বৎসর আগে জুনাপুরে অপি সাউ এসেছিল চাকরীর জন্যে, এখন চাকরীর থেকে উৎখাত হয়ে জুনাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের গোটা দুই-তিন কাঁথা, বড় একটা লেপ, ছোট-বড় বালিশ, মশারি—একসঙ্গে পাকিয়ে একটা বড় বেডিং বেঁধেছিল অপি। ওপরের সতরঞ্জিটা পুরণো, গেল বছর এটাতেই বেঁধে এনেছিল ওরা। এর মধ্যে ওটা আরো খানিকটা রঙচটা হয়েছে, দু'একটা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। বেডিংটা বগলদাবা করে এনে বাইরের বারান্দায় ফেলল অপি, কতকগুলো ধুলো উড়ে পড়ল। পরিশ্রমে একটু হাঁপিয়ে গিয়েছিল ও, বিছানাটার ওপর ধপ করে বসে পড়ল। দুই হাঁটুর ওপর কনুই, তারপর দুই হাতের তেলোতে মাথাটা নেতিয়ে দিলে। ছেঁড়া গেঞ্জি-পাজামাতে ওর লিকলিকে চেহারাটা কেমন শুকনো, নিস্তেজ মনে হল। মনে হল, এই সব ঝামেলা ওকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেছে। গোবিন্দ সেই সময় বাইরে বেরিয়ে এল, দুটো বুঁচকি নিয়ে, বাবার দিকে একবার তাকিয়েই সেগুলো রাস্তায় সামনের ঠেলা গাড়িটাতে নিয়ে গিয়ে রাখলে। ওরা জিনিসপত্র নেবার জন্যে গাড়িটা ভাড়া করেছে। গোবিন্দ আবার ভেতরে চলে গেল।

অপি হাতের তেলো থেকে মাথা তুলে ঠেলা গাড়িটার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু লক্ষ্য করল বলে মনে হল না। একটু আগে ঝুঁকে-পড়া অবস্থায় ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ক্রমাগত বিরুদ্ধ ঘটনার চাপে ভেঙে পড়েছে ও কিন্তু এখন ওর মুখভাবে তার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। ওর মুখখানা থমথমে, ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টি, ওর ঠেলে-ওঠা চোখের ওপর পাতা দুটো একটুখানি টেনে নামানো (এমনি চোখের ভাব মেনকার বিয়ের পর দেখা গিয়েছিল ওর)—মনে হল কে যেন ওর মুখের ওপর একটা আবরণ টেনে দিয়েছে। অপি ট্যাঁক থেকে বিড়ি-দেশলাই বের করলে, গোটা দুই কাঠি নষ্ট করে বিড়িটা ধরালে, তারপর তেমনি অন্যমনস্কভাবে টানতে লাগল।

বেলা বারোটা পেরিয়ে গেছে। শ্রাবণের দুপুরের রোদটা উষ্ণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, শান্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। যতদূর চোখ যায়—বাঁ-দিকে রাস্তা বরাবর খানিকটা, ডান দিকে রাস্তা আর কোণাচি ধরে একটা মজা

জলা—বেশ উদাসীন, অথচ তৃপ্ত, উজ্জ্বল ভাব। যেন ভেতরে ভেতরে কিসের জন্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। অপির জীবনের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। অপি যখন গোমো ছাড়ল, তার আগে পর্যন্ত জানত না জুনাপুরে আসবে। দু'দিনের মধ্যেই গোমোর সঙ্গে কত বছরের সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল ওরা। এই এক বছরের মধ্যে জুনাপুরে অনেক কিছুই ঘটেছে ওদের জীবনে, ওরাও ঘটিয়েছে। আশা করেছে, ভেঙেছে সেই আশা, আবার অপ্রত্যাশিত-ভাবে কোন আশা পূর্ণ হয়ে গেছে। আঘাত পেয়েছে, দিয়েছেও আঘাত। এসবের জের এখনো মেটে নি, হঠাৎ চলে যাচ্ছে ওরা। বেলুড় এ্যালুমিনিয়ম ফ্যাক্টরীতে ওর এক ভায়রা কাজ করে, তারই ওখানে চলে যাচ্ছে ও হয়তো···না, নিশ্চয়ই কিছু একটা জুটে যাবে এখানকার মতো। তারপর হয়তো আবার জাল-বোনা আরম্ভ হবে। অপি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারত, 'কেনই বা আমি জুনাপুরে এলাম, আর কেনই বা চলে যেতে হচ্ছে?' কিন্তু ও কেবল বিড়িটা শেষ করে ফেলে দিয়ে তেমনি করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল, আর ট্যাঁক হাতড়াতে লাগল আর একটা বিড়ির জন্যে।

ঘরের ভেতর শেষ দফায় বাঁধাছাঁদার কাজ করছিল গোবিন্দ আর কাদু। ট্রাংকটা নিয়েই পড়েছিল ওরা, কাপড় চোপড়ে ভর্তি হয়ে এসেছে ওটা, কিন্তু এখনো ওটাতে অনেক কিছুই ঢোকাবার বাকি আছে। কাদুর মুখে একটা অসহায় বিরক্তি ফুটে উঠেছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ওর মুখে একটা নিস্পৃহভাবও উঁকি মারছে, 'এই সবই কি যাবে?···আর যদি নাই গেল ত ক্ষতি কি!' কেবল গোবিন্দর উৎসাহের অভাব নেই। 'মা, এই পটগুলা তুমার বাক্সে দিয়ে দাও···', বলে ও কালীঘাটের পট এবং আরও দু' একটা ছবি এগিয়ে দিলে, আর সেগুলো সাজিয়ে রাখতে সাহায্যও করলে। তখন কাদু বললে, 'ওই গঙ্গাজলের ভাঁড়টো দে···'। কালো-দাগ-পড়া কাঁসার ছোট ভাঁড় একটা কোণায় কাপড়ের জঙ্গলের ভেতর ঢুকিয়ে দিলে কাদু। ট্রাংকের ডালাটা ফেলতে যাবে এমন সময় গোবিন্দ বলে উঠল, 'মা, এই মশারিটা ওর মধ্যে দিয়ে দাও···হ্যাঁ, ঠিক চলে যাবে···' গোবিন্দ ঘাড় নাড়ল। মশারিটা ভাঁজ করে ওর মধ্যে দিতে ডালাটা উঁচু হয়ে রইল, পড়ল না। কাদু মশারিটা বের করে নিতে চাইলে, কিন্তু গোবিন্দ ভীষণ আপত্তি করতে লাগল। দুই কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ও একবার পরীক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে, কিছু করা যায় কি না। তারপর মশারির কোণগুলো টেনে

ট্রুনে দিয়ে আবার ও ডালাটা ফেললে। বললে, 'মা, আমি চেপে ধরছি, তুমি বন্ধ কর।' ট্রাংকটার পেছন দিকে গিয়ে দু'হাতে দুটো কোণা চেপে ধরল ও, কিন্তু তাতেও ঠিক মতো পড়ল না। তখন দু'হাতের চাপটা সমান রেখে (এতে মুখখানা লাল হয়ে উঠল ওর, শক্ত হয়ে ওঠা হাত দুটো কাঁপতে লাগল) ট্রাংকটার ওপর উঠে বসল গোবিন্দ। কুটুস করে একটা শব্দ হল, কাদু ডালাটা লাগিয়ে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করলে।

'শালাঃ বন্ধ হবেক নাই···' গোবিন্দ শ্রান্ত অথচ বিজয়ীর ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

এরও ঘণ্টা খানেক পরে অপি যখন জামাটা গায়ে চড়িয়ে নেবার জন্য ঘরের ভেতর ঢুকল, তখন দেখলে কাদু সাজগোজ সেরে পান সাজছে। 'তুমি পান লিবে গা···' কাদু পেছন দিকে না তাকিয়ে মাথার কাপড় তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে। অপি ঝুঁকে পড়ে খবরের কাগজের ওপর পাতা সারি থেকে একটা পান তুলে নিলে। কাদু গোটা দুই পান গালে পুরে কৌটো থেকে দুই আঙুলে একটা বিরাট দোক্তার টিপ মুখের মধ্যে ফেললে, তারপর সেই অবস্থায় বললে, 'আজ গবা যে পান এনেছে, ছি-ছি। খিলি মুড়তে কুলায় নাই···' বলে ও বাকি পানগুলো ডিবেতে পুরতে লাগল ভাঁজ করে করে।

অপি একবার ভাবলে বলবে, 'কি রে, আমার ছাঁটাইয়ের খবরটা একশন কমিটির আপিসে দিব নাকি···', কিন্তু পরক্ষণে ঠোঁট উল্টে নিজেই সরে গেল, ভাবলে, 'যাক গে, কী হবে···!'

কাদু ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল, শূন্য ঘরটার দিকে তাকালে। কিন্তু ঘরটার খাঁ-খাঁ ভাবের কোনো চিহ্নই ওর মুখে ছিল না। আস্তে আস্তে পানের রসে ঠোঁট দুটো লাল হয়ে উঠছিল ওর। চিক্কণ গালের ওপর একটা বেশ তৃপ্তির আভাস ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরের উঠানে একবার ঢুকল ও, দেখলে যে কোথাও কিছু ছেড়েছে কি না। তারপরে রান্নাঘরে ঢুকে আঁচের উনুনটা লাথি মেরে ভেঙে দিলে। বাসা ছাড়বার সময় আস্ত উনুন রেখে যেতে নেই।

গোবিন্দ তখন রাস্তায় ঠেলাওয়ালাকে সরব ঠেলা মারছিল, 'জলদি করো না, ভেইয়া। হামকো সাড়ে চার বাজে আরানসোলমেঁ ট্রেন ধরনা পড়েগা নেহী'? ওর হাল্কা তীব্র কণ্ঠস্বর সমস্ত ব্যাপারটাতে সকৌতুক ব্যস্ততা এনে দিয়েছিল। এখান থেকে ওরা বাস স্ট্যাণ্ডে যাবে। তারপর বাসে করে

আসানসোলে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবে ওরা। গোবিন্দ নিজেই ঠেলার একটা দিকে হাত দিয়ে সজোরে বেঁকে পড়ল।

কাছু বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে একবার তাকাল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে, অপি ছোট ছেলেটাকে নিয়ে এগিয়ে গেছে। 'মা, আর কিছু নাই, তুমি এগিয়ে পড়...' গোবিন্দ হেঁকে বললে। কাছু ওর বলার ভঙ্গীতে মুচকে হাসতে গিয়েই থেমে গেল। মেনকার কথা মনে পড়ল ওর—এই সময় একবার দেখা হলে ভালই হত। তখনই ওর মনে হল, জুনাপুর ছেড়ে ওরা চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে, মেয়েটার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল কাছু। মেনকাকে কেন্দ্র করে তাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যে ঝড় বয়ে গেছে, তার কিছুই মনে পড়ল না ওর। কেবল শিবলালকে মনে পড়ল। ছেলেটাকে বলে গেলে হত, মাঝে-মাঝে মেনকার খোঁজ নেবার জন্য, ছোট বোনটির মতো।

পানের পিক ফেলল কাছু। 'দুর্গা, দুর্গা...' বিড় বিড় করতে করতে দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করলে। তারপর রাস্তায় নেমে এল।

অধ্যায় ৭

সমীর মোহন সেনের পদত্যাগ-পত্র সোস্যালিস্ট পার্টির স্থানীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। সমীর এখন দেবীপুরে তার নতুন কাজ আরম্ভ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেখানকার পটারী এণ্ড সেরামিক ওআর্ক্‌সের শ্রমিকদের বস্তিতে একটা খোলার চালওয়ালা খুপরীতে মীনাক্ষীকে নিয়ে থাকবার সিদ্ধান্ত করেছে ও। ঘরও ঠিক হয়ে গেছে। বস্তিতে থেকেই শ্রমদানের কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করে অন্যকে সে চমকে দিয়েছে, কিন্তু নিজে একটা গভীর তৃপ্তি পেয়েছে। যেহেতু সে জুনাপুর কারখানার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে না, সুতরাং এখানকার বস্তিতেই সে বাসা নিতে পারত, কিন্তু এখানকার মালিক পক্ষের থেকে কাজ আরম্ভ করবার অনুকূল কোনো সহানুভূতি সে প্রত্যাশা করে না, যা তার কর্মনীতির পক্ষে খুবই সহায়ক হত। কিন্তু ও বলেছে, 'অন্ধকারে মশাল এক জায়গায় জ্বালালেই হল, অন্যত্র আলো পৌঁছোতে দেরী লাগবে না।' দেবীপুরে এখনই সে উঠে যেতে পারে,

কিন্তু তার একমাত্র অসুবিধে, তার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, সেইটে মিটে গেলেই হসপিটাল রোডের এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে সে উঠে যাবে।

সন্ধের একটু আগে সমীর ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। ওদের শোবার ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, বাইরের ঘরে এসে পড়ল ও। বাইরে মেঘ করেছে বলে আবহাওয়াটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে কিন্তু তখনও আলো জ্বালায় নি ও। পোষাক আর চেহারাতেও অনেকখানি বদল হয়েছে সমীরের। খালি পা, মোটা খদ্দরের ধুতি, কাজের সুবিধের জন্য হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ওঠানো। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা, তেল দেওয়া হয় নি। সমস্ত শরীর আর মুখে একটা আপাত-রুক্ষ ভাব, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই তার মধ্যে একটা তপস্যার প্রসন্নতা দেখা যায়। ঝাঁট দিতে দিতে শিবলালের কথাই ভাবছিল সমীর। মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে সে এখন জুনাপুর হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। শিবলালের আন্তরিকতায় কোনদিন সংশয় প্রকাশ করে নি সমীর। এখনও ওর মনটাকে প্রশংসায় ভরে তুলল।

কোণায় বইয়ের নতুন র‍্যাকটা সরিয়ে তার তলায় ঝাঁটা চালাল সমীর। র‍্যাকের ওপর একখানাও বই নেই, বাঁধা হয়ে দেবীপুরে চালান যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। র‍্যাকটা ছেড়ে ও ভাবলে, 'শিববাবুর পথ আলাদা, কিন্তু তাঁকে স্বীকার না করে তো আমি পারি না।'

'একি, আবার তুমি ঝাঁটা হাতে করেছ! বসন্ত তো করত এক্ষুণি…' মীনাক্ষী শোবার ঘর পেরিয়ে এসে মাঝখানের দরজার মুখে দাঁড়াল, কিন্তু কথাটা শেষ করল না। খেয়ালী আদর্শবাদী স্বামীর এই নতুন পরিবর্তন তাকে ব্যথিত করেছে, কিন্তু এটা সে মেনে না নিয়েও পারে নি। চৌকাঠটা ডান হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইল ওর দিকে তাকিয়ে। একটা শাদা পাতলা চাদর গায়ের ওপর দিয়েছে ও, তার ভারী দেহটাকে ঘিরে সেটা হাঁটুর কাছ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তাতেই একটু একটু হাঁপিয়ে উঠছে ও। এখন ওর নিটোল গলাটা রোগা, লম্বাটে হয়ে উঠেছে। ওর লাবণ্যময় মুখশ্রী এখন নিষ্প্রভ, ক্লান্ত দেখায়।

মীনাক্ষীর কথার উত্তরে সমীর মুখ তুলে একটু হাসল, যেন বলতে চাইলে, 'আমি কেন এ কাজ করছি সেটা তো তোমার না জানার কথা নয়, তবু এ প্রশ্ন কেন?' তারপর তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে করতে বললে, 'মীনু, দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

ভেতরে বাথরুমের দিকে হাত মুখ ধুয়ে আসার জন্য যেতে যেতে সমীর বললে, 'দেবীপুরে আমার সঙ্গে মনোতোষ বাবুর মেয়ে যোগ দেবেন সে তো তুমি জানতে। আরো একজন যোগ দিচ্ছেন তুমি শুনলে হয়তো অবাক হবে, কিন্তু আমার কাছে এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় ···। মিস সুমিত্রা ব্যানার্জীও আমাদের কাজে যোগ দেবেন জানিয়েছেন। আমি আসছি এখনই···' বলে মীনাক্ষীকে পেরিয়ে গেল ও।

মীনাক্ষী ধীর, ক্লান্ত পায়ে শোবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, তারপর ব্র্যাকেট থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে ওদের তক্তপোষের ওপর গিয়ে বসল। সুমিত্রার খবরটা সত্যিই ওকে অবাক করে দিলে। সেই যেদিন সুমিত্রা এসে এখানে অনেকক্ষণ ছিলেন আর গান গেয়েছিলেন, সেদিনের কথা মনে পড়ল ওর। কিন্তু কিছুতেই দেবীপুরের নতুন কাজের মধ্যে ওঁকে কল্পনা করতে পারল না।

সমীর ঘরে ঢুকতেই তোয়ালেটা তার হাতে দিয়ে তক্তপোষ থেকে আবার নেমে গেল মীনাক্ষী। বাইরে ঝড়ো বাতাসের মতো উঠেছে। জানালাগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিতে লাগল ও। বাতাসের বেগে ওর গায়ের চাদরটা উড়ে যেতে লাগল। সমীর বলতে গেল, 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো তোমার মুখের আঁচলখানি······', কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে বললে, 'মীনু, তুমি বস, আমি বন্ধ করছি।' হাত-পা মোছা শেষ না করেই সমীর উঠে গেল এবং জানালাগুলো বন্ধ করতে করতে ভাবলে, এটাই ঠিক হয়েছে। ক্লিষ্টা মীনাক্ষীকে কবিতায় শান্তি দিতে পারত না।

'দেখো, মীনু, দুনিয়াতে কত তাড়াতাড়ি সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে জিস্কোর দেশী-বিদেশী মালিকানার মধ্যে ফাটল ধরেছিল, এখন তা আবা ঠিক হয়ে গেছে...' ওর কণ্ঠস্বরে একটা বিস্ময় এবং তিক্ততা ফুটে উঠল এব যা ওর এক মুহূর্ত আগেকার প্রসন্ন মনোভাবের একেবারে বিরোধী বলে ম হল। 'অবশ্য সম্পর্ক বদলে গেছে। আগে যারা ছিল ওপরে তারা এসে নিচে, যারা নিচে ছিল তারা ওপরে উঠে গেছে। তুমি বোধ হয় জান স্যার মুখার্জীর শেয়ার শতকরা আটচল্লিশ ভাগে এসে পৌঁছেছিল কয়েক ম আগে···মিঃ সেনগুপ্তর কল্যাণে। তখন আমি খবরটা শুনে খুবই উল্লসি হয়ে উঠেছিলাম! কিন্তু এখনকার খবর শোন, জুনাপুরে এস-ডি-ও'র বাংলে সামনে শ্রমিকদের গ্রেট মাসাকারের পর স্যার টমাস নিজে আরও

পার্সেন্ট্ শেয়ার স্যার মুখার্জীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। কয়েকদিন আগে কলকাতায় সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। স্যার টমাস 'স্বেচ্ছায়' দান করছেন…' একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠল সমীরের মুখে, 'স্বেচ্ছায়' কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল ও।

মীনাক্ষী জানালা থেকে সরে এসে তক্তপোষে বসল, এবং আশা করতে লাগল যে সমীরও এসে তার কাছে বসবে। সমীরও তাই করল, তোয়ালেটা রেখে মীনাক্ষীর পাশে এসে বসল ও। মীনাক্ষী একটু আগে সুমিত্রার সম্পর্কে কী চিন্তা করছিল ভুলে গেল, সমীরের কথাগুলোও লক্ষ্য করতে পারল না। কেবল সমীরের কণ্ঠস্বরের তিক্ত, ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীটাই ও বুঝতে পারলে এবং সেটাও পেরিয়ে স্বামীর ওপর একটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ওর মনকে ভরে তুলল। আবছা অন্ধকারে সমীর লক্ষ্য করতে পারল না কিন্তু মীনাক্ষী তার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসল আর একটু পরে বিছানায় শুয়ে পড়ে সমীরের হাতখানা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

সমীর বললে, 'শীগ্রিই জুনাপুর হোটেলে ওরা একটা পার্টি দেবে…তাতে কোম্পানীর নতুন নীতির ঘোষণা করবে বোধ হয়। এবার আর 'ভাস্বতী ভবন'-এর অনুষ্ঠান নয়, সে রকম ধাপ্পাবাজির আর দরকার নেই।' একটু থেমে সমীর আবার খুব তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করল, যেন একটা নোংরা জায়গা খুব দ্রুত ও পেরিয়ে যেতে চায়, 'এই শাদা আর কালা মালিকের মিতালির আসল কারণটা কী জানো! সাদা মালিক চায় ভারতবর্ষের বাজার ঠিক রাখতে, আর কালা মালিক স্বপ্ন দেখছে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার…মিঃ সেনগুপ্তের বিদেশ-ভ্রমণ তাৎপর্যহীন নয়।'

সমীর ঈষৎ অস্থির হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে যেতেই মীনাক্ষী 'না-না' করে উঠল। বললে, 'দোহাই, শাদা আলো জ্বালিও না, আমার ঘরে কালো আলোই ভালো।' বলে ও বেড্-সুইচ টিপে কমজোরী সবুজ আলো জ্বালালে। বাইরে বাতাসটা বেড়ে উঠেছিল, এখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। জানালার খড়খড়ি বেয়ে জলের রেখা দেখা দিল।

মীনাক্ষীর পরিহাসে হাসতে গিয়ে থেমে গেল সমীর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে মৃদুমৃদু হাসছে, ওর কোনো কথাই শোনে নি সে। বুঝলে, ওর নিজের উদ্বেগ আর উষ্মার একটুও ছোঁয়া লাগে নি তাকে কিন্তু

তবুও মীনাক্ষীকে ও ভুল বুঝল না। তার হাসির মধ্যে সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর ভালোবাসা সে দেখতে পেলে যা তাকে বারবার আকর্ষণ করেছে। জেলের ভেতর মীনাক্ষীর সেই দেখা করতে যাওয়া, সেই অবিরল চোখের জলের কথা মনে পড়ল। ভাবলে, তার সেই অশ্রু আর আজকের এই হাসিটাই ঠিক, এটাই ওর নিজের সত্যকারের পথের নিশানা, একটু আগেকার ক্ষোভ নয়। দেশী-বিদেশী মালিকানায় নূতন সম্পর্ক সম্বন্ধে ওর সমালোচনা থাকতে পারে কিন্তু ওর আদর্শ তো ভালোবাসার অশ্রু, সেবার আদর্শ। দেবীপুরে ওকে সেটাই সত্য করে তুলতে হ'বে। সমীর মীনাক্ষীর রোগা হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের মুখের ওপর বুলোতে লাগল।

'কি…' মীনাক্ষী জিজ্ঞাসু অথচ পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালে।

'মীনু, আমার জন্য তুমি এত কষ্ট সহ্য করছ কেন? অথচ তোমার প্রসন্নতারও তো অভাব নেই?' সমীর মীনাক্ষীর মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিতে নিতে বললে।

'কই…না তো…' মীনাক্ষী দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাতে কেবল ওর দুর্বলতাটাই প্রকাশ হ'ল।

'মীনু, জেলে দেখা করতে গিয়ে তোমার সেই কান্না আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সেটাই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে!' সমীর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কতকটা নিজের মনে বলতে লাগল, 'এই যে তুমি আমার জন্য গর্ভধারণ করার কষ্ট সহ্য করছ, সে কেন? আগেও আমার কষ্ট হত গর্ভিণী স্ত্রীলোককে দেখলে, তখন পুরুষের কামনাটাকেই আমার কুৎসিৎ মনে হ'ত। কিন্তু এখ তোমাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে, জানো? স্ত্রীলোক যে গর্ভধারণ করে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে, সে শুধু ভালোবাসার জন্যে। তাই না, মীনু?'

সমীর সাগ্রহে মীনাক্ষীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল, এবং মুহূর্ত পরে আে নত হয়ে চুম্বন করলে। আবেগমন্থর কণ্ঠে বললে, 'মীনু, এই যে তোম দেহটা আমি বুকে নিয়েছি, কামনা করেছি কতবার, এর পেছনে য ভালোবাসা না থাকত? তাহলে নরনারীর সম্পর্ক কী কুৎসিৎ হয়ে দাঁড়াত বলো না, কিছু বলছ না কেন তুমি…!'

ঘরের ভেতরকার আবছা সবুজ আলো, বাইরে বৃষ্টির শব্দ সমীরের বুে ভেতর একটা অপূর্ব আবেগের সঞ্চার করলে। মীনাক্ষীর বুকের নিচে ত

গর্ভের ওপর ওর উৎসুক ডানহাতখানা স্থির হল আর তার গালের উপর, মীনাক্ষীর হাসির জন্য যেখানে টোল পড়েছে, সেখানে বার বার চুম্বন করতে লাগল ও।

'দেবীপুরে আমরা যখন যাব, তখন কি করব জানো…' কিন্তু এর উত্তর না দিয়ে মত বদলে সমীর বললে, 'জানো, প্রেমই সব কিছু জয় করে। প্রেমই সব কিছু পূর্ণ করে দেয়।'

অধ্যায় ৮

১৩ই আগস্ট জুনাপুর আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর পক্ষ থেকে জুনাপুরে 'মিলনোৎসব'-এর অনুষ্ঠান করা হল। সমীর মীনাক্ষীকে যা বলেছিল, জুনাপুর হোটেলে না হয়ে হল জিস্কোর ডিরেক্টর্স্‌ বাংলোতে। কয়েকদিন আগে থেকেই এই উৎসবের কথা জুনাপুরে এবং সংবাদ-পত্রে বিস্তৃত করে প্রচার করা হচ্ছিল। কোম্পানী নানা কারণে এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন। শ্রমিকদের সম্পর্কে কোম্পানীর নূতন নীতি এই উপলক্ষ্যে ঘোষণা করা হল। তাছাড়া এই উৎসবকে 'যথার্থ' মিলনোৎসব করে তোলার জন্য তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন। দেশী এবং বিদেশী মালিক পক্ষ ছাড়াও জিস্কোর প্রধান অফিসারগণ, শ্রমিক প্রতিনিধিরা, জিস্কোর প্রধান খরিদ্দারগণ এতে আমন্ত্রিত হলেন। কোম্পানীর দিক থেকে এর একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যও স্বীকার করে নেওয়া হল। ১৯১৭ সালে যেদিন প্রথম জিস্কোর পরিকল্পনা করা হয়, সেই তারিখটিও ছিল ১৩ই আগস্ট। তাছাড়া, এটা ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসের এত কাছাকাছি যে সেটাও সাধারণত চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

শ্রমিকদের সম্পর্কে কোম্পানীর নীতি বিশদ করে ঘোষণা হ'ল। ১১ই আগস্টের কলকাতার সংবাদপত্র এবং পরদিন জুনাপুরে ছাপানো ইস্তাহারে স্যার মুখার্জী এবং স্যার টমাসের স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রচারিত হ'ল। এই নীতি-বিবৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, শ্রমিক স্বার্থকে কোম্পানীর সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে অভিন্ন বলেই কোম্পানী মনে করেন। উৎপাদন-বৃদ্ধি ও শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে

ওঠা বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকদের একটি মাত্র ইউনিয়ন থাকাই ভাল, কিন্তু শ্রমিকরা ইচ্ছে করলে একাধিক ইউনিয়নে সংগঠিত হতে পারে (এতে কার্যত এ্যাকশন কমিটিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে)। দ্বিতীয়ত, বর্তমান এ্যাকশন কমিটির আহূত ধর্মঘটের অবসানের জন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোম্পানী পূর্বে যে নোটিশ দিয়েছিলেন, জেম্‌স্ সাহেবের দেওয়া ইউনিয়নের পাশ নিয়ে কারখানায় ঢুকতে হবে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ধর্মঘটকালীন মাহিনা দেওয়া হবে। ধর্মঘট করার জন্ত বা কোনো রকম শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করার জন্ত কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না। তৃতীয় দফায়, মিঃ টমসন পূর্বে এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আলোচনার সময় যে প্রস্তাব করেছিলেন, তাই আবার নূতন করে বলা হয়েছে : গত এক বছরের মধ্যে যে সমস্ত শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের বিষয় একটা ট্রাইবুন্যালের হাতে তুলে দেওয়া হ'বে এবং এটাও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, শ্রমিক হিসাবে অক্ষমতা ছাড়া অন্য কারণে যারা বরখাস্ত হয়েছে তাদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

১৩ই আগস্ট রাত্রিতে ডিরেক্টর্স্‌ বাংলো দীপান্বিতার মতো শোভা পেয়েছে। জুনাপুর সাউথ টাউনের উচ্চতম তথা দক্ষিণতম প্রান্তে উদ্যান-পরিবৃত এই অভিজাত বাংলোটি এমনিতেই চোখে না পড়ে পারে না, আজ আপন গৌরবে তা জুনাপুরের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ বাংলোটি তিন তলা, প্রথম দুই তলায় আবাস-কক্ষ, তিন তলায় কন্‌ফারেন্স হল পরিচালকরা প্রয়োজন মতো এখানে সম্মিলিত হ'ন। এটি জাহাজের ডেকের মতো, লম্বা, দুই ধার খোলা, দু'ধারে রেলিং, তফাতের মধ্যে ওপরে সমস্ত বাংলোর মতোই সবুজ রং করা এ্যাসবেস্টসের ছাউনি। দিনের বেলায় বাংলোর সবুজ আর উদ্যানের সবুজ মিলে একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। মখমলের ওপর কারুকার্যের মতো, সযত্ন লালিত সবুজ ঘাসের জমির ওপর ফুলগাছের সারি—জিনিয়া, ডালিয়া, ক্যালিফোর্নিয় পপি, ক্রিসেন্‌থিমাম, ব্ল্যাকপ্রিন্স, এ্যান্টিরাইনম্‌, কর্ণফ্লাওয়ার, কত এদের নাম সঙ্গে আছে ঝোলানো অর্কিডের টব; দেশী ফুলও রয়েছে এদের সঙ্গে দোপাটি, জুঁই, রজনীগন্ধা, বেল, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী। রাত্রিতে এদের বৈশিষ্ট্য দূর থেকে উৎসবমত্ত নরনারীর মতো অস্পষ্ট, সব মিলে একটা সম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এখন বাংলোর চারদিক ঘিরে আলোর ফুটা

খিলানের লাইন বরাবর আলোর মালা, কার্নিস বরাবর আলোর রেখা। অনুত্তেজক, স্নিগ্ধ নিবেদনের মতো তাকিয়ে রয়েছে। প্রবেশ পথে আলোর অক্ষরে বাংলায় লেখা রয়েছে, 'মিলনোৎসব'।

রাত্রি আটটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার কথা। তার ঘণ্টাঘানেক আগে থেকে অতিথিরা আসতে আরম্ভ করেছেন। নানা মডেলের গাড়ি জুনাপুরের বাইরে থেকে এবং জুনাপুরেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দি রীজ-এর দিকে ছুটে আসছে। দি রীজ বীথি হেডলাইটের আলোতে কেবলই চমকে চমকে উঠছে। ডিরেক্টর্স্‌ বাংলোর সামনে বীথির দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত গাড়ির সারি দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনও মিনিট কুড়ি বাকি আছে, তারপর যাঁরা আসতে লাগলেন তাঁদের বহু দূরে গাড়ি রেখে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পায়ে হেঁটে আসতে হল··· পেছন থেকে আসতে-থাকা গাড়ির আলো তাঁদের পিঠে ধাক্কা দিয়ে বিভ্রম জাগাতে লাগল। যেমন গাড়ির স্রোত, তেমনি অভ্যাগত নরনারীরা সকলেই একমুখান, কেউ বিপরীতমুখী নয়। গেটে ঢুকে এক লহমায় সমস্ত বাংলোটা ওঁদের চোখে পড়ে। এই প্রবেশ পথ, এই উদ্যান এঁদের অনেকেরই চেনা, কিন্তু বিচ্ছুরিত আলোতে সব কিছু নতুন মনে হয়। ভাবেন, ঠিক এমনটিই আশা করে এসেছিলেন এঁরা। সামনে ব্যালকনির নিচে, দোতলার বারান্দায় এবং তিনতলায় রেলিঙের ধারে আগেই যাঁরা এসেছেন তাঁরা ঘোরাফেরা করছেন, অনুচ্চ সানন্দ স্বরে কথাবার্তা বলছেন। এঁরা উৎসুক, পরীক্ষার দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে মুখ তুলে তাকান। বুকের মধ্যে শেষ মুহূর্তের একটা ঘন আবেগ অনুভব করেন যে এখনই ওঁদের মধ্যে এসে পড়বেন। ব্যালকনির নিচে,প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে শোনেন···বাংলোটার সর্বত্র দামী মাইক্রোফোনের মৃদু আওয়াজে কখনো পিয়ানোর, কখনো গাটারের গৎ পরিবেশিত হচ্ছে, দোতলার কনসার্ট হল থেকে। 'ভাস্বতী ভবনে'র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, ভারতীয় সংগীতই পরিবেশন করা হয়েছিল। এখন ইউরোপীয় সঙ্গীতের গৎ বাজছে এবং আজকের অনুষ্ঠানের শেষে বলনৃত্যের ব্যবস্থা আছে। সঙ্গীতের দোলা বুকের মধ্যে অনুভব করতে কর তিনতলায় নরনারীর ভিড়ের মধ্যে এসে ক্ষণিকের জন্য খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। অভ্যাগতেরা অনেকেই এঁদের জানাশোনার মধ্যে, এই রকম পার্টিও এঁদের অধিকাংশেরই অজানা নয়, কিন্তু তথাপি তিনতলার মেঝেতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। উচ্চতম পদ-মর্যাদার এতগুলি লোক

একসঙ্গে সহসা সমবেত হন না। স্ত্রী-পুরুষ যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ পোষাক এবং অলংকারে সজ্জিত। এঁরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাতে উল্লসিত করমর্দন করছেন, হাস্য-পরিহাস চলছে, কোনও সুকণ্ঠী হয়তো কী কারণে উচ্চহাস্য করে উঠছেন। সমুদ্রের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য যেমন তার গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করে না এঁদের কলরবও তেমনি এই অনুষ্ঠানের মর্যাদাকে ব্যাহত করছে না, বরঞ্চ তাকে পুষ্ট করে তুলছে। স্ত্রীলোকেরা না দেখার ভান করে পরস্পরের প্রসাধন-বিন্যাস লক্ষ্য করছেন, কিন্তু অন্য সময়ের মতো অন্যের সম্বন্ধে নাক সিটকোচ্ছেন না, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের উপযোগী কে কতখানি প্রস্তুত হতে পেরেছেন যেন সেটাই দেখে নিচ্ছেন। নিজেদের কথাবার্তায়, হাস্য-পরিহাসে এর উপযোগী হবার একটা গোপন, সতর্ক চেষ্টা চলছে।

ব্যালকনির নিচে মিঃ টমসনের পার্সন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট মিঃ এস-আর (শ্রীসরোজরঞ্জন মিত্র) অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। সাতটা বাজার আগের থেকেই তিনি নিজের স্থানটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যত সময় যাচ্ছে, ততই তাঁর কাজের চাপ বাড়ছে। কিন্তু কেউ যদি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন ক্রমশ তিনি সহজ, সাবলীল, উৎসাহী হয়ে উঠছেন। যাকে যেমনটি বলা দরকার ঠিক তেমনটি অতি সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসছে। ইংরেজী, বাংলা, প্রয়োজন মতো কখনো বলছেন হিন্দীতে। কথাগুলি খুবই সামান্য, 'মিঃ টমসন আপনাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হবেন,' কিংবা, 'আসুন, মিঃ শর্মা, গেল শীতের সেই গার্ডেন-পার্টির পর আপনার সঙ্গে এই প্রথম দেখা হচ্ছে…', কিন্তু অভ্যর্থিতের মুখে তাতেই সেই সন্তোষের ভাব ফুটে উঠছে, যাতে মনে হয় তিনিই বিশেষ মনোযোগের পাত্র হয়েছেন।

বস্তুত, যেমন কথাবার্তায় তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদে মিঃ এস-আর খুবই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ঘন বাদামী রঙের প্যান্ট আর সিল্কের শার্ট তাঁর ব্যক্তিত্বকেই ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর ভরাট প্রসাধন করা মুখের ওপর সুবিন্যস্ত চুলের দুয়েক গাছি এসে পড়েছে, গলায় আর চিবুকে একটু ঘাম-ঘাম মনে হয়, কিন্তু ক্লান্তি অপেক্ষা এসব তাঁর চৌকোশ কর্মক্ষমতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু তথাপি এসবের আড়ালে মিঃ এস-আর' এর মনে একটা বিপরীত-

মুখী ধারা চলছিল যা তীব্রতায় এর থেকে কোন অংশে কম নয়। তাঁর ভেতরে একটা নিরুত্তাপ কালো সংশয়ের ছায়া পড়েছিল এবং একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি বাইরের সব কিছুকে চিরে চিরে দেখছিল। 'অল দিস ইজ নাথিং···একটা চমৎকার প্রহসন মাত্র···' কারও সঙ্গে করমর্দন করবার সময়, কিংবা কোনো সমাগত দলের আনন্দচ্ছবি দেখে অনেক বারই মনে মনে উচ্চারণ করলেন তিনি। আর আশ্চর্য এই, তাঁর মনের ভেতরে এই ব্যঙ্গাত্মক ভাবটা যতই বেড়ে গেল, বাইরে তিনি ঠিক ততখানিই মুখর, উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলেন।

তাঁর মনের যেখানটায় কালো হয়ে উঠেছিল, সেখানে একটা কথা বারবার ভেসে উঠছিল। জুনাপুর হোটেলে স্যার মুখার্জীর সঙ্গে যখন দেখা করেছিলেন তিনি, তখন স্যার মুখার্জী বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন, কলসীর স্থান কলসীকে দিতেই হবে, এবং একযুগের কলসী আর সব সময়েই কলসী থাকে না। ঠিক তো তাই হল। যারা ছিল হাঁড়ি, তারা কলসী হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্যার টমাস নিজের হাতে তিন পার্সেণ্ট শেয়ার স্যার মুখার্জীর হাতে তুলে দিয়েছেন। আবার সেই নিয়ে এই উৎসবও হচ্ছে। কেন? মিঃ সেনগুপ্তরা শেয়ার মার্কেটে অনেক ভেল্কি খেললেও, স্যার টমাসদের হাত থেকে এক পার্সেণ্ট কেন, জিস্কোর একখানা শেয়ারও তো এঁদের হাতে আসত না। অবশ্য স্যার টমাসদের দলের কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন।

অথচ এমনি একটা কিছু প্রত্যাশিতই তো ছিল। মিঃ টমসনের কাছ থেকে এটা তো তিনি বুঝতে পারতেন। 'ভাস্বতী ভবনে' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগে কলকাতায় যখন তিনি স্যার টমাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন এই ধরণের কথাবার্তাই তো বলেছিলেন তিনি নিজে। তবে? তিনি কি তার অর্থ বোঝেন নি? 'ঠিক তাই···' এস-আর মনে মনে বললেন, 'এর পেছনে যেটা কাজ করছিল, এর আগে তা কখনও বুঝতে পারি নি আমি।' এই মিলনোৎসবকে তাই তাঁর অশুভ মনে হতে লাগল। অথচ, এছাড়া আর কি হ'তে পারত?···তারও কোনও উত্তর পেলেন না মিঃ এস-আর।

কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল, একটা জিনিস এস-আর বুঝতে পারলেন: এই যে তাঁর বাইরে আর ভেতরে দ্বিমুখী ক্রিয়া চলছে, এটাই হচ্ছে আজকের

উৎসবের সত্য কথা, ইনার স্পিরিট। সেইটে নিজের অন্তরে ধরতে পেরেছিলেন বলে খুশি হয়ে উঠলেন এই যা। আজকের অনুষ্ঠানের বাইরেটা যতখানি আনন্দময়,মিলনমুখী,আড়ম্বরপূর্ণ, ভেতরটা তেমনি নিরুত্তাপ, বিচ্ছিন্ন, সংশয়িত। যখনই কোনও অতিথি আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করবার সময়, তাঁর সুখভাবের আড়ালে এইটেই যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন মিঃ এস-আর।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সবার আগে যিনি পৌঁছোলেন তিনি হচ্ছেন ওআর্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট জেম্‌স্‌ মাধবন। শাদা সিল্কের প্যাণ্ট-শার্ট, আর তাঁর শাদা দাঁতের হাসিতে তাঁকে খুবই স্মার্ট আর আনন্দিত দেখাচ্ছিল। জুনাপুরে তাঁর একাধিপত্যের কিছুটা লাঘব হয়েছে, পাল্টা শ্রমিক ইউনিয়নের অস্তিত্ব কোম্পানী কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু তথাপি বিনাশের মুখে অর্ধেক ত্যাগ করে রক্ষা পাওয়াও তো ভালো। এই লোকটিকে দেখলেই মিঃ এস-আর'এর মনে একটা সকরুণ হাস্যের উদ্রেক করত, পত্নী শ্রীমতী নীলিমার নিকট এক পত্রে তিনি ওঁকে 'ঘর-জামাই' আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন। কিন্তু আজকে ওঁকে পকেটে হাত ভরে আদুরে ভঙ্গীতে আসতে দেখে তাঁর সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর মনে পড়ল, এই লোকটিই মিঃ টমসনের সমস্ত সহানুভূতি পেয়েও তাঁরই কাজে বারবার বাধার সৃষ্টি করেছেন। বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এ্যাকশন কমিটির মীটিং ভেঙেছেন, লজ্জা হয় নি যে তাঁর মীটিংএই কালো পতাকা দেখানো হয়েছিল। মিঃ এস-আর এমন কি জেম্‌সের গায়ের রঙ আর পোষাকের রঙে তীব্র বিরোধ দেখলেন, আর এটাকে তাঁর কুৎসিত বলে মনে হতে লাগল। যখন জেমসের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি, তখন চোখা-চোখি এড়াবার জন্যই ওঁর কপালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জেমসের কপালে লম্বা কালো দাগটা তাঁর কাছে কেমন অস্বাভাবিক কিন্তু অর্থপূর্ণ বলে মনে হতে লাগল।

এর কয়েক মিনিট পরে এলেন মিসেস টমসন। ঠিক আগেই এক দল অতিথি নিয়ে এস-আর ব্যস্ত ছিলেন বলেই হোক, বা, মিসেস টমসনের পরিচিত পোশাকের বদলে শাড়ি পড়ার জন্যেই হোক, তিনি একেবারে কাছাকাছি চলে না আসা পর্যন্ত তাঁকে লক্ষ্যই করতে পারেন নি এস-আর। মিসেস টমসন আগেই তাঁর করমর্দন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ এস-আর, আমার ছোট্ট বোনটি···নীলিমা কোথায়?'

'উনি আগেই এসেছেন, ওপরে গেছেন…' মিসেস টমসনের নোতুন পোষাকের দিকে চোখ রেখে বললেন এস-আর। মিসেস টমসনকে দেখলেই তাঁর এদেশের সেবাপরায়ণা মাতৃমূর্তির কথাই বারবার মনে হ'ত, এখন মনে হ'ল, উনি একজন ইংরেজ মহিলা মাত্র, ভারতীয় পোশাক পরেছেন। 'সকলেরই আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন আছে…' কথাটা কেন জানি তাঁর মনে হতে লাগল, এবং মিসেস টমসনের এই রূপ তিনি স্বীকার করে নিতে পারলেন না। কিন্তু এটার অপেক্ষাও বড়ো বিস্ময় এবং আঘাত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। মিসেস টমসন তাঁর পেছনের একজন বাঙালী মহিলাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিঃ এস-আর, তুমি এঁকে নিশ্চয়ই চিনতে পারছ?'

'ও, ইয়েস…হ্যাঁ…আমি…' এস-আর তাঁর অভ্যস্ত চৌকোশ হাসি হাসতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। সারা সন্ধে বেলাটার মধ্যে এই প্রথমবার তাঁর বাইরের উজ্জ্বল আবরণ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে পড়ল। যাকে তিনি দেবী বলে জানতেন, তাঁকে এমনিভাবে দেখবেন তা কল্পনাও করতে পারেন নি। মিসেস টমসন কমলা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নিজেকে সম্বরণ করতে করতে বললেন এস-আর, 'হ্যাঁ, গত পুরস্কার বিতরণী সভায় ওঁর সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল…' কিন্তু মনে মনে যন্ত্রবৎ ভাবলেন, সেদিন যে কমলা দেবীকে দেখেছিলেন, ইনি কি তিনিই? অথচ সেই রঙ, সেই উচ্চতা, সেই মুখশ্রী, সবই আছে!

'কোম্পানীর নতুন নীতি গঠনের ব্যাপারে আপনার কন্‌ট্রিবিউশনের কথা আমরা প্রায়ই আলোচনা করি…' কমলা দেবী হাসি মুখে বললেন। 'বাবার সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কথা আমি সব শুনেছি।'

এস-আর বুঝলেন, আদব-কায়দা অনুসারে এখনই তাঁর একটা পাল্টা প্রসংশা করা উচিত, একটু আগে হলে তিনি তা করতেনও; কিন্তু এই মুহূর্তে কমলা দেবীর প্রতি পূর্বের সত্যকার সম্ভ্রমবোধ এবং বর্তমান নৈরাশ্যে তাঁর মন এতখানি পূর্ণ ছিল যে, তিনি প্রত্যুত্তরে আমতা আমতা করে হাসলেন মাত্র।

কেবল মিসেস টমসনের সঙ্গে কমলা দেবী যখন বিদায় নিয়ে সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গেছেন, তখনই তাঁর আশাভঙ্গের কারণটা বুঝতে পারলেন। এস-আর'এর মনে হল, কমলাদেবী অসাধারণ রূপবতী, এবং ক্লাবযোগ্য

বেশবাস এবং প্রসাধনে তিনি রূপসাধনা করে এসেছেন। পুরস্কার বিতরণী সভার কমলা দেবীর সঙ্গে পার্থক্যটা মুহূর্তে ধরা পড়ল। 'আশ্চর্য, সেদিন ওঁকে রূপসী বলে আমার মনেই হয় নি...' অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন মিঃ এস-আর। 'শী ওআজ এ সাবলিমিটি, দ্যাট ডে...'।

আরও কতক্ষণ পরে মিঃ টমসন ওপরে গেলেন। তাঁর স্বভাব-শান্ত, সকৌতুক মুখ আজ অসাধারণ গম্ভীর দেখাচ্ছে। মিঃ এস-আর'এর সঙ্গে যখন কয়েকটা কাজের কথা বলছিলেন, তখন তাঁর চিবুকটা টান-টান, ডান গালের ওপরকার আঁচিলটা কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। স্পষ্টত, নিজের ভেতরকার আবেগ এবং উত্তেজনা চাপছিলেন তিনি। মিঃ টমসনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মিঃ এস-আর'এর মনে পড়ল, এঁর নির্দেশে তাঁর কলকাতায় স্যার টমাসের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা। ইনিই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, স্যার মুখার্জীর শেয়ার বেড়ে শতকরা আটচল্লিশ হয়েছিল বলে। কিন্তু ইনি কি জানতেন, এঁদেরই অংশ থেকে আরো তিন ভাগ দিয়ে সেটা শতকরা একান্ন করতে হ'বে? স্ট্রেঞ্জ!

আটটা বেজে পনেরো মিনিট হয়েছে, তখনও মিঃ এস-আর ব্যালকনির নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এখন তিনি একাকী। ঘড়ির কাঁটা ধরে, আটটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগেই শেষতম অতিথি এসে গিয়েছেন। এতক্ষণে, পান-ভোজনের প্রাক্কালে কন্‌ফারেন্স হলে মীটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। একথা কয়েকবার মিঃ এস-আর'এর মনে হল যে, হয়তো মিঃ টমসন তাঁকে খোঁজ করতে পারেন, তথাপি কেমন একটা আলসেমিতে পেয়ে বসল তাঁকে। পাশে ফুলের টবগুলোর কাছে সরে গেলেন তিনি, আলতো করে স্পর্শ করতে লাগলেন ফুলগুলো। এই সময় তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হবে না যে, একটু আগেই তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং মুখর ছিলেন। তথাপি ক্লান্ত পদে নিজেকে টেনে টেনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন মিঃ এস-আর এবং একটু পরে দোতলায় এসে পৌঁছলেন। কিছুক্ষণ আগে পিয়ানোর সুর বাজছিল, এখন সেটা স্তব্ধ হয়েছে। কেবল ওপর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছে। নিজের অজান্তেই এইটে মিঃ এস-আর'কে বাকি পথটুকু টেনে নিয়ে গেল।

নদীতে জোয়ার এলে যেমন দুই কূলে একটা আলোড়ন তোলে, তারপর নদীর বুকের ওপর ফুলে উঠে স্থিতিলাভ করে, তেমনি অতিথিদের আগমন,

কলরব এবং উচ্ছ্বাস সংহত হয়ে আসছিল। পরিচারকেরা নীরবে, ত্বরিত অথচ সুদক্ষ হাতে কাচের গেলাস, ফলের প্লেট সাজিয়ে রাখছিল। আর কিছু পরে, সংক্ষিপ্ত ভাষণাদি শেষ হলে, পরিবেশন করা হবে। এই পরিবেশন-রীতির মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির ভাবটাই গৌণ, প্রাচুর্যের উদারতা এবং সজ্জার চারুতাই এর লক্ষ্য। পরিবেশনের ক্ষিপ্রতা কেবল একটা অভ্যাস নয়, তা একটা চিত্তশক্তি এবং শিল্পকর্মের আভাস এনে দেয়। যাঁরা কন্‌ফারেন্স হলের সুপ্রচুর আলোকমালার নিচে লম্বা টেবিলের দু'ধারে বসে সভাপ্রধান-দের কথা শুনবার জন্য সেদিকে সাগ্রহ হয়েছেন, এসব যেন তাঁদেরই উপযুক্ত, সুন্দর পরিমণ্ডল রচনা করেছে।

এই হলেরই এক প্রান্তে ঈষৎ উচ্চ মঞ্চে প্রধানরা আসন গ্রহণ করেছেন। স্যার টমাস ম্যাককুলাক এবং স্যার ধীরানন্দ মুখার্জী রয়েছেন মাঝামাঝি জায়গায়, তাঁদের মাঝখানে কমলা দেবী। স্যার মুখার্জীর ডান দিকে আছেন শ্রী অমরেশ ব্যানার্জী, লেবার এণ্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার, স্যার টমাসের বাঁ-দিকে জেনেরাল ম্যানেজার মিঃ টমসন। মিঃ টমসনকে যতখানি আত্মস্থ এবং গম্ভীর দেখাচ্ছে, শ্রী ব্যানার্জী ঠিক ততখানি সানন্দ এবং কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাছে তাঁর ভূতপূর্ব সহকারী মিঃ ডি-কে কেবলই আসছেন এবং কী সম্পর্কে নির্দেশ নিয়ে যাচ্ছেন। মিঃ ডি-কে'-কে এই উৎসবে দেখে অনেকেই চমকে উঠতে পারতেন, কিন্তু আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর জিস্কোর মার্কেটিং-এ্যাডভাইসার নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। বিদেশী বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার জন্য কোম্পানী এই নতুন পদে সৃষ্টি করে তাঁকে নিযুক্ত করেছেন।

শ্রী ব্যানার্জীকে দেখলে মনে হবে না, এই কয়েকদিন আগেও তীব্রতম মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। মনে হবে না,যে স্যার মুখার্জীর পাশে গৌরবের আসনে বসেছেন তিনি, তাঁরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এবং কুলিবস্তিতে গিয়ে নিজের প্রাণের প্রেরণা খুঁজেছিলেন। সম্ভবত, তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, একজন শ্রমিক কর্মীর আত্মত্যাগের জন্যে ফিরে আসতে পেরেছিলেন সেখান থেকে। আসলে, সেই ঘটনার পরেই তিনি বুঝতে পারেন, একটা নতুন সমন্বয়ের মধ্যে সমস্ত কিছু এসে দাঁড়িয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি পারেন নিজেকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। মিঃ টমসন সভার উদ্বোধনী বক্তৃতা দেবেন, এবং তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ হবার মিনিট

খানেক আগে শ্রী ব্যানার্জী তাঁর আসন থেকে উঠে নিচে নেমে এলেন, এবং প্যাসেজে কাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে (যা খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছিল) আবার নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

আর যাই হোক, শ্রী ব্যানার্জী নতুন সমন্বয়ের আসল রূপটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। আমলাতন্ত্রের পুরাণো এ্যারিস্টক্রাসী নয়, ডেমাগগীর মধ্যে এসে দাঁড়াতে হবে। সে গণতন্ত্র জনতার নিজের হাতে গড়া নয়, তার কাঠামো, তার মূর্তি সবই স্যার মুখার্জী আর স্যার টমাসরাই গড়ে দিয়েছেন আর জনতাকে তাই গ্রহণ করতে বলেছেন। এই শ্রী ব্যানার্জীই একদা বছর দশেক আগে, পাঁচ হাজার মজদুর যখন তাঁকে এবং জেনেরাল ম্যানেজারকে ঘেরাও করেছিল, তখন একলা তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন : প্যান্টের বাঁ পকেটে রিভলবার শুদ্ধ হাত ঢোকানো, রক্তবর্ণ মুখে উদ্ধত দৃষ্টি। বিক্ষুব্ধ মজদুররা মুহূর্তে চুপসে গিয়েছিল। সেই আভিজাত্য ছিল অকৃত্রিম। শ্রী ব্যানার্জীর বুঝতে দেরি হয় নি, এখন সেই শ্রমিকদের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের হাসতে হ'বে, ওদেরকে কেবল 'কথা' বলে তুষ্ট করতে হবে : যা উভয়পক্ষের কাছেই ভুয়ো অথচ বর্তমান সমন্বয়ের পটভূমিতে যা অপরিহার্য। উভয়ের মাঝখানে থাকবে একটা কৃত্রিম-আদর্শের মায়া-পর্দা, যা ঠকাবে অথচ ভুলিয়ে রাখবে।

মিঃ এস-আর ওপরে এসে তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন না, প্যাসেজ দিয়ে হলের শেষ প্রান্তের দিকে হেঁটে চলে গেলেন। কোনো দিকে না তাকিয়ে আনত দৃষ্টিতে হাঁটছিলেন তিনি, স্পষ্টত, প্রধানদের মঞ্চের দিকে চোখ পড়াটা এড়াতে চাচ্ছিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল, পাছে কমলা দেবীকে আবার কাছাকাছি দেখতে পান, এবং কোন নতুন কারণে আবার আহত হন। 'বাট হোয়াই দিস ডিসইলিউশনমেন্ট...হোয়াট··· আই ডু নট নো···' নিজের অনুৎসাহিত পদক্ষেপের সঙ্গে যেন তাল রাখতে রাখতে অস্ফুটে উচ্চারণ করতে লাগলেন তিনি।

হলের শেষ প্রান্তে এসে তারপর সামনের প্রধানদের মঞ্চের দিকে তাকালেন মিঃ এস-আর। সকলেরই চোখ তখন সেদিকে। এতদূরে দাঁড়িয়ে মিঃ এস-আর এতক্ষণে একটা আড়াল পেলেন যেন। এখন কারুরই মনোযোগ তাঁর ওপর নেই, কাউকেই আপ্যায়িত করতে হচ্ছে না তাঁকে। মঞ্চের ওপর দেখতে পেলেন সবাইকে, এমন কি কমলা দেবীকেও, কিন্তু তাঁর

মনে হতে লাগল, ওখানে যা হচ্ছে তার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। মিঃ টমসন যতক্ষণ ভাষণ দিতে থাকলেন ততক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি কিন্তু একটা বর্ণও বুঝতে পারলেন না। 'অল দিস্ ইজ নাথিং, এ্যাবসলিউটলি নাথিং...' ঠাণ্ডা বরফের মতো একটা শূন্যতা তাঁর বুকের ওপর চেপে বসল।

কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পর্দা হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে যেমন সব কিছু আলোকিত এবং উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সহসা মিঃ এস-আর'এর মনের ভেতরটাও তেমনি হয়ে উঠতে লাগল। শ্রী অনিমেষ সেনগুপ্তকে ভাষণ দিতে ডাকা হয়েছে। এতক্ষণ অতিথিদের মধ্যে বসেছিলেন তিনি, সেখান থেকে উঠে এসেছেন। মিঃ টমসন যেখানটায় বসে আছেন ঠিক তারই পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখবামাত্র সত্যকার প্রসংশায় মিঃ এস-আর'এর মন ভরে উঠল। 'দে হ্যাভ কল্‌ড দি রাইট পার্সন্ ইন হিজ রাইট প্লেস...' মনে মনে উচ্চারণ করলেন তিনি। এক শ্রী সেনগুপ্তের পোশাকই এঁদের সবার মধ্যে অনাড়ম্বর, চিরপরিচিত ভঙ্গীর। তাঁর ধুতি আর আঁটো-সাটো রাধাকৃষ্ণন কোট তাঁর তীক্ষ্ণ চেহারাকে আরও পরিস্ফুট করেছে। যখন শ্রী সেনগুপ্তের ভাষণ শুনছিলেন তিনি, তখন একই সঙ্গে দুটো জিনিস ভাবছিলেন। 'হ্যাঁ, উনি ঠিকই বলছেন, ওঁর কথাতেই নতুন জীবনরস পাবেন এঁরা... তা কেন, স্যার মুখার্জীদের নতুন পথ তো উনিই দেখিয়েছেন···' আবার সেই সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটা সাদৃশ্য মনে পড়তে লাগল : মিঃ টমসন এবং শ্রী সেনগুপ্ত আকৃতির দিকে থেকে একই রকম, সম্ভবত প্রকৃতিতেও। দু'জনেই স্বল্পভাষী, আত্মস্থ, চোখাচোখা নাক-মুখের গড়ন। আশ্চর্য, এই সাদৃশ্য এর আগে মনে হয় নি কেন তাঁর।

শ্রী সেনগুপ্ত বলছিলেন, 'সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জেগে উঠেছে। সেইটের তাৎপর্য আমাদের বুঝতে হবে। এই জাগরণ একটা অনিবার্য ঘটনা, একে অস্বীকার করে লাভ নেই। এর ভালো-মন্দ বিচার করছি না, এটা শেষ পর্যন্ত কোন্ পরিণতি পাবে তাও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু, সেটা যাই হোক, বিধাতা ভারতবর্ষকে এর মধ্যমণিরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাকে তার স্থান গ্রহণ করতেই হ'বে।···' এইখানে মুহূর্তের জন্য থামলেন অনিমেষ, তাঁর শান্ত, কঠিন মুখখানা একটুখানি ফিরিয়ে একবার স্যার মুখার্জী এবং স্যার টমাসের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে

আমরা ইংলণ্ডের আর ইয়োরোপের ইতিহাস পড়তেই অভ্যস্ত, কিন্তু চীন দেশ বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি। ইয়োরোপের ইতিহাস পড়া নিন্দনীয় বলছি না আমি, কিন্তু এটাও জানতে হবে। জিস্কো কি কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস অধ্যাপনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চেয়ার সৃষ্টি করতে পারে না?'

মিঃ এস-আর তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। সমস্ত হলের মৃদু অথচ গম্ভীর হাত-তালির সঙ্গে যখন বক্তৃতা শেষ হল তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন, 'হ্যাঁ, এটা ওঁদের উল্লসিত করেছে। কিন্তু…'

একটু পরেই স্যার মুখার্জী উঠলেন। দীর্ঘ দেহ, লম্বাটে মুখ, ভাসা-ভাসা চোখ, প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ভরে দাঁড়ালেন, কতকটা ছেলেমানুষের মতো কৌতূহলী ভঙ্গীতে তাকালেন হলের দিকে। অতিথিরা সাগ্রহে স্বীকার করে নিলেন তাঁকে, কিন্তু শ্রী সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটাও মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু আগেই যাঁরা নিরুদ্ধ-শ্বাস হয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন, তাঁরা মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনির সঙ্গে স্যার মুখার্জীকে সম্বর্ধনা করে নিলেন। মিঃ এস-আর তৎক্ষণাৎ বুঝলেন তাঁর এ ভাষণ শোনার প্রয়োজন নেই। অসুস্থতার পর উঠে কোনো ছেলে যেমন সুস্থতার আনন্দে চঞ্চল এবং আদুরে হয়ে ওঠে, স্যার মুখার্জীকে দেখে তাঁর সেটাই মনে হতে লাগল। স্যার মুখার্জী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করতেই আস্তে আস্তে সরে গেলেন হল থেকে।

'…কারখানার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যন্ত্রপাতি নয়, অর্থও নয়, সুদক্ষ শ্রমশক্তি হচ্ছে আসল কথা। ভারতবর্ষকে নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে হ'বে…কারিগরী নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। তার জন্য উৎপাদনক্ষম শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন…'

হল থেকে বেরিয়ে পেছনের করিডরের দিকে যেতে যেতে মিঃ এস-আর স্যার মুখার্জীর কথাগুলো শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল, এ কথাগুলো মিঃ সেনগুপ্তের বক্তৃতারই পরিশিষ্ট, কিন্তু বাসি, অর্থহীন শোনাতে লাগল। একটু পরেই হলের পেছন দিকে এসে পড়লেন তিনি, আর পেছনের সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে এল। রেলিংএর ধারে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন মিঃ এস-আর, অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে।

একটু পরে কিসের মৃদু শব্দে বাঁ দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে চমকে উঠলেন এবং লজ্জিত হয়ে পড়লেন। একজন মহিলা চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে

মাথা রেখে পড়ে রয়েছেন। দেখেই মিঃ এস-আর বুঝলেন, কোনো তীব্র বেদনা নিঃশব্দে বহন করছেন তিনি, আর সেইটে আড়াল করবার জন্যে সরে এসেছেন এখানে। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে গিয়েই থমকে গেলেন মিঃ এস-আর, তারপর এক মুহূর্ত দৃষ্টিপাত করেই এগিয়ে এলেন ওঁর সামনে।

'নীলিমা, তুমি…' একটা আহত বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে, তৎক্ষণাৎ একটা সমবেদনাও প্রকাশ হল সেই সঙ্গে, যেন নীলিমার বেদনার কারণটা বুঝতে পেরেছেন।

নীলিমা মাথা তুলে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। 'এই এমনি মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে করতে মাথা ধরে গেল, তাই চলে এলাম এখানে…' পিঠের ওপর শাড়িটা টানতে টানতে বললেন নীলিমা।

তৎক্ষণাৎ মুচকে হেসে বললেন মিঃ এস-আর, 'এই জন্যেই তো তুমি আমার সহধর্মিনী। আমারও মাথা ধরেছিল…'

নীলিমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এস, আমরা ভেতরে যাই…'

'না, তার থেকে বাড়ি যাই চলো…' বলে মিঃ এস-আর আবার রেলিঙের ধারে এগিয়ে গেলেন, এবং নীলিমাও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'এতক্ষণ আমার মনের ওপরে একটা ভার চেপেছিল, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, আমার নৈরাশ্যের কারণটা কী। সবাই যেটা মেনে নিতে পারছে আমি সেটা পারছি না কেন…' মিঃ এস-আর পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন নীলিমার দিকে। 'কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি সেটা বুঝতে পারলাম…'

নীলিমার মুখে একটা ক্লান্ত হাসি ফুটে উঠল। যেন বলতে চাইলেন, 'হ্যাঁ, তুমি যে কারণটা অনুমান করছ সেটাই ঠিক।'

মিঃ এস-আর বললেন, 'নীলিমা, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই অনুষ্ঠানে সবই আছে অথচ কী যেন নেই। পুরস্কার-বিতরণী উৎসবে এটা তো মনে হয় নি আমার। তোমার যে অংশ ছিল সেই অনুষ্ঠানে, আজ সেটা নেই। এই হচ্ছে পার্থক্য…' মিঃ এস-আর পকেট হাতড়াতে লাগলেন সিগারেটের প্যাকেটটার জন্যে। 'কিন্তু বলতে পারো, এই অনুভূতিটা কেবল আমাদের পারিবারিক, না কি, এর আর কোনও অর্থ আছে?'

'কি জানি…' মৃদু হাসলেন নীলিমা। তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন আবারও বোঝাতে চাইলেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা অনুমান করছ সেটাই ঠিক।'

অধ্যায় ১০

লীলাদের বাড়ির সামনে পুষ্প যখন রিক্সার ওপর বসে রয়েছে, তার কোলে মণ্টু চঞ্চল, উৎসুক দৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ জনতার দিকে তাকাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে পুষ্পর হাত ছাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছে, তখন শিবলাল একবার লীলাদের বাড়িতে উঠল, কী জন্যে জনতার মধ্যে এগিয়ে গেল। মুহূর্তে কেমন করে লাঠির ঘায়ে আহত হল সে, তারপর জনতারই একটা অংশ শিবলালকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে গেল। এর সবই ঘটল পুষ্পর সামনেই।

'মাগো, একি হ'ল···আমি কি এই জন্যে দাদাকে এখানে এনেছিলাম··· মণ্টুকে রিক্সার ওপর বসিয়ে (কোল থেকে নামতেই ছেলেটা চীৎকার করে কেঁদে উঠল) পুষ্প নামতে গেল, কিন্তু কাঁপা কাঁপা পায়ে যদিও বা নামতে পারল, কখন পায়ে কাপড় জড়িয়ে গেছল বুঝতে পারে নি, মাটিতে পা দিতেই পড়ে গেল, আর মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

পুষ্পর এই অচৈতন্য অবস্থা বেশিক্ষণ ছিল না। রিক্সাওয়ালা অন্যের সাহায্যে তাকে রিক্সায় তুলে ওদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে না আসতে ওর চেতনা ফিরে এল। কলে-দম-দেয়া যন্ত্রের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকল পুষ্প। নেতিয়ে পড়া ছেলেটাকে উঠোনের ওপর নামানো মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল ওটা। ছেলেটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পুষ্প, তারপর 'মাগো, দাদাকে কোথায় রেখে এলাম···' ককিয়ে বলতে বলতে ধপ্ করে বাচ্চার পাশেই বসে পড়ল ও। খবর পেয়ে একটু পরে বিহারী এসে পড়ল। বিহারীর নিজের শরীরটাও ক'দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না, সর্দি-কাশিতে কষ্ট পাচ্ছে, দিন দুই আগে একটু জ্বরও হয়েছিল। চন্দ্রকান্তর মৃত্যু-শয্যায় সেই যে কয়েকদিন ধরে ওঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিল, তারপর দু'একবার মাত্র এদের বাড়ি এসেছে। ওর ধারণা ছিল, পুষ্প এতদিনে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। এখন সমস্ত শুনে দুঃখের সঙ্গে বললে, 'পুষ্প, তোমাকে ভাল অবস্থায় আর দেখলাম নাই! শিবুদার যদি কিছু···এমনি ভাগ্য' বলে ও যেমনি অবস্থায় ছিল, তেমনি করেই চলে গেল হাসপাতালের দিকে।

হরির মা তখনও ফিরতে পারে নি লীলাদের বাড়ি থেকে। পাড়া-প

কয়েকজন যারা বিহারীর সঙ্গে এবং পরে এসে পৌঁছেছিল, তারা শিবলালের ঘটনাটা নিয়ে উত্তেজিত বিষণ্ণতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল, আর পুষ্পকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করল। পুষ্পর আহত চৈতন্যে এসবের কিছুই ছায়া ফেলতে পারল না, ওর মনে হতে লাগল : এই একটু আগেও সব ঠিক ছিল, এখন কিছুই নাই। যেখানকার যেমনটি ঠিক তেমনিই আছে, এমন কি সেই ভিজে ভিজে আবহাওয়াটা পর্যন্ত। কিন্তু সব কিছুর ভেতরের রসটা পর্যন্ত কে নিংড়ে নিয়েছে যেন। এই রাত্রি, এরও শেষ হবে, আবার সকাল হ'বে, কিন্তু একজন থাকবে না।

তারপরের দিন সমস্তক্ষণ পুষ্পর একটা নিদারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটতে লাগল। শোবার ঘরের মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে লাগল ও। হরির মা মণ্টুটাকে নিয়ে কি করছে কে জানে। ছেলেটা কেন জানি ভীষণ চেঁচাচ্ছে, মাঝে-মাঝে ক্লান্ত হয়ে ককিয়ে ককিয়ে শ্বাস টানছে। ছেলেটার চিৎকার পুষ্পর কাণে ছুঁচ ফুটোতে লাগল যেন, আর অসহ্য বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মনটা কুঁকড়ে গেল। 'ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে পাক, আমি কি করব। মানুষ কেউ কাউকে ভালবাসে না, সংসারে ভালবাসা নাই···' এই রকম ধরণের একটা ঈষৎ অস্পষ্ট অথচ নিশ্চিত চিন্তা তার বুকের ভেতরটায় চেপে রইল। সংসারে যদি ভালবাসা থাকত, তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের এত অবস্থার পার্থক্য হয় কেন। শিবলালের সঙ্গে একসাথে কাল বেরিয়েছিল সে, লীলাদের বাড়িতে যাবার বিষয়ে একই রকম আনন্দ পেয়েছে ওরা, কিন্তু আজ একজন হাসপাতালে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে (শিবলালের সম্বন্ধে 'মৃত্যু'র কথা এই প্রথম ভাবতে পারল ও), আর একজন দিব্যি সুস্থ রয়েছে। তার কাছে দিন-রাত্রি, ভালো-মন্দ, ঘর-সংসার, লোকজন, সবই সত্য। এটাও যদি সম্ভব, তাহলে আর বাকি রইল কি।

এর মধ্যে একটা মারাত্মক অনুভূতি তার মনের মধ্যে ছুরির ফলার মতো কেটে কেটে বসতে লাগল : শিবলালের এই অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। সে-ই তো শিবলালকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মায়াবিনী পিশাচীর জাত তারা···এক মায়াবিনী কেবলই ছলনা করেছে, বিশ্বাস ভেবেছে, আর একজন (সে নিজে) তেমনি ভুলিয়ে নিয়ে গেছে ওকে। শিবলালের ফুলের মতো জীবন, অশুচির ছোঁয়া লাগতে না লাগতে ঝরে পড়ে গেল।

উপুড়-হয়ে-পড়া পুষ্পর দেহখানা শক্ত হয়ে উঠল, কপালটা কঠিন মেঝের

ওপর চেপে ধরল ও। মাথাটা ঠুকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইল পুষ্প, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘৃণার সঙ্গে থেমে গেল ও, 'মাথা ঠুকে কি হবে। এও এক রকমের ন্যাকামি…' পুষ্প ভাবলে, আর তেমনি করে পড়ে রইল।

হরির মার পক্ষে এটা আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠল। সে-ই বোধ হয় সমস্ত ব্যাপারটার আগাগোড়া জানত। এই পরিবারটিকে যথার্থই সে ভালবেসে ফেলেছিল সুতরাং এদের দুঃখের পুরো ধাক্কাটাই তার বুকে লাগল, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ওর মনে হতে লাগল যে ঠিক এই সময়ই ওর কিছু করার রয়েছে। পুষ্প গতকাল থেকে অনাহারে রয়েছে, খাবার কথাটা তুলতেও ভয় করতে লাগল ওর। কেবল ভাবলে, যদি তাকে স্নানটাও করিয়ে দেওয়া যায়। দু'তিন বার পুষ্পকে বললেও, কিন্তু বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত যখন পুষ্প মেঝে ছেড়ে উঠল না, তখন তার পাশে গিয়ে বসে হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে ও। চোখের জল চাপতে চাপতে বললে, 'দেখ মা, আমি তোমার মায়ের তুল্য, আমি বলছি…', কিন্তু বলতে গিয়েই কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল ওর, নিজেকে আর চাপতে পারল না। পুষ্পর হাত দুটো হাতে রেখেই ও কাঁদতে লাগল।

পুষ্প আস্তে আস্তে উঠে বসল, হরির মার চোখের জলের দিকে তাকিয়ে বুঝলে এর কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, না উঠেই বা কী করবে সে। সব কিছুই চলছে একই রকম, এর পরেও চলবে। সে সুস্থ আছে শুধু তাই নয়, ক্ষুধা তৃষ্ণাও লাগতে আরম্ভ করেছে।

কোনো কথা না বলে যে রকম করে পুষ্প উঠে গিয়ে স্নান করলে, তারপর খাবার জন্যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল, সেইটে হরির মাকে অবাক করে দিলে। যেমনটি সে ভেবেছিল, বা তার যা করার ছিল বলে মনে করেছিল, তার কিছুই হল না। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল, কিন্তু তবুও অন্যরকম কোন কিছু বলতে সাহস করল না ও। ওর সামনে ভাতের থালা ধরে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইল ও, আর পুষ্পকে লক্ষ্য করতে লাগল।

'চিন্তা-ভাবনা কর নাই, মা, শিবু বাবা আমার ('শিবু' বলাটা তার এই প্রথম) ভাল আছে। তোমার মা ভাগ্যিমানি, অমন বেটা পেটে ধরেছিল… নিজের চোখে দেখলম ত সব…' হরির মা পুষ্পর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলতে আরম্ভ করলে। যা সে বলছিল তাতে তার আন্তরিকতা ছিল না তা নয় কিন্তু পুষ্পর মনের মধ্যে এখন কি আছে সেইটে আশংকা করে কেমন শুকিয়ে উঠেছিল।

'ওকথা বল না, হরির মা, ওকথা বল না…' পুষ্প মুখের গ্রাস শেষ না করেই বলে উঠল। যে বিতৃষ্ণা এতক্ষণ অনুভব করছিল ও, সেইটে যেন ক্রোধের মতো ওর ক্লান্ত, বসা-বসা চোখের ওপর ঝিকিয়ে উঠল। 'আমি পিশাচী, তাই তাকে খেয়েছি। আমি তাকে নিয়ে গেছলাম আর এক ডাইনীর কাছে, তা না হলে এমন হত না…' হঠাৎ ওর থেমে-যাওয়া হাতটা দ্রুত চলতে লাগল, অস্থির আঙুলে খামকাই কোলের কাছের ভাতগুলো চট্‌কাতে লাগল।

হরির মা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। আত্মগ্লানির এই 'পিশাচী' মূর্তিতে পুষ্পকে দেখবে তা ভাবতেই পারে নি। কিন্তু তার পরেই ও স্ফুরিত হয়ে উঠল। গতকালকার দেখা সমস্ত ঘটনা মনে পড়তে লাগল ওর। একটু আগে যেমন ও ভেবেছিল পুষ্পকে ওর শান্ত করতে হবে, তেমনি তৎক্ষণাৎ ওর মনে হল লীলার সম্বন্ধেও ওর সত্য কথাটা বলা দরকার। ও ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, মা, তুমি উকথা বলবেক নাই। তুমাদের যে বউ হবেক, উয়ার মতন ভাল মেয়ে আমি দেখি নাই। উয়ার লেগে যা কিছু বলেছিলম তুমাকে, সে সব ভুল। মানুষ এমন কথাও রটাতে পারে, মা …'

পুষ্পর অস্থির হাতখানা আবার থেমে গিয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে হরির মায়ের কথার তোড় যেন আরও বেড়ে গেল। বলতে লাগল, 'উঃ, মেয়েটার তেজ যদি তখন তুমি দেখতে, মা। বাপের বিটী বটে…অমন যে দত্যির মত লোকটা গাঁই-গাঁই করতে করতে ঘরে ঢুকল, ওই মেয়ের সামনে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল, হঁ…'ঢোক গিলে একবার থামল হরির মা, ওর চোখ দুটো সত্যকার প্রশংসা আর বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। শ্রী ব্যানার্জীর সঙ্গে লীলার সংঘর্ষটা এখনও চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিল ও।

'হরির মা, কি বলছ তুমি…'

'তা লয়? আমি স্বচক্ষে দেখলম!…কিন্তু আমি ভাবছি কি, ওই লোকটাকে বাঁচাতে যেয়ে আমার বাপ জখম হল কেনে…' একবার থামল হরির মা, তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটা পুষ্পকে বললে।

হরির মার রুদ্ধ কণ্ঠ আর ভরে-আসা চোখ কিছু লক্ষ্য করল না পুষ্প, সে অবস্থাও ওর ছিল না। সব শুনে ও কেবল বলতে পারল, 'হরির মা, লীলা একথা বলেছে…এই সব বলতে পারলে ও?' পাতের ভাত ওর পাতেই পড়ে রইল, তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল ও। যে পথে ও চলছিল, তার সম্পূর্ণ

বিপরীত একটা আবেগ এসে মুহূর্তে ওকে বিহ্বল করে ফেললে। ওর আর খাওয়া হল না।

হরির মাও ভাতের থালাটা ঢাকা দিয়ে উঠে এল। শোবার ঘরে এসে দেখলে, ওদিকে দেয়ালের দিকে মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পুষ্প। বাপ-মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছে! হরির মা আসতেই ফিরে দাঁড়াল পুষ্প, দুটি চোখ বেয়ে অজস্র ধারা গড়িয়ে পড়ছে। গতকাল থেকে এতক্ষণকার রুদ্ধ আবেগ ছাড়া পেয়েছে যেন। ওর সমস্ত বিতৃষ্ণা আর ক্রোধ গলে গিয়ে ওকে ওর স্বরূপে ফিরিয়ে এনে দিলে: এ পুষ্প মমতাময়ী, যে নিজের চোখের জল দিয়ে অন্যকে ভালবাসতে পারে।

হরির মার হাত দুটো ধরে ফেললে পুষ্প, রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করতে করতে বললে, 'হরির মা, তুমি বল, দাদা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে, দাদার কিছু হবে না, বল তুমি…'

হরির মার পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব ছিল, কিন্তু তথাপি ও কিছু বলবার আগেই পুষ্প ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'হরির মা, আমার বাবা-মার পুণ্যের শরীর, তাঁদের আশীর্বাদ কি ছেলের উপর নাই? বল না…' পুষ্প কাঁপছিল, হরির মা ওকে তক্তপোষের ওপর বসিয়ে দিলে। বললে, 'মা, ভগমানকে ডাক, তিনি সব ঠিক করে দিবে…'

পুষ্পর চোখ দিয়ে তেমনি ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল, কিন্তু নিজের আবেগটা শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল ও। এক সময় বললে, 'হরির মা, বিহারীদা কি বাড়িতে আছে, না কি হাসপাতালে? হ্যাঁ, দেখ, তুমি খেয়ে নাও, নিয়ে তোমাদের গাঁয়ে যাও একবার। কানাইদাকে নিয়ে এস...আমার ভাগ্যের কথা শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। হাসপাতালে যাব আমি…' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিহারী আর কানাইয়ের সম্বন্ধে বললে, 'এ সময় ওনারা ছাড়া আর আমাদের কে আছে!'

অধ্যায় ১১

আহত পাখির দুই ডানার মতো একদিকে পুষ্প, অন্যদিকে লীলা কেবল ছটফট করতে লাগল। ডানার ঝাপটানি দেখেই যেমন বোঝা যায় আঘাতের পরিমাণটা কতখানি, তেমনি ওদেরকে না দেখে বোঝা যায় আঘাতে

স্বরূপটা সত্যিই কি হতে পারে। দুটি ডানা দুদিক থেকে যেমন একই প্রাণের আকৃতিকে প্রকাশ করতে থাকে, তেমনি, পুষ্প যদিও সেটা জানত না, তবু এই বেদনার মধ্যে তারা পরস্পরের কত কাছাকাছি হতে পেরেছিল। কোন্ অলক্ষ্য সূত্র তাদের দুটিকে এক সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল।

শ্রী ব্যানার্জীর আসা থেকে আরম্ভ করে শিবলালের আহত হওয়া পর্যন্ত সবই লীলার চোখের সামনে ঘটল। এর প্রত্যেকটি ঘটনা এতই অস্বাভাবিক এবং আকস্মিক যে, যেকোন মানুষকেই তা বিহ্বল করে দিতে পারত। লীলা এর সম্পূর্ণ দাহটা অনুভব করলে, কিন্তু বাইরে কেমন করে ওকে একটা আশ্চর্য স্থিরতা দিলে।

শ্রী ব্যানার্জীর গাড়িটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। বোধ হয় বুঝেছিল, ওখানে থাকা আর নিরাপদ হবে না। লীলা দরজার আড়াল থেকে যেন টানা হয়ে সামনে এগিয়ে এসেছিল, তখনও নিঃস্পন্দ মূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখের সামনে থেকেই লোকগুলি সরে গেল। একটু পরে মনেই হল না যে, এখানে কেউ ছিল। ভেতরের বারান্দা থেকে হরির মা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে একটা ভীত, সতর্ক দৃষ্টি, যেন এখনও লোকটা (শ্রী ব্যানার্জী) ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার সামনে দিয়ে ওকে যেতে হবে। লীলা ফিরে ওকে বললে, 'হরির মা, পুষ্পাদি এসেছিলেন...ওদিকে কোথা দাঁড়িয়েছিলেন বললেন উনি। তুমি দেখতে পারো...'

'হুঁ হুঁ, তেনার ত আসবার কথা। ছোটবাবু এসেছিল, কোথা গেল আবার...' তারপর লীলার পাশ দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফেলেই হঠাৎ ওর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, 'ও মা, ই যে ভেল্‌কি লেগে গেল দেখছি। এই এত লোকজন, হট্টগোল, আর এখুনি কেউ কোথাও নেই...হুঁ...' ওর ধারণা ছিল না এর মধ্যে কি ঘটে যেতে পারে।

লীলা এক মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর শিবলালের ঘটনাটা জানাল ওকে। বলবার সময় স্থির দৃষ্টিতে হরির মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ও, যেন সেইভাবেই একটা অবলম্বন পাচ্ছিল।

'দিদিমণি, ই কি বুলছ গো...' কথাগুলো যেন আটকে গেল হরির মার। বিবর্ণ স্বরে, লীলার পায়ের কাছে ধপ করে বসে পড়ল ও, হাত দু'টো এক রকম করে শূন্যে তুলে দিলে, যেন লীলার হাত দুটো ধরতে চাইলে। 'ই

আমার কি হল গো, দিদিমণি, ই-ই...' কিছুক্ষণ থমকে থাকার পর ককিয়ে উঠল ও, ওর কথাগুলোতে এমন একটা ভঙ্গী ফুটে উঠল, যেন যা ঘটেছে তার জন্য লীলাকেই ও দায়ী করছে।

একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস লীলার গলা পর্যন্ত ঠেলে এল, কিন্তু ও সহজ ভাবে বললে, 'হরির মা, দেখ একবার, পুষ্পদি' সামনেই কোথাও আছেন হয় তো...'

হরির মা লীলার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল, ভাবলে, কোথায় যেন তার কি ভুল হয়ে গেছে। সহসা চুপ করে গেল ও এবং পরক্ষণেই রাস্তায় নেমে গেল। দু'এক পা গিয়েই চোখে কাপড় দিলে ও, ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর, কোনো রকমে রাস্তায় এগোতে লাগল।

লীলা দরজা বন্ধ করলে, টেবিলের ওপর যে হারিকেনটা ছিল সেটার দম কমিয়ে মেঝের ওপর রাখল। তারপর শোবার ঘরে ঢুকে এমন করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল,. যেন এতক্ষণ ধরে কিছুই হয় নি, এর পরেও ওর করবার কিছু নেই।

চিৎ হয়ে শুয়ে কপালের ওপর ডান হাতখানা মুড়ে রাখল লীলা, পরিচিত বিছানা মুহূর্তে ওর প্রিয়জনের আশ্রয়ের মতো মনে হল। ঘরের মধ্যে আলো ছিল না, অস্পষ্ট অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না কিছু, কিন্তু কোথায় কি আছে কেমন করে আছে সব অনুভব করতে পারে লীলা। মাথার কাছে খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস সিরসির করে বয়ে আসে, হাতের দু'পাশের ফাঁক দিয়ে বয়ে এসে মুখের ওপর, তারপর সমস্ত শরীরে লাগে। মাথার তেলোতে ঠাণ্ডা লাগে, একটা অবসন্ন শ্রান্তিতে লীলার চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে আসে। লীলার মনে পড়ে, শম্ভু এখনো ফেরে নি, বনমালীও না। শম্ভু কখনও কখনও কাকারও পরে বাড়ি ফেরে। ওদের খেতে দিতে হবে।

আজকে যা-যা ঘটেছে বনমালীকে বলতে চাইলে লীলা। লীলার মনে পড়ল, যেদিন বনমালী ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোতে নিয়ে গিয়েছিল তাকে সেদিনকার কথা! সেইদিনকার সূত্র ধরেই তো আজকের ঘটনা ঘটল। মনের মধ্যে মুচকে হাসল লীলা, তারপর থেকে বনমালী সামনে আসে না, মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। একটা করুণায় লীলার মনটা ভরে এল। বনমালী আজকাল কেমন হয়ে গেছে, একটা গাছকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে

ফেলে রাখলে যেমন হয়। বনমালীর অবস্থা সত্যই তাই। বনমালী এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান হয়েছে কিন্তু সে কি তা-ই চেয়েছিল? লোকে তাকে ব্যানার্জী সাহেবের দালাল বললে তার গর্ব হ'ত। এমন একজন মানুষের বিশ্বাস সে পেয়েছে যিনি শক্তিমান, যাঁকে জুনাপুরে সমস্ত লোক ভয় করে। সেই ব্যানার্জী সাহেবেরই শিড়দাঁড়া ভেঙে গেছে, আর ঐ মেয়ে-মুখো ডি-কে সাহেবরাই আজকাল দালাল হয়ে গেছেন। লীলা বনমালীর ভেতরকার এত সব খবর জানত না। বনমালী যেখান থেকে প্রাণরস পেত সেটা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু গাছের নেতিয়ে-পড়া পাতা দেখে যেমন বোঝা যায় শেকড়ের কাজে কোথাও গোলমাল আছে, আসল কারণটা না জানলেও বনমালীর মুখের দিকে তাকিয়ে লীলা সেটা বুঝতে পারত।

'আঃ, এই সময় কি কাকিমা ফিরে আসতে পারে না, ওঁকে দেখা-শোনা করার জন্য?'

…চটকা লেগে লীলার তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। সচেতন হয়েই ওর মনে হল, এতক্ষণ ও ঘুমোয় নি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে জাগরণের মতো একটা বিপরীতমুখা চিন্তাধারা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেললে। ওর বুকের ভেতরটায় এত ঘটনার পর এই সর্বপ্রথম আর্ত প্রশ্ন উঠল, 'ভগবান, আমার এই ভাগ্য কেন...আমি কি করেছি...আজ এই সবের পর...' লীলা বাকিটা ভাবতেও পারল না, তার স্পর্শ-কাতর নারীচিত্ত হা-হা করে উঠল।

পরপর কত ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর, আর লজ্জায় গ্লানিতে মাটিতে মিশে যেতে চাইলে ও। পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় পল্টা মণ্ডলদের সঙ্গে তার দেখা, শেফালির বিয়ে-বাড়িতে মদনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ব্যানার্জী সাহেবের বাংলোতে যাওয়া…ছি-ছি, লজ্জা, লজ্জা। 'কিন্তু কেন, কেন...' লীলা বিছানার ওপর উঠে বসল, কপালের রগটা দপ দপ করতে লাগল ওর। 'লজ্জা কেন…কি করেছি আমি…আমার কি হয়েছে, কেন লোকে আমাকে এমনি করবে?' লীলা নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল, কথাগুলো গলায় যেন আটকে গেল ওর। 'কেন আমাকে ওরা ঘেন্না করে, আমাকে দেখলে মুচকে হেসে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়?'

তখন বিদ্রোহিনীর মতো প্রতিবাদ করে উঠল ও, 'না-না, ওরা আমাকে এমনি করতে পারবে না, আমি কি করেছি ওদের….'

পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় লীলারা একলাই গিয়েছিল, শিবলাল কেন

ওদের অমনি করে মেলা থেকে টেনে এনেছিল? শেফালিরা তাকে দেখে ঘৃণার সঙ্গে কথা বলেছে, কেন বলে ওরা? কেন তার নাম জড়িয়ে দরজার সামনে পোস্টার দেয়, যারা দেয় তারা কি কিছু জানে? কেন কাকিমা বাপের বাড়ি চলে গেল, সত্যি কথাটা জানবার মতো ধৈর্য হল না তার? এই তো আজকেই, একটু আগেই শিবলাল অবিশ্বাসী চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছিল—কেন?' তার আগে ব্যানার্জী সাহেবের সঙ্গে যখন সে কথা বলছিল তখন এসে শুনে যেতে পারে নি?

বিদ্রোহিনীর বুকের ভেতরটায় অদ্ভুত গৌরবে ভরে উঠল। লঘু পায়ে বিছানা থেকে মেঝের ওপর নেমে এল লীলা, একবার ভাবলে বাইরে যাবে, কিন্তু তারপরেই মত পরিবর্তন করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। না, তার যাবার দরকার নেই। নিজেকে এই মুহূর্তে সুস্পষ্ট করে দেখতে পারল লীলা—এমন করে এর আগে আর কখনো দেখে নি সে। দেখলে: ক্রুদ্ধ হতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে উঠল সে। আগাগোড়া স্বচ্ছ, কোথাও অস্পষ্ট নেই, এতটুকু দাগ স্পর্শ করতে পারে নি তাকে। একেই তো সে এতদিন ধরে চিনে এসেছে!

'না-না, এটা তাঁকে (শিবলালকে) দেখতেই হবে, কেন তিনি অবিশ্বাস করবেন, কেন অমনি করে বলবেন তিনি...' ঘাড় নেড়ে বললে লীলা। তৎক্ষণাৎ, প্রায় একই সঙ্গে, আর একটি স্বর বলে উঠল, 'তুমি জানো, এখন তিনি কোথা...কি করছেন? জানো তুমি...'

লীলা চমকে উঠল। ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত পাতার মতো তাকে এখান থেকে ওখানে ছিটকে দিলে যেন। একটু আগে তারই চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটে গেছে, নিজের আবেগে কি করে সে মন থেকে তা সরিয়ে রেখেছিল! 'তিনি বেঁচে আছেন তো...'সবার আগে এই কথাটা আর্তনাদের মতো তার মনের ওপর আছড়ে পড়ল। দুই হাত দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেলল লীলা। বিদ্যুতের আঘাত লেগে যেমন মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে, মুহূর্তকাল আগেকার সমুজ্জ্বল আত্মগৌরবের আঘাত পেয়ে তার চোখ দুটিও তেমনি অশ্রুতে ভরে উঠল। এক-পা দু-পা করে বারান্দার দিকে এগিয়ে এল ও, চৌকাঠটা পর্যন্ত পেরোতে পেরেছিল, তারপর ধপ করে সেখানেই বসে পড়ল। যেমন রাত্রির মেঘ উঠে সমস্ত সৃষ্টিটাকে অন্ধকার, আচ্ছন্ন করে ফেলে, তারপর একরোখা বেগের সঙ্গে নিজেকে নিঃশেষ করতে থাকে, লীলার অবস্থাও তাই হল। নিজেকে সামলাবার কথা চিন্তা করতে পারল না ও।

'উনি অবিশ্বাসী চোখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেটাই ভাবছিলাম আমি। কেন না আমি কষ্ট পেয়েছিলাম! ইস...' একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর ওর সমস্ত দুঃখ ভেদ করে ঝলকে উঠল। 'আর, উনি যে আমার কথায় এগিয়ে গেলেন, মেরে ফেললেন নিজেকে...'

শিবলাল মুখ শুকনো করে ওদের ঘর থেকে ফিরে যাচ্ছিল। সিঁড়ির নিচে নেমে পড়েছিল, লীলা ডেকে পুষ্পদির কথা জিজ্ঞেস করছিল ওকে। উনি কী রকম সকরুণ, কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তার দিকে। সে দৃষ্টি কি বিশ্বাসের দৃষ্টি নয়? তা না হলে এগিয়ে গেলেন কেন? 'হ্যাঁ, আমারই কথায়, আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে গেছলেন তিনি...' ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতরটা গর্বে, বিশ্বাসে ফুলে উঠল তার। আশ্চর্য এই, তার একবারও মনে হল না যে সে অলুক্ষুণী, সর্বনাশীর মতো শিবলালকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছে (একটু আগেই যা ওর মনে হচ্ছিল), বরঞ্চ তার মনে হল, সে-ই তার বীরকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছে, তিনি তারই মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেছেন।

বর্ষণের মধ্যেই আর একবার বিদ্যুৎ-চমক হল, আর বর্ষণকে তেমনি ঘন-ঘোর করে তুললে। লীলা সেইখানেই মেঝের ওপর পড়ে মুখ থুবড়ে কাঁদতে লাগল। চোখের জল, মেঝে আর মুখ, সব একাকার হয়ে গেল ওর। যেন শিবলালের পায়ে মাথা রেখে ও মনে মনে বলতে লাগল, 'ওগো, আমার মতো অভাগিনীকে বিশ্বাস করেছ তুমি, আমাকে গরবিনী করেছ। কতদিন আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। পৌষ-সংক্রান্তির মেলায়...না, আমি আর ভুল বুঝব না, আমার গ্লানি থেকে বীরের মতো আমাকে রক্ষা করেছ তুমি। আমাকে তুমি ভালবেসেছ, কিন্তু আমি তার যোগ্য নই। তোমার এই পা দু'টি দিয়ে আমাকে মাড়িয়ে যাও তুমি, তুমি খুশি হও...'

যেন পা দুটি জড়িয়ে ধরতে চাইছে এমনি করে হাত দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে এল লীলা, আর নিজের অশ্রুতে ভাসা উষ্ণ মুখখানা চেপে ধরল।

অধ্যায় ১২

জুনাপুর হাসপাতালের দোতলার বারান্দায় প্রায় সতেরো ঘণ্টা অচেতন অবস্থায় থাকার পর শিবলালের চৈতন্য ফিরে এল। সর্বপ্রথম যা সে ধারণা করতে পারল, তা হল আলোর···চারদিকে ঘিরে রয়েছে। শিবলাল ভাবলে এটা সে হয়তো অনুভব করছে, এটা হয়তো স্বপ্ন, তাই চোখ খুলে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারল না। দৃষ্টি কেঁপে গিয়ে পরক্ষণেই শিবলাল বুঝলে ও তাকিয়েই রয়েছে, হয়তো চৈতন্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ খুলে তাকিয়েছিল। তখন, যা ওর চোখ ভরে দিয়েছিল, সেটাই দেখতে লাগল ও। হালকা উজ্জ্বল আলো, যেন কোনো উৎস থেকে উঠে ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হয়, এখনো ছড়িয়ে পড়ছে। 'খুব মৃদু গতিতে, একটা অস্পষ্ট ভাবনা-সঞ্চারের মতো। ছড়িয়ে ছড়িয়ে নেমে আসে, তেমনি অত্যন্ত মৃদুভাবে তার চোখ দুটি স্পর্শ করে। তারপর তা বুকের ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে তা ঈষৎ উত্তপ্ত, একটা সুখের স্পর্শের মতো লাগে। আপনিই চোখ দুটি নিমীলিত হয়ে আসে ওর, কতক্ষণ সে এমনি করে থাকে, তারপর আবার তার চোখ খুলে যায়। একটা নতুন রঙ্ তখন তার চোখের ওপর ফুটে ওঠে, একটা ঘন নীল বিচ্ছুরিত হয়ে রয়েছে। রঙটা আশ্চর্য স্নিগ্ধ, একটু আগে বুকের ভেতর যে সুখ-স্পর্শটা অনুভব করছিল শিবলাল, মনে হ'ল চোখের সামনে সেটাই ভেসে রয়েছে। বুকের ভেতর আর চোখের সামনে এক হয়ে রয়েছে।

'এই যে···আপনি কেমন বোধ করছেন এখন ?'

শিবলালের চোখের পাতা নড়ে উঠল। দেখলে একখানা উদ্বিগ্ন মুখ (যা ছাপিয়ে একটা খুশির আভাস ফুটে উঠেছে) তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শিবলাল উত্তরে খুব অস্পষ্টভাবে হাসল, যেন জানিয়ে দিতে চাইলে, 'হ্যাঁ, ভাল আছি।' তারপরই ওর মনে হল, কেবল হাসিতে উনি কি ওর কথাটা বুঝতে পারবেন, কোনো কথা বললে হত। পরক্ষণেই ও সেটা ভুলে গেল, নয়তো নার্স সরে গেল সামনে থেকে। শিবলালের চোখ দুটো আবার সেই আলোতে গিয়ে পড়ল।

যে ঘন নীল রঙটা তার চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল, সেইটে এখন

চিনতে পারল ও। ঘন নীল আকাশ থেকে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছিল। এটা চিনতে পেরেই আবার একবার হাসল ও। ওর বুকের ভেতরটা আরো ভরে উঠল। 'আশ্চর্য···কিন্তু কী ভীষণ নীল···' এ আকাশ তার পরিচিত, কিন্তু এমনটি ছিল না। আকাশ এত নীল হতে পারে সেটা ভাবতে পারত না শিবলাল। তার চোখের ওপর অজস্র আলো, কিন্তু আকাশে সেটাই নীল হয়ে ঝরে পড়ছে। শিবলাল বুঝতে পারে, এই নীল চাপ-বাঁধা, কঠিন নয়, বরঞ্চ নিকটে তা হালকা, তরল, তারপর দূরে ক্রমশ ঘন হয়ে উঠেছে। ধুহুচির ঘন, সুগন্ধ ধোঁয়ার মতো এই নীল কোথা থেকে, কোন্ গভীর থেকে কেবলই উঠে আসছে, তারপর চোখে ছুঁয়ে যাচ্ছে আলো হয়ে।

'উঃ, মাগো···' ওদিক থেকে কে আর্তনাদ করল। শিবলাল মুহূর্তের জন্য উৎকর্ণ হয়ে শুনল, তারপর আবার তেমনি করে তাকিয়ে রইল। আবার আস্তে আস্তে তার চেতনাকে ভরে দিলে।

ঘন নীল উৎসটা কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে, আর কত উঁচু। আরো উঁচুতে, আরো গভীরে, আরো···শিবলালের বুকের ভেতরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ বলে উঠল ও, 'ভগবান···আঃ!'

কাল রাত্রে যখন লাঠির আঘাতে চৈতন্য হারিয়েছিল শিবলাল, তখন চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র, কালো অন্ধকারের একটা পর্দা দুলে উঠতে দেখেছিল। সেইটাকে মৃত্যু বলে মেনেছিল ও। ভয় নয়, ভাবনা নয়, একটা সহজ, আকস্মিক শূন্যতা সামনে দেখতে পেয়েছিল ও, আর সেইটে মেনে নিয়েছিল। তারপর প্রথম যখন তার চেতনা হ'ল, তখন তার চেতনায় যা সত্য হয়ে উঠল, তা হল এই আলো। '···এই আমার চোখের সামনে···এত বড়, উদার, এত উঁচু···' মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগল শিবলাল।

ভাবলে, মৃত্যুর পর্দাটা ঠেলে সরিয়ে দিতে পারলেই এই অনুভূতির মধ্যে এসে পৌঁছানো যায়। মৃত্যুর পরপারেই ইনি থাকেন। শিবলাল ভাবলে, সে আর এক জগতে এসে পড়েছে, যেখানে দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, কেবল আলো, স্নিগ্ধ, সুখকর আলো। আলোর ওপর আলো, অজস্র, অসীম আলো এসে পড়ছে। একটা অজানা কৃতজ্ঞতায় ওর হৃদয় ভরে গেল।

শিবলালের চোখ দুটি নিমীলিত হয়ে এল। কিন্তু চোখ বন্ধ করা হল না ওর, চোখ বন্ধ করতে গিয়ে নিজের শোয়ানো দেহটার ওপর নজর পড়ল ওর।

আর চোখ দু'টো কতক্ষণ আটকে রইল সেখানে। হাত দুটি অবশের মতো দু'পাশে পড়ে রয়েছে। বুকের নিচে থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে বুক আস্তে আস্তে ওঠা-নামা করছে। শিবলাল কোনো দিন নিজের চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায় নি, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে নিজের দেহটা ওকে একটা অপূর্ব আনন্দ দিলে। 'আমি বেঁচে আছি…এই আমার…আমি বেঁচে আছি…' কথাগুলো মন্ত্রপূত ফুলের মতো তার মনের ওপর এসে পড়তে লাগল। আর সেগুলোর স্পর্শে কেমন উজ্জীবিত করে তুলতে লাগল তাকে। আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে আবার মহাশূন্যে তাকাল শিবলাল, আর নিজের ভেতর-বাহির একাকার হয়ে উঠল।

না, এক মুহূর্ত আগে যা ভাবছিল শিবলাল, তা তো সত্য নয়। মৃত্যু জীবন আর এই আনন্দ-চেতনার মাঝখানকার কোনো অনিবার্য কালো পর্দা নয়। জীবনের বৃন্তের ওপরই আনন্দময় ফুটে রয়েছেন। জীবনে যা কিছু মহৎ, যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই তো আনন্দ। শিবলাল পাশ থেকে হাত দুটো সরিয়ে আনল, আস্তে আস্তে রাখল বুকের ওপর। কথাগুলো যেন নতুন করে উপলব্ধি করতে চাইল ও। চোখের ওপর, কপাল আর মুখের ওপর যে আলো এসে পড়েছিল, তা যেন সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল, তার কপাল ছুঁয়ে এই আলো কত দ্রুত আকাশের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করছে, সেখান থেকে সেই আলো আবার তেমনি করে ফিরে আসছে। কি অচিন্তনীয় তার গতি, কতখানি ব্যাপ্তি তার। দেখতে দেখতে শিবলালের বুকের ভেতরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল। কতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল ও।

সহসা, আর এক অনুভূতির কথা মনে পড়ল ওর। দেখতে দেখতে সেটা ছড়িয়ে গেল বুকের মধ্যে। গেল বার পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় আশ্চর্য একটা অনুভূতি লাভ করেছিল শিবলাল। নদীর শীর্ণ রেখা বিস্তৃত চরের দূর প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে। আরো দূরে বাঁকের মাথায় পেপার মিল। এদিককার চরে বসেছে মেলা। বাঁধের ওপরকার গঙ্গা মন্দির থেকে আরম্ভ করে অন্তহীন জনস্রোত ছড়িয়ে পড়েছে। এর পুণ্য এর আনন্দ যেমনি, এর লোভ, এর গ্লানিও তেমনি এখানে সতী-অসতী, ত্যাগ-কামনা, ব্যাধি-আরোগ্য, জীবন-মৃত্যু সব সহস্র রূপ ধরে ফুটে ওঠে। সেদিন বুঝতে পারে নি শিবলাল। বুঝলেও সমস্ত চিত্ত দিয়ে অনুভব করতে পারে নি। আজ এই আলোর মধ্যে তাকেই দেখতে পেলে।

দেখতে দেখতে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। খুব স্নিগ্ধ, অস্পষ্ট, তবু এই হাসি, ওর চোখের দৃষ্টি, আর যে আলোতে চোখ দুটি মেলে রেখেছিল ও সেই আলো—সব যেন একই সুরে বাঁধা। সব মিলে একটা অখণ্ড, সম্পূর্ণ অনুভূতির সৃষ্টি করলে।

সেই দিন বিকেলে সর্বপ্রথম দেখা করতে এল, লীলা। একলাই হাসপাতালে এসেছে ও। এইটে শিবলালের কাছে আশ্চর্য যোগাযোগের মতো মনে হ'ল। শিবলাল তৎক্ষণাৎ ওকে স্বীকার করে নিলে। অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। জল-ভরা মেঘের মতো মন্থর গতিতে শিবলালের বেডের পাশে এসে দাঁড়াল লীলা। ওর হাত দুটি জড়ো করা। গায়ের ওপর বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকদের মতো একখানা শাদা পুরনো সিল্কের চাদর জড়ানো (শিবলাল জানত না, এ চাদরটা লীলার কাকিমার)। শিবলাল মৃদু হেসে বললে, 'লীলা, তুমি এসেছ···,' এমনি ভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করলে ও, যেন ঠিক তারই জন্য ও অপেক্ষা করছিল। 'এস, বস তুমি···'

এইটে লীলাকে যেন একটা পথ দেখিয়ে দিলে। একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার বেগ তাকে হাসপাতাল পর্যন্ত ঠেলে এনেছিল, কিন্তু যখন অন্যান্য দর্শনার্থীরা আগ্রহের সঙ্গে ভিড় করে ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করলে, তখন ও সহসা শক্তিহীন হয়ে উঠেছিল যেন। কোনো রকমে একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করে শিবলালের বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার বালিশের পাশে বসে পড়ল ও।

শিবলাল ওকে আর পুরোপুরি দেখতে পেলে না, কেবল লীলার মুখখানি তার চোখের সামনে নত হয়ে রইল। এ মুখ তার কতদিনকার পরিচিত। শুধু তাই নয়, এ মুখে একটা আশ্চর্য মমতা মাখানো দেখতে পেলে ও। এইটে শিবলালের বুকের ভেতরটা উচ্ছ্বসিত করে তুললে। লীলার চোখ দুটো নীচু করা ছিল, শিবলালের ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল, লীলা চোখ তুলে তাকায়, আর ও তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে। 'লীলা···' ও ডাকলে, কিন্তু ডাকবামাত্র ও নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। লীলার চোখের পাতা আর ঠোঁট নড়ে উঠল, আর তার পরেই চোখের কোণা দিয়ে বড় বড় ফোঁটা পড়ল গড়িয়ে। শিবলাল বললে, 'লীলা, তুমি কাঁদছ! কেন···' এইটেই লীলার বাঁধটা ভেঙে দিলে যেন, ওকে ভাসিয়ে দিলে একেবারে। চোখের জল গড়িয়ে এসে শিবলালের বাহুতে এসে পড়তে লাগল।

আলাপও করে নিয়েছে। তার নাম ধরমচাঁদ, উরুতে একটা দূষিত ক্ষতে ভুগছে। হাসপাতালে যে কটা সীট আছে হলের মধ্যে, তাতে কুলোয় না, সেই জন্য বারান্দায় কয়েকটা বেডের বন্দোবস্ত করে তাদের রাখা হয়েছে। এর আগে শিবলাল হাসপাতালে আসে নি। হাসপাতাল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটা ভয়ও আছে—রোগীর আর্তনাদ, রুগ্ন লালসা, এসব অনেকেই সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু শিবলালের কাছে এ দৃশ্য অন্যবিধ একটা অনুভূতির সঞ্চার করলে। হাসপাতালে না এলে হয়তো সেটা হত না। এই যে ক্ষত, গ্লানি, ব্যাধি, মানুষ এর থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে, এই তো মনুষ্যত্ব। এর দুটো দিক, যন্ত্রণা আর সেবা, একদিকে মানুষ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছে আর একদিকে আরোগ্যের জন্য জ্ঞান-সাধনা আর সেবা চলছে। তবেই সে মুক্তি আসে।

লীলার আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু শিবলাল উদ্বিগ্ন বোধ করল না, ওর শংকাও নেই, সংশয়ও নেই। ও ঠিক জানে, লীলা আসবেই। ও কেবল বন্ধু-মিলনের দৃশ্য দেখতে লাগল। দুপুর থেকে প্রত্যাশা করে রয়েছে রোগীরা, ওদিকে আত্মীয়রাও, হয়তো তারও আগে থেকে তৈরী হয়েছে। দুই পক্ষের চোখাচোখি হচ্ছে, আর সব উদ্বেগ ছাপিয়ে হাসি ফুটে উঠছে। কারও প্রিয়জন ভালোর দিকে, তার তো কথাই নেই—কারও অসুখ বেড়েছে, দর্শনার্থীর চোখে জলের ধারা বাধা মানছে না, তথাপি মিলনে সুখ আছে। মানুষের হৃদয় অবুঝ, আর-এক হৃদয়ের সাহচর্য কামনা করে, তাইতেই তা ফুটে ওঠে। শিবলাল মনে মনে কতবার লীলার সঙ্গে চোখাচোখি করলে, কত আগন্তুককে লীলা বলে ভুল করলে, আর পুলকিত হয়ে উঠল। 'ও বোধ হয় এতক্ষণে গেটের কাছে এসে গেছে···' শিবলাল মনে মনে ভাবলে।

নার্সরা ধব্‌ধবে পোষাক পরে হাঁসের মত খুটখুট করে এদিক-ওদিক করছে। থার্মমিটার দিয়ে কারও তাপ নিয়েছে, কাউকে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিলে। প্রয়োজনীয় সংবাদ নিলে কারও বন্ধুর কাছে। কাকেও বা তিরস্কার করলে। শিবলাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

অবশেষে লীলা এল। একেবারে কাছে চলে না আসা অবধি তাকে চিনতেই পারে নি শিবলাল—যদিও তাকেই ওদিক দিয়ে বারান্দায় ঢুকতে দেখেছে আর যখন লীলা কয়েকটা বিছানা পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে আসছিল

তখন তারই দিকে তাকিয়েছিল ও। লীলা আগাগোড়া পরিপাটি করে সেজে এসেছে। কালকের সেই সাদা সিল্কের পুরাণো চাদরটা ওর গায়ে জড়ানো নেই। সাদা জামার ওপর ঘন-নীল সিল্কের একটা শাড়ি পরে এসেছে ও। ওর কেশ এবং বস্ত্রের বিন্যাস, ওর হাঁটবার ভঙ্গী, ওর মুখের ওপর একটা সতর্ক অথচ আত্মগত ভাব, সব মনে করিয়ে দিলে যে এখানে আসবার জন্য ও অনেকক্ষণ ধরে সজ্জা এবং প্রসাধন করেছে।

'আপনি কেমন আছেন আজ...' শিবলালের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে মৃদু স্বরে লীলা জিজ্ঞেস করলে। এই স্বর শিবলালের কানে সঙ্গীতের মতো শোনাল। কিন্তু লজ্জায় তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলে ও। কেমন করে লীলার দিকে তাকিয়েছিল ও? সহসা ওর মনে হল, লীলাকে এমনি করে সে প্রত্যাশা করে নি।

'আমি আজ ভাল আছি, বস তুমি...' আবার চোখ তুলে জড়ানো জড়ানো স্বরে বলতে গেল শিবলাল, কিন্তু তার আগেই লীলা ওর বিছানায় বসে পড়ল—আজ বালিশের পাশে নয়, কাল যেখানে পুষ্প বসেছিল, সেখানে ওর পায়ের পাশে বসল সে, হাতে কিসের একটা মোড়ক পাশে নিয়ে। শিবলাল কাল শুধু ওর মুখখানাই দেখেছিল; আজ ওর পূর্ণায়ত, লাবণ্যময়, উজ্জ্বল দেহখানা দেখতে পেলে। লীলা কি সেই জন্যই আজ ওখানে বসেছে!

'পুষ্পদিরা কেউ আসেন নি এখানে?' লীলার সুন্দর ঘাড়খানি কাত হয়ে উঠল, শিবলালের চোখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করলে ও। শিবলালের বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা করে উঠল, এই আত্মীয়-সম্বোধনটা কেন জানি তার ভাল লাগল না। মনে হল, কালকের ওর সেই অশ্রু-ভেজা মুখের সঙ্গে এই মোহিনীর কোনো মিল নেই। ছলনাময়ী আজ কি তাকে নিয়ে খেলা করবার জন্য এসেছে?

'ওরা কাল এসেছিল, আজ হয়তো আবার আসবে...' শুকনো স্বরে শিবলাল বললে, তবু লীলার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না ও। যেটা সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, সেইটেই 'তাকে অধিকার করে বসল। বুকের ভেতর রক্তধারা চঞ্চল হয়ে উঠল ওর, নাকের নিঃশ্বাস উঠল উষ্ণ হয়ে। নিজের এই আকস্মিক কামনাটা অস্বীকার করতে চাইলে ও, রুদ্ধ করতে চাইলে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেরে গেল। চোখ দুটো সতৃষ্ণ হয়ে উঠল ওর। লীলার প্রসাধন করা মুখের ওপর কালো ভ্রূ, টানা

'লীলা তুমি রোজ আসবে? আমি যত দিন অসুস্থ থাকব...'

লীলা হাতখানা সরিয়ে নিলে। কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল ও, হাত দুটি জড়ো করে। বললে, 'আপনি আমাকে ও-কথা বলবেন না...অত সুখ সহ্য হবে না আমার...আমি বড় অভাগিনী...' বলতে বলতে লীলার চোখ দু'টি সজল হয়ে এল।

'না-না, কেন একথা বলছ তুমি...' মুহূর্তের জন্য সংশয়ে কালো হয়ে উঠতে চাইল শিবলালের মন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলালে ও। লীলার সজল চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, 'সব ঠিক আছে, আমি আর ভুল করব না।' বললে, 'লীলা, বুঝতে পার না, তুমি এলে আমার কত ভাল লাগে। মনে হয়, আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠব। তুমি আরও একটু অপেক্ষা করে যাও, পুষ্পরা এলে দেখা হবে।'

অধ্যায় ১৪

কত দিন হয়ে গেল শিবলাল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মাথার ঘাও শুকিয়ে উঠেছে ওর। এখন আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয় না। কারখানা খুলে যাওয়াতে নিয়মিত কাজেও যোগ দিয়েছে ও। কেবল দেহের দুর্বলতাটা এখনও পুরোপুরি যায় নি। তবে পুষ্পর শাসন আর তত্ত্বাবধানে সেটাও আর বেশি দিন থাকবে বলে মনে হয় না। এখন সে ভগ্নীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছে।

লীলার সঙ্গে শিবলালের বিয়ের সমস্ত কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে। আগামী অগ্রহায়ণে বিয়ে হবে। বনমালীরও আর আপত্তি নেই। পুষ্প বনমালীর কাছে কয়েক বারই গিয়েছে, লোকটার ওপর কেমন মায়া বসে গেছে ওর। আত্মীয়-বন্ধুরা সকলেই একটা প্রত্যাশা নিয়ে রয়েছে।

পুষ্প আর কল্যাণীর আনন্দের সীমা নেই। বিশেষ করে পুষ্পর। নানা কারণে ওর বুকের আগল খুলে গেছে। লীলাকে বউ করে ঘরে আনার

ইচ্ছে ছিল বাবার, আর সেটা পূর্ণ হতে চলেছে সে জন্যও বটে, লীলার নামে যে কলংকের কথা রটেছিল সেইটে মিথ্যে হয়ে গেছে সে জন্যেও বটে। তাছাড়া, এই সেদিন যে বিপদ ঘটল, সেটার থেকে শিবলাল রক্ষা পেয়েছে। অনেক দুঃখ, অনেক অশ্রুর পর, এই মিলন সত্যিই সুখের হয়েছে। এ তাদের প্রাপ্যও ছিল। আরও একটি কারণ আছে। সেটা তার মেয়েলি স্বভাবের জন্যে। লীলাকে সত্যিই সে ভালবেসেছিল। যে দিন পুষ্প বাবার কাছ থেকে প্রথম লীলার কথা শোনে (সেটা কয়েক বছর আগেকার কথা) সেদিন থেকেই। তাছাড়া, লীলার মতো মৃদু স্বভাবের ফুটফুটে মেয়েটি বউ হিসেবে ঘরে আসবে, এতে তার সুখ, গর্বের শেষ ছিল না।

কথা আছে, শ্রাবণের শেষে অর্থাৎ আর মাত্র দু'দিন পরে পুষ্প শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে এবং অগ্রহায়ণ মাস পড়লেই ফিরে আসবে। সব কিছু দেখা-শোনা এবং আয়োজন করার ভার তো তারই। এই কটা দিন ও কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে…একবার রামবাঁধে কানাইদের বাড়ি, আর একবার বনমালীদের বাড়ি। কখনো কখনো তিন জনেই—কল্যাণী, লীলা, আর সে নিজে—একসঙ্গে হতেও পারছে। আজ কানাই শিবলাল আর বনমালী এই দুই বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে গেছে রাত্রিতে খাবার জন্য। ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করে পুষ্প আর কল্যাণী একটা শয়তানি করেছে। পুষ্পকে সকাল বেলাই নিয়ে চলে গেছে কল্যাণী, তাকে সাহায্য করবার জন্য। বি-শিফ্‌টের কাজ সেরে বনমালীর যেতে রাত্রি হবে। তাই বিকেলে লীলাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে শিবলালেরই ওপর।

লীলা বা শিবলাল কেউই এটা বুঝতে পারে নি আগে থেকে। শিবলাল বরসিংবাঁধে লীলাকে নিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখল ওদের পরিচিত রিক্সাওয়ালা কালু সেখ রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি কালু, কি খবর?'

'আজ্ঞে, আপনারা যাবেন তাই…'

শিবলাল পেছনে লীলার দিকে তাকাল।

'আজ্ঞে না, উনি লয়। সকাল বেলা দিদিমণি আমারে কয়ে দিয়েছেন। আমি অনেকক্ষণ আছি এখেনে…'

শিবলাল আবার লীলার দিকে তাকাল, ওর লজ্জা করছিল। লীলা গম্ভীর

এবং শিবলালের মুখের দিকে না তাকিয়েও বুঝলে তার চোখ মাঠের দিকে পড়েছে।

শেষ শ্রাবণের অপরাহ্ণে মাঠের চেহারা সত্যিই অপূর্ব হয়ে উঠেছিল যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ—সোনালী আলোতে হিলহিল করে উঠেছে বাতাস বইছে আর সবুজের ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। দূরে দিগন্তের কাছে যেখানে নীল আকাশ আর সবুজ মাঠ মিলেছে, সেদিকে তাকালে বুকের ভেতরটা ভরে যায়…এত বড়, এমনি উদার! পৃথিবীর মাটির ওপর মানুষ ক্ষতের দাগ এঁকে দিচ্ছে, তবু কল্যাণী লক্ষ্মী মানুষের জন্য অন্ন সাজিয়ে দিচ্ছেন নিজের হাতে। এই মাঠের দিকে না তাকালে বোঝা যায় না সেটা।

সহসা লীলাকে ধরে পেছন দিকে ফেরাল শিবলাল। জিস্কোর কারখানাটার ওপর তার চোখ পড়ল। সারি সারি কালো মিল আর বিল্ডিং-এর চেহারা মুহূর্তে তার রুক্ষ রূপ নিয়ে আকাশের গায়ে ফুটে উঠল। অতিকায় দানোর থ্যাবড়া নাকের মতো ফার্নেসের স্টোভগুলো উঁচু হয়ে রয়েছে স্টোভ আর বিভিন্ন মিল থেকে কালো চিমনিগুলো আকাশ ফুঁড়ে উঠে ধোঁয়া ছাড়ছে। শিবলাল বললে, 'লীলা, তুমি হচ্ছ লক্ষ্মী, এই মাঠের মতোই, আর আমি হচ্ছি ঐ, দেখ…' ও কথা না শেষ করে লীলার ডান হাতের মুঠিতে এবং বাম বাহুতে চাপ দিলে।

লীলা কি জবাব দিতে গেল, কিন্তু শিবলালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আসঙ্গে সহসা আড়ষ্ট হয়ে উঠল। লীলাকে পেছনে ঘোরাবার সময়, এবং কারখানা আর মাঠের মিলনের ইঙ্গিত করতে গিয়ে শিবলাল আবেগভরে ওকে এত কাছে টেনেছিল যে লীলা কার্যত তার দুই হাতের মধ্যে এসে গিয়েছিল। লীলা কটাক্ষে সেটা দেখে নিয়ে বললে, 'এই, ছাড়ুন, লোকজন আছে না।'

শিবলাল থতমত খেয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ হাত দুটো শিথিল হয়ে নেমে এল ওর। লজ্জায় মাথা নিচু করে প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল ও। বুকের মধ্যে তার রক্তস্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়তে লাগল, আজকে আবার নতুন করে অনুভব করলে ও, লীলা সুন্দরী, তরুণী, এবং সে তার বধূ হবে।

কানাইদের বাড়িতে পৌঁছোবার আগেই কানাইয়ের স্ত্রী কল্যাণী বেরিয়ে এল, এবং ওদের বাগানের বেড়ার ধার থেকে নিয়ে গেল ওদের। 'এস, ভাই, এস…এতদূর আসতে খুব কষ্ট হল…' কল্যাণী এসে লীলার হ

ধরলে। শিবলালকে কিছু বললে না, কিন্তু অর্থপূর্ণভাবে মুচকে হাসল, যেন বলতে চাইলে, 'কি, যে জন্যে তোমাদের একলা আসবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, তার কিছু হয়েছে ত, না কি এতটা পথ শুধু নিরামিষ আসা হয়েছে?' মনে হল, কল্যাণী একেবারে নিরাশ হয় নি। খুশি হয়ে লীলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

শিবলাল কিছুক্ষণ বাগানে ফোটা গোলাপ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ভরা মেঘের লক্ষ্যহীন ভেসে যাওয়ার মতো ঘরের ভেতর ঢুকল। কেউ তাকে কিছু বলল না, কাউকে দেখতেও পেল না ও। কিছু না ভেবে আস্তে আস্তে কানাইদের শোবার ঘরে এসে ঢুকল। কিন্তু ঢুকেই চমকে গেল ও, যেন সম্পূর্ণ একটা পৃথক আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়েছে। তক্তপোষের ওপর পুষ্প বসেছিল···মুখখানি গম্ভীর। মোটা মোটা কঙ্কন পরা হাত দুটি কোলের ওপর রাখা। শিবলাল ওকে দেখবামাত্র বুঝলে, ও তারই জন্য অপেক্ষা করছে এবং যে কথাটা এতক্ষণ বুকের মধ্যে বহন করছে সেটা এখনই ও বলবে। 'কিরে পুষ্প, এখানে একলা বসে আছিস···, শিবলালের কণ্ঠস্বরে স্বতই একটা উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'দাদা, বস, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে···' পুষ্প বললে।

শিবলাল বোনের মুখের দিকে চোখ রেখে ওর পাশে এসে বসল। পুষ্প বললে, 'দাদা, লীলার সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা ভীষণ ভুল ধারণা ছিল, সেটা সত্যি নয়···'

শিবলালের বুকের ভেতর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। শেষ দফায় কোন বজ্রের আঘাতে সব চুরমার হয়ে যাবে কে জানে।

'দাদা, কথাটা আমি তোমাকে অনেকবার বলব বলে ভেবেছি, কিন্তু পারি নি। আজ তোমার সব শোনা দরকার, তা না হলে ওর ওপর ভীষণ অন্যায় হবে···' বলে লীলার কলঙ্ক সম্বন্ধে পুষ্প যা শুনেছিল, সেটা কতদূর মিথ্যে, হরির মার বলা সব ঘটনা এক এক করে বলে গেল ও। জলগর্ভ মেঘের মতো আপনাকে নিঃশেষ করে দিয়ে তৃপ্তি পেল পুষ্প। শেষে বললে, 'লীলা খুব খাঁটি মেয়ে, দাদা, অমন রত্ন হয় না। তাচ্ছিল্য করবার জিনিস ও নয়। ওকে ভালভাবে নিও।'

'ও, এই কথা···' শিবলালের বুকের ভেতর থেকে অসহ্য গুরুভার নেমে গেল যেন। লীলার সম্বন্ধে সব কথা শুনে খুশি হয়ে উঠল ও। কিন্তু সহসা

আর একদিক থেকে তার বুকের ভেতর একটা বড় অবলম্বন চলে গেল যেন। লীলার সব ত্রুটি সত্য বলেই ধরে নিয়েছিল সে আর বীরের মতো সেই বাধা বুকে ঠেলে এগোচ্ছিল। সেটা স্বীকার করে নিয়েই ওকে ভালবেসেছিল। আজ জানল লীলা নিষ্পাপ, তার কোনো দোষ নেই। সহসা তার উচ্ছ্বসিত ভালবাসা নিষ্প্রভ হয়ে এল যেন।

'আশ্চর্য, যাকে আমরা যা বলে জানি, সে তা নয়…' শিবলাল মনে মনে ভাবল। 'যাকে আমরা পাপ বলে আঘাত করি তা কি সত্যই পাপ? যাকে ভাল বলে ভালবাসি, তা কি সত্যই ভালো? আশ্চর্য!'

জীবন সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ নতুন চেতনা, একটা নতুন দিগন্ত যেন তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, এসব কখনই জীবন নয়, তাতে আরোহণ করবার সিঁড়ি মাত্র। জীবন এসব অতিক্রম করে পেতে হয়। সেখানে সবই সত্য, সবই প্রয়োজনীয়। জীবন ঊর্ধ্বায়িত এক বিরাট সত্তা, তা যেমনি অগম্য তেমনি সত্য!

পুষ্প দাদার চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু দাদা, বাবাকে ভুলো না যেন। মনে মনে তাঁকে প্রণাম কোরো।'

শিবলাল মুখ তুলে তাকাল বোনের মুখের ওপর, উত্তরে শান্তভাবে হাসল। যেন বলতে চাইলে, 'পুষ্প, সে কথা কি আমাকে বলা দরকার!'

লীলা ঘরে ঢুকল, কিন্তু ঢুকেই থমকে গেল ও। বুদ্ধিমতী মেয়েটি বুঝতে ভুল করল না যে ভাই-বোনের মধ্যে একটা গভীর বোঝা-পড়া চলছে। একবার ভাবলে ফিরে যাবে, কিন্তু তার পরেই বুঝলে এদের মধ্যেই তো তাকে স্থান করে নিতে হবে, এদের হৃদয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে তাকে। তখন ধীর পায়ে এগিয়ে এল।

'এস বৌদি, এস...' পুষ্প ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশটিতে বসাল।

॥ দশম পর্ব সম্পূর্ণ ॥

। উত্তর খণ্ড সমাপ্ত।

॥ গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥

। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস ।

॥ উত্তর খণ্ড ॥

এ. পি র ব ই

লেখকের অন্যান্য বই।

উপন্যাস ঃ

লখীন্দর দীগার

কটা-ভানারী

জননী

প্রবন্ধ ঃ

রবীন্দ্রনাথ

॥ রবীন্দ্র-রচনার পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ॥

গুণময় মান্না

জুনাপুর স্টীল

উত্তর খণ্ড ॥



এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স

প্রকাশক: নির্মলেন্দু ভদ্র

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
এ/৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা ১২

মুদ্রাকর। বিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৯

ব্লক নির্মাতা। স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ। নিউ প্রাইমা প্রেস
১১ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদ-রূপায়ণ। খালেদ চৌধুরী

দাম। নয় টাকা

শম্ভুদা

জীবনের যে প্রান্তে আপনি নীরবে সাধনা করে চলেছেন, আমি রয়েছি তার থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তবু আপনাকে কিছু-কিছু বুঝতে যে পারি, এই বই পড়ে হয়তো তা বুঝবেন।